আরোগ্য-নিকেতন

সূচনা

আরোগ্য-নিকেতন অর্থাৎ চিকিৎসালয়।

যে চিকিৎসালয়টির কাহিনী বলতে বসেছি, সেটি স্থাপিত হয়েছিল প্রায় আশী বৎসর পূর্বে। এখন সে ভেঙে পড়েছে। তার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। তবে কোন রকমে এখনও খাড়া রয়েছে। প্রতীক্ষা করছে তার সমাপ্তির; কখন সে ভেঙে পড়বে সেই ক্ষণটির পথ চেয়ে রয়েছে। তার সর্বাঙ্গের ফাটলে ফাটলে শতাব্দীর ঐতিহাসিক লিপি। সে লিপি অচিরেই ঢাকা পড়বে মাটির তলায়।

অথচ যেদিন স্থাপিত হয়েছিল—সেদিন স্থাপন-কর্তা জগদ্বন্ধু কবিরাজ মহাশয় বলেছিলেন, "যাবৎ চন্দ্রার্ক মেদিনী" অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য পৃথিবী যতকাল এত বড় ধৃষ্টতার কথা বলব না—বলব—আমাদের বংশে এই নবগ্রামের বসতি যতকাল থাকবে ততকাল থাকবে এ আরোগ্য-নিকেতন। হেসে বলেছিলেন—দম্ভ মনে করো না ভাই মিশ্র—দম্ভ নয়। বিদ্যা হ'ল সত্য—সেই সত্য রইল কুলের অক্ষয় সম্পদ হয়ে, আর এই সম্পদের কারবার হল—সংসারে শ্রেষ্ঠ লাভের কারবার। দেনা-পাওনা—দেওয়া নেওয়া দুই দিকের শ্রেষ্ঠ লাভ মিলবে এখানে, অথচ দুই পক্ষের কেউ ঠকবে না। সুতরাং এর পতন নেই, এ সাগর-সঙ্গম-মুখী নদীর মত ক্রমশঃ বিস্তৃত এবং গভীর হয়েই চলবে।

জগদ্বন্ধু মহাশয়ের বন্ধু চন্দ্রশেখর মিশ্র ছিলেন একেবারে হিসেবনবীশ বিষয়ী লোক, অর্থাৎ জমিদারের গমস্তা। তিনি বড় বড় অঙ্ক বুঝতেন, মামলা মকদ্দমা বুঝতেন, কথা বুঝতেন না। তিনি বলেছিলেন—নাড়ী টিপে কবি

গাছ-গাছড়া তুলে এনে পাঁচন বড়ি দিলেই পয়সা—অন্তত চৌদ্দ আনা লাভ তোমার বাঁধা—সে বুঝলাম—কিন্তু—রোগীর লাভ কতটা? মৃত্যু-রোগে নিষ্কৃতি নাই—সুতরাং পয়সা খরচ করে—

বাধা দিয়ে জগদ্বন্ধু মশায় বলেছিলেন—পয়সার কথাটা পরের কথা। যে লাভ বললাম—সে লাভ পয়সার নয়, অথচ ওটাই সংসারে শ্রেষ্ঠ লাভ। একপক্ষের লাভ আরোগ্যলাভ, অন্যপক্ষের লাভ সেবার পুণ্য লাভ।

জান? বিশ্বসংসারে আরোগ্য লাভই হ'ল শ্রেষ্ঠ লাভ। যক্ষরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে যে সব প্রশ্ন ক'রেছিলেন তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল—লাভানামুত্তমং কিং—?

সংসারের লাভের মধ্যে সর্বোত্তম লাভ কি? যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যং অর্থাৎ আরোগ্য লাভই শ্রেষ্ঠ লাভ।

সেদিন চন্দ্রশেখর মিশ্র হেসেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই হঠাৎ বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ওই জগদ্বন্ধু মশায়ের চিকিৎসাতেই আরোগ্যলাভ করে বলেছিলেন—তুই ভাই আমাকে জীবনদান করলি, তুই জেনে রাখিস ভাই যে যদি কোনোদিন দরকার হয়—আমি তোর জন্যে জীবন দেব।

হেসে জগদ্বন্ধু মশায় বলেছিলেন—তা' হ'লে—লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যং—কথাটা স্বীকার করলি আজ?

হেসেই বলেছিলেন চন্দ্রশেখর মিশ্র—হ্যাঁ করলাম।

পরদিন নিজে জগদ্বন্ধু মশায়ের আরোগ্য-নিকেতনে এসে একটা কাঠির ডগায় ন্যাকড়া জড়িয়ে তেল সিন্দুরের লালরঙে নিজের হাতে দেওয়ালে মোটা হরফে লিখে দিয়েছিলেন—লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যং। শুধু ওই কথাটিই নয়—তারই নিচে আরও একটি কথা লিখেছিলেন—আতুরস্য ভিষক্ মিত্রং।

আরোগ্য-নিকেতন—নামকরণ তখন হয় নাই। তখন এ অঞ্চলের লোকেদের কতক বলত—'মশায়ের—হোথা', কতক বলত—'মশায়ের কবিরাজখানা'।

আরোগ্য-নিকেতন নাম-করণ হয়েছিল পুরুষান্তরে জগদ্বন্ধু মশায়ের ছেলে জীবন মশায়ের আমলে। তখন কালান্তর ঘটেছে। একটি নতুন কাল শুরু হয়েছে। দেশের কেমন যেন—নগরে নগরে তার অনেক আগেই শুরু হয়েছে—

এ-অঞ্চলে তখন সবে প্রারম্ভ। জীবন মশাই তাঁদের চিকিৎসালয়ের নাম-করণ ক'রে বড় একটি কাঠের ফালির উপর কাল হরফে আরোগ্য-নিকেতন নাম লিখে বারান্দার সামনে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়—জগদ্বন্ধু মশায় যে ঘরখানি করেছিলেন—সে ঘরেরও অনেক অদল-বদল করেছিলেন।

আজও দেখতে পাবেন।

আরোগ্য-নিকেতনের জীর্ণ পতনোন্মুখ ঘরখানি—ওই নামলেখা কাঠের ফলক—এমন কি—জীবন মশায়কেও দেখতে পাবেন, সেখানে গেলে।

* * *

যাবেন, মহানগরী থেকে শতাধিক মাইল—চলে যাবেন বড় লাইনের ট্রেণে। সেখান থেকে পাবেন একটি অপরিসর শাখা-রেলপথ। মাইল দশেক গিয়ে—পাবেন একটি সমৃদ্ধ গ্রামের স্টেশন। তার চারিদিকে দেখতে পাবেন কালান্তরের সুস্পষ্ট পরিচয়। দেখতে পাবেন, একখানা ট্যাক্সি, একখানা মোটর বাস, অনেকগুলি গরুর গাড়ি। স্টেশন থেকে এই আরোগ্য-নিকেতন দূর পথ নয়, সামান্য পথ, এক মাইলের কিছু উপর। প্রয়োজন হলে গরুরগাড়ী একখানা নেবেন। কিন্তু তার চেয়ে—হেঁটে যাওয়াই ভাল। দেখতে পাবেন ভাঙাগড়ায় বিচিত্র গ্রামখানিকে।

পাকা লাল কাঁকরে তৈরী শড়ক ধরে যাবেন। দেখবেন প্রাচীন কালের জমিদারদের বড় বড় নোনাধরা পাকা বাড়ী। ভাঙা বাগান। [illegible] পাঁচীল। শ্যাওলা-পড়া মন্দির। পুকুরের ভাঙা ঘাট। পুরানো মন্দির। চারিদিকে দেখবেন ধূলি-ধূসরতা। আবর্জনার স্তূপ। পতিত জায়গায় আগাছার জঙ্গল। এরই মধ্যে এক জায়গায় পাবেন এক পুরানো [illegible] [illegible], শাখা প্রশাখা জীর্ণ; গোড়াটা বাঁধানো;—তাতেও দেখবেন অনেক [illegible]। এটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা। এর পরই এই রাস্তাটি শেষ হয়েছে, মিশেছে [illegible] একটি পাকা শড়কের সঙ্গে। লাল মাটি ও নুড়ি জমানো রাস্তা, রাস্তার দুপাশে দোকান। এইটিই হ'ল বাজারপাড়া। প্রাণস্পন্দনে মুখরিত। মাল বোঝাই গরুর গাড়ীর সারি চলেছে, মানুষ চলেছে, কোলাহল উঠছে, [illegible] এখানকার বিচিত্র। বাজারটা দিনদিন বেড়ে চলেছে। চা-মিষ্টান্নের দোকান পাবেন; ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করলে এখানে ঢুকে পড়বেন। [illegible] মেডিকেল স্টোর্স [illegible]

পাশেই আছে সব চেয়ে ভাল চা-মিষ্টির দোকান। খুব খুঁজতে হবে না, নবগ্রাম মেডিকেল স্টোর্সের ঝকঝকে বাড়ী, আসবাব, বহু বর্ণে বিচিত্র বিভিন্ন ওষুধের বিজ্ঞাপন আপনার দৃষ্টি আপনিই আকর্ষণ করবে। বুশসার্ট প্যান্ট-পরা ডাক্তারকে গলায় স্টেথেসকোপ্ ঝুলিয়ে বসে থাকতে দেখতে পাবেন। ভাল চায়ের দোকানটা ঠিক এরই পাশেই।

এখান থেকে বেরিয়ে উত্তরমুখী একটি শাখাপথ পাবেন। রাস্তাটি খুব পরিসর নয়;—একখানি গাড়ি যায়, দুপাশে দুসারি লোক বেশ স্বচ্ছন্দে চলতে পারে।

একটু, বোধ হয় সিকিমাইল চলবেন ছায়াচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে; দুপাশে চার-পাঁচটি পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর পাড়ের উপর আম, জাম, শিরীষ, তেঁতুলের গাছগুলি দুপাশ থেকে পল্লব বিস্তার ক'রে পথটিকে ঢেকে রেখেছে। একটি পুকুরে একটি ছোট বাঁধাঘাটও পাবেন। এখান থেকে বের হলেই পাবেন উন্মুক্ত প্রান্তর। এখানে দেখবেন বিচিত্র দৃশ্য। নতুন বাড়ীঘর, একেবারে নতুন কালের ফ্যাশন, নতুন কালের ইঞ্জিনীয়ারিংএর নিদর্শন। ক্যানেল আপিস তৈরী হয়ে গেছে। আশে পাশে ছোট ছোট কোয়ার্টার। এ দিকে নতুন ক্যানেল তৈরী হচ্ছে। এর পরই পাবেন আর একদফা বাড়ীর সারি; গুটিকয়েক ছোট ইমারতকে ঘিরে বড় বড় ইমারত তৈরী চলছে। চারিদিকে ভারা বাঁধা, রাজ মজুর খাটছে, মজুরিণীরা গান গাইছে আর ছাদ পিটছে। হ্যাট কোট প্যাণ্ট পরা ইঞ্জিনীয়ার ঘুরছে সাইকেল হাতে নিয়ে। ওই ছোট বাড়ীগুলি এখানকার হাসপাতাল। ছোট হাসপাতালটি, ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের ছোট খাটো দুটি কোয়ার্টার; আরও ছোট কয়েকটি কাঁচা বাড়ীর বাসা, এখানে থাকে নার্সেরা। একটু দূরে একটি ছোট ঘর দেখবেন—সেটি মতিয়া ডোমের বাড়ী। আর ওই অর্ধ-সমাপ্ত বড় ইমারতটি—ওটাও হাসপাতালের ইমারত, এ অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী হচ্ছে।

এ সব দেখে থমকে দাঁড়াবেন না। নতুন গঠনের মধ্যে আশা আছে, ভবিষ্যত গড়ছে সুতরাং মনে মোহের সঞ্চার হবে, স্বপ্ন জেগে উঠবে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে; সেই স্বপ্নে ভোর হ'য়ে পড়বেন, আরোগ্য-নিকেতন পর্যন্ত যেতে আর মন উঠবে না।

চলে যাবেন এগিয়ে, এই সব নতুন কালের ঝক্‌ঝকে ইমারতগুলিকে বাঁয়ে রেখে চলে যাবেন। আরও মাইলখানেক পথ যেতে হবে। দু'ধারে শস্য-ক্ষেত্র; মাঝখানে লাল কাঁকর দেওয়া ওই একখানি গরুরগাড়ি যাওয়ার মত আঁকা-বাঁকা পথটি। মাইলখানেক পর গ্রাম দেবীপুর; এই গ্রামেই আছে পুরাতন আরোগ্য-নিকেতন।

শ্রীহীন গ্রাম দেবীপুর, দারিদ্র্যের ভারেই শুধু নিপীড়িত নয়, কালের জীর্ণতাও তাকে জীর্ণ ক'রে তুলেছে। লক্ষ্য ক'রে দেখবেন—গ্রামের বসতির উপরে যে গাছগুলি মাথা তুলে পল্লব বিস্তার ক'রে রয়েছে তার অধিকাংশই প্রবীণ প্রাচীন, নতুন গাছের লাবণ্যময় শোভা কদাচিৎ চোখে পড়বে। জীবনের নবীনতার ধ্বজা হ'ল নতুন সতেজ গাছের শ্যামশোভা। প্রথমেই চোখে পড়বে—ঝড়ে-শুয়ে-পড়া শূন্য-গর্ভ-কাণ্ড বকুলতলা, ধর্মঠাকুরের আটন। তার পরেই পাবেন কামারশালা; অবশ্য কামারশালাটির অস্তিত্ব অনেক আগে থেকেই অনুভব করবেন আপনি। কামারশালার ঠং-ঠং শব্দ দেবীপুরের দক্ষিণে—ওই নতুনকালের বসতি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠছে যে প্রান্তরে—সেই প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে।

কামারশালে দেখবেন চাষীদের ভিড়, গলিত লোহার ফুলকি। তারপর গ্রাম শুরু। শান্ত ছোট গ্রাম। বাঁশের বনে শিরীষগাছের মাথায় পাখি ডাকে। নানা ধরণের পাখি।

কুহু—কুহু—কুহু!

চোখ—গে-ল। চোখ—গে-ল!

কৃষ্ণ কো-থা হে?

বউ কথা কও!

কা—কা—কা—কা! ক-ক্ ক-ক্ ক-ক্।

মধ্যে মধ্যে বড় অর্জুন গাছের মাথার উপরে চিল ডেকে ওঠে—চি—লো। চি—লো। আর শালিকের ঝাঁকের কলহ-কলরব—ক্যা-ক্যা-ক্যা কর্‌কর্‌ কিচিরমিচির কট্-কট্ কট্ কট্; তারপরই লেগে যায় ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি।

কিন্তু মানুষের দেখা পাবেন কদাচিৎ। যা' দু-এক জন পাবেন তারা দেহে জীর্ণ, মনে ক্লান্ত, দৃষ্টিতে সন্দিগ্ধ। আপনাকে দেখেও কথা বলবে না।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে যাবে, কিছু দূর গিয়ে পিছন ফিরে আবার তাকাবে।

সেকালে অর্থাৎ যখন প্রথম স্থাপিত হয়েছিল আরোগ্য-নিকেতন তখন ধারা ছিল অন্য রকম। মানুষেরাও ছিল আলাদা। একালের মত জামা জুতো পরত না; সেকালের লোকেরা হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরে অনাবৃত প্রশস্ত বক্ষ নিয়ে চলে যেত। ধবধবে কাপড় জামা চকচকে জুতোপরা আপনাকে দেখলে—হেঁট হয়ে নমস্কার করে বলত—কোথা থেকে আসা হচ্ছে? কোথায় যাওয়া হবে?

আপনি বলতেন—আরোগ্য-নিকেতন।

—ওঃ। তা নইলে—আপনকাদের মত মনুষ্য আর কোথা যাবেন—ই গেরামে! তা' চলে যান। ওই সামনেই দেখছেন—মা-কালীর থান, বাঁয়ে চন্দ মশায়ের লটকোনের দোকান—ডাইনে ভাঙবেন—দেখবেন বাঁধানো কুয়ো; সরকারী কুয়ো, তার পাশেই ডাক্তার মশায়ের কবরেজখানা অর্থাৎ আরোগ্য-নিকেতন। লোকে লোকারণ্য। গাড়ির সারি লেগে আছে। চলে যান।

আজ কিন্তু সেখানে মানুষজন পাবেন না। লোকারণ্য কথাটা আজ অবিশ্বাস্য, এমন কি হাস্যকর বলেই মনে হবে। সকালের দিকে দু' জন বড় জোর চার জন রোগী আসে, হাত দেখিয়ে চলে যায়; আরোগ্য-নিকেতনে আজ আর কোন ওষুধ পাওয়া যায় না; ওষুধের আলমারীগুলি খালি পড়ে আছে। বার্নিশ চটে গেছে, ধুলোয় সমাচ্ছন্ন। দুটো তিনটের কব্জা ছেড়ে গেছে। যারা হাত দেখাতে আসে তারা হাত দেখিয়ে চলে যায়, তারপর বাকী সময়টা স্থানটা প্রায় খাঁ-খাঁ করে।

অপরাহ্ণের দিকে গেলে দেখতে পাবেন জগদ্বন্ধু মশায় একা বসে আছেন। দেখতে পাবেন উত্তর-দক্ষিণে লম্বা—লম্বায় প্রায় পঁচিশ হাত একখানা খোড়ো ঘর। প্রস্থে আট-দশ হাত। সামনে একটি সিমেণ্ট করা বারান্দা। কেটে প্রায় ফুটি-ফাটা হয়ে গিয়েছে, মধ্যে মধ্যে খোয়াও উঠে গিয়েছে, তিন পাশের [illegible] ইটের ভিত স্থানে স্থানে বসে গিয়েছে। ধুলো জমে আছে বারান্দায়। শুধু বারান্দার দুই কোণে দুটি রক্তকরবীর গাছ সতেজ সমারোহে অজস্র লাল

ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে বাতাসে দুলছে। ওই গাছ দুটির দিকে চেয়ে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। প্রায় সত্তর বছর বয়স। স্থবির ধূলিধূসর দিক-হস্তীর মত বৃদ্ধ। এককালের বিশাল দেহের কাঠামো কুঞ্চিত দেহচর্মে ঢাকা; বক্ষপঞ্জর প্রকট হয়ে পড়েছে, মোটা মোটা হাত—তেমনি দুখানি পা, সামনে দেখবেন প্রকাণ্ড আকারের অতিজীর্ণ এক-জোড়া জুতো, পরনে ময়লা থান ধুতি—তাও সেলাই করা; শোভা শুধু শুভ্র গজদন্তের মত পাকা দাড়ি-গোঁফ; মাথার চুলও সাদা—কিন্তু খাটো করে ছাঁটা।

পুরানো আমলের একখানা খাটো-পায়া শক্ত তক্তাপোষের উপর ছেঁড়া শতরঞ্জি বিছিয়ে বসে থাকেন, ফুলে-ভরা গাছ দুটির দিকে চেয়ে—শুধু ভাবেন। নানা ভাবনা।

ভাবেন—মানুষের চেয়ে গাছের আয়ু কত বেশী! ওই করবীর কলম দুটি তাঁর বাবা লাগিয়েছিলেন—সে প্রায় ষাট বৎসর হল! আজও গাছ দুটির জীবনে এতটুকু জীর্ণতা আসে নাই। অবশ্য ফসল জাতীয় গাছের কথা স্বতন্ত্র। ওদের ধারাই স্বতন্ত্র। জীব-জগতে যেমন অণ্ডজ কীট—উদ্ভিদ-জগতে তেমনি ফসল। একসঙ্গে বহু প্রসব করেই ওরা মরে। ওদের কর্ম ওখানেই শেষ।

ভাবনায় ছেদ পড়ে যায় তাঁর। কে যেন কোথায় অস্বাভাবিক বিকৃতস্বরে কি যেন বলছে। চারিদিকে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পান না। পরক্ষণেই হাসেন তিনি। হাটকুড়ো জেলের পোষা শালিক পাখিটি আশে-পাশে কোন গাছে বসে আছে, গাছতলার পথে কাউকে যেতে দেখে কথা বলছে। বলছে—মাছ নাই! মাছ নাই! মাছ নাই।

পাখিটা সাধারণ পাখি থেকে খানিকটা ব্যতিক্রম। পোষমানা পাখি—তাড়া পেয়ে উড়ে গেলে আর ফেরে না। প্রথম প্রথম আসে বটে বাড়ির কাছে। কিন্তু খাঁচাতে আর ঢোকে না। এ পাখিটা কিন্তু ব্যতিক্রম। ওকে সকালে খাঁচা খুলে ছেড়ে দেয়, পাখিটা উড়ে যায়, আবার সন্ধ্যার সময় ঠিক ফিরে আসে। খাঁচার দরজা খোলা থাকলে একেবারে খাঁচায় ঢুকে পড়ে। না থাকলে—খাঁচার উপর বসে ডাকে—মা—মা। মা। খুড়ো, খুড়ো, অ-খুড়ো।

বুড়ো হল হাটকুড়ো জেলে। হাটকুড়োর স্ত্রী ওকে বুড়ো বলে ডাকে। সেইটা পাখিটা শিখেছে। পাখিটা বোধ হয় কোথাও কাছেই বসেছে, জীবন দত্তকে ডেকে কথা বলছে। মানুষের দর্শনে পাখিটা জীবনে সার্থকতা লাভ করেছে। অন্ততঃ লোকে তাই বলে। বলে—পূর্বজন্মের সাধনা কিছু আছে। কেউ বলে—মানুষই ছিল পূর্বজন্মে, কোন কারণে শাপগ্রস্ত হয়ে পক্ষী হয়ে জন্মেছে।

জীবন ডাক্তার দাড়িতে হাত বুলান। সঙ্গে সঙ্গে হাসেন। জীবন জন্মান্তর সম্পর্কে তিনি কোন ভাবনাই ভাবেন না। ঘন ঘন হাত বুলান তিনি দাড়িতে। এক একবার মাথায় খুব ছোট করে ছাঁটা চুলের উপর হাত বুলাতে বেশ লাগে। তালুতে সুড়সুড়ি লাগে।

সেতাব মুখুজ্জে এখনও এল না!

সে এলে দাবা নিয়ে বসা যায়; কালসমুদ্রের খানিকটা—অন্ততঃ রশিখানেক—কাগজের নৌকায় পরমানন্দে অতিক্রম করা যায়। ডাক্তার পথের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ণে ঘুনি-ঘুনি বৃষ্টি পড়ছে, উতলা হাওয়া বইছে। কিন্তু সেতাবের সাদা ছাউনি দেওয়া ছাতা এর মধ্যেও বেশ দেখা যাবে; বয়স হলেও ডাক্তারের চোখ বেশ তাজা আছে। ইদানীং সুচে সুতো পরাতে চশমা সত্ত্বেও একটু কষ্ট হচ্ছে। তা হোক, দূরের জিনিস বিশেষ করে কালোর গায়ে সাদা কি সাদার মধ্যে কালো—ছাতার মত বড় জিনিস চিনতে কোন কষ্ট হয় না তাঁর। দেহ সম্পর্কে ভাল যত্ন নিলে এটুকু দৃষ্টিহানিও বোধ হয় হোত না। সেতাবের দেহও ভাল আছে। মধ্যে মধ্যে সেতাবের নাড়ী তিনি পরীক্ষা করে দেখেন। বুড়োর যেতে এখনও দেরি আছে। নাড়ীর গতি কি?

জীবন ডাক্তার নাড়ীর মধ্যে কালের পদধ্বনি অনুভব করতে পারেন। এটি তাঁর পিতৃ-পিতামহের বংশগত সম্পদ। তাঁরা ছিলেন কবিরাজ। তিনিই প্রথম ডাক্তার হয়েছেন। কবিরাজীও অবশ্য জানেন। কিন্তু কবিরাজী মতে চিকিৎসা বড় করেন না। তবে এই নাড়ী দেখা তিনি চর্চা করেছেন। নাড়ীর স্পন্দনের মধ্যে সুস্থ জীবনের পদক্ষেপ, রোগাক্রান্ত জীবনের পদক্ষেপ, কালের দ্বারা আক্রান্ত জীবনের পদক্ষেপ তিনি বুঝতে পারেন।

নাড়ী দেখে বহুজনের মৃত্যু তিনি পূর্বাহ্ণেই ঘোষণা করেছেন তাঁর চিকিৎসক জীবনে। একের পর এক রোগীর কথা পলকে পলকে মনে উঠে মিলিয়ে যায়। এই মনে পড়াটার গতি অতি অস্বাভাবিক রকমের দ্রুত। থেমে গেল একজায়গায়। কৈলাস আচার্যের ছোট ছেলে শশাঙ্কের মৃত্যু ঘোষণার কথা। মনে পড়ল শশাঙ্কের ষোড়শী বধূর সেই বিচিত্র দৃষ্টি; তার সেই মর্মান্তিক কথাগুলি!

পেশায় তিনি চিকিৎসক।

কত মৃত্যু—কত কান্না—কত নীরব মর্মান্তিক শোক তিনি দেখেছেন। রোগীর জীবনান্ত ঘটেছে—তিনি ভারী পায়ে স্থির পদক্ষেপে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা তিনি করেছেন, কিন্তু জেনেই যে, ব্যর্থ চেষ্টা। মনকে বেঁধে প্রস্তুত রেখে করতেন। চলে আসতেন—ভাবতে ভাবতেই পথ চলতেন। পথের মানুষ অতি অন্তরঙ্গ জনও চোখে পড়ত না। রোগের কথা—চিকিৎসার কথা ভাবতেন; কখনও কখনও মৃত্যুর কথাও ভাবতেন। ডাক্তারের ভাবনামগ্ন চিত্ত তখন বিশ্বলোক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে। চর্মচক্ষের দৃষ্টিপথে মানুষ পড়েও পড়ত না। বহু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দূরের গ্রামে, রোগীর মৃত্যুর পর বাধ্য হয়েই বাড়ীতে প্রতীক্ষা করতে হ'ত; শোকবিহ্বল পরিবারটির মধ্যে বসে থাকতেন অচঞ্চল হয়ে, গুমোটে ভরা বায়ুপ্রবাহহীন গ্রীষ্ম-অপরাহ্ণের স্থির বনস্পতির মত। লোকে এই কারণে ডাক্তারদের বলে থাকে—ওরা পাথর। তা মিথ্যে বলে না তারা। পাথর খানিকটা বটে ডাক্তারেরা। মৃত্যু এবং শোক দেখে চঞ্চল হবার মত মনের বেদনাবোধও নষ্ট হয়ে যায়। মনে ভাঁটা পড়ে যায়। কিন্তু শশাঙ্কের মৃত্যু-রোগে—মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে—ঘোষণা করতে গিয়ে আঘাত তিনি পেয়েছেন—কিন্তু চিকিৎসকের কর্মে কর্তব্যে ত্রুটি তিনি করেন নি। তাঁর নিজের পুত্র—।

তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। নিজের পুত্রের হাত দেখেও তিনি তার মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন। তিনমাস আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। একথা তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন।

ছেলেও ছিল ডাক্তার, তাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছিলেন। আজ ভাবেন—কেন বলেছিলেন এ কথা ?

চিকিৎসা-বিদ্যায় পারঙ্গমতার দম্ভে ?

তাই যদি না হবে তবে সত্যকে ঘোষণা ক'রে মনের কোণে বেদনা অনুশোচনা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে কেন ? ওই স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠলেই ছি-ছি-কার সশব্দে মর্মস্থল থেকে বেরিয়ে আসে কেন ? 'পরমানন্দ মাধবকে' মনে পড়ে না কেন ? উদাস দৃষ্টি তুলে ডাক্তার তাকিয়ে থাকেন আকাশের নীলের দিকে।

(এক)

উনিশ শো পঞ্চাশ সাল—বাংলা তের শো ছাপ্পান্ন সালের এক শ্রাবণ অপরাহ্ণে জগদ্বন্ধু ডাক্তার এমনি ক'রেই তাকিয়েছিলেন আকাশের দিকে। পথের উপর থেকে কেউ যেন তাঁকে ডাকলে।

—প্রণাম গো, ডাক্তার জ্যেঠা।

—কে? অ—মতি! কোথায় যাবি রে?

মতি কর্মকার আটহাতি কয়লার ধুলোমাখা কাপড়খানা পরেই কোথায় হন হন করে চলেছে। গোষ্ঠ কর্মকারের ছেলে মতি। গোষ্ঠ ডাক্তারকে বড় ভক্তি করত। ডাক্তারও তাকে ভালবাসতেন। গোষ্ঠ অনেকগুলি ওষুধ জানত। সন্ন্যাসীদত্ত ওষুধ। রঘুবর ভারতী একজন বড়দরের যোগী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল সে। গোষ্ঠ ডাক্তারকে ওষুধগুলি দিতে চেয়েছিল। ডাক্তার নেন নি। তবে অনেক রোগীকে তিনি পাঠিয়ে দিতেন গোষ্ঠের কাছে। বিশেষ করে দুদিন অন্তর জ্বরের জন্য; বড় পাজী জ্বর ওটা। একদিন অন্তর জ্বর—পালাজ্বর—তবু ওষুধ মানে; কিন্তু ঐ দুদিন অন্তর জ্বর—ও ওষুধ মানে না। মানাতে অন্তত দীর্ঘদিন লাগে। কুইনিন ইনজেকশনও মানতে চায় না। অথচ ওই রঘুবর ভারতীর ওষুধে এক দিনেই বন্ধ হয়ে যাবে। আগে গোষ্ঠ দিত, এখন মতিই দেয়, জ্বরের নির্দিষ্ট দিনে একটা হলুদমাখা ন্যাকড়ায় একটা জলজ গাছের পাতা কচলে রস বার করে বেঁধে শুঁকতে দেয়। তাতেই জ্বর বন্ধ হয়। হবেই বন্ধ! বিচিত্র দ্রব্যগুণ-রহস্য। অতি বিচিত্র! এদেশের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত ছিল—বিস্ময়কর ফলপ্রদ চিকিৎসা! একবার তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল—ওই চিকিৎসা-প্রণালী জানবার, কিন্তু—। কিন্তু তাঁর গুরুর নিষেধ ছিল। তিনি বলেছিলেন—ডাক্তারী যখন শিখছ, তখন ও-দিকে যেয়ো না। যার গুণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে জান না, তাকে প্রয়োগ করো না।

মতি কর্মকার বললে—একবার আপনার কাছেই এলাম জ্যেঠা।

বাঁচলেন ডাক্তার, একজন কথা বলবার লোকের জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন। এবার তক্তাপোষে ভাল করে বসলেন তিনি, পুরানো তাকিয়াটাকে টেনে নিয়ে বললেন—আয় আয়। বস। কি খবর বল?

—একবার আমার বাড়ীতে যেতে হবে।

—কেন?

—মাকে একবার দেখতে হবে।

—কি হল মায়ের?

—আজ্ঞে, মাস দুয়েক হবে, পুকুর ঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, তা পরেতে খুবই বেদনা হয়, নিয়ে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। তখন দেখে বেঁধে-ছেঁদে ছেড়ে দিয়েছিল, বলেছিল,—দিন কতক উঠা হাঁটা কর না, সেরে যাবে। তাই গিয়েও ছিল। কিন্তু আবার আজ দিন আষ্টেক হল বেদনাটা চাগিয়ে উঠেছে; দিন রাত কন কন করছে। আবার নিয়ে গেলাম হাসপাতাল—তা বললে, এক্সরে করতে হবে, সে না হলে কিছু বলতে পারবে না। তা'—সে তো অনেক খরচ—অনেক ঝঞ্ঝাট—

হাসলেন জীবন ডাক্তার। বেচারী মতি! বুড়ো মা গলায় কাঁটার মত লেগেছে। মায়ের উপর মতির গভীর ভালবাসা। মায়ের প্রতি তার এই ভক্তির জন্য লোকে তাকে বুড়ো খোকা বলে। মায়ের কষ্টও সে দেখতে পারছে না—আবার এক্স-রে করানোও তার পক্ষে অনেক ঝঞ্ঝাট। অগত্যা এসেছে তাঁর কাছে।—তা বেশ, কাল সকালে যাব।

—আজ্ঞে, না, একবার চলুন এখুনি। বুড়ী চীৎকার করছে আর গালাগাল করছে আমাকে। বলছে নিজের মেয়ে হলে এমনি অচিকিৎসেতে ফেলে রাখতে পারতিস?

বলতে বলতে খানিকটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মতি। বললে—সারা জীবন মায়ের অযত্ন করি নাই, আজ মা আমাকে—কেঁদে ফেললে মতি।

ডাক্তার বললেন, চল তবে। দেখে আসি।

খালি গায়েই বেরিয়ে পড়লেন ডাক্তার। মতি ব্যস্ত হয়ে বললে—আপনার ছাতা?

—ছাতা লাগবে না, চল। এই ফিন-ফিনে জলে—এতে ছাতা লাগে না।

ভারী পায়ে ডাক্তার হাঁটেন একটু মন্থরগতিতে। মতি ছুটে চলে গেল।—আমি যাই জ্যেঠা, বাড়ীতে খবরটা দিই গে।

—যা।

বাড়ীটা একটু পরিষ্কার ক'রে ফেলবে। ছেলেপুলেগুলোকে সামলাবে। বোধ হয় মতির মা—ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে আছে, তাড়াতাড়ি একখানা ফরসা কাপড় পরবে। ডাক্তারের অজানা তো কিছু নাই।

বাড়ীর দোরে গিয়ে গলা ঝাড়লেন ডাক্তার। তারপর ডাকলেন—মতি! মতি সাড়া দিলে—আজ্ঞে, এই যাই।

তার মানে—আরো খানিকটা অপেক্ষা করুন ডাক্তার জ্যেঠা। এখনও প্রস্তুত হতে পারি নাই। দাঁড়ালেন ডাক্তার, ভালই হ'ল, বরাবর সামনে দেখা যাচ্ছে সোজা কাঁচা শড়কটা। ওই পথে সাদা কাপড়ের ছাউনি দেওয়া ছাতা মাথায় দিয়ে আসবে সেতাব মুখুজ্জে। এক হাতে ছাতা অন্য হাতে নিভানো লণ্ঠন আর দাবার পুঁটলী! কই সেতাব?

* * *

বৃদ্ধা কাতর হয়ে পড়েছে। মতি ঠিক বলেছে—জেরবার হয়ে পড়েছে বুড়ী। হাঁটুটা ফুলেছে। স্ফীত স্থানটার উপর হাত দিলেন ডাক্তার। রোগী কাতরে উঠল, ডাক্তার চমকে উঠলেন। জরও হয়েছে যেন! হাঁটু থেকে হাত তুলে বললেন—হাতটা দেখি!

নাড়ী ধ'রে বসলেন ডাক্তার।

—জর কবে থেকে হ'ল?

মতি বললে—জর তো হয় নাই জ্যেঠা।

—হয়েছে। নাড়ী দেখতে দেখতেই বললেন ডাক্তার।

মতির-মা ঘোমটার ভিতর থেকেই ফিস ফিস করে বললে—ও বেথার তাড়সে গা খানিক জর জর হয়েছে। বেথা সারলেই ও সেরে যাবে।

—হ্যাঁ, ব্যথা সারলেই জর সারবে, জর সারলেই ব্যথা সারবে।

—না-না জরের ওষুধ আমি খাব না। জর আমার আপনি সারবে। আপনি আমাকে পায়ের বেদনার ওষুধ দেন। জরের চিকিৎসের দরকার নাই। ও কিছু নয়।

ডাক্তার হেসে বললেন—উপোস তোমাকে করতে হবে না। সে আমি বলব না তোমাকে। তুমি তো আমার আজকের রোগী নও গো। নতুন বউ থেকে তোমাকে দেখছি আমি। সেবার পুরনো জ্বর—সে তো আমিই সারিয়েছিলাম। গোষ্ঠ আমার কাছে কবুল খেয়েছিল। রাত দুপুরে—হেঁসেল থেকে মাছ ভাত বের ক'রে তোমাকে খাওয়াত সে। সে আমি জানি। তাতেই আমি তোমার জন্যে পোরের ভাতের ব্যবস্থা দিয়েছিলাম।

হাসতে লাগলেন ডাক্তার।

ঘোমটার মধ্যে জিভ কেটে লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে গেল মতির-মা। গোষ্ঠ তাকে চুরি করে খাওয়াত না, সে নিজেই চুরি করে খেত। একদিন স্বামীর কাছেই ধরা পড়েছিল। তার পরদিনই গোষ্ঠ ডাক্তারের কাছ থেকে পোরের ভাতের ব্যবস্থা এনেছিল।

ডাক্তার বললেন—তা বল না কি খেতে ইচ্ছে?

চুপ ক'রে রইল মতির-মা। এরপর আর কি উত্তর দিতে পারে সে? লজ্জায় তার মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ছি! ছি! ছি!

—বল, লজ্জা করো না। যা ইচ্ছে হয় খেয়ো। যা খুসী। মতির দিকে তাকিয়ে বললেন—মায়ের যা খেতে ইচ্ছে—খেতে দিবি, বুঝলি?

—আর ওষুধ? শঙ্কিতভাবেই প্রশ্ন করলে মতি।

মতির-মা-ও মাথার ঘোমটা খানিকটা কমিয়ে দিলে।

—আগুনের সেঁক। শত বৈদ্য সম অগ্নি; ওর চেয়ে বেদনার আর ওষুধ হয় না।

—ওষুধ দেবেন না? যা খুসী তাই খাব? আমি তা হলে আর বাঁচব না? পরিপূর্ণভাবে ঘোমটা খুলে মতির-মা এবার ডাক্তারকে প্রশ্ন ক'রে নিষ্পলক দৃষ্টিতেই তাঁর দিকে চেয়ে রইল। বিচিত্র সে দৃষ্টি! কঠিনতম প্রশ্ন সে দৃষ্টিতে সমুদ্যত হয়ে রয়েছে। জীবনের শেষ প্রশ্ন!

এমন দৃষ্টির সম্মুখে কেউ বোধ হয় দাঁড়াতে পারে না। পারে তিন প্রকারের মানুষ। এক পারে বিচারক—যাকে প্রাণদণ্ড দিতে হয়, আসামী তাকে প্রশ্ন করে—আমাকে মরতে হবে?—তবে বিচারক বলতে পারে হ্যাঁ, হবে।

আর পারে জহ্লাদ—যে ওই দণ্ড হাতে তুলে দেয়।

আর পারে চিকিৎসক।

এই দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে এ যুগের চিকিৎসকেরা এ কথা বলতে পারে না। জীবন ডাক্তারের যুগে তাঁরা বলতে পারতেন। অবশ্য প্রবীণ রোগীকেই বলতেন—আর কি করবে বেঁচে? দেখলেও অনেক, শুনলেও অনেক, ভোগ করলেও অনেক—ভুগলেও অনেক। এইবার যারা রইল তাদের রেখে—। প্রসন্ন হাসি হাসতেন।

তাঁর বাবা জগৎমশায় শেষটায় বলতেন—গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরিনাম কর, ইষ্টনাম কর। নামের তরী বাঁধা ঘাটে।

তাঁর ডাক্তারী বিদ্যার গুরু রঙলাল ডাক্তার ছিলেন বিচিত্র মানুষ। রোগীর সামনে সচরাচর মৃত্যুর কথা বলতেন না—তবে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন —Medicine can cure disease, but cannot cure death; বলেই লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন।

আজ জীবন ডাক্তার মতির মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—তার চেয়ে তুমি একবার ঠাঁই বদলে দেখ। স্থান-পরিবর্তন, হাওয়া পাল্টে এস।

কথার মাঝখানেই মতি বলে উঠল—এই দেখুন ডাক্তার জ্যেঠা, কি বলছেন দেখুন। হ্যাঁ গো, সে টাকা আমাদের আছে?

—কেন? এই তো দশ ক্রোশ পথ, ট্রেনে যাবি, বাড়ীভাড়া করে রেখে আসবি। কিই বা খরচ? কাটোয়াতে ভিড় বেশী, অনেক পূর্ববঙ্গের লোকজন এসেছে—তার চেয়ে উদ্ধারণপুর ভাল। পাড়া-গাঁ—গঙ্গাতীর, এক মাস গঙ্গার বাতাস গায়ে লাগলেই সব ভালো হয়ে যাবে। নিত্য গঙ্গাস্নান করবে, দেখবি মায়ের নবকলেবর হয়ে যাবে।

বলেই ডাক্তার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—মতি! জল দে হাতে।

(দুই)

মন খারাপ হ'ল না ডাক্তারের। মতির মায়ের বয়স হয়েছে, দেহ বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী ভেঙেছে। বাত-জ্বর, পেটের গোলমাল—নানান খানা রোগ। একমাত্র ছেলে—বউ—কয়েকটিই নাতি-পুতি—তা যাক না বুড়ী; এ তো সুখের যাওয়া। বুড়োর যেতে ইচ্ছে নাই। ডাক্তার এক নজরেই বুঝতে পারেন। মৃত্যুর কথা শুনলে চমকে ওঠে না—এমন লোক বোধ হয় সংসারে নাই। তিনি দেখেন নি। তবু বোধ হয় বলেন এই কারণে যে, মানুষের এগিয়ে যাওয়ারও সীমা নেই, অন্ধকারে পিছনে পড়ে থাকারও নিরাকরণ হয় না। সসাগরা ভারত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করে যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। ও না-হয় পুরাণের কথা, ও উদাহরণ ছেড়ে দিয়েই হিসেব করতে হবে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে গেলেও এর নিদর্শনের অভাব হবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধোন্মাদনার মধ্যে মৃত্যুবরণকে তিনি গণনা করবেন না। উন্মাদনায় মৃত্যুবরণ বড় কথা নয়। সে গণনা করলে আত্মহত্যা যারা করেছে তাদেরও গণনা করতে হবে। বুদ্ধের মত মৃত্যুর পদধ্বনি শুনে দেহত্যাগের জন্য কুশীনগর যাত্রা করেন যাঁরা পরমানন্দে গণনীয় শুধু তাঁদের কথা। সেখানেও মানুষ পৌচেছে। সে সাধনার বিরাম নাই। অন্তত এই পুণ্যভূমিতে নাই। এ দেশের রক্ত যার ধমনীতে সঞ্চরণ করে তার দুটি চোখের একটি নিবদ্ধ জীবনের দিকে—একটি নিবদ্ধ মৃত্যুর দিকে। এই দুইকে সমান আনন্দে গ্রহণ করার সাধনা তার।

ইংরেজী উনিশ শো পঞ্চাশ সাল—সভ্য মানুষের বহু অহঙ্কারের সভ্য বিংশ শতাব্দী। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতেই গান্ধীজীর মৃত্যুবরণের কথা মনে কর। গুলী করলে। এক্ষেত্রে জৈবিক কোষে গঠিত এই দেহের—যন্ত্রণায় আরামে—বিভিন্ন প্রকারের দেহভঙ্গির প্রকাশ আছে। গুলীর নিষ্ঠুর যন্ত্রণা যখন তাঁর রক্ত-মাংস-স্নায়ু-শিরাকে প্রচণ্ড আকস্মিক আঘাতে চরম বিচলিত করলে—তখন দেহে কোন্ ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া উচিৎ ছিল? স্বাভাবিক ছিল? কণ্ঠস্বরে যন্ত্রণাবোধের প্রকাশ পাওয়া এবং তাঁর দুখানি

হাতের ওই ক্ষতস্থানটি চেপে ধরাটাই স্বাভাবিক ছিল না কি? কিন্তু তিনি নাকি হাতজোড় করে বলেছিলেন—হে-রাম। মৃত্যুভয় তো তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি! আর পিছিয়ে থাকার উদাহরণ? ও দিতেই হবে না। ওটা সর্ববাদিসম্মতভাবে স্বীকৃত সত্য। পৃথিবীতে আতঙ্ক ভয়—সব ওই সত্যকেই স্বীকার করে অবনতমস্তকে। এ্যাটম বোমায় দুটো শহর মৃত্যুগর্ভে ধূলিসাৎ হল, গোটা জাপানী জাতটা হার মানলে।

বেচারী মতির-মা পিছনে পড়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে। তাকে দোষ দিতে পারবেন না। ছেলে, বউ, নাতি, নাতনী, ঘর-সংসার—বড় জড়িয়ে পড়েছে বুড়ি।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম!

বুড়ী সেই সনাতন 'আশ্চর্য্য' হয়ে উঠেছে আজ। কিন্তু যেতে হবে বুড়ীকে। আর যাওয়াটাই ওর পক্ষে মঙ্গল। হ্যাঁ মঙ্গল। নইলে দুর্ভোগের আর অন্ত থাকবে না।

জীবন ডাক্তারের দেহখানা খুব ভারী। পা দুটো মাটির ওপরে দেহের ওজনে জোরে জোরেই পড়ে। ডাক্তার পথ দিয়ে চলেন—পাশের বাড়ীর লোকেরা জানতে পারে—ডাক্তার চলেছেন। এই শ্রাবণ মাসের ঝিন্‌ঝিনে বৃষ্টিতে পিছল এবং নরম মেটে রাস্তার উপর সন্তর্পণে পা ফেলে চলতে হবে। চোখ রাখতে হবে মাটির উপর। দুটোই ডাক্তারের পক্ষে বিরক্তি-জনক। কিন্তু উপায় নাই—পিচ্ছিল পথে পদস্খলন হলে অঙ্গ আর থাকবে না। পৃথিবীকে মানুষ বলে—মা, সবুজ ঘাসে আর ফসলে ঢাকা দেখে বলে—কোমলাঙ্গী; একবার পড়লেই ভুল ভেঙে যায়। আপন মনেই ডাক্তার হাসেন। মনে পড়ে গেল শরৎচন্দ্রকে; তাঁর থেকে অন্ততঃ পঁচিশ বছরের ছোট, ছেলেবেলা কাঠির মত হিলহিলে রোগা ছিল—সেই শরৎ এমন মোটা হয়েছে যে, সিঁড়ি উঠতে মধ্যে মধ্যে হাঁপায়। আঃ, সেদিনের ছেলে—মানুষটিও বড় ভাল—ছেলেটার চুল পেকে সাদা হয়ে গেল এরই মধ্যে!

আরে—আরে—আরে! ডাক্তার থেমে গিয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। পথের ধারে একটা [illegible]

পরিমাণে খানিকটা জল জমেছে—দুটো ছেলেতে পরমোৎসাহে তাই ছেঁচতে শুরু করেছে। কাদা-গোলা জল ছিটিয়ে রাস্তার ওই ঠাঁইটা অনতিক্রম্য ক'রে তুলেছে।

ছেলে দুটো থেমে গেল। ডাক্তার এখানে সর্বজনমান্য।

—কী করছিস? হচ্ছে কি?

—মাছ গো। এই এতু বড়ি একটা ল্যাটা মাছ।

—তুই তো মদন ঘোষের ব্যাটা?

—হিঁ গো, মদনার ব্যাটা বদনা আমি।

ডাক্তার হেসে ফেললেন, বললেন—শুধু মদনার ব্যাটা বদনা? তুই মদ্‌নার ব্যাটা—বদনা ঠ্যাটা! পাজীর পা-ঝাড়া। উল্লুক!

—ক্যানে? কি করলাম আমি?

—কি করলি? এবার কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ ক'রে ডাক্তার বললেন—এমনি ক'রে বাবার নাম—নিজের নাম বলতে হয়? বলতে হয়—আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্রীমদনলাল ঘোষের ছেলে আমি, আমার নাম শ্রীবদনলাল ঘোষ। বুঝলি?

বদন ঘাড় কাত করে মাথাটা কাঁধের ওপর ফেলে দিলে। খুব খুশী হয়েছে বদন। ডাক্তার বললেন—আর এটি? এটি কে?

ছেলেটি বেশ সুশ্রী। সুন্দর চেহারা। এ গ্রামের বলে মনে হচ্ছে না। ডাক্তারের কথার উত্তরও দিলে না। বদন বললে—ও আমাদের গাঁয়ে এসেছে। সরকারদের বাড়ী। মামার বাড়ী এসেছে।

—আচ্ছা! অহীন্দ্র সরকারের মেয়ে অতসীর ছেলে?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে দিলে দু'বার।—হ্যাঁ।

ডাক্তার বললেন—জলে ভিজো না, বাড়ী যাও। সর্দি হবে। জ্বর হবে। মাথা ধরবে।

বদন বললে—আপুনি ভিজছে ক্যানে?

ডাক্তার কৌতুকে একটু সরবেই হেসে ফেললেন। বললেন—আমি ডাক্তার রে দুষ্টু! যা—বাড়ী যা! চল আমার সঙ্গে চল।

ছেলে দুটোকে নিয়েই তিনি ফিরলেন। সেতাব না এসে থাকলে এদের

[illegible] আমরা

খেলে অম্বল হয়, অম্বল হলে জ্বর হয়। কিন্তু ডাক্তারেরা খায়। আমড়া খাই আমরা, লোককে বলি খেয়ো না আমড়া।

ডাক্তারখানার বারান্দায় ইতিমধ্যেই সেতাব মুখুজ্জে এসে বসেছিলেন। ডাক্তারকে দেখেই তিনি বললেন—গিয়েছিলি কোথা ? আমি এসে বলি গেল কোথায় !

ছেলে দুটোকে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন—যা—বাড়ী যা তোরা। সেতাবকে বললেন—গিয়েছিলাম মতি কর্মকারের বাড়ী। মতির মায়ের হুকুম এসেছে। বস, চায়ের জন্যে বাড়ীতে বলে আসি। নন্দা ব্যাটা গেল কোথায় ? তামাক দেয় নি তোকে ?

একেবারে সাত আটটা কল্কেতে তামাক সাজার কথা। এ ছাড়াও তামাক টিকে থাকবে। নন্দা সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়, ডাক্তার বা সেতাব নিজেরাই দরকার মত কল্কেতে আগুন দিয়ে নেন। জীবন ডাক্তার আর সেতাব মুখুজ্জে বসবেন দাবাতে। কতক্ষণ চলবে কে জানে ? বাড়ীতে ভাত ঢাকা থাকবে। তবু তো আগেকার কালের শক্তিও নাই—উৎসাহও নাই।

ডাক্তার চায়ের বরাত ক'রে নিজেই তামাক টিকে সাজিয়ে নিয়ে দাবায় বসলেন। খেলাটা হঠাৎ বেশ জমে উঠল। ইদানীং খেলা এমন জমে না। ওদিকে আজ আকাশে মেঘও বেশ জমেছে, বৃষ্টিও বেশ সুরু ধরেছে, ঝিপ্-ঝিপ করে বৃষ্টি নেমেছে, বৃষ্টি খানিকটা হবে বলে মনে হচ্ছে। এবারের অনাবৃষ্টির হতাশার মধ্যে বৃষ্টি নামার আশ্বাসও বোধ হয় খেলা জমার একটা প্রধান কারণ। নীরবেই খেলা চলছিল, সেতাব মুখুজ্জে বললেন—ভিতরে চল জীবন—গা শিরশির করছে।

—শিরশির করছে ? কেন রে ? আমার তো বেশ আরাম বোধ হচ্ছে !

—তোর কথা আলাদা। এত চর্বিতে শীত লাগে কখনও ? আমার শরীরটাও ভাল নাই।

—জ্বর হয় নি তো ? দেখি হাত ?

—না, হাত দেখতে হবে না। ওই তোর বাতিক। আমি নিজেও জানি হাত দেখতে। দেখেছি, নাড়ী গরম একটু হয়েছে। ও কিছু নয় ; চল, ভিতরে চল। সেতাব সরিয়ে নিলেন হাতখানা।

ডাক্তার কিন্তু ছাড়লেন না, হাত বাড়িয়ে একরকম জোর করেই সেতাবের হাতখানা টেনে নিলেন। হ্যাঁ, বেশ উত্তাপ হাতে! কিন্তু নাড়ী অনুভব করার সুযোগ পেলেন না। সেতাব মুখুজ্জে হাতখানাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছেন।

—ছাড়, হাত ছাড়, জীবন। হাত ছাড়।

—পাগলামী করিস নে সেতাব। নাড়ী দেখতে দে!

—না। চীৎকার করে উঠলেন সেতাব।

—কি, হল কি তোর? আরে! বিস্মিত হয়ে গেলেন জীবন ডাক্তার।

—না-না-না। ছেড়ে দে আমার হাত। ছেড়ে দে! ঝটকা মেরে ডাক্তারের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেতাব উঠে দাঁড়ালেন। নিজের লণ্ঠনটা তাঁর একপাশে নামানো ছিল। সেটা জ্বালবার অবকাশও নিলেন না; নিভানো লণ্ঠনটি নিয়ে নেমে পড়লেন দাওয়া থেকে।

—সেতাব, ছাতা, তোর ছাতা।

সেতাব ফিরলেন এবার। ছাতা, দাবাবড়ের ছক ঘুঁটি নিয়ে লণ্ঠনটি জ্বালতে জ্বালতে বললেন—নিজের নাড়ী দেখ তুই। তুই এইবার যাবি আমি বললাম। লোকের নাড়ী দেখে নিদান হেঁকে বেড়াচ্ছে।

সেতাব চলে গেলেন সেই বৃষ্টির মধ্যে।

ডাক্তার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেতাব মধ্যে মধ্যে এমনি অকারণ রেগে ওঠেন। অকারণ ঠিক নয়, নিজের চাল ভুল হলে মনে মনে রাগেন নিজের উপরেই, তারপর একটা যে কোন ছুতোতে ঝগড়া করে বসেন। উঠেও চলে যান। ফেরানো তাঁকে যায় না, পরের দিন ডাক্তার যান তাঁর বাড়ী। গেলেই সেতাব বলেন—আয়—আয়, বস। এই যাব বলে উঠেছিলাম আর তুইও এলি।

ডাক্তার একটু হেসে বাড়ীর ভিতরে যাবার জন্যে ঘুরলেন; ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ করতে গিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন। আজ সেতাবের রাগটা প্রচ্ছন্ন বিকার নয় তো? অল্প জ্বর হ'লেও—' তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবলেন—যাবেন এখুনি সেতাবের বাড়ী?

ফল নেই। তাই যদি হয় তবে সেতাব কিছুতেই তাঁকে হাত দেখতে দেবেন না বরং আরও বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠবেন।

আর এই বৃষ্টিতে ভিজে অনিষ্ট? সে যা-হবার হয়েছে। সেতাব ফিরবেন না।

মৃত্যু-রোগের একটা যোগাযোগও আছে, যা বিচিত্র এবং বিস্ময়জনক।

পরের দিন।

সাধারণতঃ ডাক্তার ওঠেন বেশ একটু দেরীতে। আজ উঠলেন কিন্তু সকালেই। সমস্ত রাত্রি তিনি ঘুমান নাই। সেতাব সম্পর্কেই দুশ্চিন্তা হয়েছে। তাঁর অভিজ্ঞতায় যত বিচিত্র রোগলক্ষণ উপসর্গ তাঁর চোখে পড়েছে, তিনি উপলব্ধি করেছেন—সেই সব উপসর্গের লক্ষণ তিনি সেতাবের আচরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। যত দেখেছেন ততই যেন মিলেছে। মনে মনে অনুতাপ হয়েছে, সেতাবকে তিনি জাপটে ধরে জোর করে ঘরে বন্ধ করে রাখলেন না কেন? ওই বর্ষণের মধ্যে যেতে দিলেন কেন? প্রচ্ছন্ন বিকার নিয়ে জ্বরই খুব খারাপ, তার উপর এই বর্ষায় ভিজে যদি সর্দিটা প্রবল হয়—তবে যে অসাধ্য হয়ে উঠবে।

বয়স সেতাবের হয়েছে, জীবনে বন্ধনও নাই। বন্ধন বলতে স্ত্রী—কিন্তু সে স্ত্রী এমনই সক্ষম ও আত্মপরায়ণা যে, সেতাবের অভাবে তার বিশেষ অসুবিধা ঘটবে না। সেতাবের অভাব অনুভব করবেন তিনি নিজে। সেতাব না হলে তাঁর দিন কাটে না। তিনি থাকবেন কাকে নিয়ে?

সকালে উঠেই তিনি সেতাবের বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। ডাক্তার-গিন্নী সকালেই ওঠেন। এবং তাঁর বিচিত্র স্বভাবের বিচিত্রতম অংশটুকু এই প্রথম প্রভাতেই আত্মপ্রকাশ করে। নাম তাঁর দুর্গা। দুর্গা প্রভাতে ওঠেন যুদ্ধোদ্যত দশপ্রহরণধারিনীর মত। মেজাজ তাঁর সপ্তমে তুলে বকে ঝকে বাড়ীটাকে সন্ত্রস্ত করে কিছুক্ষণ পরে আশ্চর্যভাবে ধীর স্থির হয়ে পড়েন। ডাক্তার দেরীতে ওঠেন যেসব কারণে ওটা তার মধ্যে একটা প্রধান কারণ।

ডাক্তার সকালে উঠলেও ডাক্তার-গিন্নী অবশ্য তাঁর আগেই উঠেছেন এবং বাসনমাজা-ঝিকে তিরস্কার করছেন বালি এবং করকরে ছাই দিয়ে বাসনমাজার জন্য। ওতে বাসনের পরমায়ু কতদিন? সংসারে যাঁরা সিদ্ধপুরুষ, মৃত্যু যাঁদের ইচ্ছাধীন, তাঁদের মাথায় ডাণ্ডা মারলে তাঁরাও মরতে বাধ্য হন। ওতো নির্জীব কাঁসার গেলাস। বালি দিয়ে দু'বেলা ঘষলে ও আর কতদিন। কাঁসার দাম যে কত দুর্মূল্য হয়েছে সেও তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ডাক্তার উঠে আসবার সময় কেশে গলা পরিষ্কার করে সাড়া দিয়ে নামলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন—আমি বেরুচ্ছি একবার মাঠে।

অর্থাৎ চাষ দেখতে। সকালে মেঘ আবার ঘনিয়েছে। ছাতাটি নিয়ে বেরিয়ে এসে উঠলেন ওই বড়বাজারে গ্রামখানিতে, সেতাবের বাড়ীর সামনে। হন হন করে এসেছেন—পথে কোন দিকে তাকান নি।

সেতাবও তখন উঠেছেন। তক্তাপোষের উপর বসে তামাক খাচ্ছেন। ডাক্তারকে দেখে হেসে বললেন—এসেছিস?

ডাক্তার তক্তাপোষের উপর বসে বললেন—যাক্। জ্বরটর নাই তো? মুখ দেখে মনে হচ্ছে ছেড়ে গিয়েছে।

সেতাব হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন—দেখ।

—দেখব? হাসলেন ডাক্তার।

—দেখ। নিদান একটা হাঁক দেখি। আর তো পারছি না। জীবনে ঘেন্না ধরে গেল!

ডাক্তার হেসে বললেন—তা' কাল রাত্রে বুঝেছি। যে রাগ তোর আমার উপর।

সেতাব ওদিক দিয়েই গেলেন না, বললেন, কাল রাত্রে বুড়ী আমাকে যা বকলে, সে তোকে কি বলব? এক মুঠো মুড়ি পর্যন্ত খেতে দিলে না রে। বললাম সর্দিতে গা গরম হয়েছে, জীবন আমাকে খেতে বলেছে দুধ-মুড়ি, ঘি-ময়দা থাকলে চারখানা গরম লুচি সব থেকে উত্তম। ঘরে ঘি-ময়দা আছে, বুঝলি—জেনেই আমি বলেছিলাম। বাজারে ময়দা মেলে না— আমার জমিতে মণ দুই গম হয়েছিল সে পিষিয়ে ময়দা করিয়ে রেখেছি।

বাড়ীর দুধ হয় না হয় না করেও সের দেড়েক হয়। তার সব সর জমিয়ে ঘি করে। একদিন সরের মুখ দেখতে পাই না। কাল বিকেলে সর গালিয়েছে। তা' তোকে কি বলব, আমাকে ন ভূতো ভবিষ্যতি, তোরও বাপান্ত করে ছাড়লে। এই সকালে পেট জ্বলছে খিদেতে—কি করব—তামাক টানছি। এর চেয়ে যাওয়াই ভাল!

ডাক্তার হাতখানা এবার টেনে নিলেন—স্পর্শমাত্রেই বুঝলেন জ্বর ছেড়ে আসছে। বললেন—নাঃ—জ্বর তোর ছেড়ে আসছে। তা গিন্নী খেতে না দিয়ে ভালই করেছে। আজ সকাল সকাল ঝোল ভাত খা। এখন বরং চায়ের সঙ্গে কিছু খা।

—কিছু খা! ঠাকুর-সেবা নাই? সে কে করবে?

—কাউকে বল না করে দেবে।

—দেবে? একালের কোন ব্যাটা এসব জানে, না এতে মতি আছে! আছে এক মুখ্য ডাং ওই ঠ্যাঙ বাঁকা চাটুজ্জেদের ছেলে। তা এখন তার কাছে যায় কে? যদি ব্যাটা বুঝতে পারে যে আমি খেয়েছি তবে এক বেলাতেই আট আনা চেয়ে বসবে।

—তাই দিবি। শরীর আগে না পয়সা আগে! পেট তোর খিদেয় জ্বলছে—আমি বুঝতে পারছি, তুই খা। আমি বরং ব্যবস্থা করছি। আমাদের গ্রামের মিশ্রদের কাউকে পাঠিয়ে দোব, বুঝলি। খা তুই, পেট ভরে খা। চায়ের সঙ্গে মুড়ি ফেলে নাস্তা কর।

সেতাব এবার চুপি চুপি বললেন—তুই বল না, একটু হালুয়া করে দিক। ময়দা চাললেই সুজি বেরুবে। চিনি অবিশ্যি নাই, তা ভাল গুড় আছে। খেজুর গুড়ের পাটালীও আছে ওর ভাঁড়ারে। বুঝলি, রোজ রাত্রে দুধের সঙ্গে ভাত খায় আর ওই পাটালী বার করে। ভাবে আমি ঘুমিয়ে গিয়েছি। আমি সাড়া দিই না কিন্তু গন্ধ পাই। বল না ওকে।

অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তার।

খাওয়ার বিলাসে সেতাব চিরকাল বিলাসী, একটু ভালমন্দ খেতে ভালবাসে ব'লে ওর স্ত্রী নাম দিয়েছে বালকদাসী। বলে, উনি আমার বালকদাসী—ভালমন্দ খেতে ভালবাসি! রাম রাম রাম—জিভখানা কেটে ফেল গিয়ে।

না-খেলে মানুষ বাঁচে না, খিদে পেলে পৃথিবী অন্ধকার, তাই খাওয়া। তা ব'লে এটি খাব—ওটি খাব—সেটি খাব—একি আবদার! রামচন্দ্র!

ভাল মন্দ খাওয়ার রুচি ওদের স্বামী স্ত্রী দুজনেরই। বার্ধক্যের সঙ্গে সে রুচি আরও বেড়েছে। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধে। ডাক্তারকে মধ্যে মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হয়। সেতাবের কথা শুনে ডাক্তার তাই হাসলেন।

সেতাব ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন—হাসলি যে।

ডাক্তার বললেন—নিদান হাঁকতে বলছিলি না?

মুহূর্তে সেতাবের মুখ শুকিয়ে গেল। ডাক্তার সেটুকু লক্ষ্য করলেন—এবং সেই কারণেই সমাদরের সঙ্গে অভয় দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—এখনও অনেক দেখবিরে তুই। দেরী আছে। রুচি এখনও সমানে আছে। কিন্তু আজ আর হালুয়াটা খাসনে। জ্বরটা একেবারে ছেড়ে যাক। বরং এক বেলা আজ ঝোল ভাত খাস। ওবেলা যদি আর জ্বর না আসে—কই দেখি দে, নাড়ীটা দেখি। গায়ে হাত দিয়ে জ্বর ছাড়ছে বুঝে আর নাড়ী দেখি নি। জ্বর আসবে কিনা দেখি।

নাড়ী ধরে ডাক্তার হাসলেন, বললেন—না। জ্বর আর আসবে না মনে হচ্ছে। হালুয়া কাল তোকে আমি খাওয়াব। আজ না। কিন্তু হঠাৎ হালুয়াতে এমন রুচি হল কেন বল-তো?

—চা-মুড়ির নাম শুনে বমি আসছে। বুঝেছিস না? কি রকম অরুচি হয়ে গিয়েছে। তা তুই এক কাজ কর, দোকান থেকে চারখানা বিস্কুট আনিয়ে দিতে বল। তাই বলে যা। চায়ের সঙ্গে ভিজিয়ে সে ভাল লাগবে।

বিস্কুট নিজে পাঠিয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার উঠলেন। সেতাব-গৃহিণী এখনি তর্ক তুলবেন, রোগীর এই অবস্থায় মুড়ি বেশী উপযোগী অথবা বিস্কুট বেশী উপযোগী? একেবারে সমকক্ষ চিকিৎসকের মতই তর্ক তুলবেন। এবং প্রশ্ন করবেন—দেশে যে আগেকার কালে বিস্কুট ছিল না তখন রোগীরা খেত কি? এবং বিস্কুট খেত না বলে তারা কি মনুষ্যপদবাচ্য ছিল না? সেতাব-গৃহিণী নারী না হয়ে পুরুষ হ'তেন যদি তবে বড় উকীল হ'তে পারতেন। রাগ করে চেঁচামেচি করেন না, নিজের খুঁটে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কূট তর্ক করেন; কার সাধ্য তাঁকে এক পা হটায়। এ যুগে জন্মালেও জন্ম

সার্থক হ'তে পারত। এখন তো মেয়েরাও উকীল জজ ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছেন—দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ডাক্তারের মনের মধ্যেই কথাগুলি খেলে গেল। ডাক্তার সেতাবকে বললেন—গিন্নীকে বলে কাজ নাই। আমি বরং ফিরবার পথে বাজার থেকে দেখে ইয়ে করে কারুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ইয়েকে বলে তুই যেন বাইরে থাকিস। বুঝলি!

নিজের পথ্য সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়ে সেতাব এবার হাত ধ'রে বললেন—বস বস, একটু চা খেয়ে যা।

ডাক্তার হেসেই বললেন—চা খাব তো তোর ইয়ে কিনে পাঠাবে কে? মানে বিস্কুট? তা ছাড়া কর্মফল ভোগ, সেই বা কে করবে? দু চারজন হাত দেখাতে আসবে তো! বসে থাকবে তারা!

বলেই তিনি উঠলেন।

সেতাব সম্পর্কে দুশ্চিন্তা কেটে গেছে তাঁর। পরমানন্দ মাধব, পরমানন্দ মাধব! মৃদুস্বরে নাম জপ করতে করতে ভারী পা ফেলে তিনি অগ্রসর হলেন।

মাথার ছাতাটা একটু নামিয়ে মাথার উপর ধরলেন। সাধারণ লোকে—যাদের ঘরে রোগী আছে—তারা দেখলে আর ছাড়বে না।—ডাক্তারবাবু, একটু দাঁড়ান। ছেলেটার হাত দেখে যান। কি—একবার আমার বাড়ী চলুন। আজ দশদিন পড়ে আছে আমার বাবা—একবার ধাতটা দেখুন।

তারপর অনর্গল প্রশংসা। যার নাম নিছক তোষামোদ। বিনা পয়সায় একবার ডাক্তার দেখানো! ওতে অবশ্য ডাক্তারের খুব একটা আপত্তি বা দুঃখ নেই, কারণ বাপের আমল থেকে তাঁর আমল পর্যন্ত এই বিনা ফি-এ গরীবগুনা মধ্যবিত্তদের ঘরে চিকিৎসা করে এসেছেন। কিন্তু এখন এই বয়সে আর না। তা ছাড়া—। এই বাদলা দিনের ঠাণ্ডা সকাল বেলাতেও তাঁর কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। লোকে তাঁকে আর চায় না। হ্যাঁ, চায় না। বলে—। বলে—সে আমলের ডাক্তার, তাও পাশ করা নয়। আসলে হাতুড়ে। এখনকার চিকিৎসার কত উন্নতি হয়েছে। সে সবের কিছু জানে না।

কেউ কেউ বলে গোবদ্যি।

হন হন করে হাঁটলেন ডাক্তার।

পথের পাশেই হাসপাতাল; পাশেই তৈরী হচ্ছে নতুন হেলথ সেণ্টার। ওদিকে একবার না তাকিয়ে পারলেন না। যাবার সময়ও তাকিয়েছিলেন, তখন সব নিঝুম স্তব্ধ ছিল। এখন জেগেছে সব। হাসপাতালটার বারান্দায় ক'জন রোগী বাইরে এসে বসেছে। ঝাড়ুদারেরা ঘুরছে স্বামী-স্ত্রীতে। ওই নার্সদের ঘর থেকে দুজন নার্স বেরিয়ে চলেছে হাসপাতালের দিকে। চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারীর বারান্দায় এর মধ্যেই ক'জন রোগী এসেছে। আরও আসছে। ওই ওদিকে হেলথ সেণ্টারের নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। প্রকাণ্ড বড় বাড়ী। অনেক আয়োজন, অনেক বেড, অনেক বিভাগ, শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, সংক্রামক ব্যাধির বিভাগ, সাধারণ বিভাগ, বড় সার্জারী বিভাগ হবে, রক্ত থেকে যাবতীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। তা ভালই হচ্ছে। রোগে যে রকম দেশ ছেয়ে ফেলছে তাতে এমনি বিরাট ব্যবস্থা না হলে প্রতিবিধান হবে না। ডাক্তারের মনে পড়ল—প্রথমেই হয়েছিল ওই চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীটি। সে হল উনিশ শো দুই বা তিন সালে।

তার আগে—।

—প্রণাম ডাক্তারবাবু! কোথায় গিয়েছিলেন? ডাকে?

ডাক্তার চকিত হয়ে মুখ ফেরালেন। দেখলেন এখানকার চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারীর কম্পাউণ্ডার হরিহর পাল তাঁর পিছনেই সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ী থেকে ডিস্‌পেনসারীতে আসছে, তাঁকে চিনেই বোধ হয় বেল না দিয়ে রথ থেকে নেমে পদাতিক হয়ে—পদাতিক তাঁকে সম্মান দেখিয়েছে। সস্নেহে ডাক্তার বললেন—ভাল আছ হরিহর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তারপর খবর ভাল তো? কি রকম চলছে তোমার?

—ওই কোন রকমে চলে যায় আর কি।

ডাক্তার হাসলেন; বুঝলেন হরিহরের প্র্যাকটিস ভালই চলছে আজকাল।

—পেনিসিলিন চালাচ্ছ খুব! এ তো পেনিসিলিনের যুগ।

—আজ্ঞে তা' বটে। সবেই পেনিসিলিন। ওষুধটা খাটেও ভাল। বলতে বলতেই হরিহর একটু চঞ্চল হয়ে বললে—ডাক্তারবাবু আসছেন আমাদের। আপনাদের গ্রাম থেকেই আসছেন দেখছি। ওঃ, বোধ হয় মতি কর্মকারের মাকে দেখতে গিয়েছিলেন। কাল রাত্রে মতি এসেছিল, কল দিয়ে গিয়েছিল।

মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল যেন। মতি কল দিয়ে গিয়েছে? তার মাকে দেখতে? মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার। ওদিকে হাসপাতালের নূতন ডাক্তারটির বাইসিক্ল দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। জীবন ডাক্তার নমস্কার করলেন—নমস্কার!

হাসপাতালের ডাক্তার নামলেন বাইসিক্ল থেকে। তরুণ বয়স, পরণে ধূতি ও কামিজের উপরে ওয়াটারপ্রুফ, মাথায় অয়েলস্কিনের ঢাকনি মোড়া শোলার হ্যাট। চোখে শেলের চশমা; হাওড়ার অধিবাসী—নাম—অর্ধেন্দু রায়। প্রতি-নমস্কার করে ডাক্তার বললেন—ভাল আছেন?

—ভাল? তা রোগ তো নেই। সংসারে তো একেই ভাল থাকা বলে। তারপর—মতির-মাকে দেখে এলেন?

—হ্যাঁ। কাল রাত্রে মতি এসে বলে—রাত্রেই যেতে হবে। তার মা না-কি যন্ত্রণায় অধীর অস্থির হয়ে পড়েছে। সে কিছুতেই ছাড়বে না। কেসটা তো জানা। প্রথম যখন পড়ে যায় তখন কিছুদিন হাসপাতালে ছিল। কমেও গিয়েছিল বেদনা। তারপর বেদনা বাড়ল আবার, বোধহয় ওই অবস্থাতেই ঘোরাফেরা কাজকর্ম করেছে। আমার ধারণা আবারও ধাক্কাটাক্কা লাগিয়েছিল। আপনি তো দেখেছেন কাল বিকেলে। সবই তো জানেন।

—হ্যাঁ দেখেছি। তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, কেমন দেখলেন?

—একটু পাকিয়ে গেছে, এক্স-রে না করলে ঠিক ব্যবস্থা তো হবে না। ভিতরে কোথাও হাড়ে আঘাত লেগেছে কিন্তু যদি ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে, হাড়ের কুচিটুচি থাকে—তবে—অপারেশন করতে হবে! ব্যবস্থা হ'লে সেরে যাবে।

ডাক্তার একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, কুচিটুচি নেই। ফ্র্যাকচার নয়। ব্যথাটা সরে নড়ে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ফুলোটাও। আমার অবিশ্যি

সার্জারীতে বিদ্যেবুদ্ধি নাই। ভাল বুঝি না। বুঝি নাড়ী। আমার যা মনে হ'ল—তাতে—ওটা উপলক্ষ্য। যাকে বলে হেতু। আসলে—। কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখে একটু হেসে ইঙ্গিতের মধ্যে বক্তব্য শেষ করলেন।

অর্ধেন্দু ডাক্তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ—আপনি তো জ্ঞান-গঙ্গার ব্যবস্থা দিয়ে এসেছেন। হাসলেন অর্ধেন্দু ডাক্তার। হেসে রসিকতা ক'রেই বললেন—আমি গিয়ে দেখি ভয়ে বুড়ীর এমন প্যালপিটেশন হচ্ছে যে, জ্ঞানগঙ্গাও আর পৌঁছুতে হবে না। স্টেশনে যাবার জন্য গাড়িতে তুলতে তুলতেই হার্টফেল করবে।

আরও একটু হেসে নিলেন অর্ধেন্দু ডাক্তার। তারপর বললেন—নাঃ। বেঁচে যাবে বুড়ী! মতি কিছু খরচ করতে প্রস্তুত আছে, বাকীটা হাসপাতাল থেকে ব্যবস্থা করে ওকে খাড়া করে দেব।

শেষের কথাগুলিতে প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ রণ রণ করে বেজে উঠল। মনে হ'ল ডাক্তার তীর ছুঁড়লে—তীরটা তাঁর মাথার খাটো করে ছাঁটা চুলগুলি স্পর্শ করে বেরিয়ে চলে গেল; তার দাহ—তীরটা তাঁর কপালে কি ব্রহ্মতালুতে বিঁধলে তার যন্ত্রণা থেকে শতগুণে মর্মান্তিক।

ডাক্তার দৃঢ়স্বরে বললেন—বুড়ীকে তিন মাস কি ছ'মাস—এর মধ্যে যেতেই হবে ডাক্তারবাবু। তিন দিন—ন দিন, তিন সপ্তাহ, ন সপ্তাহ, তিন মাস—তারপর ছ মাস, এই ওর মেয়াদ। এর মধ্যে আসবেই মৃত্যু।

অর্ধেন্দুবাবু চকিতে ঘাড় তুললেন—তারপর বললেন—পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন—এক্স-রে—এ সবের যুগে ওভাবে নিদান হাঁকবেন না। এগুলো ঠিক নয়! তা ছাড়া এ সব হ'ল ইনহিউমেন—; অমানুষিক।

তারপরই জীবন ডাক্তারকে আর কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে অর্ধেন্দু ডাক্তার বললেন—আচ্ছা নমস্কার। চলি। দেরী হয়ে যাচ্ছে হাসপাতালের। সঙ্গে এক্সে বাইসিক্লে উঠে—ভিতরের দিকে চালিয়ে দিলেন দ্বিচক্রযানখানিকে। কটু কথা বলে মানুষের কাছে চক্ষুলজ্জা এড়াবার জন্য মানুষ এমনি নাটকীয় ভাবেই হঠাৎ পিছন ফিরে চলে যায়!

খানিকটা গিয়ে আবার নেমে বললেন—আসবেন একদিন, আমাদের ব্যবস্থা দেখলেই বুঝতে পারবেন সব। নতুন নতুন কেসের সব অদ্ভুত ট্রিটমেন্টের

হিস্ট্রি পড়ে শোনাব—মেডিকেল জার্নাল থেকে। হাতুড়ে চিকিৎসা ছাড়া এককালে যখন চিকিৎসা ছিল না—তখন যা করেছেন—করেছেন। কিন্তু একালে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা যখন হয়েছে, লোকে পাচ্ছে—তখন ওই চিকিৎসা ফলানো—মারাত্মক অপরাধ—।

কঠিন হয়ে উঠেছে তরুণ ডাক্তারটির মুখ।

জীবন ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি অপরাধী?

হাসপাতালের ডাক্তার এবার চলে গেলেন। জীবন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। কয়েকটি রোগী হাসপাতালে ঢুকবার সময় তাঁর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। জীবন ডাক্তার লক্ষ্য করলেন না। তিনি আত্মসম্বরণ করছিলেন। এ তো তাঁর পক্ষে নূতন নয়। দীর্ঘজীবনে পাশ-করা ডাক্তার এখানে অনেক এল—অনেক গেল। জেলা থেকে বড় ডাক্তারও এসেছেন। কলকাতা থেকেও এসেছিলেন। মতভেদ হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনি অবজ্ঞাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে জীবন ডাক্তারই অভ্রান্ত!

এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রই রোগের মৃত্যু-পরিণাম-নির্ণয়ের ক্ষেত্র। কদাচিৎ নির্দিষ্ট দিনের দু একদিন পার্থক্য ঘটেছে মাত্র।

মনে পড়ছে। সব ঘটনাগুলি মনে পড়ছে।

ডাক্তার হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললেন।

পিতামহ এই জ্ঞানযোগ পেয়েছিলেন—এখানকার বৈদ্যকুলতিলক কৃষ্ণদাস সেন কবিরাজ মহাশয়ের কাছে।

আবার তিনি চলতে শুরু করলেন।

(তিন)

জীর্ণ আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ায় তখন জন দশেক রোগী এসে ব'সে আছে। এদের অধিকাংশই মুসলমান। আজ তিন পুরুষ ধরে—তাঁর পিতামহের আমল থেকে—তাঁরাই এদেরও পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা ক'রে আসছেন। জীবন ডাক্তারের আর চিকিৎসা-ব্যবসায়ে উৎসাহও নেই, মধ্যে মধ্যে ভাবেন—ছেড়ে দেবেন। কিন্তু এরা তাঁকে ছাড়ে না। চার মাইল দূর থেকে—এই বাদলার মধ্যেও বেচারারা এসেছে। তিনখানা গাড়ি এসেছে—দুজন বৃদ্ধ হিন্দু এসেছেন, একখানায় এসেছেন একজন মুসলমান মহিলা। যাঁরা হেঁটে এসেছেন তাঁরা অধিকাংশই রোগী নয়—রোগীর আত্মীয়; অবস্থা ব'লে ওষুধ নিয়ে যাবে।

আরোগ্য-নিকেতনে আজ আর ওষুধই নাই; ও ব্যবস্থা ডাক্তার উঠিয়ে দিয়েছেন। প্রেসক্রিপসন লিখে দেন। নবগ্রামে বি কে মেডিকেল স্টোর্স ওষুধ দেয়। দু তিন মাস অন্তর কিছু অর্থও দেয় কমিশন বাবদ। অনেক দুঃখেই আরোগ্য-নিকেতন থেকে ওষুধের ব্যবস্থা তিনি তুলে দিয়েছেন। সেকালে প্রচুর ওষুধ ছিল।

এখনও ওই ভাঙা আলমারী তিনটের মাথায় ওষুধের হিসেবের খাতা স্তূপীকৃত হয়ে জমা হয়ে রয়েছে। খেরো-মলাটগুলো আরসোলায় কেটেছে। ভিতরের মড়মড়ে হলুদ পাতাগুলি পোকায় চালুনির মত শতছিদ্র করে তুলেছে। তবু আছে। ডাক্তারের দুর্ভাগ্য—উই নেই; অথবা কোন দিন অগ্নিকাণ্ড হয় নি; ওগুলো আছে। ওর মধ্যে অন্তত ডাক্তারের বিশ ত্রিশ হাজার টাকা পাওনার হিসেব আছে। বেশী, আরও বেশী। তিন পুরুষের হিসেব ধরলে লক্ষ টাকা। তাঁর আমলের—তাঁর নিজের পাওনা—অন্তত চল্লিশ হাজার টাকা।

পিতামহ দীনবন্ধু দত্ত ওই নবগ্রামে রায়চৌধুরী বংশের আশ্রয়ে এসে পাঠশালা খুলেছিলেন, পাঠশালা করতেন, রায়চৌধুরীদের দেবোত্তরের খাতা লিখতেন, কিছু আদায়ও করতেন। ওই রায়চৌধুরীদের বাড়ীতে চিকিৎসা

করতে আসতেন কবিরাজশিরোমণি কৃষ্ণদাস সেন। দীনবন্ধু দত্তকে তিনিই শিষ্যত্বে গ্রহণ করেছিলেন। রায়চৌধুরী বংশের বড়তরফের কর্তার একমাত্র পুত্রের সান্নিপাতিক জরবিকার হয়েছিল; জীবনের আশা কেউই করেনি; মা শয্যা পেতেছিলেন, বাপ স্থাণুর মত বসে থাকতেন, তরুণী পত্নীর চোখের জলে নদীগঙ্গা বয়ে গিয়েছিল। আশা ছাড়েন নি কবিরাজ মহাশয়। তিনি বলেছিলেন—একজন ধীর অক্লান্তকর্মা লোক চাই, সেবা করবে। তা' হ'লে আমি বলতে পারি, রোগের ভোগ দীর্ঘ হলেও রোগী উঠে বসবে। সেবা করতে এগিয়ে এসেছিলেন দীনবন্ধু দত্ত। দীর্ঘ আটচল্লিশ দিনের দিন জর ত্যাগ হয়েছিল। কবিরাজ দীনবন্ধুকে বলেছিলেন—আজও তোমার ছুটি হল না। অন্ততঃ আরও চল্লিশ দিন তোমাকে সেবা করতে হবে। এখনই সেবা কঠিন। এখন স্নেহান্ধ আত্মীয়স্বজনেরা স্নেহাতিশয্যে সেবার নামে রোগীর অনিষ্ট করবে। রোগীকে কথা বলাবে বেশী, কুপথ্যও দেবে। এই সময়ে তোমাকে বেশী সাবধান হতে হবে। তাও দীনবন্ধু নিখুঁতভাবে করেছিলেন।

সন্তান আরোগ্য লাভ করতে বড়কর্তা দীনবন্ধু দত্তকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দীনবন্ধু তা গ্রহণ করেন নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছিলেন—আমি তোমাকে পুরস্কার দেব। প্রত্যাখ্যান করো না। তোমার আশ্চর্য ধীরতা, বুদ্ধিও তোমার স্থির; তুমি নির্লোভও বটে। তুমি চিকিৎসাবিদ্যা শেখ আমার কাছে।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে—নবগ্রামের পাশে এই ছোট শান্ত গ্রামখানিতে তিনি বাস ক'রেছিলেন। নবগ্রামে বাস করেন নি—গ্রামখানি ব্রাহ্মণ জমিদার বংশঅধ্যুষিত বলে এবং সেখানে কোলাহলও বড় বেশী। ব্রাহ্মণ জমিদার বংশ ক্রমশ বহুভাগে বিভক্ত হয়ে চলেছে—সেখানে কলহও অবশ্যম্ভাবী। ও থেকে দূরেই তিনি থাকতে চেয়েছিলেন। বলতেন—দেবতারা প্রসন্ন সহজে হন না, কিন্তু রুষ্ট হন মুহূর্তে; সামান্য অপরাধে—আজীবন সেবার কথা ভুলে যান।

মশায় উপাধি প্রথম পেয়েছিলেন এই দীনবন্ধু মশায়ই। পরণে থান ধুতি, পায়ে চটি, খালি গা, দীনবন্ধু মশায় গ্রাম গ্রামান্তরে রোগী দেখে বেড়াতেন এ অঞ্চলে প্রতিটি বালক তাঁকে চিনত। তিনি ডেকে তাদের চিকিৎ

করতেন ; মধু সহ-যোগে বটিকা সেবন করাতেন। আর আশ্চর্য ছিল তাঁর সাধুপ্রীতি। সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করে, তাদের পরিচর্যা ক'রে বহু বিচিত্র মুষ্টিযোগ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। ভণ্ড সন্ন্যাসীর কাছে ঠকেছেনও অনেক। তাতে তাঁর আক্ষেপ বা অনুশোচনা ছিল না ; কেউ এ নিয়ে তাঁকে নির্বোধ ব'লে রহস্য বা তিরস্কার করলে—বলতেন—সেই আমাকে ঠকিয়েছে—আমি তো তাকে ঠকাই নি। আমার আক্ষেপ কি অনুতাপের তো হেতু নাই। শুধু কি সন্ন্যাসী—কত বেদে, ওস্তাদ, গুণীন—এদের কাছেও তাদের বিদ্যা তিনি সংগ্রহ করতেন।

পুত্র জগদ্বন্ধু দত্ত ছিলেন উপযুক্ত সন্তান। তিনি পিতার কাছে সমস্ত বিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন। মৃত্যুকালে দীনবন্ধু মশায় ছেলেকে বলেছিলেন বিষয় কিছু পারি নি করতে—কিন্তু আশয় দিয়ে গেলাম মহৎ। মহদাশয়ত্বকে রক্ষা করো। ওতেই ইহলোক পরলোক—দুইই পূর্ণতায় সার্থক হবে।

* * *

জগদ্বন্ধু দত্ত পিতৃবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছিলেন। তাঁকেও লোকে বলত—জগৎমশাই। মহাশয়ত্ব তিনি সত্যসত্যই অর্জন করেছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যেমন ছিল ব্যুৎপত্তি তেমনি ছিলেন তিনি নির্লোভ এবং রোগীর প্রতি স্নেহপরায়ণ। আবার মানুষ হিসাবে যেমন ছিল তাঁর মর্যাদা বোধ তেমনি ছিল প্রকৃতির মধুরতা, সে মধুরতা প্রকাশ পে'ত তাঁর মিষ্ট ভাষায়। আরও ছিল তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ; বড় রসিক মানুষ ছিলেন জগৎমশায়। তাঁর রসিকতার কয়েকটি স্মৃতি এখানকার মানুষের রসশাস্ত্রের স্মৃতি কথায়—কয়েকটি অলিখিত অধ্যায় হয়ে আছে। তাঁর রসিকতার সব চেয়ে বড় কথা তাতে এতটুকু কটু বা অম্লরসের এতটুকু প্রক্ষেপ ছিল না। মানুষকে মধুর রসে আপ্লুত করে দিত। প্রসন্ন হয়ে উঠত রসিকতার অভিষিক্ত জনটি।

এই যে লাল কাঁকরে মোড়া পাকা রাস্তাটি নবগ্রাম থেকে এই গ্রামে এসে পৌঁচেছে—এবং এই গ্রাম পার হয়ে উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ মাঠখানির বুক চিরে চলে গিয়েছে—ওই রাস্তাটির কথা উঠলেই সে কথা লোকের মনে পড়ে যায়।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই মন সরস ও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। আপন মনে একা একাই লোকে হেসে সারা হয়।

অনেকদিন পর, বোধ হয় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর পর অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে। তখন—এখনকার এই পরিচ্ছন্ন গ্রাম্য সড়কটির শুধু আকারই ছিল—আয়তনও একটা ছিল—অবয়বও ছিল,—কিন্তু কোন গঠনই ছিল না। একটা অসমান, খানাখন্দে বন্ধুর এবং দুর্গম গো-পথ ছিল। বর্ষার সময় এক-বুক কাদা হ'ত। সে কাদা একালে কেউ কল্পনাই করতে পারবেন না। মশায়ের রসিকতার কাহিনীটি থেকেই বুঝতে পারবেন। সেকালে গ্রামে একদিন বর্ষার রাত্রে ঢুকেছিল একটি চোর; কিন্তু তার ভাগ্য ছিল খারাপ—তখনও গৃহস্থ ছিল সজাগ। চোরের সাড়ায় সে সোরগোল তুলেছিল, প্রতিবেশীরাও সাড়া দিয়েছিল। ধরা পড়বার ভয়ে চোর পালাল ছুটে। গ্রামের লোকও উঠে ছুটল। চোর ছুটেছে প্রাণভয়ে—সুতরাং তার নাগাল গ্রামের লোক পেলে না। লোকেরা আক্ষেপ করে ফিরে এল। বঁড়শী-গাঁথা রুই মাছটা জলের কিনারায় এসে পালাল! কিন্তু সে আক্ষেপ দূর হ'ল পরদিন সকালে। এই রাস্তাটির কল্যাণে। ভোরবেলা আয়ুর্বেদ-ভবনের জগদ্বন্ধু মশায় গাড়ু হাতে মাঠের দিকে যাবার পথে দেখলেন একটা খানার মধ্যে চোর বেটা আকণ্ঠ কাদায় ডুবে মাথাটি কোন-রকমে জাগিয়ে রেখে উদ্ধারকর্তার উদ্দেশে আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে। জগদ্বন্ধু মশায়কে দেখে আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছিল।

—আমায় বাঁচান বাবা!

জগদ্বন্ধু মশায় দড়ি ফেলে টেনে তুলে তাকে বাঁচিয়েছিলেন। মশায়ের সে এক দায় হয়েছিল। গরম জল ক'রে লোকটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতেই গ্রামের লোকেরা এল—কাচাকাচি শেষ হয়েছে এইবার আমরা নিয়ে যাই। ইস্তিরী করে আনি। অর্থাৎ প্রহার দিই। সকলকে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে মশায়কে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সারা রাত্রি কাদায় ডুবে থাকার ফলে-লোকটা অসুস্থ হয়ে পড়লে—তার চিকিৎসাও তাঁকে করতে হয়েছিল; বলা বাহুল্য ওষুধ পথ্য সবই জোগাতে হয়েছিল তাঁকে। মায় সংসার খরচ। নিছক গল্প মনে করবেন না। এখনও ওখানে সেকালের খানাখন্দের নাম শুনতে পাবেন,

একটু প্রবীণ দেখে যাকে খুসী জিজ্ঞাসা করবেন—সে নাম বলবে—চোরধরির গাদ অর্থাৎ কাদা; গরুমারির খাল। চোরাবালির মত একটা চোরা গর্তে ওই গ্রামের মিশ্রবাড়ীর হৃদয়নাথ মিশ্র পা ভেঙেছিলেন; একটা খানায় ব্রজ পরামাণিকের একটা বুড়ো গাই পড়ে মরেছিল। এই কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ হেসে উঠবে। না হেসে থাকে কি ক'রে? ভাবুন তো ব্যাপারটা!—ব্রজর গরু মরল, কিন্তু সে বিপদের চেয়েও বড় বিপদ হল—ব্রজ প্রায়শ্চিত্ত করবে তার মাথা কামাবে কে? সে নিজে নাপিত, ক্ষুর তার আছে, কিন্তু চালাবে কে? এখনকার মত তখন তো সবাই ক্ষুর চালাতে জানতো না। জানলেও, নিজের হাতে মাথা কামানো নিশ্চয় যায় না। শেষে ওই জগদ্বন্ধু মশায়ই দিয়েছিলেন ব্রজর মাথা কামিয়ে। কবিরাজ ছিলেন, বিকারগ্রস্ত রোগীর মাথা অনেক সময় তাঁকে কামিয়ে দিতে হ'ত কি না! এ সব রোগীর মাথায় ক্ষুরের মত অস্ত্র চালাতে তিনি পরামাণিকের হাতে ক্ষুর ছেড়ে দিতেন না। সেদিন ব্রজর মাথা কামাতে ব'সে তার মাথাটি বাঁ হাতে ধরে নিজেই হেসে ফেলেছিলেন, হেসেই বলেছিলেন কামাবার সময় জগদ্বন্ধু মশায় ব্রজ আজ শোধ নি?

—আজ্ঞে? ব্রজ অবাক হয়ে গিয়েছিল—শোধ? কিসের শোধ?

—কামাবার সময় অনেক রক্ত দেখেছ বাবা, আজ আমি দেখি? শোধ নি?

থাক। এই রাস্তাকে ভাল করেছিলেন—জগদ্বন্ধু মশায়ের ছেলে জীবন ডাক্তার মশায়। তিনিই ওই কাঠের নামফলকখানা টাঙিয়েছিলেন। জগদ্বন্ধু মশায় ছিলেন কবিরাজ। জীবন ডাক্তার ছিলেন—ডাক্তার কবিরাজ দুই। তখনকার দিনের একটা কথা আজও লোকের মনে আছে। আজও লোকে বলে—জগৎ খাবি, না জীবন খাবি? সেকালে অসুখ হলে—বাড়ীর লোক রোগীকে প্রশ্ন করত—জগৎ খাবি, না জীবন খাবি? অর্থাৎ ডাক্তারি ওষুধ খাবি—জীবন দত্তকে ডাকব? না—কবিরাজী ওষুধ খাবি—জগদ্বন্ধু কবিরাজ মশায়কে ডাকব?

—মশায়! বাবা!

জীবন ডাক্তার আহত অন্তর নিয়ে ফিরে এসে ডাক্তার খানায় স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন, স্থির নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বাইরের দিকে। হাসপাতালের নতুন ডাক্তার শহরের ছেলে, বড় ধার ছেলেটির কথায়, অন্তরে অন্তরে পুরোপুরি সায়েব মানুষ, এ দেশের পুরানো সব কিছুর উপর প্রচণ্ড অবজ্ঞা ; ছেলেটির কথায় অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন জীবন মশায়। নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ডাক্তারটি বললে—

—পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, এক্সরে, রক্তপরীক্ষার যুগে এভাবে নিদান হাঁকবেন না। এগুলো ঠিক নয়। অপরাধ, অন্যায়।

কথাগুলিতে তাঁর মর্মস্থল যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। উত্তর হয়তো ছিল, হয়তো কেন, আছে উত্তর, কিন্তু আঘাতে তিনি যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হতবাক হয়ে তিনি কোন মতে বাড়ী ফিরে এসে ব'সেছেন। তাঁর নিস্পলক স্থির দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে উঠেছে অতীত কালটা। এইটিই তো তাঁর উত্তর। অপরাধ? অন্যায়? সুদীর্ঘ অতীত কালের মধ্যে কত নিদান তিনি হেঁকেছেন। অতীতকালের সুদীর্ঘ ইতিহাস ভেসে উঠেছে তাঁর মনশ্চক্ষুর সামনে। তাঁর পিতৃপুরুষের সাধনার ইতিহাস, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, তাঁর বংশের সম্পদের ইতিহাস, তাঁর নিজের জীবনের ইতিহাস ভেসে উঠেছে চোখের সামনে ; বাইরের সব কিছু মুছে গিয়েছে বাইরে দাওয়ার উপর রোগী যারা এসে বসে আছে, তাদের অস্তিত্বের কথা তিনি বিস্মৃত হয়ে গেছেন।

এরই মধ্যে শেখপাড়ার বৃদ্ধ মকবুল এসে দরজার মুখে ব'সে তাঁকে ডাকলে—মশায়! বাবা!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনা-আপনি বেরিয়ে পড়ল জীবন মশায়ের মুখ দিয়ে। তিনি সচেতন হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন মকবুলের দিকে।

মকবুল বললে—হাতটা একবার দেখেন বাবা! বড়া কষ্ট পাচ্ছি এই বুড় বয়সে। অটাঙ্গে দরদ। ঘুষঘুষা জ্বর। মাটি নিতে হবে তা আমার মালুম এসেছে। কিন্তু এই কষ্ট—এ যে সইতে নারছি বাবা। ইয়ার একটা বিধান দেন

ডাক্তার বললেন—আমার কাছে তোমরা আর এস না মকবুল চিকিৎসা আর আমি করব না। তা ছাড়া—একালে অনেক ডা

চিকিৎসা উঠেছে, হাসপাতাল হয়েছে, নতুন ডাক্তার এসেছে। তোমরা সেইখানেই যাও।

মকবুল অবাক হয়ে গেল। জীবন মশায় এই কথা বলছেন? দীনু-মশায়ের নাতি, জগত-মশায়ের ছেলে—জীবন মশায় এই কথা বলছেন? যে ব্যক্তি নাড়ীতে হাত দিলে মকবুলের মনে হয় অর্ধেক রোগ ভাল হয়ে গেল, তাঁর মুখে এই কথা!

ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হেসে তাকে বুঝিয়েই বললেন—আমার আর ভাল লাগছে না মকবুল। তা ছাড়া বয়স হয়েছে, ভুল-ভ্রান্তি হয়—

—অ—ডাক্তার! বলি, তুমি চিকিৎসা ছাড়লে আমাদের কি হবে হে? আমরা যাব কোথায়? নাও—নাও। লোকের হাত দেখে বিদেয় কর। তোমার ভুলভ্রান্তি! কি বলে, তোমার ভুলভ্রান্তি হ'লে সে বুঝতে হবে আমাদের অদৃষ্ট ফের! নতুন চিকিৎসা, নতুন ডাক্তার—অনেক সরঞ্জাম, বৃহৎ ব্যাপার, ও সব করাতে আমাদের সাধ্যিও নাই ওতে আমাদের বিশ্বাসও নাই।

লোকটি একসঙ্গে এতগুলি কথা বলে অনর্গল কাশতে শুরু করে দিলে, বুকের পাঁজরাগুলি সেই কাশির আক্ষেপে কামারের ফুটো হাপরের মত শব্দ করে দু'প্‌তে আরম্ভ করলে, মনে হ'ল কখন কোন মুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। ডাক্তার চারিদিক তাকিয়ে খুঁজলেন একখানা পাখা অথবা যা হোক একটা কিছু—যা দিয়ে একটু বাতাস দেওয়া যায়। লোকটির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। কিন্তু কিছুই নাই কোথাও। ওই নন্দ হতভাগার জন্যে কিছু থাকবার জো নাই। শিশি বোতল থেকে মিনিমগ্লাস, মলম তৈরীর সরঞ্জাম, থারমোমিটারের খোল এমন কি পুরানো বাতিল স্টেথিসকোপের রবারের নলের টুকরো দুটো পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে হতভাগা। কিছু না পেয়ে ডাক্তার উঠে ভাঙা আলমারীর ভিতর থেকে টেনে বের করলেন একখানা পুরানো হিসেবের খাতা; লাখ টাকা পাওনার তামাদি দলিল; তারই একদিকের যেরোর মলাটখানা ছিঁড়ে নিয়ে বাতাস দিতে শুরু করলেন। বাইরে স[illegible] রোগীদের

দিকে তাকিয়ে একজনকে বললেন—বাড়ী থেকে একগ্লাস জল আন তো। চট ক'রে!

কামদেবপুরের এই বৃদ্ধ দাঁতু ঘোষালের চিরটাকাল একভাবে গেল। লোকটা যত কৃপণ তত লোভী; পরের বাড়ী খেয়ে লোভে তৃপ্তি খুঁজে বেড়ালে সারা জীবন; কিন্তু তাতে লোভের তৃপ্তি হয় নাই, হয়েছে রোগ। তার উপর খায় গাঁজা। এককালে গাঁজা খেত ক্ষুধার জন্য; গাঁজায় দম দিয়ে খেতে বসলে পাকস্থলীটি না কি বেলুনের মত ফেঁপে ওঠে। তাতে আহার্য ধরে বেশী পরিমাণে। এইভাবেই দাঁতু ঘোষাল দেহখানিকে এমন জীর্ণ ক'রে তুলেছে। ডাক্তারের বাড়ীতেই দাঁতুঘোষাল নিমন্ত্রণ খেতে বসে অন্ন ব্যঞ্জনে বালতীখানেকেরও উপর কিছু উদরস্থ করে—মিষ্টান্নের পালায় সাতচল্লিশটি রসগোল্লা খেয়ে উঠেছে। জ্যৈষ্ঠমাসে কাঁঠাল খেয়ে দাঁতু ঘোষাল যে কতবার বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে তার হিসেব নাই। বার চারেক তো কলেরার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তবু ঘোষাল লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। এখন বদহজম থেকে হাঁপানী হয়েছে। তার উপর নেশা। গাঁজায় দম দিয়ে হুঁকো হাতে বসবে, টানবে আর কাশবে। কাশতে কাশতে হাঁপাতে সুরু করবে। এবং সপ্তাহে দুদিন ডাক্তারের এখানে আসবে—ওষুধ দাও ভাই ডাক্তার। ভাল ওষুধ দাও। আর ভুগতে পারছি না।

ভাল ওষুধ চায় ঘোষাল কিন্তু মূল্য দিয়ে নয়। বিনা মূল্যে চাই। বাল্যকালে ঘোষাল জীবন ডাক্তারের সঙ্গে পাঠশালায় পড়েছিল, অনেক মন্দবুদ্ধি এবং মন্দকর্মে মতি সে জুগিয়েছে, সেই দাবীতে ডাক্তারের চিকিৎসায় ঔষধে তার অবাধ অধিকার। তার উপরে ঘোষাল যজমান-সেবী পুরোহিত ব্রাহ্মণ। অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতা পূজা ক'রে বেড়ায়। সে হিসেবেও তার এ দাবী আছে। বিদেশী ডাক্তারেরা এ দাবী মানে না। না-মানতে পারে। কিন্তু জীবন মানবে না কেন? এ দাবী তারা দীনবন্ধু মশায়ের আমল থেকে চালিয়ে আসছে, ছাড়বে কেন? তবে গুণও আছে ঘোষালের। কোন যজিবাড়ী থেকে কাকের মুখে বার্তা পাঠিয়ে দাও, ঘোষাল এসে হাজির হবে। কোমর বেঁধে দিবারাত্রি খেটে কাজ সেরে খেয়ে দেয়ে

বাড়ী যাবে। দক্ষিণা দাও ভালই, না-দাও তাতেও কিছু বলবে না সে; পুরিয়া দুয়েক অর্থাৎ দু আনা কি চার আনার গাঁজা দিলেই ঘোষাল কৃতার্থ। আরও আছে, শ্মশানে যেতে ঘোষালের যুড়ি নাই। সে হিসেবে ঘোষাল এ অঞ্চলের সকলজনের একজন বান্ধব তাতে সন্দেহ নাই, উৎসবে আছে, শ্মশানে আছে—রাজদ্বারেও আছে ঘোষাল; মামলায় সে পেশাদার সাক্ষী।

সুস্থ হ'তে ঘোষালের বেশ কিছুক্ষণ লাগল। হেউ-হেউ শব্দে ঢেকুরের পর ঢেকুর তুলবার চেষ্টা ক'রে অবশেষে দু তিনটে বেশ লম্বা এবং সশব্দ ঢেকুর তুলে একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে ঘোষাল বললে—আঃ বাঁচলাম! তারপর আবার বললে—তুমি বরং ওদের হাত দেখে শেষ কর ডাক্তার। আমি আর একটু জিরিয়ে নি।

মকবুলই এগিয়ে এল সুযোগ বুঝে। ডাক্তার তার হাতখানি ধরলেন। বিচিত্র হাস্যে তার মুখখানি প্রসন্ন হয়ে উঠল। উপায় নাই। তিনি ছাড়তে চাইলেও লোকে ছাড়বে না; তাঁর কর্ম তাঁকে রেহাই দেবে না। একে একে রোগীদের দেখে তাদের ব্যবস্থা দিয়ে সব শেষে দেখলেন দাঁতু ঘোষালকে।

ঘোষাল বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। এবার সে হাতখানি বাড়িয়ে দিলে। জীবন ডাক্তার বললেন—তোর হাত দেখে কি করব ঘোষাল? রোগ তো তোর ভাল হবার নয়! তোর আসল রোগ হ'ল লোভ। লোভ তো ওষুধে সারে না! তার উপর নেশা। সকালে উঠেই এই অবস্থায় তুই গাঁজা টেনে এসেছিস।

দাঁতু লজ্জিত হয় না, সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললে, গাঁজাতে হয় নাই দত্ত। বিড়ি! বিড়ি! বিড়িতে হল। তোমার দাওয়াতে বসে ছিলাম, দেখলাম ওই কি বলে তাহের শেখ বিড়ি টানছে। ভারী পিপাসা হল, ওরই কাছে একটা বিড়ি নিয়ে যেই একটান টেনেছি অমনি বুঝেছ কি না, হাঁপ ধ'রে গেল। তারপরেতে তোমাকে কতকগুলো কথা একসঙ্গে বলেছি আর-ব্যাস হঠ্যাৎ বুঝেছ কি না—।

হাত দুটি নেড়ে দিলে দাঁতু ঘোষাল—এতেই বুঝিয়ে দিলে যে আচমকা রোগটা উঠে পড়ল। এতে আর তার অপরাধটা কোথায়? ঘোষাল

নিরপরাধ ব্যক্তির মতই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—এ সব গ্রহের ফের বুঝলে না! তা দাও ভাই যা হোক একটা এমন ওষুদ দাও যাতে হাঁপানী কাসিটা কমে। সকালে বিকেলে চায়ের সঙ্গে দুটো ক'রে চারটে আরসুলা সিদ্ধ ক'রে খাচ্ছি তাতেও কিছু হচ্ছে না।

ডাক্তার বললেন—গাঁজা তামাক বন্ধ করতে হবে। লোকের বাড়ী খাওয়া বন্ধ করতে হবে। একেবারে ঝোল আর ভাত। না হলে ওষুধে কিছু হবে না, ওষুধও আমি দেব না ঘোষাল!

—তবে আর একবার ভাল ক'রে হাতটা দেখ।

ঘোষাল হাতটা বাড়িয়ে দিলে।—দেখ, দেখে বলে দাও কবে মরব। নিদান একটি হেঁকে দাও। ওতে তো তুমি বাকসিদ্ধ! দাও! শুনলাম কামারবুড়ীকে নিদান হেঁকে দিয়েছ। গঙ্গাতীরে যেতে বলেছ। আমাকেও দাও!

ডাক্তার চমকে উঠলেন। নতুন ক'রে মনে পড়ে গেল সকালবেলার কথা। তিনি চঞ্চল হয়ে নড়েচড়ে ব'সে বললেন—তুই থাম ঘোষাল, তুই থাম।

তিনি তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ টেনে প্রেসকৃপসন লিখে ঘোষালের হাতে দিয়ে বললেন—এই নে। গাছ-গাছড়া শুধু, দু তিনটে জিনিস মুদীখানায় কিনে নিবি। তৈরী ক'রে নিয়ে খাস।

ডাক্তার উঠে পড়লেন। চেয়ারখানা ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল অমরকুঁড়ির পরাণ খাঁ। সে সেলাম ক'রে দাঁড়াল। সামনে ছইওয়ালা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খাঁয়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর দীর্ঘস্থায়ী অসুখ। আজ ছ'মাস বিছানায় পড়ে আছে। মৃত সন্তান প্রসব ক'রে বিছানায় শুয়েছে। সপ্তাহে দুদিন ক'রে পরাণ ডাক্তারকে নিয়ে যায়। আজ যাবার দিন। যেতে হবে। পরাণ খাঁ অবস্থাপন্ন চাষী। নিয়মিত ফি দিয়ে থাকে। ডাক্তার হাসলেন; একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছে। এই সব বিনা ফি-এর রোগীদের তিনি যখন বলেছিলেন—আর চিকিৎসা তিনি করবেন না, তখন এই কথাটি তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। চিকিৎসা ছাড়লে চলবে কি ক'রে?

পরাণ বললে—দেরী হবে না কি আর?

—নাঃ দেরী কিসের। ডাক্তার পা বাড়ালেন।—চল।

পরাণ এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে—আপনি তা' হ'লে গাড়িতে চড়েন। আমি পায়দলে তুরন্ত গিয়া ধরব গাড়ি। একটু অপ্রস্তুত ভাবেই বললে—কিছুটা তরি নিয়া এসেছিলাম। নন্দ নিয়া গেছে ভিতরে। ডালাটা নিয়াই যাব আমি।

পুরানো কালের লোক পরাণ; এখনও ভালবাসার মূল্য দেয়। ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ ডাক্তারের বাড়ী মধ্যে মধ্যে পাঠায়; কখনও নিজেই নিয়ে আসে। বিবির অসুখে এই ভেট পাঠানোর বহরটা একটু বেড়েছে। ডাক্তারের উপর অগাধ বিশ্বাস পরাণের। নতুন কালের চিকিৎসায় বিশ্বাস থাক বা না-থাক নতুন কালের অল্পবয়সী ডাক্তারদের উপর বিশ্বাস তার নাই। তৃতীয় পক্ষের বিবি যুবতী, মেয়েটি শ্রীমতীও বটে; এর উপর পরাণের আছে সন্দেহ বাতিক। বিবিকে বাঁচাবার জন্য তার আকুলতার সীমা নাই, অর্থ ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত নয় কিন্তু জেনানার আব্রু জলাঞ্জলি দিয়ে বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল। জীবন মশায়ের কথা আলাহিদা। পরাণ 'আলাদা' শব্দটাকে বলে 'আলাহিদা'। মাথার চুল সাদা হয়েছে, চোখের চাউনির মধ্যে বাপ-চাচার চাউনি ফুটে ওঠে, গোটা মানুষটাই শীতকালের গঙ্গানদীর জলের মত পরিষ্কার।

গাড়ী মন্থর গমনে চলল।

পরাণ খাঁয়ের মত ঘর কয়েকের জন্যই ডাক্তার সংসারের ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত। বর্ষায় ধানের অভাব হলে ধান ঋণ দেয় তারা। অভাব অভিযোগের কথা জানতে পারলেই পূরণ করে। অথচ—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ডাক্তার।

কি না ছিল?

মাঠের উপর এসে পড়েছিল গাড়িটা। চারিপাশের উৎকৃষ্ট ক্ষেতগুলির দিকে আপনি চোখ পড়ল। ওগুলির অধিকাংশেই ছিল মশায়দের। ওই বিরাট পাঁজার পুকুর, ওই শ্রীলাইকার, ওই ঘোষের বাগান। শুধু জমি পুকুরই নয়—এই গ্রামের সামান্য জমিদারী অংশও কিনেছিলেন তাঁর বাবা জগবন্ধু মশায়। এক আনা অংশ তিনি চড়া দামে কিনেছিলেন।

(চার)

তখন তাঁর কিশোর বয়স।

পড়তেন নবগ্রাম মাইনর ইস্কুলে। সেইবারই তাঁর মাইনর ইস্কুলে শেষ বৎসর। সে আমলে জমিদারত্বের একটা উত্তাপ ছিল। যে জমিদারী কিনেছে সেকালে তারই মেজাজ পাল্‌টেছে। জমিদারী কিনলেই লোকে মনে করত—লক্ষ্মী বাঁধা পড়লেন। সে আমলের প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের অধিকারী কণ্ঠমহাশয়ের গানে আছে—"আগে করবে জমিদারী তবে করবে পাকাবাড়ী।" তাঁরই স্বজাতি জ্ঞাতি ঘোষগ্রামের রাধাকৃষ্ণ মিত্র ওই নবগ্রাম মাইনর ইস্কুলে পড়ত। ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নবগ্রামের প্রতিপত্তিশালী জমিদারের ভাইয়ের সঙ্গে চলত তার অবিশ্রাম প্রতিযোগিতা। লেখাপড়ার নয়, জমিদার-বংশধরত্বের। প্রায়ই খিটিমিটি বাধত। বাধবার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকত রাধাকৃষ্ণ। বলত He is a Zeminder's Son, I am also a Zeminder's Son; এখন ঝগড়া হচ্ছে, বড় হলে দাঙ্গা হবে।'

তাঁর বাবা জগদ্বন্ধু মশায় জমিদারী কেনার পর তাঁরও মনে এ উত্তাপ কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছিল। লোকে—সহপাঠীরা বলেছিল—গুলবাঘা এবার ডোরাবাঘা হ'ল! সাবধান!

সহপাঠীরা তাকে বলত—গুলবাঘ।

সেই কিশোর বয়সে তাঁর নিজের রূপের কথা মনে পড়ছিল। রূপ,—যে-রূপ সুকুমার-কোমল-উজ্জ্বল—সে রূপ তাঁর কোন কালে ছিল না। কিন্তু রূপ তাঁর ছিল। সবল পরিপুষ্টদেহ—গোল মুখ, ঝক্‌ঝকে চোখ, নির্ভীক দৃষ্টি শ্যামবর্ণ দুর্দান্ত কিশোর। হাডু-ডু-ডু খেলবার সময় মালকোঁচা মেরে জীবন ডাক দিতে ছুটলে প্রতিপক্ষ দল খানিক পিছিয়ে 'খোল' অর্থাৎ স্থল নিত। বলত—হাঁ। গুলবাঘ ছুটেছে।

এ ধার থেকে ওধার মুহূর্তে ছুটে ঘুরবার ভান করে একেবারে মাঝের দাগের কাছ পর্যন্ত এসে বোঁ করে আবার ঘুরে আক্রমণ করতেন। কাউকে বা কাউকে মেরে আবার ঘুরতেন।

বাড়ীর পিছনে কুস্তির আখড়া ছিল। ল্যাঙ্গট পরে নরম মাটির উপর বাঈকে পড়তেন। মুগুর ছিল, সে দুটো আজও আছে।

গুলবাঘ হিংস্রতর নরঘাতী ডোরাবাঘই হয়ে উঠত যদি না জগদ্বন্ধু মশায় মাথার উপরে থাকতেন। জগদ্বন্ধু মশায়ের চিত্ত যে এতে বিন্দুমাত্র উত্তপ্ত হয় নি। মশায় বংশের মহদাশয়ত্বই ছিল তাঁর কাছে সব চেয়ে বড়। দম্ভের মোহে তিনি জমিদারী কেনেন নি। জমিদারীর উপর কোন মোহ তাঁর ছিল না। জমিদারী তিনি কিনেছিলেন জমিদারদের দম্ভের উত্তাপ থেকে বাঁচবার জন্য। যে দিন জমিদারী কেনা হয় সে দিনের একটা কথা মনে পড়ছে।

জগদ্বন্ধু মশায়ের বন্ধু এই গ্রামেরই মিশ্র বংশের ঠাকুরদাস মিশ্র তাঁকে শ্লেষ ক'রে বলেছিলেন—তা হ'লে এবার জমিদার হলে। আশয়ের চেয়ে বিষয় বড় হল। আগে লোকে সম্ভ্রম করত—মশায় বলে, এবার লোক প্রণাম করবে জমিদার মশায় বলে! বাবু মশায় বলে!

জগদ্বন্ধু বলেছিলেন—ভাই, ঢাল আর তরোয়াল দুটোই হ'ল অস্ত্র। ওর একটা থাকলেই সে যোদ্ধা। কথাটা ঠিক। কিন্তু তরোয়াল না নিয়ে—শুধু ঢালটা যে রাখে তরোয়ালের চোট থেকে মাথাটা বাঁচাতে—তাতে আর তরোয়ালধারীতে তফাৎ আছে। আছে, কি না আছে—তুমিই বল। ওটা আমার ঢাল, শুধু ঢাল। বুঝেছ না, নবগ্রামের ঢাল তরোয়ালধারী জমিদারদের উঁচানো তলোয়ারে আশয়ের মাথা বাঁচানো দায় হয়ে উঠেছিল। তাই তলোয়ারের কোপ রুখতে ঢাল অস্ত্র হলেও ধরতে হয়েছে। কথাটা তোমাকে খুলেই বলি ঠাকুরদাস। নবগ্রামের জমিদারদের কাছে মান বজায় রাখা দায় হয়ে উঠেছে ভাই! সদাই ওঁরা শস্ত্রপাণি। নবগ্রামের রায়চৌধুরী বংশের তলোয়ার ভেঙেছে, ওরা এখন বঁটি ঘুরিয়ে লোকের মাথা কাটতে চায়। আবার নতুন ধনী ব্রজলালবাবু এখন আমাদের গ্রামের আট আনা অংশের জমিদার। তাঁদের হ'ল চকচকে তলোয়ার। ওহে আজ মাস ছয়েক থেকে দেখছি, ব্রজবাবুদের বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ হ'লে ডাক আসছে চাপরাশী মারফত। সেলাম অবিশ্যি করে। বলে—'সালাম গো ডাক্তারবাবু—বাবুদের বাড়ী একবার যেতে হবে যে।' ওদের দেখাদেখি রায়চৌধুরীরা পথে ঘাটে

দেখা হলে হেঁকে বলতে সুরু ক'রেছে—'মশায় হে, একবার আমাদের বাড়ী হয়ে যাবে যেন।' বড়বাবুরা ফি দেন, এরা আবার তাও দেয় না। কারণ ওঁরা জমিদার, আমি প্রজা। বুঝেছ না, অনেক ভেবে ঢাল কিনলাম। এ আমার তরোয়াল নয়। এক হাতে ঢাল থাকল—অন্য হাতে থল নুড়ি। ওটা ছাতার বদল।

কথাটা তিনি তাঁর জীবনে সত্য বলেই প্রমাণিত করেছিলেন। তাঁর ওই ঢালের আড়ালে এ গ্রামের অনেক জনকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। এবং ওই ঢাল দেখিয়ে এ গ্রামের কাউকে কখনও অস্ত্রধারীর ঔদ্ধত্যে অপমানিত করেন নি।

কথাগুলি জীবন ডাক্তার নিজের কানে শুনেছিলেন। পাশের ঘরেই তিনি বসে পড়ছিলেন।

তবুও তাঁর মনে বিষয়-বৈভবের দম্ভের উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ নয়! নইলে—তিনি ডাক্তার হ'তেন না। বাপের কাছে কবিরাজীই শিখতেন। তাঁদের কবিরাজীতে কিছু অভিনবত্ব আছে তাঁর পিতামহের কল্যাণে। তিনি ডাক্তারী শিখতে চেয়েছিলেন।

বলেছিলেন—আমার ইচ্ছে ডাক্তারী পড়ি।

—ডাক্তারী!

—হ্যাঁ। দেশে তো ডাক্তারীরই চলন হতে চলল। কবিরাজীতে লোকের বিশ্বাস কমে যাচ্ছে। বর্ধমানে ইস্কুল হয়েছে। আমি ওখানেই পড়ব।

দেশে সত্যই তখন ডাক্তারী অর্থাৎ এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা রাজকীয় সমারোহে রথে চড়ে আবির্ভূত হয়েছে। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, বর্ধমানে মেডিকেল স্কুল, জেলার সদরে সদরে হাসপাতাল, চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারী; ইংরেজ সাহেব ডাক্তার, দেশী বামজাদা ডাক্তারদের পোষাক গলাবন্ধ কোট, প্যাণ্টালুন, গোল টুপি গার্ডচেন, বার্নিশ করা কাঠের কলবাক্স; ঝকঝকে লেবেলআঁটা সুন্দর শিশিতে ঝাঁঝালো, রঙীন ওষুধ, ওষুধ তৈরির সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া, সব মিলিয়ে সে যেন একটা অভিযান। এ অঞ্চলে তখনও কবিরাজীর রাজ্য চলছে। এ যুগের সাঁড়াশী

আক্রমণের মত দুদিকে বসেছেন দুজন ডাক্তার। উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। উত্তরে বসেছেন ভুবন ডাক্তার। বড় লাল ঘোড়ায় চেপে ব্রিচেস আর গলাবন্ধ কোট পরে ভুবন ডাক্তার মধ্যে মধ্যে এ পথে যাওয়া আসা করেন। যান রেলস্টেশন—নবগ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে। আর উত্তর থেকে আসেন রঙলাল ডাক্তার—তসরের পেণ্টালুন গলাবন্ধ কোট—গলায় কারে ঝোলানো পকেটঘড়ি। রঙলাল ডাক্তার যান আসেন পাল্কীতে। রঙলাল ডাক্তার থাকেন এখান থেকে মাইল চারেক দূরে। এ অঞ্চলে তিনিই প্রথম এ্যালোপ্যাথি নিয়ে এসেছেন। অদ্ভুত চিকিৎসক। প্রতিভাধর ব্যক্তি। মেডিকেল কলেজে বা ইস্কুলে তিনি পড়েন নি; নিজে বাড়ীতে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। নদী থেকে শ্মশান থেকে শব নিয়ে এসে গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে কেটে এ্যানাটমি শিখেছেন। বিস্ময়কর সাধনা। তেমনি সিদ্ধি। কোথায় বাড়ী হুগলী জেলায়, সেখান থেকে এসেছিলেন এ জেলার রাজ হাই ইংলিশ স্কুলে শিক্ষকতার কর্ম নিয়ে। ইংরিজীতে আধিকার ছিল নাকি অসামান্য। আর তেমনি ছিল অগাধ আত্মবিশ্বাস। বিখ্যাত হেড মাস্টার শিববাবুর ইংরিজী খসড়া দেখে দু এক জায়গায় দাগ দিয়ে বলতেন—এখানটা পাল্টে এই করে দিন। ইমপ্রুভ করবে। বলতে সঙ্কোচ অনুভব করতেন না। তিনি হঠাৎ কোন আকর্ষণে ময়ূরাক্ষীর তীরে নির্জন একটি গ্রামে এসে এই সাধনা করেছিলেন তপস্বীর মত। তারপর একদিন বললেন—এইবার চিকিৎসা করব। এবং কিছুদিনের মধ্যেই এ অঞ্চলে অসামান্য প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। রঙলাল ডাক্তারের চিকিৎসার খ্যাতি রঙলালকেই প্রতিষ্ঠা দেয় নি—তাঁর সঙ্গে এ্যালোপ্যাথিরও প্রতিষ্ঠা করেছিল। চারিদিকে নূতন চিকিৎসার প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে সুরু করলে।

জীবন ডাক্তার সেদিন কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে কবিরাজীর পরিবর্তে ডাক্তারীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। প্রতিষ্ঠা চাই, খ্যাতি চাই, অর্থ চাই, মানুষের কাছ থেকে অগাধ শ্রদ্ধা চাই। তার প্রেরণা দিয়েছিল ওই জমিদারীটুকু। নইলে উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ—এই নিয়ম অনুসারে হৃদয়ের অভিপ্রায় তিনি প্রকাশ করতে লজ্জিত হতেন। জমিদারী যখন কিনেছেন

বাবা তখন অবশ্যই পারবেন ডাক্তারী পড়াতে। তাই মাইনর পাশ করে তিনি গেলেন কাঁদী রাজ হাইস্কুলে এণ্ট্রান্স পড়তে।

গরুর গাড়িটা থামতেই ডাক্তারের তন্ময়তা ভেঙে গেল। সামনেই পরাণ খাঁয়ের দলিজা। এসে পড়েছেন।

(পাঁচ)

পরাণের বিবি একটু ভালোই আছে। আরো ভালো থাকা তার উচিৎ ছিল। কিন্তু তা থাকছে না। নাড়ীর গতি দেখে ডাক্তারের যা মনে হয়—উপসর্গের সঙ্গে ঠিক তার মিল হয় না। রোগের চেয়ে রোগের বাতিকটা বেশী। এখানে ব্যথা, ওখানে ব্যথা বিছানায় শুয়ে কাতরানো, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা এর আর উপশম নেই। আরও মজার কথা—রোগী তো ভাল আছে বললেই রোগ বেড়ে যায়। কি করবেন ডাক্তার! এর চিকিৎসা তাঁর হাতে নেই। তিনি বুঝতে পেরেছেন, মেয়েটি ভালো হতে চায় না। পরাণ খাঁয়ের স্ত্রী হিসেবে সুস্থ দেহে উঠে হেঁটে বেড়াতে সে অনিচ্ছুক। তাই ডাক্তার কৌশল অবলম্বন ক'রেছেন, রোগ আদৌ কমেনি বলে যাচ্ছেন। আজো তাই বললেন।—তবে হ্যাঁ, ভয় কিছু নাই খাঁ। ভয় করো না। এ ছাড়া খাঁকেই বা কি বলবেন। ও কথা খাঁকে বললে খাঁ যে কি মূর্তি ধরবে—সে ডাক্তারের অজানা নয়। বৃদ্ধের জীবনও অশান্তিময় হয়ে উঠবে। স্বামী স্ত্রীর অমিলনের মত অশান্তি আর নাই। তিনি নিজেই চিরজীবন জ্বলছেন। এ আগুন তাঁর জীবনে কখনও নিভল না। আজও রোগী দেখে বাড়ী ফিরে দেখলেন যে সে আগুন যেন লেলিহান হয়ে উঠেছে। কোন্ আহুতি পেয়েছে বুঝলেন না।

আতর বউ নিচে নিষ্ঠুর আক্রোশে বকছে। এই মুহূর্তেও ব'কে চলেছে আপনার মনে। বকছে তাঁকে এবং নবগ্রামের শশী মুখুজ্জে হাতুড়ে ডাক্তারকে। শশীই দিয়ে গিয়েছে আহুতি; সে তাঁর অনুপস্থিতিতে এসে হাজির হয়েছিল।

জীবন ডাক্তারকে না-পেয়ে বাড়ীর ভিতর আতর বউয়ের কাছে বসে তাঁকেই জ্বালাতন ক'রে গিয়েছে। তামাক খেয়ে ছাই এবং গুল ঝেড়ে ময়লা করে দিয়ে গিয়েছে গোটা দাওয়াটা। রাজ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে ওই হাসপাতালের ডাক্তার তাঁকে যে কটু কথাগুলি বলেছে, সেগুলিও আতরবউয়ের কানে তুলে দিয়ে গিয়েছে। হতভাগা বাউণ্ডুলে শশীর হুঁস কম। তাকে আটকাবারও উপায় নাই। হতভাগা শশীর উপর আতর বউয়ের মমতাও যত ক্রোধও তত।

শশী জীবন ডাক্তারের শিষ্য। তাঁর আরোগ্য-নিকেতনেই ডিসপেনসিং শিখেছিলে—এখানেই তার হাতেখড়ি। তারপর বর্ধমান গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাকা কম্পাউণ্ডার হয়ে নবগ্রামের চ্যারিটেবিল ডিসপেন্সারীর প্রথম কম্পাউণ্ডার হয়েছিল সে। কম্পাউণ্ডিং কাজ সে ভালোই জানে। কম্পাউণ্ডিংই নয়, চিকিৎসা-বিদ্যাটাও মোটামুটি জানে শশী। তাঁর এখানেই নাড়ী দেখতে রোগ চিনতে কিছু কিছু শিখেছিল সে। কিন্তু আশ্চর্য অপরিচ্ছন্ন লোক। কামানোর ঝঞ্ঝাটের জন্য দাড়ী গোঁফ রেখেছে। স্নান কদাচিৎ করে, দাঁতও বোধ করি মাজে না। এক জামা পনের দিন গায়ে দেয়; উৎকট দুর্গন্ধ না-হ'লে সেটাকে ছাড়ে না। আর অনবরতই প্রায় তামাক টানে। জামার পকেটেই থাকে তামাক টিকে দেশলাই এবং হাতে থাকে হুঁকো। তার উপরে করে মদ্যপান। মাতাল সে। মধ্যে মধ্যে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে। ওই হুঁকোর জন্যেই তার নবগ্রাম ডিসপেন্সারীর চাকরী গিয়েছিল। পকেটে হুঁকো, কল্কে, তামাক, টিকের টিন—এ না নিয়ে শশী কোন কালেই এক পা হাঁটে না। বলে—ওরে বাবা, লোকে লুকিয়ে বাবার হুঁকো টেনে তামাক খেতে শেখে। আমি আমার কর্তাবাবার—মানে বাবার বাবার কাছে তামাক খেতে শিখেছি। লুকিয়ে নয়, তিনি আমাকে নিজে সেজে তামাক খাওয়াতেন। এ-ছাড়া চলতে বারণ। ছেলেদিগে বলেছি, আমি মরলে আমার চিতায় যেন হুঁকো কল্কে তামাক টিকে দেয়। দেশলাই চাই না। ও চিতের আগুনেই হবে। ডাক্তারখানার ওষুধের আলমারীতে তামাক টিকে রাখত। কোণে গুল ঝেড়ে গাদা করত, ডাক্তার সায়েব এলে কোন কিছু একখানা খবরের কাগজ চাপা দিয়ে রাখত। তিনবার ধরা পড়ে কোনরকমে চাকরী বেঁচেছিল, চারবারের বার আর বাঁচল না। তা না

বাঁচলেও শশী ওই বিদ্যেতেই বেশ করে খেয়েছে, আজও খাচ্ছে। মদ্যপানটা কিছু কমেছে এখন। ছেলেরা চাকরী করে। নিজেও এখনও একটা টাকা কোনরকমে উপার্জন করে শশী। পরামর্শের দরকার হলে শশী মধ্যে মাঝে জীবন ডাক্তারের কাছে আসে। জীবন ডাক্তারকে বলে—গুরুজী! অনেক শিখেছি জীবন মশায়ের কাছে। যা কিছু জানি তার বারো আনা—ব'লে প্রচুর হাসে। ইঙ্গিত আছে কথাটার মধ্যে। শশী তাঁর কাছে শুধু ডিসপেনসিং এবং ডাক্তারিই শেখেনি, দাবা খেলাও শিখেছিল সে। আরও শিখেছিল হরিনাম সংকীর্তনে দোয়ারকি। এ দুটোতে শশীর বিদ্যা—শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী যাকে বলে তাই।

শশীকে দাবা খেলতে বসিয়ে দিয়ে বন্ধুরা তার বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে এসে খেয়ে দিত। শশীর বাড়ীতে গিয়ে বলত, শশীদাকে আজ রাত্রে রোগীর কাছে থাকতে হবে। কল পেয়েছে। শশীদা আমাদের বললে, ভাই বাড়ীতে গিয়ে আমার খাবার যদি এনে দিস, তবেই তো খাওয়া হয়। শশীদার খাবার দিন।

শশী রাত্রে রুটি খেত এবং শশীর স্ত্রীর রান্নাও ছিল উপাদেয়। রাত্রি দুটোর পর শশী যখন উঠত, তখন খাবারের পাত্রটা তার হাতে দিত, বলত—নিয়ে যাও শশীদা। তোমাদের বাড়ীর থালা। শশীর আর বাড়ী যাওয়া হ'ত না। গালাগালি দিয়ে খালি পেটেই শুয়ে পড়ত সেই আড্ডাঘরে। না হলে শশীর কলের মর্যাদা যায়।

তাঁর কাছে শেখা তৃতীয় বিদ্যা সঙ্গীতে সে অসুর—অসুর বললেও ঠিক ব্যাখ্যা হয় না, বলতে হয় বিকটাসুর। কণ্ঠস্বর তার যেমন কর্কশ তেমনি সে বেমক্কা বেতালা। তার উপর মদ্যপান না করে আসরে সে নামে না। দৃষ্টান্ত দেয় বড় বড় ওস্তাদের।

সংকীর্তনের দলে শশী তারস্বরে চীৎকার করে।

জীবন ডাক্তার কপালে হাত দিয়ে হেসে বলেন, আমার কপাল! মধ্যে মধ্যে শশীকে তিনি বলেন—শশী, একসঙ্গে বেচারা হরিকে আর তালকে মেরে খুন করিস না বাবা! শিষ্যের পাপ গুরুকে অর্শায়! আমার যে নরক হবে। শশী বলে—ভাববেন না। আপনার রথ আটকায় কোন শা—।

বলেই সে হা-হা ক'রে হাসে।

এই শশী ডাক্তার!

মধ্যে মধ্যে শশী আসে পরামর্শের জন্য, কেসটা যে পেকে গেল ডাক্তারবাবু!

জীবন ডাক্তার বলেন, রোগীটা কাঁচা না পাকা আগে বল। পাকা হলে খসতে দে। তোর চিকিৎসা দোষের চেয়ে ওর বয়সের দোষ বেশী।

রোগী তরুণ হলে ডাক্তার শোনেন, গভীরভাবে চিন্তা করে পরামর্শ দেন।

কখনও কখনও কল দিয়ে নিয়ে আসে শশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সব কলে ফি নাই, বিনা ফিয়ের কল। শশী কম্পাউণ্ডার যেখানে ডাক্তার হিসেবে চিকিৎসা করে, সেখানে চারদিকে দৈন্য; চার আট আনা ফি নেয় শশী। জীবন ডাক্তার এখানকার মাটি, মানুষ, গাছপালাকে নিবিড়ভাবে চেনেন। তাদের দুঃখ তিনি জানেন। তাদের জন্য তাঁর বাপপিতামহের চিকিৎসালয়ে দুয়ার ছিল অবারিত। তাঁর দুয়ারও তিনি বন্ধ করেন নি। এরা কঠিন রোগে শয্যাশায়ী না হলে ও চার আনা বাঁচাতে বুকে হেঁটেও দাতব্যালয়ের দুয়ারে এসে হাজির হয়। তাদের কাছে তিনি কি ফি নিতে পারেন?

ইদানীং কিন্তু শশীর মাথায় যেন একটু গোল দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্রে যে কয়টা বিস্ময়কর আবিকার হয়েছে, সেই আবিষ্কারের সঙ্গে শশী কোনমতেই তাল রাখতে পারছে না। এতদিন পর্যন্ত খুব গোল বাধে নি। তারপর সাল্‌ফাগ্রুপের বিভিন্ন নামে ট্যাবলেট বের হতেই বেচারার মুশকিল হয়েছে। এর পর পেনিসিলিন—স্ট্রেপ্টোমাইসিন। নূতন কালের ডাক্তাররা ওই ওষুধগুলি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করে চলেছে। পেনিসিলিন ছাড়া তো কথাই নেই। শশী ওগুলো ব্যবহার করতে খানিকটা ভয় পায়। পাবারই কথা। পাওয়াও উচিত। জীবন ডাক্তার নিজেও এ গুলি ব্যবহার করতে খুব ভালবাসেন না। তিনি লক্ষ্য করছেন। শশী কিন্তু এর ফলে ক্ষেপে ওঠে মধ্যে মধ্যে। কিছুদিন আগে বাউড়ীদের ফুড়োরামের কন্যার হয়েছিল নিউমোনিয়া। শশীকে ফুড়োরাম বলেছিল—ডাক্তারবাবু, ওই হাসপাতালের ডাক্তার বললে ফুঁড়ে ওষুধ দিলে শিগ্‌গিরি সেরে যাবে। তা—

শশী বুঝেছিল—পেনিসিলিনের কথা বলছে কুড়োরাম। চটে গিয়ে বলেছিল—নিয়ে আয় টাকা। দিচ্ছি ফুঁড়ে। প্যাঁক করে ফুঁড়ে—একটু আঙুলের ঠেল, আমার তো ওই কষ্ট। তারপর তোরা সামলাবি দেহের দাহ। টাকার দাহ আছে। তাও সামলাবি। ও ইনজেকশন দিতে আমাকে টাকা-টাকা করে ফি দিতে হবে—তাও বলে দিচ্ছি।

—তা হ'লে?

—তা হলে যা খুসী কর। হাসপাতালের ডাক্তার তো বললে—তা হাসপাতাল থেকে দিলে না কেন? ভর্তি করে নিলে না কেন?

—সে আজ্ঞে জায়গা নাই। আর হাসপাতালেও উ সব ওষুধ দেয় না।

—তা হলে, আমি যা বলি, তাই কর। চিরকাল এই ওষুধ আর মালিশে বড় বড় নিউমোনিয়ার কেস ভাল হয়ে এল—আর আজ কুড়োরামবাবুর কন্যের বুকে খানিকটা সর্দি হয়েছে—পেনিসিলিন ছাড়া আর ভাল হবে না।

—তবে তাই দেন।

শশীর মাথায় বিকৃতি—কিছু হয়েছে বার্ধক্যে, মধ্যে মধ্যে সেটা বাড়ে। সে গভীর চিন্তা করে স্থির করেছিল মালিশের সঙ্গে সরষের তেল মেশানোর পরিবর্তে কেরোসিন মিশিয়ে মালিশ করলে মালিশের কাজ দ্রুততর হবে। কেরোসিনে আগুন জ্বলে। সুতরাং তার তেজে বুকের ভিতরের সর্দি নিশ্চয় দ্রুত গলবে। যেমন চিন্তা তেমনি কর্ম। ফলে ব্লিস্টার দেওয়ার মত বুক-পাঁজর জুড়ে ফোস্কা। শশী ছুটে এসেছিল ডাক্তারের কাছে।

জীবন ডাক্তারই ব্যাপারটা সামলেও দিয়েছিলেন। বেগ অবশ্য খুব পেতে হয় নি। প্রচুর যত্ন নেওয়ার ফলে ঘা হতে পায় নি। ফোস্কার চামড়া উঠেই নিষ্কৃতি পেয়েছে। এবং বেঁচেও উঠেছে। সেটার জন্য কৃতিত্ব কার—সে কথা জীবন ডাক্তার জানেন না। শশীর উদ্ভাবিত ওষুধের গুণই হোক, আর মেয়েটার ভাগ্যই হোক, ফোস্কা উঠলেও নিউমোনিয়াটা বাগ মেনে গিয়েছিল। বিনা পেনিসিলিনে বিনা মালিশে বিনা এ্যান্টিফ্লজিস্টিনে এবং কয়েকদিনের মধ্যে সে দিক দিয়ে বিপন্মুক্ত হয়েছিল।

এই শশীভূষণ এসেছিল। কেন এসেছিল শশী কে জানে! হতভাগা কোন বিপদে পড়েছে কি না কে জানে! কিন্তু আতর বউকে জ্বালিয়ে

গেল কেন? আতর-বউয়ের কানে কামারবুড়ীর কথাটা কেন যে তুললে! ছি! ছি! ছি!

আতর-বউ বকছে তাকেই। চিরটা জীবন মানুষের এক স্বভাব? বারবার ঠেকেও মানুষ শেখে না। নিদান-হাঁকার অহঙ্কার কেন? তুই অমুক দিন মরবি ব'লে লাভ কি? তবু যদি পাশ করা ডাক্তার হ'ত! ঘরে ডাক্তারী শিখে কেউ সর্ববিদ্যে বিশারদ হয়?

* * *

এই কথাটা ডাক্তারের অন্তরে বড় লাগে। জীবনের সকল দুঃখ ব্যর্থতার উদ্ভব ওইখান থেকেই। মানুষের দেহে যেমন একটি স্থানে অকস্মাৎ একটি আঘাত লাগে বিষমুখ তীক্ষ্ণধার কোন কঠিন বস্তুতে, তারপর সেই ক্ষত-বিন্দুকে কেন্দ্র করে বিষ ছড়ায় সর্বদেহে, এও ঠিক তেমনি। তাঁর অদৃষ্ট! অদৃষ্ট ছাড়া কি বলা যায়। সঙ্গতি থাকতেও তাঁর ডাক্তারী পড়া হয় নাই! তিনি কলেজে পড়ে পাশ ক'রে ডাক্তার হ'লে, আতর-বউ—তুমিও আসতে না এ বাড়ীতে।

বিচিত্র ঘটনা সে। তামাক টানতে টানতে ডাক্তার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এক সর্বনাশী ছলনাময়ী তাঁর জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে গিয়েছে। কাঁদী ইস্কুলে পাঠ্য জীবনে এই সর্বনাশীকে নিয়ে ওখানকার এক অভিজাত বংশের ছেলের সঙ্গে বিবাদ হল। ছেলেটিও তাঁর স্বজাতি কায়স্থ। পড়ন্ত জমিদার বাড়ীর ছেলে।

হায়রে অবুঝ কৈশোর! শক্তি যোগ্যতা বিচার করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে না। কিশোর রাখাল ছেলে—তালপত্রের খাঁড়া হাতে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

(ছয়)

বিচিত্র কৈশোর—নীল আকাশের তলায় চারা গাছের মত আলোকাভিসারে আকাশ-স্পর্শের কামনায় বিভোর হয়ে যাত্রা। কিশোর শাল আর কিশোর তমাল চারায় প্রতিযোগিতা চলে—তমাল সেদিন লজ্জা পায় না।

প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। হরিনামে শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হয় কিনা ঠিক জানেন না জীবন ডাক্তার কিন্তু প্রেমের স্মৃতি স্মরণে এলে বার্ধক্যেও জীবন সরস হয়ে ওঠে; মন মদির হয়, দৃষ্টিতে স্বপ্ন ফোটে, স্মৃতির ভাষাও উল্লসিত হয়ে ওঠে।

নবগ্রামে মাইনর পাশ ক'রে জীবন ডাক্তার কাঁদী গেলেন এণ্ট্রান্স পড়তে। কাঁদী রাজ হাই ইস্কুলে ভর্তি হলেন। এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে বর্ধমান মেডিকেল ইস্কুলে ভর্তি হবেন। মনে মনে কত কল্পনা কত আশা! নিজের ডাক্তারী জীবনের ছবি আঁকতেন মনে মনে। রঙলাল ডাক্তারের মত গরদের পাৎলুন গলাবন্ধ কোট প'রে, শাদা একটা ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘুরে বেড়াবেন এ অঞ্চল। বুকে সোনার চেনে বাঁধা সোনার পকেট ঘড়ি। থারমোমিটার স্টেথিসকোপ, কলবাকস! ঘরে লক্ষ্মী ছিলেন বাপও ছিলেন স্নেহময়, অর্থের অভাব ছিল না, জীবনের দেহেও ছিল শক্তি মনেও ছিল সাহস সুতরাং কাঁদীর পাঠ্যজীবনে উৎসাহের বা স্ফূর্তির অভাব হয় নি। একদিকে করতেন হৈ-হৈ রৈ-রৈ অন্যদিকে বোর্ডিংয়ের তক্তাপোষে শুয়ে স্বপ্ন দেখতেন ভাবী-কালে জীবন দত্ত এল এম এস শাদা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন জীবনের মোড় ফিরে গেল। সদ্য যুবক জীবন দত্ত প্রেমে পড়ে গেলেন। প্রেমে পড়েছিলেন এক দরিদ্র কায়স্থ শিক্ষক-কন্যার। তাঁর বয়স তখন আঠারো, নায়িকার বয়স বারো। সেকালে চৌদ্দ বছরেই মেয়েরা যৌবনে প্রবেশ করত। দেহে মনে দুইয়েই তারা একালের বেণী-দোলানো সতের বছরের মেয়েদের থেকে স্বাস্থ্যে এবং মনে অনেক বেশী পরিপুষ্ট হয়ে উঠত। এ মেয়েটি আবার একটু বেশী পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। আজকালকার মতে অকালপক্ক বললে একটু আপত্তি করেন জীবন ডাক্তার। বলেন—অকালে পাকা আর সকালে পাকায় তফাৎ আছে। অকালে যা

পাকে তাতে গঠনে খুঁত থাকে ; উপাদানে খামতি থাকে। কিন্তু সকালে যা পরিপুষ্টিতে পূর্ণতা লাভ করে পাকে তাতে খুঁত থাকে না ; যে যে উপাদানে রস পরিপূর্ণতায় স্বাভাবিকভাবে ফলই বল বা দেহমনই বল রাঙা রঙ ধরে মিষ্ট গন্ধে মনকে আকর্ষণ করে, পরিপক্কতার সবই থাকে তার মধ্যে। সুপক্কতা আর পাকামি তো এক জিনিস নয় !

মেয়েটির নাম মঞ্জরী।

মঞ্জরী নামে মঞ্জরী হলেও সে তখন ফুটতে সুরু করেছে। স্বাস্থ্য ছিল সুন্দর। বারো বছরের মঞ্জরী একালের কলেজে পড়া ষোড়শী বা পূর্ণিমার চেয়ে স্বাস্থ্যে শক্তিতে পূর্ণাঙ্গী ছিল। চুল দেখে শুধু সন্দেহ হ'ত যে মেয়েটি ষোড়শী নয়—তাই ত্রয়োদশীর চেয়ে কম মনে হত না। এক পিঠ চুল —কিন্তু চুলগুলি পিঠ ছাড়িয়ে নিচে নামে নি। কোমর ছাড়িয়ে কালো চুলের রাশীটি নিচে নামলে তবে তার রূপটি পরিপূর্ণ হবার কথা। ঠিক কেমন জান ? যেন, কোজাগরীর লক্ষ্মীপ্রতিমার পিছনে চালপট লাগানো হয়েছে অথচ তাতে ডাকসাজের বেড়টি এখনও লাগানো হয় নি। সেই গুলি আঁটা হলেই নিখুঁত হয়ে লক্ষ্মীপ্রতিমা হয়ে উঠবে। এইটুকু খুঁত ছিল। তার বেশী নয়।

একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে। জীবন ডাক্তার মনে মনেই সংশোধন ক'রে নেন সেটুকু। লক্ষ্মীপ্রতিমা বটে—তবে শ্যামা। এবং তাতেই যেন অধিকতর মনোরমা মনে হত মেয়েটিকে। মঞ্জরীর রূপটি তখন ছিল ভুঁই চাঁপার সবুজ নিটোল ডাঁটাটির মত, মাথায় এক থোকা ফুলের কুঁড়ি তখন তখনও ফোটেনি ; ফুটবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ।

অন্তরের দিক থেকেও বারো বছরের মঞ্জরী ষোড়শীর চেয়ে কম ছিল না। দেহের পরিপুষ্টিতায় স্বাস্থ্যসমৃদ্ধির কল্যাণে সে তখন কিশোরীর মন পেয়েছিল। একেবারে ষোল আনার অধিকারীর চেয়েও বেশী, আঠারো আনা বলা চলে ; বলা চলে কেন জীবন দত্তের হিসাবে তাই হয়। ষোল বছরে কৈশোর পূর্ণ হ'লে বয়স মেপে হিসেবের আইনে বার আনা তো পাওয়ারই কথা, ষোল আনার বাকী চার আনার দুআনা পুরণ করেছিল তার সমৃদ্ধ স্বাস্থ্য, বাকী দুআনা সেকালের ঘরের শিক্ষায় এবং মায়ের প্রদত্ত শ্বশুর-বাড়ী

যাওয়ার মন্ত্রপাঠের ফলে সে পেয়েছিল। এর উপরও বাড়তি দুখানা মূলধন তার ছিল। সে পড়ে পাওয়া নয়, সেটা সে পড়াশুনা ক'রে পেয়েছিল। গরীব হলেও বাপ ছিলেন শিক্ষক, বাঙলা লেখাপড়া কিছু শিখিয়েছিলেন। বাপ শিশুবোধক থেকে বোধোদয় পর্যন্ত পড়িয়ে আর পড়ান নি, বলেছিলেন কৃত্তিবাসী কাশীদাসী রামায়ণ মহাভারত পড়। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত পড়েও সে ক্ষান্ত হল না। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত নিজেই পড়লে। ওগুলি বাড়ীতেই তাদের ছিল। খাতায় লেখা পূর্বপুরুষের সম্পদ। এর পর বঙ্কিমচন্দ্র পেলে হাতে। প্রতাপ শৈবলিনী, জগৎসিংহ আয়েষার সঙ্গে পরিচয় হ'তে ষোল আনা আঠারো আনায় ফেঁপে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্র তার হাতে এনে দিয়েছিলেন প্রজাপতি!

সেকালে এ ব্যাপারে প্রজাপতিই ছিলেন বিধাতা। যার গলায় যে মালা দেবে বা যে দুটি নরনারী কিছুদিন খেলা করে আবার পৃথক হয়ে যাবে, তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পথ রচনা করতেন তিনি; মানুষের ভাগ্যফলের ছকের সঙ্গে মিলিয়ে তিনিই বিচিত্র রেখায় এঁকে দিতেন। প্রজাপতি এ ক্ষেত্রেও পথ ছকে রেখেছিলেন। এই প্রজাপতিটি ছিল—মঞ্জরীর দাদা বঙ্কিম। বঙ্কিমের ডাকনাম ছিল চতুরানন; ধূমপান পারঙ্গমতার জন্য এই নাম তাকে দিয়েছিল তার সহপাঠীবৃন্দ। বলত—চারটে লোকের টান বঙ্কিম একা মেরে দেয়; ও বেটা চারমুখে হুঁকো টানে।

জীবন ওখানে সহপাঠী পেলে মঞ্জরীর এই ভাইকে। বোর্ডিংয়ে জীবন নাম-ডাক ছুটিয়েছিল; খরচ করত দরাজ হাতে। ওই যে, বাপ জমিদারী কিনেছিলেন—তারই হাঁকটা জীবন ওখানে নানাপ্রকারে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে ভাল তামাকের গন্ধটা ছিল একটি বিশেষ প্রকার। ঐ গন্ধে গন্ধে এলেন চতুরানন। আলাপ জমিয়ে তুললে। তারপরই ডানা বের করে প্রজাপতি রূপটি প্রকাশ করলে। আলাপের সূত্রে আবিষ্কার করলে জীবন তাদের আত্মীয়। বঙ্কিমের মামা জীবনের নিজের মামীর দেওরের আপন ভায়রার নাত-জামাই। এবং একদা টেনে নিয়ে গেল নিজেদের বাসায়। বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে—জানতাম না, জীবন আমাদের আপনার লোক বাবা। বঙ্কিমের বাবা নবকৃষ্ণ সিং সম্পর্কের উপর গুরুত্ব

দেন নি, তবুও তিনি পরিচয় পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই সমাদর করলেন।

—দীনবন্ধু দত্ত মহাশয়ের পৌত্র তুমি? জগদ্বন্ধু দত্ত মহাশয়ের ছেলে? তোমরা তো মহাশয়ের বংশ গো। আয়ুর্বেদ তোমাদের কুলবিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুনেছি তোমার বাবা জমিদারী কিনেছেন।

পুলকিত হয়েছিল জীবন। সলজ্জ মুখে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভালই লেগেছিল এ প্রশংসাবাদ। বাপ জমিদারী কেনায় গোপন অহঙ্কার তার তখন ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশী এবং বড় ছিল তার কুলগত বিনয়ের শিক্ষা জীবনের সম্ভ্রম। মুখ তুলে কি হাসা যায় এমন ক্ষেত্রে?

নবকৃষ্ণবাবু বলেছিলেন—আমার বাড়ীও তো তোমাদের ওই দিকে গো। চাকরী করি—যাওয়া আসা পুজোর সময়—গরমের ছুটিতে. বড় যাই না। দেশে তো সম্পত্তি তেমন কিছু নাই। বিঘে পাঁচ সাত জমি, শরীকে শরীকে বিবাদ। কি করব গিয়ে? নইলে পাঁচ কোশ দূরে বাড়ী, আত্মীয়তাও যা হোক একটা আছে, আলাপ থাকত। তা ভাল হ'ল আলাপ হ'ল। কিন্তু—।

একটু ভুরু কুঁচকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন,—কিন্তু তুমি যে ইংরেজী পড়তে এলে?

প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝতে পারেন নি জীবন; উত্তরে প্রশ্নের সুরেই বলেছিল—আজ্ঞে?

—তোমাদের তো আয়ুর্বেদই এক রকম কুলগত বিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুলধর্মও বলতে পার। এর জন্য তোমার সংস্কৃত পড়া উচিত ছিল গো? ইংরেজী পড়তে এলে কেন? বিদ্যাই শুধু নয়, বাঁধা টাট, বাঁধা ঘর—সে এক রকম যজমানের মত। ওই থেকেই তো তোমাদের প্রতিষ্ঠা, মহাশয় উপাধি; জমি পুকুর জমিদারী সব তো ওই থেকে!

জীবন বলেছিল—আমার ইচ্ছে ডাক্তারী পড়ব।

—ডাক্তারী! বাঃ বাঃ। খুব ভাল হবে। সে খুব ভাল হবে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ সিংহ। তারপর তিনি বলেছিলেন—যাও, বাড়ীর ভিতরে যাও। বঙ্কিম, নিয়ে যা তোর মায়ের কাছে। তিনিই তো হলেন আসল আত্মীয়। আমরা তো তাঁর টানে-টানে আত্মীয়! যাও।

বাড়ীতে ঢুকেই জীবন থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। মনে হ'ল একটা তীর এসে সোজা হৃদপিণ্ডে বিদ্ধ হ'ল। ব্যাধিনী শরাহত বন্যবরাহের মত অবস্থা।

সেদিনের কথা মনে হলেই জীবন দত্তের ওই উপমাটি মনে পড়ে। সে-কালে যাত্রাগানের পালায় দেখেছিলেন এমনি ঘটনা। প্রলয় এসেছে সৃষ্টির প্রথম মন্বন্তরে। সৃষ্টি পৃথিবী প্রলয় সাগরে ডুবে গিয়েছে। নতুন সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু পৃথিবীকে উদ্ধার না-করলে সৃষ্টি হয় কোথায়? চতুরানন-ব্রহ্মা প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু তখন মৎস্যাবতার লীলা শেষ করে বিশাল বরাহ মূর্তিতে প্রলয়ের পঙ্কপল্বল ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন মনের আনন্দে। প্রজাপতির ইসারায় বরাহ দন্তবিদ্ধ ক'রে পৃথিবীকে তুললেন প্রলয় সমুদ্র হ'তে। পৃথিবী উঠে চেতনা পেয়েই দেখলেন এক বন্যবরাহ সম্মুখে। অমনি তিনি ধরলেন ব্যাধিনী রূপ! বাণবিদ্ধ করলেন বরাহকে। এরপর খানিকটা ছুটোছুটি। বরাহ তাড়া করে ব্যাধিনীকে, ব্যাধিনী ছুটে পালাতে পালাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাণবিদ্ধ করে বরাহকে। তারপর অবশ্য বরাহ মূর্তি ভেদ ক'রে মনোহর শ্যাম কলেবর চতুর্ভুজ বিষ্ণুর আবির্ভাব; এবং পৃথিবীর সঙ্গে পরিণয়। নরকাসুরের জন্ম ইত্যাদি। সে সব বাহুল্য এবং বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। সে দিন বাড়ী ঢুকেই তিনি দ্বাদশী মঞ্জরীর হাতের একটি চড় খেয়েছিলেন একেবারে বুকের উপর।

মঞ্জরী তখন উঠানে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আনি-পানি ঘুরছিল। গায় কোমর বেঁধে হাত দুটোকে দুদিকে প্রসারিত করে দিয়ে বন বন করে খাচ্ছিল ঘুরপাক। পাক খাওয়ার বেগে খাটো এলো চুলের রাশ উঠছিল ফুলে মুখে সে ছড়া আওড়াচ্ছিল—

"আনি পানি জানি না
পরের ছেলে মানি না
লাগলে পরে নাইক দোষ
মানব না-কো রাগ কি রোষ
সরে যাও—সরে যাও
নইলে এবার ধাক্কা খাও।"

বলেই দুরন্ত ভাইদের একজনের সঙ্গে খাচ্ছিল ধাক্কা। একজন সে-ভাইই হোক বা বোনই হোক পড়ছিল। পড়ে গিয়ে কেউ অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে রাগ রোষ সত্যই করে না, পড়ে শুয়েই থাকে চোখ বুজে, মনে হয় মাটি দুলছে—আকাশ দুলছে—ঘরগুলোও দুলছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে—অতলের কি পাতালের দিকে সে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। সর্বাঙ্গ শির-শির করে ওঠে।

বঙ্কিম জীবনকে নিয়ে ঘরে যখন ঢুকল—তখন মঞ্জরী পাক খাচ্ছে। পাক খেতে খেতে ঠিক এক নজরে আগন্তুককে বোধ হয় দেখতে পায় নি, সে দাদাকেই পরের ছেলে বলে লক্ষ্য করে তার দিকেই এগিয়ে এল পা দুয়েক এবং দাদা ভ্রমে জীবনের হৃদ্‌পিণ্ডের উপর ফেললে ঘূর্ণমান হাতের চড়টি ও খিল্ খিল্ ক'রে উঠল হেসে। জীবন দত্ত থ' মেরে দাঁড়িয়ে গেলেন। এদিকে মঞ্জরীর হাসিও স্তব্ধ হয়ে গেলে কয়েক মুহূর্তের জন্য। তার ভুল ভেঙেছে। ঘুরপাক থামিয়ে সে অপরিচিত একজনকে দেখে এবং দাদা ভ্রমে তাকই চড় মেরেছে বুঝে বিস্ময়ে ও লজ্জায় চোখ দুটো বড় করে—ও-মাগো বলে ছুটে পালিয়ে গেল গৃহাভ্যন্তরে। এবং আবার সুরু করলে খিল্ খিল হাসি। জীবন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সে আমলে ওই যথেষ্ট।

বৃদ্ধ জীবন ডাক্তার আজও সে স্মৃতি স্মরণ করে হাসলেন। তাঁর বার্ধক্য-জীর্ণ ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটে ওঠে। তিনি শপথ নিয়ে বলতে পারেন যে, এ আমলে ফুলে-ভরা কোন গাছের ডাল ধরে দোল-খাওয়া অষ্টাদশীও কোন তরুণের মনে এমন অনুরাগ-বিহ্বলতা জাগাতে পারবে না।

ঘটনার ওইখানেই শেষ নয়, আরও আছে।

বঙ্কিম পলায়নপরা মঞ্জরীকে উদ্দেশ করে হেসে বলেছিল—মর হতচ্ছাড়ী! তারপর মায়ের সঙ্গে জীবনের পরিচয় করিয়ে দিলে। জীবন তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—না না। তুমি তো সম্পর্কে আমার বড় গো। আমার দাদা তোমার মাসিমার দেওরের ভায়রার নাতজামাই। সে হিসেবে তুমি আমার দাদার কোন শ্বশুর-টশুর হবে। আমারও তাই

তা' হলে। বস-বস। প্রণাম আমিও তোমাকে করব না, তুমিও আমাকে ক'রো না।

বঙ্কিম এ সম্পর্ক-নির্ণয়ে পুলকিত হয়েছিল—তা'হলে তো তার সঙ্গে সম্পর্ক আর এক পর্ব তফাৎ অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষ। নাতি-দাদামশায় সম্পর্ক—রসিকতার অবাধ অধিকার।

মা খাবার আনতে উঠে যেতেই বঙ্কিম ভিতরে গিয়ে মঞ্জরীকে ডেকে বলেছিল—আয় না হতচ্ছাড়ি, দাদামশায় দেখবি।

—কে? মঞ্জরীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ চাপা হলেও শুনতে পাচ্ছিল জীবন।

—দাদামশায়রে।

—দূর! ওই আবার দাদামশায় হয়! ও একটা ভল্লুক। মা গো—কি হোঁৎকা চেহারা, কালো রঙ! ভালুক একটা।

—ছি! তুই ভারি ধিঙ্গী হচ্ছিস দিন দিন। আমাদের বড় মামা হল ওর মাসীমার দেওরের নিজের ভায়রার নাতজামাই।

—মরণ। সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো-বউয়ের বোনঝি-জামাই!

—না। না। উঠে আয়, আমার বন্ধু। খুব ভাল ঘরের ছেলে।

—ভাল ঘরের ছেলে তো এমন হোঁৎকা ভালুকের মত চেহারা কেন?

—কোথায় ভালুকের মতো চেহারা! বীরের মত চেহারা। মুগুর ভাঁজে কি না!

—তা'হলে পড়তে না এসে যাত্রার দলে ভীম সাজতে গেল না কেন? আমরা সত্যিকারের ভাল গদাযুদ্ধ দেখতে পেতাম। তুই যা—আমি যাব না।

বঙ্কিম একটু ক্রুদ্ধ হয়েই ফিরে এল।

জীবনও বন্য বরাহের মত মাথা হেঁট করেই বসেছিল; খুব প্রীতিপ্রদ নয়, তরুণ বয়সে ও কথায় কারুরই পুলক-সঞ্চার হয় না। সে চলে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে—আজ যাব ভাই, কাজ আছে।

মা ঠিক এই সময়েই জলখাবারের থালা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। থালাখানি নামিয়ে দিয়ে ডাকলেন—মঞ্জী কই? মঞ্জী—জল নিয়ে আয় এক গেলাস। মঞ্জী!

মা-টি বড় রাসভারী লোক। অমান্য সহজে করা যায় না। জীবন ওই কণ্ঠস্বর শুনেই 'না' বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। মঞ্জরীও মিনিটখানেকের মধ্যেই জলের গেলাস হাতে বেরিয়ে এল।

মা বললেন—প্রণাম কর। দাদার বন্ধুই শুধু নয়, আপনার লোক। তোদের দাদামশায় হয়।

মঞ্জরী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

—হাসছিস যে? প্রণাম কর!

—ওইটুকু আবার দাদামশাই হয়?

—হয়। মামা-কাকা বয়সে ছোট হয় না? তুলসী পাতার ছোট বড় আছে?

মঞ্জরী এবার প্রণাম করলে। সে আমলে গড় ক'রে প্রণাম করত। এ আমলের মত হেঁট হয়ে পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকানো প্রণাম নয়। উঠেই আবার হাসতে লাগল।

মা বিরক্ত হয়েই বললেন—হাসছিস কেন?

—দাদামশাই মিলছে না বলে হাসছি।

—কি? কি মিলছে না?

—দাদামশায়ের গালে কাদা কই? ছড়ায় আছে ঠাকুর দাদা গালে কাদা—। বলেই মঞ্জরী হাসতে হাসতেই চলে গেল।

এর পর জীবন দত্তের কথা বোধ করি না বললেও চলে। জীবন দত্ত ঠিক বরাহের মতই ব্যবহার করেছিলেন।

শরবিদ্ধ বন্য বরাহ জান্তব প্রকৃতি অনুযায়ী ছোটে। কিন্তু পালাবার জন্য নয়; সে ছোটে আক্রমণের জন্য। প্রাণের ভয় তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে আক্রমণটা যে দিক থেকে আসে—সেই দিকে তার মাথা নামিয়ে দাঁত উঁচিয়ে ছুটতে থাকে। সামনে যে বা যা পড়ে তাকেই দন্তাঘাতে বিদীর্ণ করে দেয়। জীবনও ছুটল ওই নবকৃষ্ণের বাড়ীর মুখে। ব্যাধিনী মৃত্যুরূপিণী মোহিনীর মত মায়া-জাল পেতেছিল।

একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠল। মঞ্জরী! মঞ্জরী! মঞ্জরী! মঞ্জরীকে সে জয় করবেই। কিন্তু অকস্মাৎ পথ রোধ ক'রে একজন দাঁড়াল। সেও এক বরাহ।

না-না। সে বরাহ নয়। সিংহ ব্যাঘ্র মাতঙ্গ—তাও শ্বেতমাতঙ্গ, এমনি একটা কিছু সে। এই হ'ল সেই ছেলে যার সঙ্গে বিবাদ ক'রে জীবনের সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়ে তিনি বাড়ী ফিরেছিলেন। অভিজাত বংশের উগ্র দাম্ভিক ছেলে ভূপতিকুমার বসু। লোকে ডাকত, ভূপী বসু বলে। ভূপী বসু—ওখানকার নামজাদা দুর্দান্ত। মাঝখানে শহরে বাজারে বেশ গা দুলিয়ে হেলে দুলে যে মাতঙ্গ-গমন ধরণের চলনটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটা ওখানে অর্থাৎ কাঁদী অঞ্চলে আমদানী করেছিল ভূপী বোস। যে পা-খানা সে যখন ফেলত —তখন তার সর্বাঙ্গটা সেই দিকে লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যেন হেলে যেত। সামনে বা পিছনে যারা থাকত তারা বাধ্য হয়ে দেখত ; পাশে যারা চলত—যাদের পাশে তাকাবার অবকাশ থাকত না, তারা ওই দোলার ধাক্কা খেয়ে তাকিয়ে সভয়ে সরে যেত ; ওরে বাবা—ভূপী বসু যাচ্ছে !

ভূপী বসু ছিল গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি—; মাথায় রেখেছিল বাবরী চুল ; সুতরাং তাকে সিংহ ব্যাঘ্র যা বল মানাবে। ভূপী বসু কবে যে ব্যাধিনীকে দেখেছিল, সে জীবন জানে না। তবে ভূপী ওত পেতে ছিল—ব্যাধিনীর উপর সে ঝাঁপ দেবে। ভূপীও ওই প্রজাপতি চতুরানন বঙ্কিমকে আয়ত্ত করে ওদের বাড়ীর ভিতর প্রবেশাধিকার গ্রহণ করেছিল, তার ধারণা ছিল—তার রূপগৌরব বংশ গৌরব-মহিমায় মঞ্জরী—বাঘের চোখের সামনে অভিভূত ব্যাধিনীর হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাটিতে তার থাবার সামনে লুটিয়ে পড়বে। মাস্টার সম্পর্কে তার কোন চিন্তাই ছিল না। বঙ্কিম আছে, ওকে দিয়ে মাস্টারের কানে কথাটা মৃদুস্বরে আশাবরী রাগিণীতে গাইয়ে শুনিয়ে দিলেই হবে।

সুতরাং ভূপী বোসের সঙ্গে আরম্ভ হ'ল প্রতিযোগিতা। ব্যাঘ্র বরাহ সংবাদ রচনা সুরু করলেন কৌতুকপ্রিয় বিধাতা।

(সাত)

তাঁর সহপাঠী বোর্ডিংয়ে পাশের সিটের ছাত্র এরা তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু একটু দেরী হয়ে গিয়েছে তখন। দোষ তাদেরও ছিল না, তাঁরও অর্থাৎ জীবনেরও ছিল না।

সহপাঠীরা জানত না যে জীবন মঞ্জরীর দ্বারা শরাহত হয়েছে এবং সেই-দিকে ছুটেছে। এবং জীবনও জানত না যে, ভূপী বোস রূপী ব্যাঘ্রটি মঞ্জরী ব্যাধিনীর দিকে ওৎ পেতে বসে আছে। সে সময়ে সামান্য একটা কারণে অভিজাত কুলপ্রদীপ ভূপী বোস মঞ্জরী ও মঞ্জরীর মায়ের উপর রাগ ক'রে ওদিক দিয়ে যাওয়া-আসা বন্ধের ভান করে ব'সে ছিল।

ভূপী জীবন থেকে বয়সে বড়। কিন্তু ফেল ক'রে জীবনের এক ক্লাস উপরে পড়ে। ভূপীকে জীবনের না-জানা নয়। কাঁদি ইস্কুলে সে-কালে যারাই পড়েছে তারা ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পাঁচদিন বা সাতদিনের মধ্যে চিনেছে। প্রথমেই চোখে পড়ত তার হেলে দুলে চলন। তারপর শুনত তার বিচিত্র বাগবিন্যাস।

—কোথায় বাড়ী রে ব্যাটাচ্ছেলে? দরিদ্র অবস্থার পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের প্রতি এইটিই তার প্রথম প্রশ্ন।

তার চেহারা বেশভূষা এবং বাকভঙ্গিতে আগন্তুক দরিদ্র সন্তানেরা শঙ্কিত হ'ত, একালের মত বিদ্রোহ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কাল ছিল বিরূপ। তারা সসম্ভ্রমেই বলত গ্রামের নাম। তারপরই ভূপী প্রশ্ন করত—অ! কোন থানা র‍্যা? কোন পরগণা! কত নম্বর লাট?

তারপর বলত—ওইখানেই আমাদের একটা লাট আছে। ৫০৭ কি ৭০৫ একটা নম্বর তাতে সে লাগিয়ে দিত।

জীবন দত্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কিন্তু এই ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে নাই ভূপী; একটু খাতির করে বলেছিল—কোথায় বাড়ী হে ছোকরা? জীবনের বলিষ্ঠ দেহ এবং বেশ ফিট্‌ফাট পোষাক দেখেই তাকে র‍্যা এবং ব্যাটা না বলে বলেছিল হে এবং ছোকরা।

তবুও এতেই প্রথম দিন জীবন ভড়কে গিয়েছিল। বিরক্ত হয়েও সে বিরক্তি গোপন করেই বলেছিল—নবগ্রাম।

বলেই সে চলে গিয়েছিল। দণ্ডী, নখী, শৃঙ্গীদের সান্নিধ্য পরিত্যাগই শ্রেয়,—এই বাক্যটির স্মরণ করেছিল এবং ভূপীকে ওই দলেই ফেলেছিল। কিন্তু ভূপী ছাড়ে নাই। সে নিজেই এসেছিল এগিয়ে, দু' চার দিন পরেই একদিন বোর্ডিংয়ে জীবনের ঘরে এসে বলেছিল—শুনলাম না কি ছোকরা তুমি তামাক খাও ভাল। কই খাওয়াও দেখি! দেখি—কি তামাক তুমি খাও! ভূপীর কণ্ঠস্বরে রীতিমত পৃষ্ঠপোষকের কণ্ঠস্বর।

জীবন দুর্দান্ত ছিল, কিন্তু অভদ্র ছিল না এবং জমিদারী যত কালের পুরানো হ'লে জমিদার বংশে পচ্ ধরে—তাদের একআনা জমিদারী ততকালেরও পুরানো হয় নি। এবং সত্য বলতে কি সে-কালে একটু গোপন খাতিরও মনে মনে অনুভব করেছিলেন ভূপী বোসের উপর। বড় বংশের ছেলে, ভালো চেহারা, এমন বোল চাল, তার উপর জীবন বিদেশী, ভূপী এখানকারই লোক সুতরাং ওটা স্বাভাবিকই ছিল। জীবন সে দিন তামাকও খাইয়েছিলেন। সে দিন যাবার সময় ভূপীর হঠাৎ নজর পড়েছিল জীবনের মুগুর দুটোর উপর। একটু নেড়ে চেড়ে দেখে গিয়েছিল।

হঠাৎ ব্যাঘ্রবরাহসংবাদের সূচনায় ব্যাধিনী কর্তৃক বরাহ শরাহত হওয়ার কয়েক দিন পরই নবপর্যায়ে গুপ্ত ব্যাঘ্র ও আহত বরাহের অর্থাৎ ভূপীর সঙ্গে জীবনের দেখা হল।

ভূপী বোস নবকৃষ্ণ সিংহের বাড়ী থেকে বের হচ্ছে, জীবন ঢুকছে। ভূপী পান চিবুচ্ছিল, সঙ্গে বঙ্কিম, পিছনে বঙ্কিমের মা।

জীবনের সঙ্গে একজন মুটে। তার দেশের লোক; গরমের ছুটির পর দেশ থেকে ফিরেছে ইস্কুলে, আসবার সময় মস্ত ঝাঁকায় বাগানের আম, ক্ষেতের ফুটি, কিছু তরকারী এবং খড় দিয়ে মুড়ে একটা মাছও এনেছে।

ভূপী থমকে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হেসে বললে, কি রকম? মুদ্গর সিংহ এখানে? এ বাড়ীতে?

পিছন থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের কথা ভেসে এল—উনি আমাদের সইয়ের

বউয়ের বকুল ফুলের বোন-পো বউয়ের বোনঝিজামাই, আপনার লোক, সম্পর্কে আমার ঠাকুরদাদা! কি এনেছ গা ঠাকুরদাদা?

সকলের পিছন থেকে মঞ্জরী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে সামনে এসে দাঁড়াল।

ভূপীও সঙ্গে সঙ্গে ফিরল। বললে—চল—চল—দেখে যাই ঠাকুরদাদা মুদ্গর সিংহ কি এনেছেন? নামা ঝুড়িটা।

জিনিসপত্রগুলি দেখে মুখ বেঁকিয়ে একটা আম তুলে নিয়ে দাঁতে কেটে একটু রসাস্বাদ করেই থু-থু ক'রে ফেলে দিয়ে বললে—আমড়া! আমি ভেবেছিলাম আম! কাল আমি আম পাঠিয়ে দেব। গোলাপখাস, আর কি বলে ক্ষিষণ-ভোগ। আমের গায়ে কাগজের টিকিটে লেখা থাকবে—কবে কখন খেতে হবে। ঠিক সেই সেই সময়ে খাবেন কিন্তু। না হ'লে ঠিক স্বাদ বুঝবেন না!

ভূপী চলে গেল। মঞ্জরীর মা বললেন—এস বাবা। ভাল তো সব?

—হ্যাঁ ভাল। আমি কিন্তু চলি এখন। এই তো আসছি। বোর্ডিংয়ের বারান্দায় জিনিসপত্র পড়ে আছে। গাড়োয়ানটাকে রেখে এগুলি দিতে এসেছিলাম আমি। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, ভূপীর কথাগুলিতে সে রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

—একটু জল খেয়ে যাবে না?

—না। গাড়োয়ানটা অজ পাড়াগেঁয়ে। ভয় পাবে। আমি যাই।

তিনি সেইদিনই ভূপীর আঁচটা অনুভব করেছিলেন। এবং সেই হেতুই সেদিন তাঁর সহপাঠী, বোর্ডিংয়ের পাশের সিটের বন্ধুটিকে সব কথা বলেছিলেন বাধ্য হয়ে। না ব'লে উপায় ছিল না। এত বড় মাছটা এবং এতগুলি আম ও ফুটির উপর ছেলেদের লোভ হয়েছিল দুর্দান্ত। কোথায় কোন বাড়ীতে এগুলি গেল জানতে তাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কাজেই প্রশ্নেরও বিরাম ছিল না। অবশেষে বলতে হ'ল নাম।

বন্ধুরা শুনে শিউরে উঠল।—ওরে বাবা, গেছিস কোথায় তুই? বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা বাঁধতে গেছিস। ও যে বাবা ভূপী বোসের মঞ্জরী!

—ভূপী বোসের মঞ্জরী?

—হ্যাঁ। ও দিকে হাত বাড়িয়ো না। হাত কেটে নেবে।

জীবন দত্ত কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে প্রশ্ন করেছিল—কথা পাকা হয়েছে কিনা জান?

—না। তবে—

—ব্যস। তবে দেখা যাক মঞ্জরী কার? মঞ্জরী তো এখনও বাপরূপী গাছে ফুটে আছে রে। যার মুরদ থাকবে সেই পেড়ে মালা গেঁথে গলায় পরবে। আমিও জীবন দত্ত।

গাড়োয়ানের হাতেই সে মাকে একখানি গোপন পত্র পাঠালে—"অবিলম্বে পঞ্চাশটি টাকা চাই!" সে দিনের পঞ্চাশ টাকা আজ উনিশ শো পঞ্চাশ সালে অন্তত দু হাজার টাকা।

লাগল সংঘর্ষ।

প্রথমটা ভূপী বোস গ্রাহ্যই করে নাই। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওই ভালুকটা। বঙ্কিম অথবা মঞ্জরী দু'জনের মধ্যে একজনের কাছে নিশ্চয় সেই প্রথম দিনের বৃত্তান্তটা শুনেছিল এবং মনে মনে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড কৌতুক ও পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করেছিল। মঞ্জরী জীবন দত্তকে দেখে ভালুক বলেছিল ব'লে ভূপীও তার নামকরণ করেছিল ভালুক। আরো তাকে বলত মুদ্গর সিংহ। ওই সব নামে সে তাকে অভিহিত করত। অবশ্য আড়ালে। আর আমড়ার স্বাদ বিশিষ্ট আমের টুকরো বা কতকগুলো ফুটি কি একটা মাছকে সে মূল্যই দিত না। ওর বদলে অল্প গোটা কয়েক কলমের গাছের ল্যাংড়া কি বোম্বাই কি কিষণভোগ নাম-বিশিষ্ট আম এবং গণ্ডাকয়েক লিচু কি গোলাপজাম বা জামরুলের মূল্য বেশী দিত। মাথার চুল জবজবে ক'রে নারিকেল তেলের চেয়ে পলাখানেক ফুলেল তেলের দাম যে অনেক বেশী আভিজাত্যপূর্ণ এ বিষয়ে জ্ঞান ছিল তার টনটনে। তার ওপর তার রূপ-গৌরব সম্পর্কে সে ছিল পূর্ণমাত্রায় সচেতন। কাজেই সে গ্রাহ্য করে নাই।

এদিকে জীবন নিজের পেলবরূপের অভাব পুরণ করতে হয়ে উঠল বিলাসী। লিচু গোলাপজামের কদরকে বেকদর করবার জন্য মনোহারী দোকানের মূল্যবান জিনিষ উপঢৌকন দিতে সুরু করলে। বাড়ীতে তার টাকার চাহিদার অঙ্ক বাড়তে লাগল। জগদ্বন্ধু মশায় বেশ একটু চিন্তিত

হলেন। তবুও একটি ছেলে, তার দাবী সহজে অগ্রাহ্য করলেন না। বাপের কাছ ছাড়াও মায়ের কাছ থেকে টাকা আনাত জীবন। পুরো দাবীটা বাবাকে জানাতে সাহস করত না।

তার জন্য জীবন কখনও আক্ষেপ করেন নি। আজও করেন না।

কি আক্ষেপ? যৌবনের স্বপ্ন, নারীপ্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এর চেয়ে মাদকতাময়—এর চেয়ে জীবনের কাম্য আর কি আছে? কোন নারীকে যে সম্পূর্ণভাবে জয় করে জীবন ভরে পেয়েছে, তার চেয়ে ভাগ্যবান কে আছে? মঞ্জরীর প্রেমের প্রতিযোগিতায় যদি জমিদারীর এক আনা ছ'গণ্ডা দু'কড়া দু'ক্রান্তি বিক্রী হয়েই যেত—তাতেই বা কি হত! তাতেও আক্ষেপ হ'ত না তাঁর।

তাই হয়তো যেত। বাবার কাছে টাকা না পেলে সে ধার করত। তখন তার হালচালে সেখানে রটে গিয়েছিল—জীবন দত্ত ধনী বলে ধনী নয়—নামজাদা ধনীর ছেলে। সুতরাং টাকা ধার পেতে সেই আমলে তাকে কষ্ট পেতে হ'ত না।

কাঁদীর বাজারে তখন তার নাম ছুটে গিয়েছে—'বাবুজী' বলে। জীবন বাজারের রাস্তায় বের হলে দোকানীরা বলত—কি বাবুজী? কোন দিকে যাবেন?

খাস লালবাগের ছোঁয়াচ-লাগা কাঁদীতে আমীরি আমলের 'জী' শব্দটা তখনও বেঁচে ছিল। কোম্পানীর আমলের বাবু শব্দের সঙ্গে ওটিকে লাগিয়ে বাবুজীই ছিল সম্মানের আহ্বান।

জীবন বাবুজী হাসত।

ওসমান সেখ ওখানকার সব থেকে বড় মনোহারী দোকানের মালিক, তার সঙ্গে ব্যাপারটা আরও অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। জীবন ওসমানকে বলত—চাচা জান। ওসমান বলত—বাপ জান। ওসমান সেখের মস্ত দোকান, দু তিনটে শাখা। মনোহারী, জুতো, তামাক। বাকী খাতার পাতায় সসম্ভ্রমে জীবন বাপজানের নামপত্তন করে নিয়েছিল ওসমান চাচা। চাচা মানুষ চিনত। জীবনের প্রয়োজন না থাকলেও চাচা তাকে ডেকে বলত—বাপজান! —আরে, শুন শুন!

—কি চাচাজান ?

—আরে বাপজান—আজ চার পাঁচ রোজ তুমাকে ঢুঁড়ছি। নতুন 'খোসবয়' এনেছি। শহরে (অর্থাৎ মুরশিদাবাদে) গেলাম, মহাজন দেখালে—দেখ ওসমান, 'খোসবয়' দেখ। আতর ছোট হয়ে গেল। নিয়া যাও—রাজবাড়িতে দিবা। রাজবাড়ির জন্যে নিলাম, আর তিন জমিদার বাড়ির জন্যে নিলাম, হাকিমদের জন্যে নিলাম। তা পরেতে বললাম—আর দু-শিশি। তুমার তো দু-শিশি চাই আমি জানি। নিজের জন্য এক শিশি ; আর—।

হেসে চাচা বলত—আর ই বাড়ির জন্য এক শিশি ! নিয়া যাও।

সঙ্গে সঙ্গে কাগজে মুড়ে তার হাতে তুলে দিত।

—দাম ?

—সে হবে। নিয়া যাও তুমি। আর আমি রাখতে পারব নাই। ইয়ার মধ্যে ভূপী চাচা এসেছে দু-দিন। ওই উকীল সাহেবের বাড়িতে দেখেছে ই খোসবয়। বলে, আমার চাই দু-শিশি। দাও। আমি বলি—নাই। সে বলে—জরুর আছে। আমি দোকান তল্লাস করব। তুমি লুকারে রেখেছ, জীবনটারে দিবে। অনেক কষ্টে রেখেছি। নিয়া যাও তুমি। দাম সে খাতায় লিখে রাখব। তার তরে তোমার ভাবনা কি ?

ওই গন্ধ রুমালে মেখে জীবন ভূপী বোসের সান্নিধ্যে এসে রুমালখানা পকেট থেকে বের করে মুখ মুছতে শুরু করত। ভূপী চকিত হয়ে উঠত। তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাত। জীবন বুঝত এবং হাসত। প্রশ্নটা ভূপীর এই—মঞ্জরীর কাপড়ে এবং এই ভালুকটার রুমালে এক মিষ্ট গন্ধ কি ক'রে সম্ভবপর হ'ল ?

ভূপী অবশ্য হটবার ছেলে নয়, ঠিক পরদিনই সেই গন্ধ সে রুমালে মেখে আসত। জীবন ভাবত—ভূপী বোস তো যে সে নয়, ওসমান চাচার দোকানে না পেয়ে নিশ্চয় মুরশিদাবাদ থেকে আনিয়েছে।

হায়—তখন কি জানতেন—? ওঃ!

থাক সে কথা। ও নিয়ে আক্ষেপ কেন ? আক্ষেপ জীবন দত্ত আর আজ করেন না। পরিহাস করেন। প্রেম একপ্রকারের সাময়িক

উন্মাদ রোগ! সেই রোগে সদ্যযুবক জীবন দত্ত সে দিন আক্রান্ত হয়েছিল।

ভূপী বোসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হার মানবার চরম মুহূর্তটির আগেকার মুহূর্ত পর্যন্ত ভেবেছিল সে জিতেছে। জয় তার অনিবার্য। মনে করেছিল পরাজয় আশঙ্কায় ভূপীর মুখ বিবর্ণ বিকৃত হয়ে উঠেছে।

ভূপী বোস তখন জীবন দত্তের অর্থ-ব্যয়ের প্রাচুর্য দেখে বেশ খানিকটা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে ছুতো-নাতায় কথা-কাটাকাটি হত। জীবন আমোদ অনুভব করত। সঙ্গে সঙ্গে দু-চার বার ডাম্বল ভাঁজার ভঙ্গিতে হাত ভাঁজত ভূপীর সামনেই। নিত্য মুগুর ভাঁজাটা সে বজায় রেখেছিল। এবং বোর্ডিংয়ে পাল্লা দিয়ে রাত্রে নিয়মিত সে রুটি খেত পঁচিশ থেকে তিরিশ খানা। ভূপী তার দেহ দেখেও ভয় খেত। জীবন হাসত। জয় তার অনিবার্য! সম্পদের প্রতিযোগিতায় তার জয় হয়েছে, বীর্যের প্রতিযোগিতায় সে শ্রেষ্ঠ; স্বয়ম্বরে আর চাই কি?

হায় রে হায়! হায়রে মানুষের দম্ভ! আর বিচিত্র মানুষের মন! বিশেষ ক'রে নারীর মন! ওযে কিসে পাওয়া যায়, এ কেউ বলতে পারে না।

হঠাৎ একদিন জীবন দত্তের ভুল ভেঙে গেল। ভূপী বোসের সঙ্গে হয়ে গেল চরম সংঘর্ষ। এবং জীবনের সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সে দিন দোলের দিন।

বেশ একটি মূল্যবান উপঢৌকনের ডালা সাজিয়ে জীবন দত্ত মঞ্জরীদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখনও মঞ্জরীর সারা অঙ্গের কোথাও এক ফোঁটা আবীরের চিহ্ন ছিল না। জীবনের অভিপ্রায় ছিল সে-ই তার শ্যামল সুন্দর মুখখানিকে প্রথম আবীর দিয়ে রাঙিয়ে দেবে। প্রথমেই দেখা হল মঞ্জরীর মায়ের সঙ্গে। সে উপঢৌকনের ডালাটি তাঁর সামনেই নামিয়ে দিয়ে বললে— মা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে আপনাদের কথা শুনেছেন কি না।

মঞ্জরীর মা গম্ভীর মানুষ, জীবন তাঁকে ঠিক বুঝতে পারত না। একটু কেমন ভয় করত। আবার যেন ভালোও লাগত না লোকটিকে।

তিনি মুখে বললেন—না-না, এ সব ঠিক নয় জীবন। বলে ডালাটি হাতে ক'রে উঠে গেলেন উপরতলায়। নিচে রইল মঞ্জরী। মঞ্জরীর মুখে চোখে

নিষ্ঠুর কৌতুক। এ নিষ্ঠুর কৌতুক জীবনের যেন ভালোই লাগত। এবং এই নিষ্ঠুরতার জন্যই তার কৌতুক যেন বেশী মধুর মনে হ'ত, বেশী ক'রে টানত তাঁকে।

একলা পেয়ে জীবন পকেট থেকে আবীর বের ক'রে বললেন—নাতনীকে আজ মাখাব কিন্তু।

মঞ্জরী হেসে বললে—আমিও মাখাব। রঙ গুলে রেখেছি। দাঁড়াও। দাঁড়াও!

সে ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। বেরিয়ে এল, হাত দুটি পিছনে রেখে। জীবনের তখন হুঁশ ছিল না। সে সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জরীর মুখে মাথায় মাখিয়ে দিলে অবীর। এদিকে মঞ্জরীর দুখানি হাত তার মুখের সামনে উদ্যত হল, দুই হাতে মাখানো আলকাতরা।

জীবন সভয়ে পিছু হটল। সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বাহির দরজার দিকে ছুটল। বন্য বরাহের মত ছুটল।

বাহির দরজার মুখেই তখন ব্যাঘ্র। ব্যাঘ্রের পশ্চাতে প্রজাপতি চতুরানন বঙ্কিম।

বন্য বরাহে এবং ব্যাঘ্রে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়ে গেল। দ্রুত ধাবমান সবলদেহে জীবন দত্তের সঙ্গে ধাক্কা লাগল ভূপী বোসের; বঙ্কিম তখন রাস্তার উপর থেকে লাফ দিয়ে উঠছে মঞ্জরীদের দাওয়ায়। জীবন দত্তের ধাক্কা সহ্য করতে পারলে না ভূপী। একেবারে চিৎ হ'য়ে উল্টে যাকে বলে সশব্দে-ধরাশায়ী-হওয়া তাই হল ভূপী বোস। জীবন ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আঘাত তাকেও কম লাগে নি কিন্তু সে সহ্য করবার শক্তি তার ছিল। এবং একটু সামলে নিয়েই সে সত্যাসত্য সহানুভূতির সঙ্গে হাত ধ'রে তুলতে গেল ভূপী বোসকে। ইচ্ছাকৃত না-হোক অনিচ্ছাকৃত হলেও ত্রুটিটা তারই বলে মনে হল তার। শুধু সে তাকে হাত ধ'রেই তুলেই নিরস্ত হল না, ভূপীর শরীরে কোথাও আঘাত লেগেছে কিনা দেখতে চেষ্টা করলে, ধূলো ঝেড়ে দিলে অপরাধীর মত।

এই অবসরে ভূপী ছিটকে যাওয়া পায়ের জুতোটা কুড়িয়ে নিয়ে তার মাথায়—মুখে পিঠে আথালি পাথালি মারতে শুরু করলে। গাল দিলে—শুয়ার কি বাচ্চা! হারামজাদা! উল্লুক!

ব্যস। উন্মত্তের মত জীবন হুঙ্কার দিয়ে পড়ল ভূপী বোসের উপর সেদিন নেশাও করেছিল জীবন। সিদ্ধি খেয়েছিল। ভূপীর সঙ্গে সে যুদ্ধ কেমন করে হয়েছিল, সে তার মনে নাই; কিন্তু বুকে বসে ভূপীর নাকে তার প্রকাণ্ড হাতের প্রচণ্ড মুঠির একটা কিল সে মেরেছিল। মারতেই মনে হ'ল নাকটা যেন বসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে দিলে ভূপী বোসের মুখ, রক্তাক্ত হয়ে গেল জীবনের হাত—জামায় কাপড়েও রক্ত লাগল। বঙ্কিম চীৎকার করে উঠল—করলি কি? আরও একটা আর্তকণ্ঠ তার কানে এল—মঞ্জরীর কণ্ঠস্বর—ও মা গো! খুনে ডাকাত খুন করলে মা গো!

চকিতে উন্মত্ত জীবন আত্মস্থ হয়ে গেল।

তাই তো! এ কি করলে সে? ভূপী বোসের জ্ঞান নাই, বুকে চেপে বসে তার স্পর্শ থেকে সে তা বুঝতে পেরেছে। বিপদের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল। ভূপীর দেশ। অভিজাত জমিদার বংশের দেউলিয়া ঘরের ছেলে। ওরা ভয়ঙ্কর। দাঁত-নখ-ভাঙ্গা বাঘই হয় নরখাদক। আর মঞ্জরীর কান্না শুনেও আজ তার স্বপ্ন ভেঙেছে! মুহূর্তে সে লাফ দিয়ে উঠে ছুটল! ছুটল একেবারে নিজের গ্রামের অভিমুখে। পথ দশ ক্রোশ। কিন্তু সে পথ ধরে ফিরল না, ফিরল অপথে-অপথে, ময়ূরাক্ষী নদীর তীর ধরে। বোধ হয় তের চৌদ্দ ক্রোশ পথ হেঁটে বাড়ি এসে পৌঁছেছিল। জামাকাপড় নদীতে কেচে—কাদা মাখিয়ে রক্তচিহ্নের আভাষ গোপন করে বাড়ি এল।

মেডিকেল কলেজে পড়ার স্বপ্ন তার শেষ হল।

মঞ্জরীর মোহে পড়ে ঘুচে গেল। মঞ্জরীই দিলে ঘুচিয়ে।

সেদিন জগদ্বন্ধু মশায় ও তাঁর স্ত্রী ছেলের অবস্থা দেখে শিউরে উঠে প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে? এমন ক'রে কেন তুমি ফিরলে? কি হয়েছে?

জীবন মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কোন উত্তর দিলে না।

জগদ্বন্ধু মশায়ের মত দৃঢ় চিত্ত প্রকৃতির মানুষের সামনেও সে অটল রইল। মঞ্জরীর নাম সে কিছুতেই প্রকাশ করবে না। শেষ পর্যন্ত বললে একজন বড়লোকের ছেলে তাকে জুতো মেরেছিল—সে তার শোধ নিয়েছে। আঘাত অবশ্য বেশী হয়েছে, রক্তপাত হয়েছে খানিকটা, সেই জন্যই ওখান থেকে

পালিয়ে এসেছে। ওখানে থাকলে সে হয়তো খুন করবার চেষ্টা করবে। ওখানে সে আর ফিরবে না। সে অন্য জায়গায় পড়বে। সিউড়ি বা বর্ধমান সরকারী হাই ইস্কুলে পড়বে সে।

—না! আর না!

জগদ্বন্ধু মশায় বললেন—আর না। বাইরে পড়তে আর আমি তোমাকে পাঠাব না। আমাদের কৌলিক বিদ্যা শেখ তুমি।

জগদ্বন্ধু মশায়ের কণ্ঠস্বর কঠিন, কিন্তু মৃদু। এ কণ্ঠস্বর শুনে জীবনের সর্বদেহ যেন হিম হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়েছিল এ-সেই কণ্ঠস্বর, এ কণ্ঠস্বরে যে কথা বলেন জগদ্বন্ধু মশায় তার আর লঙ্ঘন হয় না। জীবনের মনে পড়ল একদিন নবগ্রামের বাবুদের বাড়ির এক অনাচারী, ব্যভিচারী প্রৌঢ়ের অসুখে চিকিৎসা হাতে নিয়ে হঠাৎ একদিন ঠিক এই কণ্ঠস্বরে চিকিৎসায় জবাব দিয়েছিলেন। বাবুটি ছিলেন মদ্যপায়ী; জগদ্বন্ধু মশায় তাঁকে মদ্য পান করতে নিষেধ করেছিলেন; কিন্তু তিনি নিষেধ লঙ্ঘন করেছিলেন। জগদ্বন্ধু মশায় ঘরে ঢুকে সেই কথা জানতে পেরেই ফিরে এসেছিলেন। রোগীর আত্মীয়েরা অনুনয় করে তাঁকে ফেরাতে এসেছিল—মশায় এমনি কঠিন মৃদুস্বরে বলেছিলেন—না। ঐ ছোট একটি 'না' শব্দ শুনে জমিদার পক্ষ থমকে গিয়েছিল। এবং সে 'না'-এর আর পরিবর্তন কোনদিন হয় নাই। আজকের 'না'ও সেই 'না'। এবং এর সঙ্গে জগদ্বন্ধু যে কথাগুলি বললেন—তার মধ্যেও কণ্ঠস্বরের সেই মৃদুতা এবং সেই কাঠিন্যই রণ-রণ করছিল।

জীবন দত্ত সচকিত হয়ে মুহূর্তের জন্য বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে পর মুহূর্তেই মাথা নামিয়েছিল। বুঝতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে নি এ 'না'-এর আর পরিবর্তন নাই।

জগদ্বন্ধু মশায় পঞ্জিকা খুলে বসলেন—বিদ্যারম্ভের দিন স্থির করবেন।

(আট)

শুভ কর্মে বিলম্ব করতে নাই এবং কর্মহীন জীবনে মানুষের মতি অহরহ বিভ্রমের পিছনেই ছুটে বেড়ায়। জগদ্বন্ধু মশায় অবিলম্বে ফাল্গুনের শেষেই জীবনের হাতে ব্যাকরণ তুলে দিয়ে পাঠ দিয়েছিলেন। আয়ুর্বেদ—পঞ্চম বেদ। চতুর্বেদের মতই স্বয়ং প্রজাপতির সৃষ্টি। দেবভাষায় কথিত দেবভাষায় লিখিত। সুতরাং দেবভাষায় অধিকার লাভ করতে হবে প্রথম। ব্যাকরণ কিন্তু জীবনের খুব ভাল লাগে নাই, নরঃ নরৌ নরা থেকে আগাগোড়া ব্যাকরণ মুখস্থ কি সোজা কথা! তবে ভাল লাগল অন্য দিকটা। সকালবেলা জগদ্বন্ধু মশায় যখন রোগী দেখতে বসতেন তখন ছেলেকে কাছে বসাতেন। তাঁর আয়ুর্বেদ ভবনের ওষুধ তৈরীর কাজে জীবনকে কিছু কিছু কাজ দিতেন। গাছ-গাছড়া মূল ফুল চেনাতেন। সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছিল তাঁর নাড়ী পরীক্ষা বিদ্যা। অদ্ভুত বিস্ময়কর এ বিদ্যা! কবিরাজের ঘরের ছেলে, কিশোর বয়সেই অল্পস্বল্প নাড়ী পরীক্ষা করতে জানতেন। জ্বর হয়েছে কিনা, জ্বর ছেড়েছে কিনা, এগুলি জীবন দত্ত নাড়ী দেখে বলতে পারতেন। কিন্তু জগদ্বন্ধু মশায় যখন তাঁকে নাড়ী পরীক্ষার প্রথম পাঠ দিলেন সেদিন ওই পাঠ শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। আজও মনে পড়ছে।

দেবতাকে প্রণাম ক'রে জগদ্বন্ধু মশায় বলেছিলেন—রোগ নির্ণয়ে সর্বাগ্রে সংগ্রহ করবে বিবরণ, তারপর রোগীর ঘরে ঢুকে গন্ধ অনুভব করবে, তারপর রোগীকে আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করবে। তারপর প্রশ্ন করবে রোগীকে—তার কষ্টের কথা। তাই থেকে পাবে উপসর্গ। এরপর প্রত্যক্ষ পরীক্ষার প্রথম এবং প্রধান পরীক্ষা নাড়ী পরীক্ষা। তারপর জিহ্বাগ্র, মূত্র ইত্যাদি। পাকস্থলী মলস্থলী অনুভব করবে। সর্বাগ্রে নাড়ী।

আদৌ সর্বেষু রোগেষু নাড়ী জিহ্বাগ্রে সম্ভবাম
পরীক্ষাং কারয়েদ্বৈদ্যং পশ্চাদ্রোগং চিকিৎসয়েৎ।

অতি সুকঠিন এ পরীক্ষা। বিশেষ করে নাড়ী পরীক্ষা। রোগ হয়েছে—

রোগদুষ্ট নাড়ী—সুস্থ নাড়ী এ অবশ্য বোঝা বিশেষ কঠিন নয়। তুমিও দেখে দেখেছি।

হাসলেন জগদ্বন্ধু মশায়। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু যে বোধে রোগ-নির্ণয়, তার ভোগকাল-নির্ণয়, মৃত্যুরোগাক্রান্ত হলে মৃত্যুকাল-নির্ণয় পর্যন্ত করা যায়, সে অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানসাপেক্ষ; জ্ঞান নয়, বোধ। তার জন্য সর্বাগ্রে চাই ধ্যানযোগ। আমরা যে চোখ বন্ধ করে নাড়ী দেখি—তার কারণ নাড়ীর গতি অনুভবে ধ্যানযোগে মগ্ন হয়ে গতি নির্ণয় করি। পারি-পার্শ্বিকের কোন কিছুতে আকৃষ্ট হয়ে আমার মন যেন যোগ থেকে ভ্রষ্ট না হয়। ইন্দ্রিয়ের অগোচর শক্তি এবং রহস্য যা নাকি জগতের নিগূঢ় অন্তরে প্রবহমান—প্রকাশমান—সেই শক্তি, সেই রহস্য যেমন ধ্যানযোগে যোগীর অনুভূতির গোচরীভূত হয়,—ঠিক তেমনি ভাবেই আয়ুর্বেদজ্ঞ যখন রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করেন, তখন দেহের অভ্যন্তরে চক্ষু-অগোচর রোগশক্তির ক্রিয়া তার রূপ আয়ুর্বেদজ্ঞের ধ্যানযোগে যথাযথভাবে গোচরীভূত হয়। বায়ু, পিত্ত, কফ—এই তিনের যেটি বা যেগুলি কুপিত হয়ে দুষ্ট হয়ে রোগীর রক্তধারায় ক্রিয়া করছে, নাড়ীতে তার গতি তার বেগ কতখানি—সব একেবারে নির্ভুল অঙ্কফলের মত নির্ণীত হয়। আর—।

জগদ্বন্ধু মশায়ের কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল। তিনি বললেন—জ্ঞানযোগে নাড়ীবোধে আর মনঃসংযোগে ধ্যানযোগে যদি অনুভূতিতে সিদ্ধ হতে পার, তবে বুঝতে পারবে রোগের অন্তরালে কেউ আছে বা নাই।

জগদ্বন্ধু মশায় ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টি তুলে বলেছিলেন—আমার বাবা বলতেন—এক সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছিলেন, তিনি তাঁকে সাপের বিষের ওষুধ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—সর্পদংশনে বিষক্রিয়ার ওষুধ আছে, কিন্তু যে সাপ কালের আজ্ঞা বহন করে আসে, তার দংশনে মৃত্যুই ধ্রুব; তার ওষুধ হয় না। বাবা বলতেন, ঠিক তেমনি রোগের ওষুধ আছে, চিকিৎসা আছে, কিন্তু কালকে আশ্রয় করে যে রোগ আসে, তার ওষুধ চিকিৎসা নাই; আমরা বৈদ্য, আমরা চিকিৎসাজীবী—আমাদের চিকিৎসা করতে হয়, কিন্তু ফল হয় না। এই নাড়ীবোধের দ্বারা বুঝতে পারা যায়—রোগ

তার দেহে নির্দিষ্টকাল ভোগ করেই ক্ষান্ত হবে—অথবা রোগের অন্তে কাল তাকে গ্রহণ করবে।

জীবন মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। শুনতে শুনতে সব যেন ওলোট পালোট হয়ে গিয়েছিল। সত্যই ওলোট পালোট।

সেই ছেলেবেলায় পড়া একটি প্রথম ভাগের অতিসরল ছড়া—"লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই" মানুষের জীবনের খাঁটি সত্য বলেই জীবন দত্তের ধারণা ; উত্তর কালে—চাণক্য পণ্ডিতের "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে" শ্লোকটি ওই ছড়াটিরই সাজানো গোছানো চেহারা, তবু ও শ্লোকটি অপেক্ষাকৃত উদার এবং প্রশস্ত। পূজা সোনা রূপা দিয়ে আর ক'জন করে ? ফুল বেলপাতা-চালকলাই ওখানে বেশী, সোনা রূপা যদিই বা থাকে তবে সে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের বেশী নয়। এবং পূজা পেয়েও পূজিত পণ্ডিতদের সোনারূপার অপ্রাচুর্যের জন্য অভিযোগের অন্ত নাই। যেখানে প্রকাশ্যে নাই সেখানে অন্তরে অন্তরে আছে। জীবন দত্তেরও সেদিন চোখের সামনে ছিল রঙলাল ডাক্তারের প্রতিষ্ঠা—তাঁর গরদের কোট পেণ্টালুন, সোনার চেন—শাদা ঘোড়া—আরও অনেক কিছু যার সবই ছিল সোনারূপার আয়ত্তাধীন। কিন্তু এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন—সে দিন এ সব তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। এক অপরূপ জ্ঞানালোকের সিংহদ্বারে তাঁকে তাঁর পিতা—তাঁর গুরু এনে দণ্ডায়মান ক'রে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ওই দরজা খুলে প্রবেশ করতে পারলে অমৃতের সন্ধান পাবে। তিনি যেন তার আভাষও পেয়েছিলেন।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর—অর্ধশতাব্দী পূর্বের ঘটনার স্মৃতি। কিন্তু আজও মনে হয়—এই তো কিছুক্ষণ পূর্বের কথা ! তাঁদের এই কৌলিক শিক্ষার মধ্যে যাই তিনি পেয়ে থাকুন মনে মনে তাঁর আক্ষেপ আছে। আয়ুর্বেদ কালের সঙ্গে আর অগ্রসর হয় নাই, নূতন কালের পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান বিস্ময়কর আবিষ্কারের পথে এগিয়ে চলেছে ; ডাক্তারী পড়লে এই বিজ্ঞানকে তিনি জানতে পারতেন সম্পূর্ণ ভাবে। তবুও এই ক্ষোভের মধ্যেও এই একটি জায়গায় তাঁর পরম পরিতৃপ্তি পরম সান্ত্বনা আছে। এই নাড়ী পরীক্ষা বিদ্যা।

তাঁর বাবা বলতেন, তিনিও মানেন—কোন শাস্ত্র জানা আর সে শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ দুটো আলাদা জিনিস। বলতেন—বাবা, আমাদের শাস্ত্রে বলে, গুরুর কৃপা না-হলে জ্ঞান হয় না। শিক্ষা হয় তো হয়। মুখস্থ অবশ্য করতে পার। কিন্তু সে শিক্ষা যখন জ্ঞানে পরিণত হয় তখন পৃথিবীর রূপ পাল্টে যায়। চক্ষুর অগোচর প্রত্যক্ষ হয়, স্পর্শের অগোচর অনুভূতিতে ধরা দেয়। নাড়ী পরীক্ষা বিদ্যা জ্ঞানে পরিণত হলে তুমি জীবনের মধ্যে মৃত্যুকে অনুভব করতে পারবে।

সে কথা সত্য। জীবন দত্ত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বলতে পারেন—সত্য, এ সত্য, এ সত্য।

এই সুদীর্ঘকালে কত দেখলেন—পৃথিবীর আয়তন জম্বুদ্বীপ থেকে প্রসারিত হয়ে পশ্চিম গোলার্ধ, পূর্ব গোলার্ধ, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত হ'ল, প্রাচীনকালে যাকে সত্য বলে মেনেছে মানুষ, তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল, নূতন সত্যকে গ্রহণ করতে হল, কিন্তু এই সত্য মিথ্যা হয় নি। এ চিরসত্য।

একালে পড়েছেন—ডুবুরীর কথা। সমুদ্রে নামে—আধুনিক যন্ত্রপাতি-সংযুক্ত পোষাক প'রে মুক্তা আহরণ করে; তারা সেখানে গিয়ে সমুদ্রের তলদেশের বিচিত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, কয়েক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায় মুক্তা-আহরণের কথা। ঠিক তেমনি ভাবেই সেদিন জীবন দত্ত সব ভুলে গিয়েছিলেন; প্রতিষ্ঠার কথা, সম্পদের কথা, সম্মানের কথা সব ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। সেদিন এই প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধু মশায় তাকে এক বিচিত্র পুরাণ কাহিনী শুনিয়েছিলেন। মৃত্যু কে? ব্যাধি কি? মৃত্যুর সঙ্গে ব্যাধির কি সম্পর্ক? সেই নিয়ে সে কাহিনী বিচিত্র।

জগদ্বন্ধু মশায় ভাগবত-কথকের মত দক্ষ কথক ছিলেন। তাঁর নিপুণ গভীর বাগ্‌বিন্যাসে জীবন দত্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

বলেছিলেন—অবশ্য রোগমাত্রেই মৃত্যু-স্পর্শ বহন করে। মহাভারতে আছে, ভগবান প্রজাপতি মনের আনন্দে সৃষ্টি ক'রে চলেছেন, সৃষ্টির পর সৃষ্টি! বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর। তখন পৃথিবীতে শুধু সৃষ্টিই আছে, লয় বা মৃত্যু নাই। এমন সময় তাঁর কানে এল যেন কার ক্ষীণ কাতর কণ্ঠস্বর। তিনি উৎকর্ণ

হলেন। এবার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল যেন অস্বাচ্ছন্দ্যকর কোন গন্ধ। এবার সৃষ্টির দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করলেন। দেখে চকিত হয়ে উঠলেন। এ কি? তাঁর সৃষ্টির একটি বৃহৎ অংশ জীর্ণ মলিন স্থবির কর্কশ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর বুক বহু জীবে পরিব্যাপ্ত। স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খল অথচ উচ্ছ্বাসবিহীন—স্তিমিত। বিপুলভাবে ক্লিষ্ট পৃথিবী করছেন কাতর আর্তনাদ। আর ওই যে অস্বাচ্ছন্দ্যকর গন্ধ, ওই গন্ধের সৃষ্টি করেছে জীর্ণ সৃষ্টির জরাগ্রস্ত দেহ।

উপায় চিন্তায় নিমগ্ন হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। অকস্মাৎ এই চিন্তামগ্নতার মধ্যে তাঁর মুখমণ্ডল কুটিল হয়ে উঠল। ভ্রূকুটি জেগে উঠল প্রসন্ন ললাটে। হাস্যস্মিত অধর দৃঢ়বদ্ধ হল; প্রসন্ন নীল আকাশে যেন মেঘ উঠে এল দিগন্ত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অঙ্গ থেকে ছায়ার মত কিছু যেন বেরিয়ে এল, ক্রমে সে ছায়া কায়া গ্রহণ করলে—একটি নারীমূর্তি তাঁর সামনে দাঁড়াল কৃতাঞ্জলি হয়ে। পিঙ্গলকেশী, পিঙ্গলনেত্রা, পিঙ্গলবর্ণা, গলদেশে মণিবন্ধে পদ্ম-বীজের ভূষণ, অঙ্গে গৈরিক কাষায়; সেই নারীমূর্তি—প্রণাম করে ভগবানকে প্রশ্ন করলেন—পিতা, আমি কে? কি আমার কর্ম? কি হেতু আমাকে আপনি সৃষ্টি করলেন?

ভগবান প্রজাপতি বললেন—তুমি আমার কন্যা। তুমি মৃত্যু। সৃষ্টিতে সংহার কর্মের জন্য তোমার সৃষ্টি হয়েছে। সেই তোমার কর্ম।

চমকে উঠলেন মৃত্যু—অর্থাৎ সেই নারীমূর্তি; আর্তস্বরে বললেন—পিতা হয়ে তুমি এ কি কুটিল কঠিন হৃদয়-কর্মে নিযুক্ত করছ? এ কি নারীর কর্ম? আমার নারী-হৃদয়—নারী-ধর্ম এ সহ্য করবে কি করে?

ভগবান হেসে বললে—কি করব? উপায় নাই। সৃষ্টি যখন করেছি, তখন ওই কর্মই তোমাকে করতে হবে।

মৃত্যু বললেন—পারব না।

—পারতে হবে।

মৃত্যু তপস্যা শুরু করলেন। কঠোর তপস্যা করলেন। ভগবান এলেন—বললেন—বর চাও।

মৃত্যু বর চাইলেন—এই কঠিন নিষ্ঠুর কর্ম থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন।

ফিরে গেলেন ভগবান—না।

আবার তপস্যা করলেন মৃত্যু, এবারের তপস্যা পূর্বের তপস্যার চেয়েও কঠোর।

আবার এলেন প্রজাপতি। আবার ওই বর চাইলেন মৃত্যু—এই নিষ্ঠুরতম কর্ম থেকে কন্যাকে অব্যাহতি দিন পিতা।

প্রজাপতি নীরবে ধীরভাবে ঘাড় নাড়লেন, জানালেন—না। সে হয় না।

এবং মুহূর্তে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কন্যারূপিনী মৃত্যু দীর্ঘক্ষণ আকাশমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কাঁদলেন দীর্ঘক্ষণ। তারপর আবার আসন গ্রহণ করলেন।

তৃতীয়বার তপস্যামগ্ন হলেন মৃত্যু। এবার যে তপস্যা করলেন, তার চেয়ে কঠোরতর তপস্যা কেউ কখনও করে নি। আবার ভগবান ব্রহ্মাকে আসতে হল। আবার মৃত্যু ওই বর চাইলেন। বর প্রার্থনা করতে গিয়ে এবার তাঁর ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল। চোখ দিয়ে অনর্গল ধারায় জল গড়িয়ে এল। ব্রহ্মা ব্যস্ত হয়ে নিজে অঞ্জলি বদ্ধ করে সেই প্রসারিত অঞ্জলিতে অশ্রুবিন্দুগুলি ধরলেন।—বললেন—মা, তোমার চোখের জল—এ সৃষ্টিতে পড়বামাত্র এর উত্তাপে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে সেই অশ্রুবিন্দুগুলি হতে এক এক কুটিল মূর্তির আবির্ভাব হল। ভগবান বললেন—এরা হল রোগ ; এরা তোমারই সৃষ্টি ; এরাই তোমার সহচর।

মৃত্যু বললেন—কিন্তু আমি নারী হয়ে পত্নীর পার্শ্ব থেকে পতিকে গ্রহণ করব কি করে? মায়ের বুক থেকে তার বত্রিশনাড়ী-ছেঁড়া সন্তানকে গ্রহণ করব, এই নিষ্ঠুর কর্মের পাপ—

বাধা দিয়ে ভগবান বললেন—সর্ব পাপ পুণ্যের ঊর্ধ্বে তুমি। পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। তা ছাড়া তারাই তাদের কর্মফলে তোমাকে আহ্বান করবে এই রোগেদের মাধ্যমে। অনাচার অমিতাচার ব্যভিচারের ফলে রোগাক্রান্ত হবে মানুষ। তুমি তাদের দেবে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, জ্বালা থেকে শান্তি, পুরাতন জন্ম থেকে নব জন্মান্তর।

—কিন্তু—। মৃত্যু আকুল হয়ে বললেন—শোকাতুরা স্ত্রী পুত্র মাতাপিতা

মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, বুক চাপড়াবে, মাথা কুটবে সে দৃশ্য আমি দেখব কি ক'রে?

ভগবান বললেন—তুমি অন্ধ হলে, দৃষ্টি তোমার বিলুপ্ত হল। দেখতে তোমাকে হবে না।

মৃত্যু বললেন—তার ক্রন্দন? নারী-কণ্ঠের আর্তবিলাপ কি—

বাধা দিয়ে ভগবান বললেন—তুমি বধির হলে। কোন ধ্বনি তোমার কানে যাবে না।

জগদ্বন্ধু মশায় বলেছিলেন—মৃত্যু অন্ধ, মৃত্যু বধির। রোগই তার সন্তানের মত নিয়ত তার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে—নিয়ম—কাল। যার কাল পূর্ণ হয়, তাকে যেতে হয়। অকালমৃত্যুও আছে। স্বকীয় পাপে মানুষ নিজের আয়ুক্ষয় করে কালকে অকালে আহ্বান করে। আমাদের যে পঞ্চম বেদ আয়ুর্বেদ—তার শক্তি হল কাল যেখানে সহায়ক নয় রোগের, সেখানে রোগকে প্রতিহত করা। রোগ এমন ক্ষেত্রে ফিরে যায়, তার সঙ্গে অন্ধ-বধির মৃত্যুও ফিরে যায়। কিন্তু কাল যেখানে পূর্ণ হয়েছে, সেখানে আক্রমণের বেগে নাড়ীতে যে স্পন্দন-বৈলক্ষণ্য দেখা দেয় তা থেকে বুঝতে পারা যায়, মৃত্যু এখানে কালের পোষকতায় অগ্রসর হচ্ছে। এমন কি কত ক্ষণ, কয় প্রহর, কয় দিন, কয় সপ্তাহ বা পক্ষ বা মাসে সে গ্রহণ কর্ম শেষ করবে, তাও বলা যায়—এই নাড়ী পরীক্ষা করে।

ঘরের কোণে একটা টিকটিকি টক-কট করে ডেকে উঠেছিল। মনে আছে জীবন ডাক্তারের। মাটিতে আঙুলের টোকা দিয়ে জগদ্বন্ধু মশায় টিকটিকিটার দিকে তাকিয়েই বলেছিলেন—ওই দেখ।

সেদিকে তাকিয়ে জীবন দেখেছিলেন, ডাক দিয়েই টিকটিকিটা লাফিয়ে ধরেছে একটা ফড়িংকে। ফড়িংটা ঝটপট করছে।

মশায় বলেছিলেন—অনুরূপ অবস্থায়—মানুষের, ধর যদি কোন মানুষকে কুমীরে ধরেছে—কি কোন দুটো কঠিন জিনিসের মধ্যে চাপা পড়েছে—পিষ্ট হচ্ছে, এমন অবস্থায়—তার নাড়ী যদি পরীক্ষা করা যায়—তবে তাও এই বেদোক্ত বিদ্যাবলে নাড়ী অনুভব ক'রে বুঝতে পারা যাবে যে, মৃত্যু সমাগত। নাড়ীর মধ্যে জীবনের আর্তনাদ অনুভব করতে পারবে। তার কাতরতা

প্রত্যক্ষ করতে পারবে, মনে হবে চোখে দেখছ। আমার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বলি শোন। গিরিশবাবুর মা, এই নবগ্রামের গিরিশবাবু—তাঁর মা বর্ষার সময় বাঁধানো ঘাটের চাতালে পা পিছলে পড়ে গেলেন। পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বাবা তখন দেহ রেখেছেন—আমার বয়স তখন কম। গেলাম। নাড়ী দেখে শঙ্কিত হলাম। কিন্তু সঠিক কিছু বুঝতে পারলাম না। দেখলাম, আঘাতের ফলে যেমন নাড়ী স্পন্দনহীন হয়, তাই হয়েছে। সে ক্ষেত্রে নাড়ী অসাধ্য নয়। তবু কেমন যেন সন্দেহ হল। বললাম প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে মৃত্যু হ'তেও পারে—না হতেও পারে। আপনারা আরও বিচক্ষণ কবিরাজ এনে দেখান। পাকুলিয়ার বৃদ্ধ কবিরাজ এলেন সন্ধ্যায়। তিনি দেখলেন। বললেন—এ অবস্থায় তিনদিন সঙ্কটের কাল। তিনদিন উত্তীর্ণ হলে এ যাত্রা রক্ষা পেলেন। তবে—

আবার নাড়ী দেখলেন, বাহুমূলে, কণ্ঠে নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন—রক্ষা পেলেও এক বৎসর মধ্যেই ওঁর দেহান্ত ঘটবে। এবং দেহান্তের পূর্বে যেখানে আঘাত পেয়েছেন আজ, সেইখানে তীব্র বেদনা অনুভব করবেন। যেন নূতন করে সেদিন আঘাতটা পেলেন—এমনি মনে হবে।

গিরীশবাবু দ্বিতীয় দিনেই মাকে পাল্কী করে গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলেন। সকলেই সন্দেহ করলেন—তিনদিনের মধ্যেই দেহান্ত ঘটবে। গঙ্গাতীরে দেহরক্ষায় মায়ের একান্ত বাসনা ছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে চতুর্থদিনের প্রভাতে বৃদ্ধার জ্ঞান হল। ধীরে ধীরে সেরেও উঠলেন। দেহরক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে ফেরার নিয়ম নয়। গঙ্গাতীরেই থাকলেন তিনি। ঠিক বৎসরের শেষে—এক সপ্তাহ আগে, হঠাৎ একদিন তিনি যন্ত্রণা অনুভব করলেন আঘাতের স্থানে। ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। চব্বিশ ঘণ্টা সেই যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তিনি অচেতন হয়ে গেলেন। তারপর বারো ঘণ্টা—তাঁর ঘটল দেহান্ত।

এ আমার প্রত্যক্ষ প্রথম অভিজ্ঞতা। তারপর নিজেই অনেক দেখলাম। তুমিও দেখবে। এ ঠিক বুঝিয়ে দেবার নয়, ব্যাখ্যা ক'রে ফল নাই। উপলব্ধি করবার শক্তি এবং ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বাবা। তোমার যদি সে ভাগ্য থাকে, সে শক্তি থাকে তুমি বুঝতে পারবে।

(নয়)

সে ভাগ্য তাঁর হয়েছে। গুরু এবং পিতার আশীর্বাদে বহু ক্ষেত্রে এই জীবনমৃত্যুর বিচিত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে বেদব্যাসের আশীর্বাদে দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয়ের মত দেখতে পেয়েছেন মৃত্যুর আগমন।

হঠাৎ নিজের নাড়ী ধরলেন জীবন ডাক্তার। দীর্ঘক্ষণ নাড়ী ধরে ব'সে রইলেন। কিছুই অনুভব করতে পারছেন না।

—কি হচ্ছে কি? নিজের নাড়ী?

জীবন ডাক্তার ছেড়ে দিলেন নিজের নাড়ী। হাসলেন। আতর বউ এসেছে। কটুভাষিনী আতরবউ। কিন্তু এমন স্নেহ যত্ন কেউ করতে পারবে না। ভাত খাওয়া শেষ ক'রে লোকজনকে খাইয়ে আতর বউ সারাটা জীবন পাখা হাতে এসে বসে তাঁর বিছানার পাশে। পান দোক্তা খায়, বাতাস করে। কর্পূর দেওয়া জলের গ্লাসটি শিয়রে রেখে দেয়। তারপর একসময় মেঝের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। জীবন ডাক্তার জেগে থাকলেই বিপদ ঘটে। আতর বউ হাতে করে সেবা, মুখে অনর্গল মর্মচ্ছেদী অথচ মিষ্ট কথা বলে যাবে। তাঁকে উদ্দেশ ক'রে বড় বলে না, বলে নিজের কপালকে উদ্দেশ ক'রে। আইনের প্যাঁচে তাকে ধরা যায় না। প্রতিবাদ করলেই আতর বউ বলে—তোমাকে তো কোন কথা আমি বলি নি। আমি বলছি আমার কপালকে। তুমি ফোঁস করে উঠছ কেন?—

জীবন ডাক্তার একবার ধৈর্য হারিয়ে বলেছিলেন—তোমার কপালে যে ভগবান আমাকে বেঁধে অধিষ্ঠিত ক'রে দিয়েছেন। আঘাত করলে আমাকেই লাগে যে!

আতরবউ ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যক দৃষ্টিপাত ক'রে নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন—তোমাকে লাগে?

—হ্যাঁ। বুঝতে পার না?

আতরবউ একটা পাথরের খল নিয়ে কপালে ঘা মেরে, কপালটা রক্তাক্ত ক'রে তুলে বলেছিলেন—কই? কই? কই?

এরপর থেকে জীবন ডাক্তার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলেই চোখ বুঁজে পড়ে থাকেন ঘুমের ভাণ ক'রে। আজ অতীত কথা স্মরণ করতে গিয়ে এমনই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে পায়ের শব্দ শুনতে পান নাই।

আতরবউ আবার প্রশ্ন করলেন—কি হ'ল নাড়ীতে?

জীবন দত্ত চেষ্টা করলেন মিথ্যা বলতে। বলতে চাইলেন—শরীরটা যেন ভাল বোধ হচ্ছে না। বললেই এই আতর বউ আর এক আতর বউ হয়ে যাবে। শিশুর মত অসহায় ক'রে তুলে সেবা যত্নে জীবন ডাক্তারকে অভিষিক্ত ক'রে দেবে।

কতবার জীবন দত্তের মনে হয়েছে এই আতরবউই তাঁর জীবনের ছদ্মবেশিনী মৃত্যু। তাঁর বাবা বলতেন, তিনিও তাঁর সুদীর্ঘ চিকিৎসক জীবনে বুঝেছেন, উপলব্ধি করেছেন, মৃত্যু অবগুণ্ঠনময়ী। দূর থেকে তাকে চেনা যায় না। তাকে দেখে ভয় হয়, কারণ সে আসে জ্বালা যন্ত্রণাময়ী ব্যাধির পশ্চাদনুসরণ ক'রে—কালবৈশাখীর ঝড়ের অনুসারিণী বর্ষণ-ধারার মত। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ব্যাধি জ্বালায় যন্ত্রণায় জীবনের উপর তোলে বিক্ষোভ, মৃত্যু আসে বর্ষণধারার মত, সকল জ্বালা-যন্ত্রণার বিক্ষোভ জুড়িয়ে দিয়ে, প্রশান্ত স্নিগ্ধ করে দেয়। আতর বউ ঠিক তাই। দূরে যতক্ষণ থাকে ভয়ঙ্করী, তার অশ্রুরুদ্ধ অশ্রুতপ্ত কথাগুলি ব্যাধির জ্বালার মতই যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু—।

না। আতরবউ তাঁর জীবনে ব্যাধি, শুধুই ব্যাধি। মৃত্যু হল সেই মঞ্জরী। জীবনে তো আয়ু থাকতে কেউ মৃত্যুকে পায় না। তাই জীবন দত্ত মঞ্জরীকে পান নি। মধ্যে মধ্যে মৃত্যু ছলনা করে যায় মানুষকে, আসতে-আসতে ফিরে যায়, ধরা দিতে দিতে দেয় না। রেখে যায় আঘাতের চিহ্ন; অনেক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী ব্যাধি রেখে যায়। মঞ্জরীও তাই করেছে। ছলনা ক'রে চলে গেছে, রেখে গেছে ব্যাধিরূপিনী আতরবউকে।

নিবিষ্ট মনেই ভেবে চলেছিলেন জীবন ডাক্তার। আতর বউ এ নীরবতায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। সরস মনে থাকলে জীবন ডাক্তার বলেন—আতরবউ রাগলে—টেম্পারেচার ওঠে ম্যালেরিয়ার জ্বরের মত। দেখতে দেখতে একশো পাঁচ।

আতরবউ তাঁর জীবনে ম্যালেরিয়াই বটে; পোষাই আছে; এতটুকু অনিয়ম ব্যতিক্রম হলেই প্রকট হয়ে উঠবে। অনিয়ম না-হলেও অমাবস্যা পূর্ণিমাতে দেখা দেওয়ার মত মধ্যে মধ্যে উঠবেই।

আজ কিন্তু শশী হতচ্ছাড়া এসে আতরবউকে স্বরূপে প্রকট ক'রে দিয়ে গিয়েছে। আতরবউ শশীকে স্নেহ করেন। অনেকদিন শশী এ-বাড়িতে কাটিয়েছে; আতরবউয়ের ফাই ফরমাস শুনত, তাঁদের ছেলেমেয়েদের কোলে পিঠে করত; এ বাড়ি ছেড়েও—শশী সম্পর্ক ছাড়ে নাই, মধ্যে মধ্যে আসে। শশীকে ডাক্তার বলেন—ওটা হ'ল ম্যালেরিয়ার পিলে। ওটা কামড়ে উঠলেই ম্যালেরিয়া জাগবেন।

আতরবউ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন—বলি হাঁগা, কথা বললেও কি তোমার নিদান বুঝবার পক্ষে ব্যাঘাত হবে?

জীবন ডাক্তার এবার সোজাসুজি বললেন—শশী তোমাকে কি বলে গিয়েছে বল তো?

—শশী? শশী কি বলে যাবে? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো! সব তাতেই শশী! কার না শুনতে বাকী আছে যে, তুমি কামারবুড়ীর নিদান হেঁকেছ? কে না এ চাকলায় শুনেছে যে, সরকারী ডাক্তার তোমাকে হাতুড়ে ব'লে প্রকাশ্যে অপমান ক'রেছে! নিদান...হাঁকতে বারণ করেছে! শশী বলবার মধ্যে বলেছে—পায়ের হাড় ভেঙেছে—এতে উনি নিদানটা না হাঁকলেই পারতেন। নিদানের রুগী আছে বই কি। সেখানে পাশ-করা ডাক্তারেরা থৈ পাবে না। ওই তো তারই হাতে রুগী রয়েছে—ডাক্তারেরা কেউ কিছু করতে পারলে না। তোমাকে ডাকতে এসেছিল শশী। শশীর ওপর দোষ কেন?

বৃদ্ধ জীবন ডাক্তার চুপ ক'রে রইলেন। কি বলবেন? আমল পাল্টেছে, চিকিৎসা শাস্ত্র এগিয়ে গিয়েছে। তিনি পিছিয়ে পড়েছেন। নইলে—আগের কালের চিকিৎসা অনুযায়ী তাঁর নিদান ভুল নয়, বুড়ীকে যেতে হবে, নিশ্চয় যেতে হবে—এই আঘাতের ফলে। তবে এ কালের সার্জারীর উন্নতি, এক্সরে আবিষ্কার এ সব তাঁর অজানা নয়; সেই বিজ্ঞানে এই আঘাত জর্জরতার পশ্চাদানুসারিনীকে ফিরে যেতে হতে পারে। কিন্তু সে চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য।

তাই সে হিসেব তিনি করেন নাই। আরও একটা কথা,—বুড়ীর এই সময় যাওয়াটা ছিল সুখের যাওয়া, সমারোহের যাওয়া। স্বেচ্ছায় যাওয়াই উচিৎ। তাঁর বাবা বলতেন—।

তাঁর বাবার কথাগুলি স্মরণ করবার অবকাশ পেলেন না তিনি। বাইরে থেকে কেউ তাঁকে ডাকলে—ডাক্তারবাবু!

চমকে উঠলেন ডাক্তার। আতর-বউও চকিত হয়ে উঠলেন। এ যে নবগ্রামের কিশোরের গলা। দুজনের মুখই মুহূর্তে প্রসন্ন হয়ে উঠল। কিশোর! কিশোর আসে যেন বর্ষার দুর্যোগরাত্রির অবসান ক'রে প্রসন্ন শরতপ্রভাতের মত। বয়সে প্রৌঢ় হয়েও কিশোর চিরদিন কিশোরই থেকে গেল! আজন্ম কুমার কিশোর উনিশ শো সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত ছিল রাজনৈতিক এবং সমাজসেবক কর্মী। এখন সে সব ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ক'রে বেড়ায়, তবে অভ্যাসবশে দু চারটে পরের উপকার না ক'রে পারে না, না করলে লোকেও ছাড়ে না। কিশোর ছেলেটি ডাক্তারের জীবনের একটা অধ্যায়। তাঁর জীবনে প্রকাণ্ড বড় একটি স্থান অধিকার ক'রে আছে।

—ডাক্তার বাবু! আবার ডাকলে কিশোর।

—সাড়া দাও, আসতে বল! প্রসন্ন স্বরেই তিরস্কার করলেন আতর-বউ। এবং স্বামীর অপেক্ষা না করেই তিনি নিচে নেমে গেলেন—ডাকলেন—এস বাবা এস।

মোটা খদ্দরের কাপড় এবং হাত-কাটা খাটো পাঞ্জাবীর উপর একখানা চাদর এই হল কিশোরের চিরকালের পোষাক। প্রসন্ন প্রশান্ত সুশ্রী মানুষ। যে পোষাকই হোক কিশোরকে মানায় বড় সুন্দর। কর্মঠ সবল দেহ, সবল স্বচ্ছন্দ মন; মানুষটি ঘরে ঢুকলেই ঘরখানি যেন প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

কিশোর এসে মাটির উপরেই বসে পড়ল এবং বিনা ভূমিকাতেই বললে—একবার বেরুতে হবে ডাক্তারবাবু।

আতর-বউ একখানা আসন পেতে দিলেন, বললেন—উঠে বস কিশোর। মাটিতে কি বসে!

ডাক্তার হেসে বললেন—মহারাজ অশোক মাটিতে ব'সে রাজা হয়েছিলেন। কিশোর মাটিতে বসে একদিন রাজা না হোক মিনিস্টার হবে। কেমন কিশোর?

কিশোর হাত জোড় ক'রে বললে—তার চেয়ে এই বয়সে বিয়ে করতে রাজী আছি ডাক্তারবাবু। এমন কি শনির দশায় পড়তেও রাজী আছি। কিন্তু আপনাকে একবার তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।—শেষের কটি কথায় কিশোরের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল—জানিয়ে দিলে সরসপরিহাসের মানসিকতা তার এখন নাই।

—কি ব্যাপার? কোথায় যেতে হবে?

—যেতে হবে আমাদের গ্রামেই। রতনবাবু হেডমাষ্টার মশায়ের ছেলে বিপিনের অসুখ—একবার যেতে হবে।

ডাক্তার বিস্মিত হলেন। বৃদ্ধ রতনবাবু এককালের নাম করা হেডমাষ্টার, দুর্লভ দৃঢ় চরিত্রের মানুষ; তাঁর ছেলে বিপিনও বাপের উপযুক্ত সন্তান, সৎপ্রকৃতির মানুষ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। বিপিন কয়েক বৎসর রক্তের চাপের আধিক্যে অসুস্থ রয়েছে। সম্প্রতি অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতায় গিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। সেখান থেকে ওষুধপত্র নিয়ে দেশে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিশ্রামই এ রোগের চিকিৎসা। নবগ্রামের এম-বি ডাক্তার হরেন চাটুজ্জে কলকাতায় গিয়েছিলেন এই উপলক্ষ্যে। সেখানকার বড় ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা-বিধি বুঝে এসেছেন এবং সেইমত চিকিৎসা তিনিই করছেন। এখন হঠাৎ কি হ'ল যে, তাঁকে ডাকতে এসেছে কিশোর?

কিশোর বললে—চলুন, পথে চলতে চলতে বলব।

ব্লাডপ্রেসার ব্যাধিটা আছে নিশ্চয় চিরকাল কিন্তু ওর নির্ণয় এবং নামকরণ, যন্ত্রযোগে চাপের পরিমাণ পরীক্ষা-পদ্ধতি আধুনিক। জীবন ডাক্তার প্রৌঢ় বয়সে চোখে দেখলেন এ সব। আগের আমলে অর্থাৎ তাঁর পিতা পিতামহের আমলে এর চিকিৎসা ছিল তাঁদের পদ্ধতি অনুযায়ী ধাতুগত। তিনি নিজে কবিরাজী ডাক্তারী দুই চিকিৎসাই করে এসেছেন। যন্ত্রযোগে পরীক্ষার ফলাফল যা', তা' প্রত্যক্ষ, তাকে তিনি অস্বীকার করেন না, হৃদযন্ত্রের এবং মূত্রাশয়ের পরীক্ষা-ফলকেও উপেক্ষা করেন না. তবে

তাঁর পরীক্ষার মূল কথা নাড়ী পরীক্ষা। তিনি সেই কথাই ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলেন।

কিশোর বলে যাচ্ছিল রোগের কথা।

কলকাতায় বড় ডাক্তার রক্তের চাপ কমাবার জন্য রক্ত মোক্ষণ করেছিল। মূত্রাশয়ে দোষ পাওয়া গেছে। এখন গ্লুকোস ইন্‌জেকশানই হল প্রধান চিকিৎসা। এর সঙ্গে অবশ্যই আরও অনেক ওষুধ আছে। এ ব্যবস্থায় কলকাতায় ভালই ছিলেন বিপিন বাবু। ভাল থাকতেই দেশে এসেছেন, হরেন ডাক্তার ভরসা দিয়েছিল; বড় ডাক্তারও সম্মতি দিয়েছিলেন। এখন দেশে ফিরে হঠাৎ রোগটি যেন বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বিচিত্র এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে—হিক্কা। আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল হিক্কা চলছে সমান ভাবে। হাসপাতালের ডাক্তার প্রদ্যোত বোসকেও ডাকা হয়েছিল কিন্তু তাদের ওষুধে কোন ফল হয় নাই। তবে একমাত্র ভরসার কথা এই যে, নাড়ীর গতি বা হৃদযন্ত্রের গতির উপর এর কোন প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয় নাই। কিন্তু দিতে কতক্ষণ? কাল কিশোর হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছিল। তাতেও কোন ফল হয় নাই। তাই আজ কিশোর জীবন ডাক্তারকে ডাকতে এসেছে।

প্রদ্যোত ডাক্তারের নাম শুনে জীবন ডাক্তার সচেতন হয়ে উঠলেন, বললেন, হাসপাতালের ডাক্তারটি কি এখনও দেখছে? সেও কি থাকবে না কি? তা ছাড়া হরেন? হরেনের মতামত নেওয়া হয়েছে ত?

কিশোর তাঁর দিকে ফিরে তাকালে, বললে—প্রদ্যোত ডাক্তারের কথা আমি শুনেছি ডাক্তার বাবু। প্রদ্যোত ডাক্তার এমনিতে তো লোক খারাপ নয়, বরং ভালো লোক বলেই আমার ধারণা। হঠাৎ এমন অভদ্র—

—ভদ্রতা অভদ্রতার কথা নয় কিশোর! এ হ'ল সত্য মিথ্যার কথা। প্রদ্যোত ডাক্তারের যদি এই বিশ্বাসই হয় যে নাড়ী পরীক্ষা ক'রে আমি যে ধরণে চিকিৎসা করি সে ভুল, সে মিথ্যা, তা হ'লে—তিনি অবশ্যই আমাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতে পারেন। সে কথা এখন থাক। এখন আমি যে কথাটা জানতে চাচ্ছি তার উত্তর দাও।—জীবন ডাক্তার পথের মধ্যেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

কিশোর একটু বিস্মিত হয়েই ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকালে
জীবন ডাক্তার বললেন—তুমি আমাকে খুলে বল কিশোর। তুমি বি
সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্মতি নিয়ে আমার কাছে এসেছ? ন
নিজেই এসেছ? তোমার তো এ ব্যাধি আছে। টাকাওয়ালা লোকে
টাকব্যাধি যেমন শোভন, তোমার পক্ষে তেমনি শোভনও বটে। পরে
উপকার যারা করে পরের ঘরের বিধি-ব্যবস্থা উল্টে পাল্টে দিতে তাদে
অধিকারও থাকে।

কিশোর এবার একটু হেসেই বললে—এই শেষ বয়সে আপনি অভিমা
করলেন ডাক্তার বাবু! এবং এতখানি অভিমান?

—তা' হয়েছে কিশোর। এবং সে অভিমান আমি ছাড়তে পারব না
তুমি যখন যেখানে ডেকেছ—আমি গিয়েছি। আজ কিন্তু যেতে পারব ন
তোমার ডাকে।

—একা আমি ডাকি নি ডাক্তার বাবু। রোগীর বাপ আপনাকে আহ্বা
জানিয়েছেন, রতন বাবু আপনাকে ডেকেছেন! বলেছেন জীবন ডাক্তা
নাড়ীটা দেখলে আমি নিশ্চিন্ত হই। অন্তত অনিশ্চিত মনের সংঘাত থেকে
নিষ্কৃতি পাই। সে ঠিক বলে দেবে।

অর্থাৎ মৃত্যুর কথা!

জীবন ডাক্তার একটু বিচলিত হলেন। বৃদ্ধ রতন বাবু তাঁরই সমবয়সী
মাত্র দু বছরের ছোট। তাঁর থেকে এক ক্লাস নিচে পড়ত। যে বছর
জীবন ডাক্তার কাঁদীর ইস্কুল থেকে ভূপী বোসের নাক ভেঙে দিয়ে পালিয়ে
এলেন সেই বছরই রতন এম-ই পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে ওখানে গিয়ে ভর্তি হল
রতন এনট্রান্সেও বৃত্তি পেয়েছিল। চিরকালই ধীর প্রকৃতির মানুষ
রতন। রতন এই কথা বলেছে? বলেছে—জীবন নাড়ী দেখলে
আমি চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই! যা হবে সে ঠিক বলে দেবে!

বলবে বই কি! জীবন ডাক্তার যে নিজের একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর কথা
তিনমাস পূর্বে থেকে নাড়ী দেখে জেনেছিলেন—শুধু জেনেই ক্ষান্ত হন নি
ঘোষণা করে জানিয়েছিলেন সে কথা। সুতরাং বলবে বই কি রতন।

রতন বাবু মৃদুস্বরেই প্রশ্ন করলেন বটে কিন্তু মৃদু হলেও কণ্ঠস্বর কাঁপল না, প্রশ্ন করলেন—কেমন দেখলে বল? কি দেখলে?

হাত ধুয়ে জীবন ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—হিক্কার জন্যে ভেবো না, ও দু তিন দিনেই বন্ধ হয়ে যাবে।

অশীতিপর বৃদ্ধ হলেও রতনবাবু খাড়া সোজা মানুষ। এতটুকু ন্যুব্জ হন নি। অবশ্য মাথায় তিনি খাটো এবং দেহেও তিনি ভারী নন। তবুও খানিকটা ঝুঁকে পড়ার কথা কিন্তু তা তিনি পড়েন নি। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ হলেও স্থির এবং শুষ্ক, সহজে জল তাঁর চোখে আসে না। সেই যৌবনে তিরিশ বৎসর বয়সে পত্নী-বিয়োগের পর থেকে স্বপাকে নিরামিষ খেয়ে ছেলেকে মানুষ করেছেন। আদর্শবাদী নীতিপরায়ণ মানুষ রতনবাবু। রতনবাবু ঈষৎ হেসে বললেন—আমার প্রশ্ন তো তা নয়। আমি যা' জিজ্ঞাসা করেছি সে তো তুমি বুঝেছ জীবন!

—বুঝেছি। কিন্তু—

—তোমার কাছে তো কিন্তু প্রত্যাশা করি না। তুমি স্পষ্ট বল ব'লেই—তোমার জন্য আমার এত আগ্রহ।

ডাক্তার মাটির দিকে চেয়ে রইলেন।

—জীবন? মৃদুস্বরে ডাকলেন রতনবাবু।

—ভাবছি।

—আমার জন্যে? রতনবাবু বললেন—আমার জন্য ভেবো না। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যু—তিনিই তো পরমানন্দ।

চমকে উঠলেন ডাক্তার তাঁর সমস্ত অতীত কালের স্মৃতি যেন মুহূর্তে আলোড়িত হয়ে উঠল। তাঁর নাড়ী পরীক্ষা বিদ্যা শিক্ষার গুরু এই কথাটি বলতেন। জীবন আর মৃত্যু? যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যু—তিনিই আনন্দস্বরূপ!

বাবা জগত মশায় নস্য নিয়েছিলেন এই সময়,—সে-কথা জীবন ডাক্তারের আজও মনে আছে। তার ফলেই হোক আর হৃদয়াবেগের জন্যই হোক তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠেছিল। ভারী গলার কথাগুলির প্রতিধ্বনিতে জীবন ডাক্তারের বুকের ভিতরটা যেন বর্ষার মেঘের ডাকে

পৃথিবীর মত এক পুলকিত অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন—বাবা, এতে আমাদের দুই তত্ত্বই হয়, ইহলোক পরলোক দুই। পরমানন্দ স্বরূপ যিনি তিনিই আমার মাধব। আমাদের ইষ্ট দেবতা।

ধ্যানযোগে সিদ্ধ চিকিৎসক যখন গভীর একাগ্রতায় তন্ময় হয়ে নাড়ী পরীক্ষা করেন—তখন জীবন এবং মৃত্যুর যুদ্ধ আর বিয়োগান্ত বলে মনে হয় না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন লীলা বলে মনে হয়, তখন অনায়াসেই বলা যায় যে সূর্যাস্তের কাল সমাগত। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আনন্দ এক, পৃথক নয়।—

রতনবাবু অপেক্ষা ক'রে তাঁরই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—এবার তিনি তাঁকে ডাকলেন—জীবন!

জীবন ডাক্তার সচেতন হয়ে উঠলেন, রতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একবার যেন কেঁপে উঠলেন, বললেন—তেমন কোন লক্ষণ আমি আজ পাই নি রতন। তবে—

—কি তবে? বল! দ্বিধা করো না। হাসলেন রতনবাবু; বিষণ্ণ এবং করুণ সে হাসি। এ হাসির সামনে দাঁড়ানো বড় কঠিন। অন্তত মুখ তুলে চোখে চোখ রেখে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। মাথা হেঁট ক'রে বলতে হয়।

জীবন ডাক্তার তাঁকে মিথ্যা বলতে চান নি। তিনি যা-সত্য তাই বলতে যাচ্ছিলেন, তাই বোধ করি মাথা হেঁট করলেন না তিনি। বললেন—এ রোগটি হঠাৎ মারাত্মক হয়ে উঠে; রোগের বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হয় না, এবং বৃদ্ধির হেতুও হিসাবের বাইরে। যে কোন একটা আঘাতের ছুতো, দৈহিক হোক মানসিক হোক—হলেই চরম সর্বনাশের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়।

—সে আমি জানি।

—তা হ'লে আমার বলবার তো কিছু নাই রতন। রোগ এখন ষোল-আনা মাত্রায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও এমন কোন লক্ষণ আমি পাই নি যাতে বলতে পারি সাধ্যাতীত। খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে—দুঃসাধ্য—কিন্তু অসাধ্য আমি বলব না।

মুহূর্তে অসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। ভগবানের দয়া, সে দয়া তোমরা পিতাপুত্রে পাবার হক্‌দার।

—হক্‌দার! এ-দয়ার উপর কি কারও হক্ আছে জীবন?

জীবন ডাক্তার এবার চুপ ক'রে রইলেন। এ কথার সত্যই উত্তর নাই।

রতনবাবু বললেন—তুমি তা' হ'লে হিক্কাটা থামিয়ে দাও।

—আমার ওষুধে ডাক্তারদের আপত্তি হবে না তো? এ্যালোপ্যাথি মতে যা ওষুধ—সে বিষয়ে ওঁদের চেয়ে আমি তো অভিজ্ঞ নই। আমি দেব—আমাদের কৌলিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী ওষুধ।

হরেন ডাক্তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বললে—আমাদের ওষুধে আপনার আপত্তি হবে না তো? প্রয়োজন হলে আমরা একটা দুটো ইনজেকসন দেব, গ্লুকোজ দেব, বিশেষ ক'রে ঘুমের জন্য ইনজেকসন না-দিলে ওঁর ঘুম হয় না। তা-ছাড়া—প্রেসার বাড়লে—তার জন্যে ওষুধ দিতে হবে। আর একটা কথা—।

থমকে গেল হরেন ডাক্তার। হাজার হলেও হরেন এই গ্রামের ছেলে, জীবন ডাক্তারকে সে শ্রদ্ধা করে, ছেলেবেলায় জীবন ডাক্তারের অনেক ওষুধ সে খেয়েছে। এখনও দুচারটে রোগীকে বলে—এর জন্যে—জীবন মশায়ের কাছে যাও বাপু। আমাদের ওষুধের চেয়ে ওঁর ওষুধে কাজ বেশী হবে। জীবন ডাক্তার নাড়ী দেখে রোগ নির্ণয় করলে—রক্ত মল মূত্র পরীক্ষা না-করেও তাঁর নির্ণয় মত রোগেরই চিকিৎসা করে যায়। এই কারণেই কথাটা বলতে হরেন ডাক্তার সঙ্কুচিত হ'ল।

—বল, কি বলছ?

—আপনাকে বলার দরকার নেই, তবুও—। হরেন ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে হাসলে। বাকীটা আর বললে না।

জীবন ডাক্তার কিন্তু একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। প্রদ্যোত ডাক্তারের মুখ মনে পড়ে গেল। দু জনেই একালের ছেলে—প্রায় এক সময়ের পাশ করা ডাক্তার। দীর্ঘকালের পরিচয়ের জন্য প্রদ্যোতের মত কঠিন তিরস্কার করতে না-পারলেও—উপদেশের ছলে—তিরস্কার করতে

পারে। অসহিষ্ণু ভাবেই জীবন ডাক্তার বললেন—বলার দরকার আছে হরেন, তুমি যা বলছ—প্রকাশ ক'রে বল।

হরেন একটু ভেবে নিয়ে—বেশ হিসেব ক'রেই বললে—আমরা লক্ষ্য রেখেছি হার্ট আর কিডনির ওপর। তার জন্যে ওষুধ দিচ্ছি; আফিং ঘটিত ওষুধে হিক্কা থামতে পারে কিন্তু হার্টের কথা ভেবে সে সব ওষুধ ব্যবহার করি নি। প্রেসক্রপসন তো আপনি দেখেছেন।

—আমার ওষুধে হার্টের কোন অনিষ্ট হবে না, আফিং-ঘটিত ওষুধ আমি দেব না হরেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

(দশ)

ডাক্তার হাঁটছিলেন বেশ একটু জোরে জোরে। মনের মধ্যে উত্তাপ যেন ঘুরপাক খাচ্ছে। ওষুধ ঠিক হয়ে গিয়েছে, সে ওষুধ তিনি নিজে তৈরী ক'রে দেবেন। এ দেশেরই সুলভ কয়েকটা জিনিস দিয়ে তৈরী মুষ্টিযোগ। সে কিন্তু ওদের বলবেন না। সংসারে যা সুলভ তার উপর মানুষের আস্থা হয় না। তা' ছাড়া এ বলেও দেবেন না। কখনই বলবেন না। এবং একদিনে এই হিক্কা থামিয়ে দিয়ে ওদের দেখিয়ে দেবেন, কি বিচিত্র চিকিৎসা এবং ওষুধ তাঁর আছে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। সেতাবকে একবার দেখে গেলে হ'ত। তা হ'লে কিন্তু ফিরতে হয়, অন্যমনস্ক ভাবে পথ হাঁটতে হাঁটতে সেতাবের বাড়ির গলিটা ফেলে এসেছেন। থাক—বুড়োর জ্বর আজ নিশ্চয় ছেড়ে গিয়েছে। একলাই বোধ হয় ছকের উপর দাবার ঘুটি সাজিয়ে বসে আছে। কাল সকালে বরং দেখে যাবেন। এখন তাড়াতাড়ি গিয়ে এই ওষুধটা তৈরী ক'রে দিতে হবে।

—জীবন মাশায়, না,কে গো? ওগো জীবন মাশায়। পাশের গলি থেকে মেয়েলী গলায় কে ডাকলে।—শোন গো! দাঁড়াও!

দাঁড়ালেন জীবন মশায়। গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ়া বিধবা। নবগ্রামের নিশি ঠাকরুণ। বিখ্যাত নিশি ঠাকরুণ। গ্রামের

এ কালের ছেলেরা আড়ালে আবডালে নিশি ঠাকরুণকে বলে—মিসেস শেরীফ অব নবগ্রাম। গ্রামের মধ্যে অসীম প্রতাপ নিশি ঠাকরুণের।

নিশি ঠাকরুণ এসেই প্রশ্ন করলেন—বলি হ্যাঁগা, একে, মানে রতনবাবুর ছেলেকে দেখে এলে? কেমন দেখলে বল তো?

জীবন মশায় প্রমাদ গণলেন। কণ্ঠস্বর শুনে তিনি নিশি ঠাকরুণকে অনুমান করতে পারেন নি। কিন্তু অনুমান করা উচিত ছিল, কারণ এই গলিতে এমন ভাবে আধিপত্য খাটানো কণ্ঠস্বরে আর কে ডাকবে? নিশি ঠাকরুণ এই গলিতে নিজের দাওয়ার উপর বসে থাকে, এবং যাকে দরকার তাকেই ডেকে তার প্রয়োজনীয় সংবাদটি জিজ্ঞেস করে।

জীবন ডাক্তার সংক্ষেপে বললেন—অসুখ কঠিন বটে—তবে হালছাড়ার মত নয়। আমি যাই নিশি, ওষুধ দিতে হবে।

—আঃ, তবু যদি মাশায় তোমার ঘোড়া থাকত! দাঁড়াও না।

—ওষুধ দিতে হবে নিশি।

—তা তো বুঝছি। সঙ্গে লোকও দেখছি। ওরে লোকটা—তুই এগিয়ে চল। ডাক্তার যাচ্ছে। আমার মামাতো ভাইয়ের মেয়েটা বড় ভুগছে। পেটের ব্যামো কিছুতেই সারছে না। একবার দেখে যাও মাশায়। এই সব হালের ডাক্তারদের পাল্লায় প'ড়ে এক কাঁড়ি টাকা খরচ করলাম—কিছুতে কিছু হল না। তা' তুমি তো আর এ গাঁ মাড়াও না! একেবারে আমাদিকে ছেড়েছ। বলি—অ—নীহার, শুনছিস?

—ডাকতে হবে না, চল দেখেই আসি। ওরে দাঁড়া তুই পাঁচ মিনিট।

বাড়ির মধ্যে ঢুকেই নিশি প্রায় পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে বললে—ঠিক ক'রে বল দেখি মাশায়, রতন মাস্টারের ছেলে বাঁচবে না মরবে।

অবাক হলেন জীবন মশায়। নিশি ঠাকরুণের স্বভাবই এই। পৃথিবীর গোপন কথাগুলি ওর জানা চাই। জেনেই ক্ষান্ত হবে না, প্রচার ক'রে তবে তৃপ্ত হবে।

গম্ভীর কণ্ঠে জীবন মশায় বললেন, আমি তোমাকে লুকিয়ে কথা বলিনি নিশি। নাড়ীতে কিছু বুঝতে পারি নি।

—না পার নি! তুমি জীবন মাশায়ঃ—তুমি বুঝতে পার নি, তাই হয়? লোকে বলে জীবন মাশায় রোগীর নাড়ী ধরলে মৃত্যু-রোগে মরণ পায়ের চুট্‌কী বাজিয়ে সাড়া দেয়! লুকোচ্ছ তুমি।

এবার ডাক্তার ভ্রূকুটী ক'রে উঠলেন। নিশি এতে নিরস্ত হল কিন্তু ভয় পেলে না, বললে—আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ওই হয়েছে। এখন—ওলো ও নীহার! বলি যাস কোথায় লা?

—কি পিসী? নীহার এতক্ষণে উত্তর দিলে ঘরের ভিতর থেকে। একটুখানি দরজা খুলে উঁকি মারলে মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে আচারের গন্ধ পেলেন জীবন মশায়। মেয়েটি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আচার খাচ্ছিল। আমাশয় পেটের অসুখের ওটা একটা উপসর্গ। দুঃসাধ্য রোগের উপসর্গ।

* * *

নিশি ঠাকরুণের কথাগুলি ডাক্তারের কানের কাছে ঘুরে ফিরে বেজে উঠছিল। "লোকে বলে; জীবন মশায় নাড়ী ধরলে মৃত্যু রোগে মরণ পায়ের চুটকী বাজিয়ে সাড়া দেয়।"

নিশি ঠাকরুণের ভাইঝির নাড়ী ধরে সে বাজনা তিনি শুনতে পেয়েছেন। মেয়েটাকে মৃত্যুরোগে ধরেছে।

লোকে বলে—অন্তত আগে বলত—শুভ সিদ্ধযোগ লগ্নে সিদ্ধ গুরুর কাছে শিক্ষা যে! আর গুরু যেখানে স্বয়ং বাপ সেখানে তো কার্পণ্য ছিল না; হবেই তো!

হিক্কার ওষুধ তৈরী ক'রে ওষুধ খাওয়ার প্রণালী পালনের নিয়ম কাগজে লিখে রতনবাবুর লোকের হাতে দিয়ে জীবন মশায় আয়ুর্বেদ ভবনের দাওয়ার উপর বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। নিশি ঠাকরুণের কথা কয়টিই আবার মনে পড়ল।

মর্মান্তিক বেদনা পেয়েছেন তিনি ওই মেয়েটির নাড়ী পরীক্ষা ক'রে। পরীক্ষা করবার আগেই চোখে দেখেই শিউরে উঠেছিলেন। মেয়েটির সর্ব অবয়বের উপর তার ছায়া পড়েছে। তার—অর্থাৎ ব্রহ্মার পিঙ্গলবর্ণা কন্যার।

শীর্ণ কঙ্কালসার বাসি অতসী ফুলের মত দেহবর্ণ একটি কিশোরী। মাথায় সিঁদুর। বয়সে কিশোরী হলেও সন্তানের জননী হয়েছে।

নিশি ঠাকরুণ বললে, গর্ভ সূতিকা হয়েছে। দুটি সন্তান। সব ভেসে যাবে মাশায়। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কেঁদে ফেললে নিশি।

দুটি সন্তান। কত বয়স? চৌদ্দ? দুটি সন্তান? ডাক্তার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

চোখ মুছে মুহূর্তে সহজ হয়ে নিশি বললে—পূর্ণ বারোতে প্রথম সন্তান হয়েছে। নেকটানেকটি বিয়েন—চৌদ্দ বছরে কোলেরটি। চাঁদের মত ছেলে মাশায়, কি বলব তোমাকে, চোখ জুড়িয়ে যায়।

চাঁদ নয় যম। মাকে খেতে এসেছে। বাপের মূর্তিমান অসংযম। সমস্ত অন্তরটা তিক্ত হয়ে উঠছিল জীবন ডাক্তারের। এই সব অনাচারীর সাজা হয় না? পরক্ষণেই দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। বাবা বলতেন—রোগী যখন দেখবে বাবা, তখন কোন কারণে তার উপর ক্রোধ বা ঘৃণা কর না বাবা। করতে নাই। তিনি বলতেন, মানুষের হাত কি বাবা? মানুষ ত ক্রীড়নক।

তাঁর এ্যালোপ্যাথিক শাস্ত্রের গুরু—রঙলাল ডাক্তার বলতেন—মানুষ বড় অসহায়। তার অন্তরে পশুর কাম, ক্রোধ, লোভ; অথচ পশুর দেহের সহ্য-শক্তি তার নাই! ওদের ওপর রাগ কর না! করতে পার, অধিকার অবশ্যই তোমার আছে। কিন্তু তা হলে চিকিৎসক বৃত্তি নিতে পার না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললেন—এত দিন কি করছিলে নিশি?

—এই এটা সেটা। তা ছাড়া সূতিকা তো হয় মাশায়, এমন হবে কি করে জানব বল? তারপরে এই দিন কতক হালের ডাক্তারদের দেখালাম, ওরা আবার নানান কথা বলে। এই লম্বা খরচের ফর্দ। সে আমি কোথায় পাব?

—হুঁ। বলেই থেমে গেলেন ডাক্তার।

নিশির কথা তখনও ফুরায় নি—বাঈয়ের কবচ, দেবতার ওষুধ, অনেক করেছি।

তা বুঝতে পেরেছেন ডাক্তার। গলায় এক বোঝা মাদুলী। হাতে ন্যাকড়ায় বাঁধা জড়ি পুষ্প। কিন্তু কি করবেন? ডাক্তারই বা কি করবেন? আছে একমাত্র ওষুধ। এ্যালোপ্যাথি নয়; কবিরাজী—সূচিকাভরণ।

—পারবে? জল বারণ। খাওয়াতে পারবে নিশি?

—জল বারণ ?

—হ্যাঁ। জল বারণ। দেখি আর একবার হাতখানি খুকী।

মরণ-রোগ ক্লিষ্টা খুকী—মুখে কাপড় দিয়ে হাসে। দুই সন্তানের জননী সে—সে নাকি খুকী? ডাক্তারও হাসেন! সঙ্গে সঙ্গে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। একমাত্র উপায় বিষ। বিষম রোগের বিষজ ঔষধ! নাড়ীতে যেন পদধ্বনি শুনেছেন তিনি।

নিশি মিথ্যা বলে নি। মরণের পায়ে এদেশের মেয়েদের মত চুটকী থাকলে তার ঝুম ঝুম বাজনাও শুনতে পেতেন ডাক্তার। লোকের কথাও মিথ্যা নয়—বাপ ছিলেন গুরু, তিনি ছিলেন এই নাড়ী পরীক্ষার বিদ্যায় প্রায় সিদ্ধ পুরুষ। দীক্ষার দিন—ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভের পর যেদিন হাতে-কলমে নাড়ী পরীক্ষা বিদ্যার শিক্ষা দিয়েছিলেন—সে দিনটি ছিল অতি শুভ দিন। বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়া।

এই বৃদ্ধ বয়সেও সে দিনের কথাগুলিকে মনে হচ্ছে যেন কালকের কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে সব।

চাকর ইন্দির এসে হুঁকোটি বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল।

ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকালেন। অতীত কালের স্মৃতির মধ্যে প্রায় তন্ময় হয়ে গেছেন।

—তামাক খান! আর মা বললেন চায়ের জল ফুটছে।

অর্থাৎ বাড়ির ভিতর যাবার জন্যে আতর-বউ বলে পাঠিয়েছেন। হুঁকোটি হাতে নিয়ে ডাক্তার বললেন—চা বরং তুই নিয়ে আয়। এখন আর উঠতে পারছি না।

—এই খোলাতে বসে থাকবেন? আকাশে মেঘ ঘুরছে! বৃষ্টি নামবে কখন।

আকাশের দিকে চাইলেন ডাক্তার। শ্রাবণের আকাশে একস্তর ফিকে মেঘের নিচে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ঘুরছে, এক যাচ্ছে এক আসছে। গতি দেখে ডাক্তারের মনে হল—বৃষ্টি আসবে না। বললেন, বেশ আছি। বৃষ্টি আসবে না।

তবু দাঁড়িয়ে রইল ইন্দির। ডাক্তারের মনে পড়ল বাজারের খরচ চাইছে ইন্দির।

নিয়ম হ'ল ডাক্তার কল থেকে ফিরে টাকাগুলি আতর-বউয়ের হাতে দিয়ে থাকেন। আজকাল ডাক্তার ব্যবসা প্রায় ছেড়েছেন। এক কালে কুড়ি পঁচিশ ত্রিশ টাকা দৈনিক পকেটে নিয়ে ফিরতেন। এখন কোনদিন চার টাকা কোনদিন ছয় কোনদিন বা দু টাকা। এক একদিন কল আসে না। আবার বেশী দূরের কল যাতে টাকা বেশী তাতে ডাক্তার নিজেই যান না। আজ ডাক্তার আতর-বউকে টাকা দেন নি। পরান শেখের বাড়ি থেকে ফিরে খাওয়া দাওয়ার পরই আতর-বউয়ের সঙ্গে কলহ বেধেছিল। তারপর কিশোর এসে ডেকে নিয়ে গেল রতনবাবুর বাড়ি। ডাক্তার ইতিমধ্যেই জামা খুলে খালি গা ক'রে বসেছিলেন। জামাটা টেনে পকেট ঝেড়ে টাকাগুলি বের করে ইন্দিরের হাতে তুলে দিলেন। বললেন—কত আছে দেখ।

—দু টাকা।

—দিগে আতর-বউকে। আমাকে আর বিরক্ত করিস নে।

—আর দুটো কল্কে সেজে রেখে যাই।

—যা, তাই যা। তুই বড় বেশী বকিস।

আকাশের দিকে চেয়ে কথা বলছিলেন ডাক্তার। দেখছিলেন আকাশের মেঘ—ইন্দিরের কথার দিকে ছিল কান, মুখে তার জবাবও দিচ্ছিলেন কিন্তু মনে ঘুরছিল—সেই সেকালের এক বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়ার দ্বিপ্রহরের স্মৃতি।

* * * *

সেদিন ছিল বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়া। পুত্রের দীক্ষার জন্য এই পরম শুভ-দিনটিই নির্বাচন করেছিলেন জগত মশায়। একান্তে নির্জন ঘরে পুত্রকে কাছে বসিয়ে তিনি যেন তার চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সেদিন। বাড়িতে বলে রেখেছিলেন যেন কেউ তাঁদের না ডাকে, কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

জীবন অল্প স্বল্প নাড়ী দেখতে জানতেন। চিকিৎসকের বাড়ির ছেলে। বাল্যকালে খেলাচ্ছলে খেলাঘরে বৈদ্য সেজে বসে সঙ্গী সাথীদের হাত

দেখতেন, কাদামাটি, ধুলো কাগজে মুড়ে ওষুধ দিতেন। জীবনের মা পর্যন্ত নাড়ী দেখতে জানতেন। সে দিন বাপ তাকে প্রথম পাঠ দিয়ে নাড়ী-তত্ত্ব বুঝিয়ে আয়ুর্বেদ ভবনে যে সব রোগীরা এসেছিল তাদের কয়েকজনের নাড়ী নিজে পরীক্ষা ক'রে ছেলেকে বলেছিলেন, দেখ—এর নাড়ী দেখ।

রোগীকে ওষুধের ব্যবস্থা-পত্র দিয়ে অন্যদিকে যেদিকে ওষুধ পাওয়ার ব্যবস্থা সেই দিকে পাঠিয়ে দিয়ে জীবনকে রোগীর নাড়ীর বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই ছিল জগত মশায়ের শিক্ষার ধারা।

আয়ুর্বেদ ভবনের কাজ শেষ করে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি রোগীকে রোগীর বাড়িতে গিয়ে দেখে বাড়ি ফেরার পথে বলেছিলেন—বাবা, যে চিকিৎসক নাড়ী বিজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করতে পারে তার সঙ্গে মৃত্যুকে সন্ধি করতে হয়। মৃত্যুর যেখানে অধিকার সেখানে মৃত্যু বলে—আমার পথ ছেড়ে দাও। এ আমার অধিকার। আর যেখানে তার অধিকার নাই সেখানে ভুলক্রমে উঁকি মারলে চিকিৎসক বলেন—দেবী, এখনও সময় হয় নি, এক্ষেত্রে তোমাকে স্বস্থানে ফিরতে হবে!

কারণ এমন চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়েও ভ্রান্তি ঘটে না, ঔষধ নির্বাচনেও ভুল হয় না। মৃত্যু যেমন অমোঘ, পঞ্চম বেদ আয়ুর্বেদের স্রষ্টা ব্রহ্মার সৃষ্টি ভেষজ এবং ওষধির শক্তিও তেমনি অব্যর্থ। যে ব্রহ্মার ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি হল মৃত্যুর, সেই ব্রহ্মারই প্রসন্ন দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি হয়েছে ভেষজের। ব্রহ্মা এই শাস্ত্র দিয়েছিলেন দক্ষপ্রজাপতিকে, দক্ষের কাছ থেকে এই শাস্ত্র পেয়েছিলেন অশ্বিনীকুমারেরা, তাঁদের কাছ থেকে পেলেন ইন্দ্র, ইন্দ্র দিলেন—ভরদ্বাজ আর বিবদাস ধন্বন্তরীকে। এই খানে আয়ুর্বেদ দুভাগে ভাগ হয়েছে। ধন্বন্তরী শল্য-চিকিৎসার ভাগ পেয়েছিলেন। তারপর পুনর্বসু এবং আত্রেয়। তারপর অগ্নিবেশ। আচার্য অগ্নিবেশ রচনা করেছিলেন অগ্নিবেশ সংহিতা। এই সংহিতা থেকেই চরক সংহিতার সৃষ্টি। পঞ্চনদ প্রদেশের মনীষি চরক এই সংহিতাকে নূতন করে সংস্কার ক'রেছিলেন। চরক হলেন চিরজীবি। কথা বলতে বলতেই পথ চলছিলেন পিতা পুত্রে। চলেছিলেন গ্রামান্তরে। জগত মশায় সচরাচর রোগী দেখতে যেতে গাড়ী পাল্কী ব্যবহার করতেন না।

বেশী দূর হলে তবে গরুর গাড়ি এবং তাড়াতাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন হলে তবে ডুলীতে চাপতেন। সেদিন ছেলেকে দেখিয়েছিলেন—ঠিক আজকের মত একটি রোগিনী। ঠিক এমনি। কিশোরী মেয়ে, বড় জোর ষোল বছর বয়স—সে আবার দুই সন্তানের পর তৃতীয়বার সন্তানসম্ভবা ছিল।

সে দিন ফিরবার পথে জগত মশায় বলেছিলেন—নির্দিষ্ট আয়ুর কথা শাস্ত্রে আছে। কিন্তু কর্মফলে সে আয়ুরও হ্রাস বৃদ্ধি আছে। ব্যাভিচার করে মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনে মানুষ। এ সব ক্ষেত্রে তাই—অথচ—।

চুপ ক'রে গিয়েছিলেন জগত মশায়, বোধ হয় সংশয় উপস্থিত হয়েছিল নিজের মনে। একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন, এক এক সময় শাস্ত্র-বাক্যে সংশয় জাগে জীবন। আমাদের শাস্ত্রে বলে—স্বামীর পাপের ভাগ স্ত্রী গ্রহণ করে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি বলব? এ ক্ষেত্রে স্বামীর অমিতা-চারের ফল ভোগ করছে মেয়েটা, সেই হেতুতেই ওকে যেতে হবে অকালে!

আবার খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—হয় তো বা প্রাক্তন জন্মান্তরের কর্মফল ওই মেয়েটার—তার ফলেই স্বল্পায়ু হয়েই জন্মেছিল। তাই বা কে বলবে?

সে দিন জীবন মশায়ও ওই কথাতেই বিশ্বাস করেছিলেন। মনে মনে নিজের ভাগ্যবিধাতাকে প্রণাম জানিয়েছিলেন। তাকে পরিত্রাণ করেছেন তিনি। মঞ্জরী স্বাস্থ্যবতী বটে কিন্তু বয়স তো তার বারো বৎসর। কে বলবে—মঞ্জরীর ঠিক এই পরিণতি হত না?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আজ বৃদ্ধ জীবন মশায় আকাশের দিকে চাইলেন আবার। এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। দাড়িতে হাত বুলোলেন। আকাশে রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়েছে। গাঢ় লাল হয়ে উঠেছে দিগন্তবিস্তৃত মেঘস্তর। তার নিচে বকের সারি উড়ে চলেছে। হঠাৎ এতক্ষণে চোখে পড়ল সামনে ঢাকা রয়েছে চায়ের বাটী। ইন্দির কখন রেখে গিয়েছে। অতীত কথা স্মরণ করতে গিয়ে চায়ের কথা মনেই হয় নি। ইন্দির নিশ্চয় কথা বলেছিল, খেয়াল ক'রে দেবার চেষ্টাও সে নিশ্চয় করেছিল কিন্তু সে তিনি স্মরণ করতেই পারছেন না।

থাক। আজ চা থাক।

অতীত কালের কথার একটা নেশা আছে। বড় মনোরম বর্ণ-বিন্যাস। চোখ পড়লে আর ফেরানো যায় না। বিশেষ করে যেখানটার কথা মনে পড়ছে এখন সেখানটা যেন ওই আকাশের রক্তসন্ধ্যার বর্ণচ্ছটার মতই গাঢ়।

পথে তিনি ভাগ্য বিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এলেন—মঞ্জরীর বন্ধন থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য। আর বাড়ি ফিরেই দেখলেন—।

আবার হাসলেন এবং বার কয়েক দাড়িতে হাত বুলোলেন। হঁ্যা, কর্ম পাক নিয়ে যিনি চক্র রচনা করেন তিনি যেমন চক্রী তেমনি রসিক।

* * *

সেদিন তৃতীয় প্রহরের শেষে তাঁরা বাড়ি ফিরেছিলেন। জীবনের মা বসেছিলেন, তাঁরা ফিরে এলে ভাত চাপিয়ে দেবেন। অবশ্য সে দিক দিয়ে বিশেষ অনিয়ম হয় নি। চিকিৎসকের খাওয়া তৃতীয় প্রহরেই বটে।

মুখ-হাত ধুয়ে ভিজে গামছা পিঠে বুলিয়ে জগত মশায় বললেন—জীবনকে কুলকর্মে দীক্ষা দিয়ে আজ আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু জীবনের মা, তোমার মুখ এমন কেন?

—কেমন?

—যেন খুব চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে। কিছু ভাবছ!

—কি ভাবব? জীবনের মা কথাটা উড়িয়ে দিলেন যেন।

—তা বটে! কি ভাববে! মেয়েদের ভাবনা অলঙ্কারের, মেয়ের বিয়ের—ছেলের বিয়ের। মেয়ে নেই। সুতরাং দুটোর একটা ভাবতে পার।

হাসলেন জীবনের মা। উঠে গিয়ে উনানে চড়ানো বক্‌নোর ঢাকা খুলে হাতায় ভাত তুলে টিপে দেখতে বসলেন।

জগত মশায়ের মনটা সেদিন প্রসন্ন ছিল—নির্মেঘ শরৎকালের আকাশের মত। তিনি প্রসন্ন হেসে বললেন—কি, উত্তর দিলে না যে?

পিছন ফিরেই মা উত্তর দিলেন—কি বলব? তুমি অন্তর্যামী। ভাবছি না বললেও বলছ—ভাবছ। তা হ'লে তুমিই বলে দাও কি ভাবছি।

জীবনের অভিভূত ভাবটা তখনও কাটে নি। তার মাথার মধ্যে তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বাপের গম্ভীর মৃদুস্বরের কথাগুলি।

অভিভূত ভাবটা আকস্মিক একটা আঘাতে কেটে গেল। জীবন চমকে উঠল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ছোট রেকাবীতে হরিতকির টুকরো নামিয়ে দিয়ে জীবনের মা বললেন—তুমি অন্তর্যামীই বটে। তামাসা তোমাকে আমি করি নি। কাঁদী থেকে চিঠি নিয়ে সকালে লোক এসেছে। জানি না কি লেখা আছে, তবে কে চিঠি পাঠিয়েছে, তার নাম জেনে আমার ভাবনা হয়েছে। না ভেবে থাকতে পারি নি আমি। নবকৃষ্ণ সিং চিঠি লিখেছে—এই দেখ।

চিঠিখানি তিনি নামিয়ে দিলেন।

চিঠিখানি পড়লেন জগদ্বন্ধু মশায়। চকিত হয়ে জীবন উদ্বিগ্নচিত্তে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু মুখ দেখে কিছু অনুমান করতে পারলে না। জগদ্বন্ধু মশায় চিঠি শেষ করে স্থির দৃষ্টিতে বৈশাখের উত্তপ্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন।

মনে পড়ছে জীবন ডাক্তারের।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। তৃতীয় প্রহরের শেষ পাদ। পূর্বদুয়ারী ঘরের বারান্দায় বসে ছিলেন; সামনের পশ্চিম-দুয়ারী একতলা রান্না ঘরের চালার উপর দিয়ে—আচার্য ব্রাহ্মণদের বাড়ীর উঠানের বকুল গাছের মাথার উপর দিয়ে রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখী আকাশ যেন তপোমগ্ন রুদ্রের অর্ধনিমীলিত তৃতীয় নেত্রের বহ্নিচ্ছটায় ক্লিষ্ট নিথর। দিকে-দিগন্তরে কোথাও ধ্বনি শোনা যায় না। বাতাসও ছিল না সেদিন। মনে হয়েছিল বোধ হয় সন্ধ্যার দিকে কাল বৈশাখীর ঝড় উঠবে। পশ্চিম দিগন্তে আয়োজন হতে আরম্ভ হয়েছে। জীবন ওই আকাশের দিকেই তাকিয়ে ছিল, তারও বুকে বোধ হয় ঝড় উঠবে মনে হয়েছিল। কি লিখেছে নবকৃষ্ণ সিংহ? মঞ্জরী, হয়তো মঞ্জরীর মা—এরা যে ওই দেউলিয়া অভিজাত ঘরের বর্বর ছেলেটার মোহে মুগ্ধ তাতে আর তার সন্দেহ নাই। বঙ্কিম মঞ্জরী-সম্পর্কে তো নাই-ই, কোন সন্দেহই নাই। তাকে নিয়ে তারা খেলা করেছে। তাই বা কেন? সে নিজেই মূর্খ বানর তাই তাদের বাড়ি গিয়ে বানর-নৃত্য করেছে—তারা উপভোগ করেছে। বানর-নৃত্য নয়—

[illegible]

নেচেছে। ভালুক আর বানরে প্রভেদই বা কি? দুটোই জানোয়ার দুটোই নির্বোধ! কিন্তু কি লিখেছে নবকৃষ্ণ সিংহ। তারা কি অভিযোগ ক'রে পাঠিয়েছে তার বিরুদ্ধে? কদর্য অভিযোগ! মিথ্যা কদর্য অভিযোগ! কি করবে জীবন? ভগবান সাক্ষী, কিন্তু ভগবান তো সাক্ষী দিতে আসেন না! তিনি তো বলবেন না—প্রাণ দিয়ে ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তবে জীবন অপরাধী। নইলে সে কোন অপরাধ করে নাই! সে মৃত্যুদণ্ড প্রতীক্ষারত আসামীর মতই অপেক্ষা করে রইল।

মশায় দৃষ্টি নামিয়ে বললেন—জীবনের মা। তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

চিন্তিত মুখেই জীবনের মা প্রতীক্ষা করছিলেন। সাগ্রহে তিনি বললেন—বল! শুনবার জন্য তো দাঁড়িয়েই আছি।

—জীবনের বিবাহের আয়োজন কর।

...কার সঙ্গে? ওই মেয়ের সঙ্গে? নবকৃষ্ণ সিংহের মেয়ের সঙ্গে?

—হ্যাঁ। দিতেই হবে বিবাহ। নবকৃষ্ণ সিংহ লিখেছে—এই ঘটনায় এখানে তাঁর কন্যার দুর্নাম রটেছে চারিদিকে। ওই যে কুৎসিত প্রকৃতির ছেলেটি—সে তাঁর কন্যা মঞ্জরীকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নানারকম মন্তব্য করেছে। বলেছে—ঘটনার দিন সে নাকি জীবনকে আবীর দেবার ছলে মঞ্জরীর অঙ্গে হাত দিতে দেখেছে।

মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—জীবন!

মাকে এমন মূর্তিতে কখনও জীবন দেখে নাই।

মা আবার বললেন—বল, আমার পায়ে হাত দিয়ে বল—

জীবন সেদিন যেন নবজন্ম লাভ করেছে—বাপের সাহচর্যের ফলে—তাঁর অন্তরের স্পর্শে। সে উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে বললে—আমি তার কপালে আবীর দিয়েছি—আর কোন দোষে দোষী নই আমি।

মশায় বললেন—কর কি জীবনের মা? ছি! বিবাহের আয়োজন যখন করতে বলছি, তখন ও-সব কেন? জীবন মনে মনে মেয়েটিকে কামনা করে! এক্ষেত্রে কি শপথ করায়? ছি! বিবাহের আয়োজন কর।

—সে কি? কোষ্ঠী দেখাও। নিজে মেয়ে দেখ। তারপর কথাবার্তা,

—কিচ্ছু না ; এক্ষেত্রে ওসব কিচ্ছু না। ছক এই চিঠির সঙ্গে আছে। ওটা আমি ছিঁড়েই দিচ্ছি, কি জানি যদি বাধার সৃষ্টি করে ; আর দেনাপাওনাই বা কি ? কি লিখেছেন তিনি, জান ? লিখেছেন, "আপনাদের বংশের উপাধিই হইয়াছে মহাশয়। মহদাশয়ের বংশ আপনার। আপনি নিজে ও অঞ্চলে বিখ্যাত চিকিৎসক। আপনার পুত্র ডাক্তারী পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এ অবশ্যই আমার বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার বাসনা। কিন্তু যেরূপ ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আপনি প্রত্যাখ্যান করিলে—হয় আমার কন্যাকে ওই বর্বর পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, অথবা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে।"

—আর কোন কথা নয়। আয়োজন কর। বৈশাখে আর এ ক' দিনে বিবাহ হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেশাচারে নিষিদ্ধ। প্রথম আষাঢ়েই বিবাহ হবে।

(এগার)

অতীত কালের কথা মনে ক'রে যতই মনের মধ্যে বিচিত্র রসের সঞ্চার হয়—বৃদ্ধ জীবন মশায় ততই ঘন ঘন দাড়ীতে হাত বুলান। সাদা দাড়ী, তামাকের ধোঁয়ায় খানিকটা অংশে তামাটে রঙ ধরেছে। যত্ন অভাবে করকরে হয়ে উঠেছে। তবুও হাত না বুলিয়ে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে হাসেন, সেকালের তরুণ বয়সী নিজেকে পরিহাস করেন এই হাসির মধ্যে। একা নিজেকেই বা কেন—সমস্ত মানুষকেই করেন।

ঠিক পশুত্ব নয়, কি একটা আছে ; জলের যেমন ঢালের মুখে গতির বেগ তেমনি একটা বেগ ; সেই বেগে মানুষের মন যখন কোন একজনের দিকে ছোটে তখন শাস্ত্রের কথা, ভালো মন্দ বিবেচনার কথা, সমাজের বাধার কথা হাজার কথার কোন কথাতেই কিছু হয় না, মন বাগ মানে না। এই সব শাস্ত্র কথাগুলিকে যদি বালির বাঁধের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে জলস্রোতের মত ছুটন্ত মনের একটা দ্বন্দ্ব বাধে। হয় বাঁধ ভাঙে, নয় জল শুকায়।

তাই তো আজ হাসছেন জীবন মশায়। সেই দিনই ওই রোগিণী দেখে ফিরবার পথে মঞ্জরীর সঙ্গে বিবাহ সম্ভাবনা বন্ধ হওয়ায় তরুণ জীবন ভাগ্যবিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। মঞ্জরীর আসল চেহারা দেখতে পেয়ে তার উপর বিতৃষ্ণার সীমাও ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে জগত মশায় স্ত্রীকে বললেন—প্রথম আষাঢ়ে বিবাহ হবে, সেই মুহূর্তেই তরুণ জীবন সব ভুলে গিয়েছিল। শুধু ভুলে যাওয়াই নয়, মনে হয়েছিল হাত বাড়িয়ে সে আকাশের চাঁদের প্রায় নাগাল পেয়েছে। যেটুকু ব্যবধান রয়েছে আষাঢ় মাস পর্যন্ত নিশ্চয় সে ততখানি বেড়ে উঠবে।

জীবন দত্তের প্রত্যাশার আনন্দ-টলমল মনের পাত্র হতে আনন্দ যেন উথলে উঠে তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর যতটুকু অংশ তাঁর চোখে পড়েছিল—সমস্তটুকু আনন্দময় হয়ে উঠেছিল।

ওদিকে পত্র বিনিময় চলছিল। জগত মশায় পত্র দিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ সিংহকে। কয়েকদিন পরই সে পত্রের উত্তর এল।

নবকৃষ্ণ সিংহ দ্বিতীয় পত্রে লিখলেন—"মঞ্জরী আমার লজ্জায়-দুঃখে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল; আপনার পত্র আসিবার পর তাহার মুখে হাসি ফুটিয়াছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মাকে বলিয়াছে—আমার শিবপূজা মিথ্যা হয় নাই।"

জীবন দত্ত আনন্দে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। মঞ্জরী লজ্জায় দুঃখে শয্যা গ্রহণ করেছিল, জীবনের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধের কথা শুনে সে উঠে বসেছে? মুখে হাসি ফুটেছে? ওঃ! মনে হয়েছিল—মঞ্জরীর হাসি তার চোখের সামনে গুলঞ্চ চাঁপার গাছটার সর্বাঙ্গ ভরা ফুলে ফুলে ফুটে উঠেছে। ওঃ—কি ভুলই না তার হয়েছিল! সে বুঝতে পারে নি; মঞ্জরীর মত চতুরা নায়িকার চাতুর্যপূর্ণ রসিকতা সে বুঝতে পারে নি! যাকে সত্য ভালবাসে—তাকেই অবজ্ঞা করা যে প্রেমের একটা ধারা!

ছুটে গিয়ে সেতাবকে, সুরেন্দ্রকে এবং নেপালকে দেখিয়েছিলেন চিঠিখানা।

চিঠিখানা তিনি চুরি করেছিলেন।

নিজের গ্রামের সুরেন্দ্র এবং নবগ্রামের সেতাব ও নেপাল ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুরেন আর নেপাল তখন মদ ধরেছে। সেকালে

এ অঞ্চল সম্পর্কে লোকে বলত—মাটিতে মদ খায়। তা' খেত। তের চোদ্দ বছর হ'তেই মদ খেতে শিখত। তান্ত্রিকের দেশ, সবাই তান্ত্রিক—বিশেষ তো ব্রাহ্মণেরা। তারপর দীক্ষা হ'লে ওটা দাঁড়াতো ধর্মসাধনের অঙ্গ। অর্থাৎ প্রকাশ্যেই খাওয়ার অধিকার পেত। খেত না শুধু সেতাব। সেতাবও ব্রাহ্মণ, শাক্ত ঘরের সন্তানও বটে, কিন্তু ভড়কে যেত। সেতাব সমস্ত জীবনটাই পিতলের পাত্রে নারকেলের জল ঢেলে তাই দিয়ে তান্ত্রিক তর্পণ চালিয়ে এল।

সুরেন গ্রামের ছেলে, ঠাকুরদাস মিশ্রের ছেলে। জমিদারী সেরেস্তার পাটোয়ারী কাজ শিখছে। চতুর ছেলে। সে বললে—আজ তোকে খাওয়াতে হবে। মদ মাংস খাব। দে, টাকা ফেল।

নেপাল বাপের আদুরে ছেলে। সব-রেজেস্ট্রী আপিসের কেরাণী তার বাবার অনেক রোজগার। নবগ্রামের ছড়ায় ছিল—বিনোদ বুড়োর লম্বা জামায়, পকেট ভরে রেজকি কামায়। বিনোদ মুখুজ্জে সত্যিই রেজকি বোঝাই পকেট দুটো দুই হাতে ধরে বাড়ি আসত। নেপাল লোক ভাল। হাউ হাউ করে বকত, হা-হা করে হাসত, দুম দুম ক'রে চলত, শাদা-দিলখোলা মানুষ। একবার রাঘবপুরে ব্রাহ্মণ-ভোজনে নেমন্তন্ন খেতে যাবার পথে হঠাৎ নেপালের খেয়াল হল পৈতে নেই গলায়, কোথায় পড়েছে। নেপাল পথে কালী বাউড়ীকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি করি বলতো কেলে? আমাকে একটা পৈতে দিতে পারিস? জীবনের বাড়ি এসে মশায়ের কবিরাজখানায় ঢুকে—কামেশ্বর মোদকের বদলে খানিকটা হরিতকী খণ্ডই খেয়ে ফেলত অম্লান বদনে। স্বাদেও বুঝতে পারত না। এবং তাতেই তার নেশাও হত।

নেপাল সেদিন বলেছিল—হাম, হাম খাওয়ায়েঙ্গা। আমি খাওয়াব।

নেপালই সেদিন খাইয়েছিল। তিন টাকা খরচ হয়েছিল। লুচি মাংস মিষ্টি মদ। গান বাজনা হয়েছিল রাত্রি দুটো পর্যন্ত। সুরেন তবলাসঙ্গত করেছিল—জীবন আর নেপাল গান গেয়েছিল। সেতাব ছিল শ্রোতা।

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী। পূর্বরাগের পালাটাই শেষ করে ফেলেছিল তিনজনে। সেতাব ঘাড় নেড়েছিল—বাহবা দিয়েছিল।

ভুল হচ্ছে। বৃদ্ধ জীবন দত্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন এতক্ষণে। এতকাল পরে ভুল হয়ে যাচ্ছে। জীবন নিজেই সেদিন গুলঞ্চ চাঁপার ফুলের মালা গেঁথেছিল। একগাছি নয় চার গাছি। চার বন্ধু গলায় পরেছিলেন।

নেপাল এবং সুরেন সেদিন তাকে পায়ে ধরে সেধেছিল—একটু খা ভাই। আজ এমন সুখের সংবাদ পেয়েছিস, আজ একটু খা। একটু খেয়ে দেখ! একটু!

জীবন কিন্তু ধর্মভ্রষ্ট হন নি।

বৈষ্ণব মন্ত্র উপাসকের বংশ, মহাশয়ের বংশ। তিনি খান নি। তিনি বলেছিলেন—না ভাই। বাবার কথা তো জানিস। মঞ্জরীদের বাড়িও ঠিক আমাদের মত। তারাও বৈষ্ণব।

ওদিকে বাড়িতে চলছিল সমারোহের আয়োজন। জগদ্বন্ধু মশায়ের একমাত্র সন্তানের বিবাহ। ব্রাহ্মণ ভোজন, জ্ঞাতি ভোজন, নবশাখ ভোজন, গ্রামের অন্য লোকদের খাওয়াদাওয়া—এমনকি আশেপাশের মুসলমান পল্লীর মিঞা সাহেবদের লুচি মিষ্টি খাওয়ানো, ব্যবস্থার ত্রুটি রাখেন নি জগদ্বন্ধু মশায়। বাজনা—বাজী পোড়ানো—রায়বেশে—তার উপর দু রাত্রি যাত্রাগান হবে কিনা এ নিয়েও কথা চলছিল। সুরেন-সেতাব-নেপাল থেকে গ্রামের ঠাকুরদাস মিশ্রের মত মাতব্বর পর্যন্ত ধরেছিলেন—সে কি হয়! যাত্রাগান করাতে হবে বৈকি। না-হলে অঙ্গহীন হবে।

মশায় বলছিলেন—আষাঢ় মাসের কথা। বৃষ্টি নামলে সব পণ্ড হবে। সামিয়ানাতে জল আটকাবে না। তাঁর ইচ্ছা ওই খরচে বরং গ্রামের সরকারী কালী-ঘরের মেঝে দাওয়া বাঁধানো হোক, ঘরখানার সংস্কার হোক।

জীবন দত্ত জানেন—এই প্রতীক্ষার কাল যত সুখের তত দীর্ঘ। দিনকে মনে হয় মাস। তবুও কাটল দিন। আষাঢ়ের এগারই বিবাহ, আষাঢ়ের প্রথম দিবস এল। আকাশে মেঘ এল। সে মেঘ ভুবন-বিদিত বংশের পুষ্কর মেঘ নয়। অশনিগর্ভ কুটিল-মনা কোন অজ্ঞাতনামা মেঘ। বর্ষণের আগে বজ্রপাত হয়ে গেল সে মেঘ থেকে।

মঞ্জরী নাই।

বেলা দুপহরের সময় লোক এল পত্র নিয়ে। পত্রে লেখা ছিল—গত পরশ্ব রাত্রে আমার কন্যা বিসূচিকা রোগে মারা গিয়াছে।

কাকে অভিযুক্ত করবেন জীবন দত্ত! ভগবান? নিজের অদৃষ্ট? কাকে?

একমুহূর্তে সুখস্বপ্ন একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল! জীবন দত্ত সেকালের মানুষ, সেকালের মানুষের বিবাহিত পত্নীর মৃত্যুতে বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও আর্তনাদ বের হ'ত না বুকের ফাটল থেকে। এতো ভাবী পত্নী। জীবন কাঁদেন নি। নির্জনে কবিরাজখানার উপরের ঘরে চুপ ক'রে বসে ছিলেন। হঠাৎ ঠাকুরদাস মিশ্রের উচ্চ চীৎকারে তিনি বিস্মিত হলেন।

চীৎকার করছে ঠাকুরদাস মিশ্র।—আমি ঠাকুরদাস মিশ্রি—আমার চোখে ধূলো দেবে? লোকে ডালে ডালে যায়—আমার আনাগোনা পাতায় পাতায়। 'মুখ দেখে আমি মতলব বুঝতে পারি, পাটোয়ারিগিরি ক'রে খাই আমি। এদিকে চার দিকে গোলমাল চলছে, ওদিকে বেটা সুট করে উঠে রাস্তায় নামল! আমার সন্দেহ হ'ল। কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে হে? বললে—একবার মাঠে যাব। প্রথমটা বুকটা ধড়াস করে উঠল। সেখানে ওলাউঠো হয়েছে—লোকটা সেখান থেকে আসছে, ওর আবার কিছু হয় নি তো? লোকটা হন হন করে চলে গেল। গেল তো, একেবারে যে পথে এসেছে, সেই পথে। কাছের পুকুর জঙ্গল ফেলে চলল। হঠাৎ নজরে পড়ল ছাতাটিও বগলে পুরেছে। তখনই আমার সন্দেহ হ'ল বেটা পালাচ্ছে, আমিও গলি-পথে মাঠের ধারে এসে দাঁড়ালাম। দেখি, মাঠে এসেই ছুটতে শুরু করেছে। তখনই আমি বুঝে নিয়েছি। কিন্তু পালাবে কোথা? মাঠে চাষীরা হাল ছেড়ে ঘুরছে, হাঁকলাম—ধর বেটাকে—ধর-ধর। ধর।

সোলেমান, করিম, সাতন—তিনজন বেটাকে ধরলে, বললাম—নিয়ে আয় বেটাকে পাঁজাকোলা করে। আনতেই সোলেমানের হাতের পাঁচনটা নিয়ে বেটার পিঠে ক'রে এক বাড়ি। বল—বেটা—বল—সত্যি কথা বল। ঠিক বলবি, নইলে কাস্তে দিয়ে জিভ কেটে ফেলব। গল গল করে কবলে ফেললে সব।

জগদ্বন্ধু মশায়ের গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন জীবন দত্ত।—ওকে ছেড়ে দাও ঠাকুরদাস, ও গরীবের কি দোষ? ও কি করবে! ওকে পাঠিয়েছে—ও এসেছে। দূত অবধ্য। ও দূত। নবকৃষ্ণ সিংয়ের অপকর্মের জবাবদিহি বা প্রায়শ্চিত্ত ও কি ক'রে করবে বল?

ঠাকুরদাস বললেন—দোষ তোমার। একখানা চিঠিতে তুমি বিয়ে পাকা করলে। নিজে গেলে না, তাকে আসতে লিখলে না।

মশায় তাঁর বাপের কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করলেন,—প্রবঞ্চনা আমি করি নি ঠাকুরদাস, প্রবঞ্চনা করেছে নবকৃষ্ণ। এতে আমার দোষ কোথায় বল?

জীবন নেমে এলেন উপর থেকে।

মঞ্জরীর বিসূচিকায় মৃত্যু মিথ্যা কথা। গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তার সঙ্গে ভূপী বোসের বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

জীবনের মনে হল—দোলের দিন মঞ্জরী, হাতে আলকাতরা নিয়ে তার মুখে লেপে দিতে এসেছিল; সে দিন পারে নি, কিন্তু আজ মঞ্জরী—সেই আলকাতরা তার মুখে মাখিয়ে দিয়েছে। কানের পাশে যেন মঞ্জরীর সেই খিল-খিল হাসি বেজে উঠল।

মশায় ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে তাকে বললেন—ভগবান তোমার উপর সদয় বাবা, জীবন। তোমাকে তিনি আজীবন প্রবঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ওই মেয়ে ঘরে এনে তুমি সুখী হ'তে না। শুধু প্রবঞ্চনা নয়—আজীবন সে তোমাকে অশান্তির আগুনে দগ্ধ করত। তা ছাড়া, যার যে পতি-পত্নী। এ তো তোমার আমার ইচ্ছায় হবে না! লজ্জা পেয়ো না, দুঃখ করো না। মনকে শক্ত কর।

শেষের কথা ক'টা ভাল লাগে নি জীবনের। সে মাথা হেঁট করে সেখান থেকে চলে এসেছিল।

মশায় বলেছিলেন—তোমার সঙ্গে কথা আছে। বেরোনা কোথাও। সুরেন—তুমি যাও, তোমাকেও চাই। পাশের ঘরে অপেক্ষা কর।

পাশের ঘরে বসেই জীবন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনতে পেয়েছিলেন। ঠাকুর দাস মিশ্র আস্তে কথা বলতে জানতেন না, অন্যের কাছে আস্তে উত্তর শুনতেও পছন্দ করতেন না। জগৎ মশায়ের অনুরোধে দূতকে তিনি নির্যাতন করেন

নাই বটে তবে ধমক দিয়েছিলেন অনেক। প্রশ্নোত্তরের মধ্যে যে কথাগুলি প্রকাশ পেয়েছিল, কাহিনীর আকারে তা' হ'ল এই।

প্রতারণা নবকৃষ্ণ সিংহ ঠিক করেন নি।

করেছে মঞ্জরী, বঙ্কিম, আর ওদের মা।

জীবনের হাতে মুষ্ট্যাঘাত খেয়ে ভূপী বোস অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল; জ্ঞান হ'তেই সে প্রবল আস্ফালন চীৎকারে পাড়া গোল করে তুলেছিল। খুন করবে, সে খুন করবে বর্বর উল্লুককে, রোমশ কালো ভালুককে। তারপরই তার চোখ পড়েছিল মঞ্জরীদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ গিয়ে পড়ল তাদের উপর। বঙ্কিমকে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্জরীর সামনে হাত নেড়ে কুৎসিত মুখভঙ্গি করে বলেছিল—এ তোদের ষড়যন্ত্র। তোদের! ভাই বোন মা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছিলে আমাকে তাড়াতে! টাকার জন্যে ওই ভালুকটার সঙ্গে ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে বাধে না! ছি! ছি! ছি! তারপর সাড়ম্বরে পথে পথে চীৎকার ক'রে অপবাদ রটনা করে ফিরেছিল। কিছু দিন থেকেই তার সন্দেহ হয়েছিল মঞ্জরীরা জীবনকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। জীবনের খরচের বাহুল্য দেখে অনুমান করেছিল যে, প্রশ্রয় পেয়েই জীবন এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। সে এর প্রমাণ দিতে পারে। নইলে নাতনী দাদামশায় সম্পর্ক ধরে যে হাসিখুশি বক্র রসিকতার বাণযুদ্ধ চলছিল সে এমন সীমা ছাড়াত না। সম্পর্কটা প্রকাশ্য হলে মঞ্জরী তার কাছ থেকে দামী আতর গোপনে উপহার নিত না। আজ আলকাতরা মাখাতে যেত না। তাই সেদিন নাক ভেঙে রক্তমাখা মুখেই ওই কথা রটাতে রটাতে বাড়ি ফিরেছিল। এবং তার দল বল জড়ো ক'রে বোর্ডিং থেকে আরম্ভ ক'রে চারপাশ জীবনের খোঁজে প্রায় সমুদ্র মন্থন ক'রে ফেলেছিল।—খুন করবে—তাকে খুন করবে। তাকে না পেয়ে তার মুগুরটা কুড়ুল দিয়ে কেটে চেলা বানিয়ে তবে শান্ত হয়েছিল।

নবকৃষ্ণ সিং অথৈ সমুদ্রে পড়েছিলেন। কূল-কিনারা ছিল না। গোটা বাজারে ঐ ছাড়া কথা ছিল না। মা মঞ্জরীকে বলেছিলেন—মর-মর—তুই মর!

মঞ্জরী মরতে পারে নি কিন্তু শয্যা সত্যই পেতেছিল।

বঙ্কিম আস্ফালন করেছিল—আমিও বঙ্কিম সিংহী, আমি দেখে নোব।

বাপ তার গালে ঠাস ক'রে চড় মেরেছিলেন—হারামজাদা, তুই সব অনর্থের মূল। দুজনকেই তুই ঘরে এনেছিলি।

বঙ্কিম তাতেও দমে নি—সে আরও প্রবল আস্ফালন করে বলেছিল—খুন করব ওকে আমি।

নবকৃষ্ণ বাঁকা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কাকে? কাকে খুন করবি?

বঙ্কিম এর উত্তর দিতে পারে নি।

ও দিকে নিত্য নূতন রটনা রটাতে লাগল ভূপী বোস। কঠিন আক্রোশ তার তখন। শেষ পর্যন্ত নবকৃষ্ণ এই পত্র লিখলেন জগদ্বন্ধু মশায়কে এবং পত্রোত্তর পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। মঞ্জরীও উঠে বসেছিল। ভূপী বোসের নির্মম নিষ্ঠুর অপবাদ রটনায় লজ্জা তার হয়েছিল বই কি! দুঃখও হয়েছিল, বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেও ছিল। আঘাত যে নির্মম। কাঁদী শহরের চারিদিকে যে রটে গিয়েছিল এই কাহিনী। জগত মশায়ের পত্রে সে সব মুছে গেল। নবকৃষ্ণ মাথা তুললেন, সেই পত্র দেখিয়ে বেড়ালেন সকলকে। জগত মশায় লিখেছেন—'মা লক্ষ্মীকে সসম্মানে ঘরে আনিব ইহাতে আর কথা কি আছে!' মঞ্জরীও উঠে বসেছিল। ও দিকে ভূপী বোস গর্জাতে লাগল খাঁচার বাঘের মত। আর সে কি করতে পারে? তবুও নবকৃষ্ণ সিং সাবধানতা অবলম্বন করে কাঁদী থেকে দেশে এলেন। কাঁদীতে বিবাহ দিতে সাহস করলেন না। গ্রীষ্মের ছুটির কয়েকদিন পরই বিবাহের দিন। স্কুলে ছুটির জন্য দরখাস্ত পাঠালেন। দরখাস্ত নিয়ে গেল বঙ্কিম। সেখানে যে কি করে কি হ'ল—কেউ বলতে পারে না, তবে ভূপীর সঙ্গে বঙ্কিমের ছিন্ন প্রীতির সম্পর্ক গাঢ়তর হয়ে উঠল। বঙ্কিমই ফিরে এসে সব পণ্ড করে দিয়েছে।

লোকটি বললে—ওরারা জানতেন—পাত্র ডাক্তার হবে। কিন্তু জগত মশায় চিঠিতে লিখেছিলেন, ছেলে তাঁর ডাক্তারী পড়বে না; কবিরাজী

করবে; আমার কাছেই কবিরাজী শিখছে। এই শুনেই মায়ের মুখ বেঁকে গেল, কনের মুখে বোঝা নামল।

কিন্তু নবকৃষ্ণ সিংহ সেটা চাপা দিলেন, বললেন,—তাতে কি হয়েছে?

মঞ্জরীর মা বলেছিলেন—কোবরেজ? ছি! ছি! একালে কোবরেজের কি মান-সম্মান আছে? পয়সাই বা কোথা? তুমি বরং লিখে দাও ছেলেকে ডাক্তারী পড়াতে হবে।

ধমক দিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ সিং। বলেছিলেন—তাঁর ছেলেকে তিনি যদি ডাক্তারী না পড়ান? দায়টা আমাদের না তাঁদের?

মঞ্জরী না কি কেঁদেছিল গোপনে কিন্তু সে কথা মায়ের অগোচর ছিল না। তিনি আবারও বলেছিলেন—না-বাপু, একে তো ছেলের ওই দত্যির মত চেহারা, তার উপর কোবরেজ হলে খালি গায়ে বড় জোর পিরান চাদর গায়ে —না বাপু—।

নবকৃষ্ণ বলেছিলেন—খবরদার! সাবধান ক'রে দিচ্ছি আমি—এ বিয়ে ভেঙ্গে গেলে তোমার মেয়েকে আইবুড়ো হয়ে থাকতে হবে। ভূপী বোস কাল সাপের বাচ্চা—তার বিষে তোমার মেয়ের জীবন নীল হয়ে গিয়েছে। ও দেখে তোমার মেয়েকে নিতে পারে শুধু জগত মশায়। কবিরাজ বলে তাকে উপেক্ষা করতে চেয়ো না।

চুপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন মঞ্জরীর মা। কিন্তু গজ গজ তিনি করছিলেন।

এই অবস্থায় ভূপীর সঙ্গে আপোষ করে বঙ্কিম এল। ফলে আরও দুদিন প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল। তৃতীয় দিন রাত্রে নবকৃষ্ণ ঘুমিয়ে থাকলেন বাড়িতে, বঙ্কিমকে সঙ্গে নিয়ে মা এবং মঞ্জরী গরুর গাড়ি ভাড়া ক'রে এসে উঠল কাঁদীতে। পরের দিন ২৯শে বিবাহের দিন ছিল পাঁজিতে।

নবকৃষ্ণ সিংহ ছুটে গিয়েছিলেন বিবাহ বন্ধ করতে কিন্তু কিছু করতে পারেন নি।

তখন মঞ্জরী ভূপতির চাদরে নিজের অঞ্চল আবদ্ধ করে নবকৃষ্ণের বাসা-বাড়ি পিছনে রেখে ভূপীদের জীর্ণ পুরানো চকমিলান দালানে গিয়ে উঠেছে।

মঞ্জরীর মা ভূপতির বামপার্শ্বে মঞ্জরীকে দেখে আনন্দাশ্রু বিসর্জন ক'রে বলেছেন—দেখতো কি মানিয়েছে—এ যেন—মদন-মঞ্জরী!

ভূপতিদের বাড়িতে ওখানকার অভিজাত বংশীয়াদের সঙ্গে কুটম্বিনীর দাবিতে রহস্যালাপ করে এসেছেন। এক সঙ্গে দোতলার ঘরে বসে খেয়ে এসেছেন।

ঠাকুরদাস বলেছিলেন—চিটিং কেস কর তুমি, করতেই হবে।

জগদ্বন্ধু বলেছিলেন—তার আগে ভাল পাত্রীর সন্ধান কর। ওই এগারই তারিখে বিয়ে। সদ্বংশের সুন্দরী পাত্রী খুঁজে বের কর। বিয়ে হ'য়ে যাক—কেস-টেস তার পরে। আমোদ-আহ্লাদ খাওয়াদাওয়া সেরে হৃষ্টচিত্তে, সবল সুস্থ দেহে আদালতে হাজির হয়ে বলা যাবে—আমাদের ঠকাতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা ঠকি নি। ধারা-টারাগুলো বরং দেখে শুনে রেখো অবসর মত।

হা-হা ক'রে হেসে উঠেছিলেন মশায়।

সকলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল জগত মশায়ের মুখের দিকে। এই অপমানেও জগত মশায় হা-হা করে হাসছেন!

জগত মশায়ের সেই এক কথা—পাত্রী দেখ। বিয়ে এগারোই। একদিন পিছুবে না। সুরেন্দ্র তুমি সেতাব আমার সঙ্গে পাত্রী দেখতে যাবে। তোমরা পছন্দ করে ঘাড় নাড়লে আমি তবে হাঁ বলব। খোঁজ কর কোথায় আছে গরীবের ঘরের সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে! তবে বংশ সদ্বংশ হওয়া চাই!

সেতাব, সুরেন্দ্র, নেপাল এদের উৎসাহের আর সীমা ছিল না। উঠে-পড়ে লেগেছিল—পাত্রী খুঁজে বের করবেই। ভাল মানুষ সেতাব হেসে বলেছিল—এ সেই রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র সদাগরপুত্র কোটালপুত্রের গল্প-হল, হারা উদ্দেশে রাজকন্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ভাই জীবন তুই একটু হাস দেখি!

সেতাব চিঠি লিখেছিল তার মামার বাড়িতে। "সুন্দরী গুণবতী সদ্বংশের বয়স্থা কায়স্থ পাত্রী থাকিলে অবিলম্বে জানাইবেন। কোন পণ লাগিবে না। পাত্রের পিতা এখানকার নামকরা কবিরাজ জগত মশায়। খুব রোজগার। জমি পুকুর বাগান জমিদারী আছে। ছেলেও কবিরাজী শিখিতেছে।"

সুরেন্দ্র সত্যসত্যই চাল চিঁড়ে বেঁধে বেরিয়ে পড়ার মত বেরিয়ে পড়েছিল। জগত মশায়ের কাছে কয়েকটা টাকা চেয়ে নিয়ে বলেছিল—আমি একবার সদর শহরটা ঘুরে আসি। পসার নাই, গরীব উকীল মোক্তারের তো অভাব নাই। এদের মধ্যে কায়স্থও অনেক। বয়সওয়ালা আইবুড়ো মেয়ে এই সব জায়গাতে মিলবে।

জগত মশায় তাই পাঠিয়েছিলেন সুরেন্দ্রকে।

নেপালটা ছিল ছেলেবেলা থেকেই আধপাগলা। তার সন্ধানের ধারা ছিল বিচিত্র। তার বাবা ছিলেন সবরেজেস্ট্রী আপিসের মোহরার। নেপাল তখন বাপের সঙ্গে সবরেজেস্ট্রী আপিসে গিয়ে টাউটের কাজ করত। দলিল যাতে আগে রেজেস্ট্রী হয় তার ব্যবস্থা ক'রে দাখিল দিত, কাটাকুটি থাকলে কৈফিয়ৎ লিখে দিত, সনাক্তদার না-থাকলে সনাক্ত দিয়ে দিত। অর্থাৎ বলে দিত "এই ব্যক্তির নাম ধাম পিতার নাম যা বলিয়াছে তাহা সত্য—আমি শ্রীনেপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পিতা শ্রীবিনোদ লাল মুখোপাধ্যায় নিবাস নবগ্রাম—আমি ইহাকে জানি এবং চিনি।" তার তলায় সই মেরে দিত। ফি নিত দু আনা। নেপাল সবরেজেস্ট্রী আপিসের সামনে বটতলায় বসে জনে জনে জিজ্ঞাসা করত—বলি চাটুজ্জে মশায়, আপনার খোঁজে ভাল কায়স্থ পাত্রী আছে?

—ওহে—কি নাম তোমার? গোবিন্দ পাল? কায়স্থ পাত্রীর খোঁজ দিতে পার?

—কোথায় বাড়ি শেখজার?—আপনাদের গাঁয়ের কাছাকাছি কায়স্থ আছে? বেশ সুন্দরী ভাল বংশের কন্যে আছে? বলতে পার?

শুধু এই নয়, পথে ঘাটে পথিক পেলেই সে প্রশ্ন করত।—ভাল কন্যে আছে হে কায়স্থ বংশের? শেষ পর্যন্ত লাগল একদিন—ওদের জমির ভাগ-জোতদার নবীন বাগ্দীকে বলেছিল—খোঁজ করিস তো নবীন! ভালো কায়স্থ ঘরের বড়সড় মেয়ে।

নবীন যাচ্ছিল কাটোয়া—ভার বয়ে গঙ্গা জল আনবে। নেপাল বলেছিল—যাবি তো এতটা পথ। আসিস তো নবীন খোঁজ ক'রে!

* * * *

আজকের জীবন মশায় তখন শুধু জীবন ; বড় জোর জীবন দত্ত। সেদিন জীবনের পক্ষে এ আঘাত হয়েছিল মর্মান্তিক। কিন্তু ভেঙে পড়েন নাই। বরং ক্রোধে আক্রোশে বিবাহের জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। সে উৎসাহ অনেকের চোখে বেশী-বেশী মনে হয়েছিল। জীবন কিন্তু গ্রাহ্য করেন নাই। তরুণ জীবন সেদিন মনের ক্ষোভে উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিল।

আজ বৃদ্ধ জীবন মশায় হাসলেন। আজ তিনি দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের তরুণ জীবনের দিকে চেয়ে আছেন রসজ্ঞ দ্রষ্টার মত।

সাপের বিষে জর্জর মানুষের জিভে নিমের মত তেতোকে লাগে মিষ্টি। মিষ্ট রসকে মনে হয় তেতো।

নাঃ।

ভুল হল। বৃদ্ধ জীবন মশায় বার দুই ঘাড় নাড়লেন। না-না।

মঞ্জরী যে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তার সঙ্গে মঞ্জরীর প্রতি তাঁর ভালবাসার সম্পর্ক কি? ভালবাসার সঙ্গে কি কখনও সাপের বিষের তুলনা হয়? তিনি ক্ষোভে নিজে হাতে বিষের বাটি মুখে তুলে শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করেছিলেন।

ক্ষোভে আক্রোশে তরুণ জীবন দত্ত সেদিন দুটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

খুব সুন্দরী পত্নী ঘরে এনে সর্বোত্তম সুখে সুখী হবেন। ভালবাসবেন তাকে রামায়ণের কাহিনীর ইন্দুমতীকে অজরাজার ভালবাসার মত।

আর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—ডাক্তার তিনি হবেনই।

নাই বা পড়তে পেলেন মেডিকেল স্কুল বা কলেজে। ঘরে বসে তিনি পড়ে ডাক্তার হবেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল তাঁর চোখের সম্মুখে।

এ অঞ্চলের প্রথম বিখ্যাত ডাক্তার—রঙলাল মুখুজ্জে। নূতন দিনের সূর্যের মত তিনি তখন উঠছেন।

বিস্ময়কর মানুষ, বিস্ময়কর প্রতিভা, রোমাঞ্চকর সাধনা রঙলাল ডাক্তারের। তেমনি চিকিৎসা!

* * * *

গৌরবর্ণ মানুষ; সবল স্বাস্থ্য, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রঙলাল ডাক্তারকে এক শো জনের মধ্যে দেখবামাত্র চেনা যেত। চেহারাতেই যাঁরা প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়ে আসেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। এ সব মানুষ দুঃসাহসী হবেই। স্বল্পভাষী কিন্তু সেই অল্প কথাগুলিও ছিল রূঢ় ঠিক নয়, অতি দৃঢ়তায় কঠিন, সাধারণের কাছে রূঢ় বলে মনে হত। হুগলী জেলার এক গ্রামের সেকালের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। হুগলী ইস্কুলে এবং কলেজে এফ-এ পর্যন্ত পড়ে বাপের সঙ্গে মনান্তরের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কলেজে পড়বার সময় তিনি হুগলীর মিশনারীদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তাদের ওখানে যেতেন, তাদের সঙ্গে খেতেন। বাপের সঙ্গে মনান্তরের হেতু তাই।

বাপের মুখের উপরেই বলেছিলেন—জাত আমি মানি না। ধর্মকেও না। তাই ওদের ওখানে ওদের সঙ্গে খাওয়া আমি অপরাধ বলে মনে করি না। আর ধর্মই যখন মানি না তখন ধর্মান্তর গ্রহণের কথাই ওঠে না।

সেই দিনই গৃহত্যাগ ক'রে বেরিয়েছিলেন পদব্রজে, কপর্দকশূন্য অবস্থায়। এই জেলায় প্রথম এসে এক গ্রামে হয়েছিলেন পাঠশালার পণ্ডিত। পাঠশালার পণ্ডিত থেকে হয়েছিলেন ইস্কুল মাস্টার। এ জেলার এক রাজইস্কুলে শিক্ষকের পদ খালি আছে শুনে দরখাস্ত ক'রে চাকরী পেয়েছিলেন। এই চাকরী করতে করতেই হঠাৎ আকৃষ্ট হলেন চিকিৎসা-বিদ্যার দিকে। রাজাদের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে হয়েছিল বন্ধুত্ব। প্রায় যেতেন তাঁর কাছে। হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে রোগী দেখতেন। ডাক্তারের কাছে ডাক্তারী বই নিয়ে পড়তেন। ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করতেন—রাত্রির পর রাত্রি। এক একদিন সমস্ত রাত্রিব্যাপী আলোচনা চলত। আলোচনা থেকে তর্ক, তর্ক থেকে কলহ।

একদিন কলহ কি হয়েছিল কে জানে—সে কথা রঙলাল ডাক্তার কারও কাছে জীবনে প্রকাশ করেন নাই, ডাক্তারও করে নাই—তবে তার ফল হয়েছিল বন্ধুবিচ্ছেদ! কয়েকদিন পরেই হঠাৎ রঙলাল ডাক্তার মাস্টারী ছেড়ে তাঁর বইয়ের গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন এই অঞ্চলে। এখান থেকে ছ' মাইল দূরে ময়ূরাক্ষীর তীরে একটা বাঁকের উপর মুসলমানপ্রধান

লাল-মাটী গায়ে প্রথম রইলেন ঘর ভাড়া ক'রে। তারপর গ্রামপ্রান্তে নদীর প্রায় কিনারার উপর একখানি বাংলো বাড়ি তৈরী ক'রে বাস করলেন। সামনে বিস্তীর্ণ ময়ূরাক্ষীকে রেখে বারান্দার উপর বসে—দিন রাত্রি সাধনা শুরু করলেন। মধ্যে-মধ্যে রাত্রে বের হতেন পিশাচসাধকের মত। কাঁধে কোদাল নিয়ে, বেরিয়ে যেতেন আর নিয়ে যেতেন একটা চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ি। কবরস্থানের টাটকা কবরটি খুঁড়ে শব দেহ বের করে নিয়ে—আবার কবরটি পরিপাটি ক'রে বন্ধ ক'রে—শবদেহটা ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে টেনে আনতেন। তারপর দু একদিন রঙলাল ডাক্তারকে আর বাইরে দেখা যেত না। বাংলাটার পিছনে পাঁচোল ঘেরা বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে তিনি একটা কাচের ছাদ-ওয়ালা ঘর ক'রেছিলেন। সে ঘরে কারুর ঢুকবার অধিকার ছিল না। সেইখানে তিনি মড়া কেটে বই মিলিয়ে দেহতত্ত্ব শিখেছিলেন। কিছুদিন পরই জুটেছিল এক যোগ্য উত্তরসাধক। ময়ূরাক্ষীর ওপারের মনা হাড়ি। মনা হাড়ি ছিল ময়ূরাক্ষী ঘাটের খেয়া মাঝি আর একটা কাজ করত—সে ছিল শ্মশানের শ্মশান-বন্ধু;—দুর্দান্ত মাতাল, সব পরিচয়ের চেয়েও তার আর একটা বড় পরিচয় ছিল—লোকে বলত—মনা রাক্ষস। মনার ক্ষুধার কখনও তৃপ্তি হ'ত না। একবার এক হাঁড়ি ভাত নিঃশেষ করে মনা শ্মশানে এসে শ্মশানের অনতিদূরে একটা পাঁঠাকে দেখে আবার ক্ষুধার্ত হয়ে পাঁঠাটাকে ধ'রে ঘাড় মুচড়ে মেরে ওই চিতার আগুনেই সেটাকে পুড়িয়ে খেয়ে শেষ করেছিল। এই মনাই হ'ল রঙলাল ডাক্তারের প্রথম ভক্ত। বছর দুয়েক পর থেকে মনাই হয়েছিল তার পাচক। তার হাতেই তিনি খেতেন। এই মনাই তাঁকে শব সংগ্রহে সাহায্য করত। ময়ূরাক্ষীর জলে ভেসে-যাওয়া শব তুলে এনে দিত। অনেক সময় শ্মশানে পরিত্যক্ত শব এনে দিত। এই ভাবে বৎসর পাঁচেক সাধনার পর রঙলাল ডাক্তার একদিন ঘোষণা ক'রে বসলেন—আমি ডাক্তার। যে রোগ এখানে কেউ সারাতে পারবে না, সেই রোগী আমার কাছে নিয়ে এস। আমি ভাল করে দেব।

কিছুদিনের মধ্যেই এই ঘোষণাকে তিনি সত্য বলে প্রমাণিত করলেন। লোকে বিস্মিত হয়ে গেল তাঁর প্রতিভায়। বললে—ধন্বন্তরী। ডাক্তার পাল্কী কিনলেন কলে যাওয়ার জন্য।

মনা বললে—উঁহু! একটা ঘোড়া কিনে ফেল বাবা। মানুষের পায়ে আর ঘোড়ার পায়ে।

রঙলাল বললেন—দূর বেটা! মানুষের কাঁধে আর ঘোড়ার পিঠে? মানুষের কাঁধে আরাম কত?

—আজ্ঞে?

—সে তুই বুঝবি না রে বেটা! ঘোড়ায় চড়ে পড়ে হাড়গোড় ভাঙব?

* * *

জীবন দত্ত সেদিন আকাশকুসুম কল্পনা করে নাই। তার আদর্শ ছিল বাস্তব এবং সজীব। ডাক্তার হয়ে প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে সোনার গহনায়, সুন্দরী স্ত্রীকে সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে একদিন তার কাঁদী যাবার ইচ্ছা ছিল। সে যাবে বড় সাদা ঘোড়ায় চেপে, স্ত্রী যাবে কিংখাবে মোড়া পাল্কীতে।

ইচ্ছা ছিল খাগড়া ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে মুরশিদাবাদ যাবার অছিলায় পথে কাঁদীতে ভূপীবোসের ফাটল-ধরা বাড়ীর দরজায় ঘোড়াটার রাশ টেনে দাঁড় করিয়ে বলবে আজকে রাত্রির মত একটু বিশ্রামের স্থান হবে কি?

স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবে অন্দরে। মঞ্জরীর কাছে।

সে গিয়ে বলবে—আজ রাত্রির মত থাকতে আমাদের একটু জায়গা দেবেন? আপনি তো আমাদের আপনার লোক। সম্বন্ধটা সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো বউয়ের বোনঝি জামাইয়ের মত হলেও সম্বন্ধ তো বটে!

তারপর যা হবার আপনি হবে।

বিবাহের পর কিন্তু সব যেন বিপরীত হয়ে গেল। জীবন দত্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সেদিন, কেন এমন হল?

(বার)

সেদিন আশ্চর্য মনে হয়েছিল—আজ কিন্তু আশ্চর্য মনে হয় না।

বিবাহের পূর্বে জীবনের যে উচ্ছ্বাস শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর সমুদ্রের মত ফুলে ফেঁপে উঠেছিল বিবাহের দিনেই সেই উচ্ছ্বাস স্তিমিত নিরুৎসব বিষণ্ণ

হয়ে গেল প্রতিপদ-দ্বিতীয়ার ভাটার সমুদ্রের মত। জীবনে পূর্ণিমা তিথিটা যেন এলই না কোনদিন। অমাবস্যাই কি এসেছে? না, তাও আসে নাই আজও। একমাত্র সন্তান বনবিহারীর মৃত্যুতেও না।

এগারো আমাঢ়েই বিবাহ হয়েছিল। কন্যার এদেশে অভাব হয় না। কন্যা এ দেশে দায়ের সামিল। যা দায় তাই দুর্বহ বোঝা। সবল মানুষ বোঝা বইতে পারে, দুর্বল মানুষ বোঝা নামাতে গিয়ে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সংসারে দুর্বলের সংখ্যাই তো বেশী!

দশটি কন্যার খোঁজ এসেছিল। ছ'টি কন্যাকে পরিচয় শুনেই নাকচ করেছিলেন জগত মশায়। চারটি কন্যা চাক্ষুষ ক'রে সদর শহরের এক বৃদ্ধ মোক্তারের পিতৃমাতৃহীনা ভাগ্নীকে পছন্দ করলেন। পণ হরিতকী। মেয়েটির নাম কৃষ্ণভামিনী। মেয়েটি তখনকার দিনে অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছিল। চৌদ্দ বছর উত্তীর্ণ হয়ে মাস দুয়েক পরেই পনেরোয় পড়বে। এ মেয়ের সন্ধান এনেছিল সুরেন্দ্র।

বাইরে ঘরে উৎসব সমারোহের কোন ত্রুটি ছিল না। জগত মশায়ের তখন কবিরাজ হিসেবে খ্যাতিতে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যাকে বলে একই আকাশে চন্দ্র সূর্যের একসঙ্গে উদয়। জীবন তাঁর একমাত্র সন্তান, তার উপর এই বিচিত্র অবস্থায় বিবাহ। কাঁদীতে মঞ্জরী এবং ভূপী বোসের বিবাহ হয়েছিল যত চুপিচুপি এখানে জীবনের সঙ্গে কৃষ্ণভামিনীর বিবাহ তত উচ্চ সমারোহে নহবৎ থেকে ঢোল বাঁশী এমন কি ব্যাণ্ড বাজনা বাজিয়ে হয়ে গেল। ওই ব্যাণ্ড বাজনা আনা হয়েছিল কাঁদী থেকে। রাঢ় অঞ্চলে প্রথম ব্যাণ্ড বাজনা হয়েছিল মুরশিদাবাদে, তারপর কাঁদীতে। নবগ্রাম থেকে কাঁদী দশক্রোশ পথ; এখানকার বাজনার শব্দ দশক্রোশ অর্থাৎ বিশ মাইল অতিক্রম ক'রে সেখানে নবদম্পতীর নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটালেও বাজনাদারদের মারফৎ খবরটা পৌঁছুবার কথা। এই এত সমারোহের মধ্যেও পাত্র জীবন যখন কন্যার বাড়ীতে পৌঁছুল তখন সে ম্লান স্তিমিত হয়ে গেছে। বাসরে গিয়ে জীবন অবসন্ন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল, হাত জোড় ক'রে বললে—আমাকে মাফ্ করবেন, আমার শরীরটা বড় খারাপ করছে।

তবুও অবশ্য ছাড়ে নি মেয়েরা। গানও গাইতে হয়েছিল, সেকালের নিয়ম অনুযায়ী কৃষ্ণভামিনীকে কোলে বসাতেও হয়েছিল। কৃষ্ণভামিনীর রং ছিল পাকা সোনার মত। মুখশ্রী কোমল এবং স্নিগ্ধ হলে তাকে ডাকসাইটে সুন্দরী বলা যেত।

তের বছরের কৃষ্ণভামিনী যেদিন বধূবেশে মশায়দের ঘরে পদার্পণ করেন, সেই দিনই তাঁর নামকরণ হয়েছিল আতর বউ। কৃষ্ণভামিনীর রঙ দেখে লোকের চোখ ঝলসে গিয়েছিল। নামকরণ ক'রে জীবনের পিসীমা বলেছিলেন—তোমার স্বভাবের সৌরভে ঘর ভরে উঠুক।

ফুলশয্যার রাত্রিও কেটেছিল একটি প্রচ্ছন্ন উদাসীনতার মধ্যে। জীবন হেসেছিল, ঠাকুমা বউদিদিদের পরিহাস রসিকতায় যোগও দিয়েছিল কিন্তু সে যেন প্রাণহীন পুতুলনাচের পুতুলের মত। আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে পড়ছে শোধ নেওয়ার আনন্দ কেমন যেন নিভানো প্রদীপের মত কালো হয়ে গিয়েছিল। নিগূঢ় একটা বেদনা তাকে যেন অভিভূত করতে চেয়েছিল।

ভালবাসার অপমানের বেদনা এমনিই বটে।

এ সংসারে অপমান মাত্রেরই গ্লানি মর্মদাহী, কিন্তু সে মর্মদাহ প্রতিশোধের উল্লাসে মুছে যায়; তাই অপমান যার হয় সে স্বাভাবিক নিয়মে দুরন্ত ক্ষোভে জ্বলে উঠে প্রতিশোধ নিতেই ছুটে যায়; তৃষ্ণার্ত মানুষের জলের সন্ধানে ছুটে যাওয়ার মত। তার অন্তরে জ্বলে ওঠে যে আগুন সেই আগুনে প্রতিপক্ষকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে শান্ত হয়, তা' না পারলে সেই আগুনে নিজেই তিলে তিলে পুড়ে ছাই হয়। বড় মানুষ যাঁরা, মহৎ যাঁরা, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা অপমানের গ্লানিকে ক্ষমার প্রসন্নতায় উত্তাপকে পরিণত করেন বর্ষণে; শান্তিবারি অভিসিঞ্চনে আগুনের কুণ্ডকে নিভিয়ে ফেলেন। কিন্তু ভালবাসার ধারা বিচিত্র। ভালবাসার অপমানের গ্লানি প্রতিশোধের উল্লাসে মুছে যায় না, বরং গ্লানির দুঃখকে বাড়িয়ে তোলে; বেদনা অনাসক্তির আকারে এসে জীবনকে করে তোলে বৈরাগী। তাতেও অশান্তি যায় না। ভালবাসায় দুঃখ দিয়ে সুখ নাই, দুঃখ পেয়ে সুখ; আঘাত দিলে সেই আঘাতই ফিরে এসে বাজে শতগুণ হয়ে; সহ্য করলে বেদনার মধ্যেও সান্ত্বনা থাকে।

জীবন ডাক্তারের অশান্তি সহস্র গুণ। তাঁর আঘাত মঞ্জরীর চৌচির-হয়ে-ফাটা দেউড়ী পর্যন্তও পৌঁছুল না কোন দিন। যে সাপকে তিনি আঘাত দিয়ে ছেড়ে দিলেন শত্রুর উদ্দেশে সেই সাপ শত্রুর নাগাল না পেয়ে ফিরে এসে দংশন করলে তাঁকেই।

জীবন ডাক্তারের প্রচ্ছন্ন বেদনা সংসারে সকলের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকলেও নতুন বধূটির অগোচর রইল না। শুধু অগোচর রইল না তাই নয় বধূটিকেও আক্রমণ করলে সংক্রামক ব্যাধির মত। ফুলশয্যার রাত্রেই জীবন দত্তের মনের বেদনা নতুন বউয়ের মনে আঘাত করে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল।

ফুলশয্যার শেষ রাত্রে জীবন বধূকে আকর্ষণ করেছিল—নিজের বুকের কাছে। বধূটি তিক্ত কঠিন স্বরে বলে উঠেছিল—আঃ, ছাড়!

—কেন? কি হ'ল?

—কি হবে? ভাল লাগে না।

—ভাল লাগে না?

—না। ছেড়ে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। ছেড়ে দাও।

—কি হ'ল?

—কি হবে? আমাকে দয়া ক'রে বিয়ে ক'রেছ, উদ্ধার করেছ। দাসী হয়ে এসেছি—দাসীর মত খাটব। দু মুঠো খাব। আদর তো আমার পাওনা নয়। ছেড়ে দাও আমাকে।

আজও চলছে ওই ধারায়।

আতর বউ আজ আগ্নেয়গিরি; অগ্ন্যুদ্গার আরম্ভ হ'লে থামে না।

আতর বউয়ের দোষ কি? আতর বউয়ের বুকে আগুন লেগেছে তাঁরই বুকের আগুনের সংস্পর্শে।

* *

তবু এরই মধ্যে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ একটি সংসার।

ওই যে আতর বউ বলে—কত নাম-ডাক ছিল—দুহাতে রোজগার করেছ, চার হাতে খরচ করেছ—এর অর্থই তো হ'ল যশ-প্রতিষ্ঠা অর্থ-সম্পদ। সাধারণ মানুষের এ ছাড়া আর কি চাই?

আরও হয়েছিল—তিন কন্যা এক পুত্র। সুরমা-সুষমা-সরমা। ছেলে বনবিহারী। তারা পেয়েছিল মায়ের বর্ণচ্ছটা, বাপের স্বাস্থ্য।

খ্যাতি প্রতিষ্ঠাও তাঁর কম হয় নি এক কালে; কিন্তু সে খ্যাতি সেই আকাঙ্ক্ষার কাছে সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদতুলা না হলেও দিগন্ত-জোড়া বিলের তুলনায় বড় জোর কোন শৌখীন মধ্যবিত্তের ছোটখাটো পরিচ্ছন্ন একটি শখের পুষ্করিণী! যার বাঁধানো ঘাট আছে, জলে মাছ আছে, নামেও যে পুষ্করিণীটি কর্তার অভিপ্রায় অনুযায়ী শ্যামসায়র বা শ্যামসরোবর। জলও তার নির্মল ছিল, তপ্ত গ্রামবাসীরা তাতে অবগাহন করে তৃপ্তও হয়েছে। তৃষ্ণার্তেরা তার জল পান করে শ্যামসায়রের অধিকারীকে মুক্তপ্রাণে আশীর্বাদও করেছে। কিন্তু দিগন্ত-বিস্তৃত বিলের তুলনায় সে কতটুকু, কত অকিঞ্চিৎকর—তা সেই অধিকারীই জানে—যে ওই বিলের মতই একটি বিল কাটাতে চেয়েছিল। যার কল্পনা ছিল ওই বিলের ঘাটে এসে ভিড়বে কত দেশ দেশান্তরের বড় বড় বজরা—নৌকা ছিপ!

আজ এই পরিণত বয়সে জীবনের সকল মোহই কেটে গেছে। লাল নীল সবুজ বেগুনে—সাত রঙের ইন্দ্রধনু তিনি আর দেখতে পান না। আজ চোখের সামনে মাত্র দুটি রঙ আছে। একটি সাদা আর অন্যটি কালো। আলো আর অন্ধকার। তাই আশ্চর্য হয়ে ভাবেন—সেদিন কি করে জেগেছিল ইন্দ্রধনুর মত এমন বর্ণ-বৈচিত্র্যময় আকাঙ্ক্ষা।

এ প্রশ্ন মনে উঠতেই জীবন দত্ত হাসেন। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন—কেন? বারবার এ প্রশ্ন মনে ওঠে কেন তোমার? এ প্রশ্ন উঠবার তো কথা নয়।

দুটি রঙ—দিন ও রাত্রির সাদা ও কালো রঙ দুটি ছাড়া বাকী রঙগুলি তুমি নিজেই তো ধুয়ে মুছে দিয়েছ নিজের হাতে। অক্ষম লোকের রঙগুলি ধুয়ে যায় ব্যর্থতায়, বেদনার চোখের জলে। তুমি ধুয়ে মুছে দিয়েছ মিথ্যা ব'লে; তোমার মহাগুরু জগত মশায়ের শিক্ষার কথা ভুলে যাও কেন? তাঁর শিক্ষার মধ্যে তো নিজেকে সেদিন ডুবিয়ে দিয়েছিলে তুমি।

নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করে নিয়ে ঘাড় নাড়লেন জীবন মশায়। বারবার দাড়ীতে হাত বুলালেন। ঠিক! ঠিক!

হঠাৎ একটা আলোর ছটা এসে চোখে বাজল। উঃ—সন্ধ্যা হয়ে গেছে। খেয়াল ছিল না। পুরানো কথা মনে করতে গিয়ে বর্তমানের কথা ভুলেই গিয়েছেন তিনি। বাঁ হাতে হুঁকোটা ধরাই আছে। একবারের বেশী আজ তামাকই খাওয়া হয় নাই। আলোটা আসছে ভিতর বাড়ী থেকে, হয় ইন্দির নয় নন্দ আলো নিয়ে আসছে। কিন্তু—। না-তো। পায়ের দিকে কাপড়ের ঘের দেখে মনে হচ্ছে—মেয়ে-ছেলে। আতর বউ আসছে। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন জীবন মশায়। অসময়ে আতর বউয়ের আসাটা তাঁর কাছে শঙ্কার কারণ।

আতর বউই বটে। আলোটা সামনে নামিয়ে দিয়ে আতর বউ কাছে দাঁড়ালেন। দীর্ঘাঙ্গী গৌরবর্ণা আতর বউ, কপালে সিন্দুরের টিপটি আজও পরেন, সিঁথীতে সিন্দুর ডগ-ডগ করে। কঠোরভাষিণী আতর বউ সুযোগ পেলে বোধ করি একটা রাজ্যশাসন করতে পারতো। জীবন মশায় এ-কথা অনেকবার বলেছেন রসিকতা ক'রে। আতর বউ উত্তর দিয়েছেন—একটা মানুষকেই আনতে পারলাম না হাতের মুঠোয়, তো একটা রাজ্য! হায়, হায়, হায়! আতর বউ এই উত্তর দিয়ে চিরকাল এক বিচিত্র হাসি হাসেন।

—কি খবর? মুখ তুলে বললেন জীবন মশায়। ওই কথাটা আজ তিনি উঠতেই দেবেন না। আতর বউয়ের মুখখানি বড় মধুর লাগছে আজ। মমতায় ভিজে বর্ষার ধরিত্রীর মত কোমল। এরই মধ্যে ওই কথা তুলে অনাবৃষ্টি বর্ষার পৃথিবীর মত তাকে কঠোর ক'রে তুলবেন না।

আতর বউও ঈষৎ উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—তুমি আজ চা খাও নি?

—ভুলে গিয়েছি।

—ভুলে গিয়েছ? হাসলেন আতর বউ।—চা খেতে ভুলে যায় মানুষ। নন্দ ছোঁড়া গিয়ে বললে—তামাক পর্যন্ত খাও নি। এসে ডেকেছে, সাড়া দাও নি! শরীর ভাল আছে তো? না—মন ভাল নাই? কি হ'ল তোমার?

অপ্রতিভের মত হেসে জীবন মশায় বললেন—হয় নি কিছু। এমনি ভাবছিলাম। নবগ্রামে রতন মাস্টারের ছেলেকে দেখে এলাম; পথে

নিশিঠাকরুণ ধরেছিল—ডেকে দেখালে তার ভাইঝিকে। রতন ডাক্তারের ছেলের রোগ খুবই কঠিন, তবে জোর ক'রে কিছু বলা যায় না। কিন্তু এই মেয়েটি—এর আর—।

ঘাড় নাড়লেন ডাক্তার। আবার বললেন—এই কচি মেয়ে—বড় জোর পনের বছর বয়স—এরই মধ্যে দু'টি সন্তান হয়েছে। নিশি দেখিয়ে বললে—চাঁদের মত ছেলে। আমি দেখলাম চাঁদ নয়, যম। মাকে খেতে এসেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

—নিশিকে তাই বলে এলে নাকি? শিউরে উঠলেন আতর বউ।

—না। তবে নিশির বোঝা উচিত। বলেছি জলবারণ খেতে হবে। এ ছাড়া ওষুধ নাই। কে? আতর বউয়ের পিছনে কেউ এসে দাঁড়াল। ও—ইন্দির!

—হ্যাঁ। ওকে চা ক'রতে বলে আমি চলে এসেছিলাম। নাও চা খাও! ভাল মানুষ তুমি। চা-যে চা, নেশার জিনিস—তা না-খেলে তোমার কষ্ট হয় না! তামাক খেতে ভুলে যাও?

ইন্দির চায়ের পাথরের গেলাসটি এগিয়ে দিল। আতর বউ বললেন—তুমি খাও, আমি দাঁড়িয়ে আছি। গেলাস আমি হাতে ক'রে নিয়ে যাব। ইন্দিরের হাতে শনি আছে, ছ মাসে তিনটে পাথরের গেলাস ভাঙলে। ইন্দির, তাকের ওপর বড় এলাচ গুঁড়ো করা আছে, নিয়ে আয়।

ইন্দির চলে যেতেই আতর বউ বললেন—তুমি আমাকে লুকোলে। ওই হাসপাতালের ডাক্তারের কথায় তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ। নতুন কালের ছেলে মানুষ ডাক্তার, অহঙ্কার অনেক। কাকে কি ব'লেছে জানে না। আমি তো জানি তোমার নিদান মিথ্যে হয় না। মতির মা যখন মরবে তখন বুঝতে পারবে ছোকরা ডাক্তার। আমিও তোমাকে ওবেলা কতকগুলো খারাপ কথা বললাম। মুখ পোড়া শশী, যে এইখানে হাত দেখা শিখলে, কম্পাউণ্ডারী শিখলে সে এসে বলে কিনা, হাত পা ভাঙ্গাতে নিদান হাঁকা তো শুনি নি, বুঝিও না। ও যে কেন মশায় বলতে গেলেন কে জানে? শশীর মুখে এই কথা শুনে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি তাকে বলেছি, এ কথা তুই কোন মুখে বললি শশী? বলতে লজ্জা লাগল না? কলিকাল নইলে তোর জিভ খসে যেত। আমি বলেছি।

জীবন ডাক্তার হাসলেন। কিন্তু কথার কোন উত্তর দিলেন না শশীর উপর আজ অত্যন্ত চটেছে আতর বউ।

আতর বউ প্রতীক্ষা করলেন ডাক্তারের উত্তরের, উত্তর না পেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু ভাল দেখতে পেলেন না স্বামীর মুখ। শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি—তিন পাশে অনেকখানি খোলা জায়গার মধ্যে বারান্দাটির উপর একটি পুরানো লণ্ঠন যেটুকু আলোকচ্ছটা বিস্তার করেছিল সে নিতান্তই অপর্যাপ্ত। তার উপর আতর বউয়ের দৃষ্টি বার্ধক্য-ম্লান। হাত বাড়িয়ে আলোটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। তারপর ঝুঁকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রুষ্ট স্বরেই বলে উঠলেন—হাসছ তুমি? তোমার কি গণ্ডারের চামড়া? হাসি দেখে অকস্মাৎ চটে উঠলেন আতর বউ।

ডাক্তার কিন্তু আরও একটু হেসে বললেন—তা ছাড়া করব কি বল? কাঁদব?

—কাঁদবে? তুমি? চোখে জল তো বিধাতা তোমাকে দেয় নাই। কি ক'রে কাঁদবে তুমি? যে মানুষ নিজের ছেলের নিদান হাঁকে; মরণের সময় বাইরে ব'সে থাকে, বলে কি দেখব? ও আমি ছ মাস আগে দেখে রেখেছি—

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন—থাম, আতর বউ থাম। তোমাকে মিনতি করছি। থাম তুমি। আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও। রতনবাবুর ছেলেকে দেখে এসেছি, আমাকে একটু ভাবতে দাও। বুঝতে দাও।

আতর বউ যেন ছিটকে উঠে পড়লেন ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত, বললেন—অন্যায় হয়েছে। আমার অন্যায় হয়েছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসাই আমার অন্যায় হয়েছে। আমার অধিকার কি? আমাকে এনেছিলে তোমরা দয়া ক'রে, মামার বাড়ীর বাপ-মা মরা ভাগ্নী বিনা পণে দয়া করে ঘরে এনেছিলে—দাসী বাঁদীর মত খাটাতে—আমার সেই অধিকার ছাড়া আর কোন অধিকার তো নাই। একশোবার অন্যায় করেছি, হাজারবার। মাফ করো আমাকে।

উঠে চলে গেলেন তিনি অন্ধকারের মধ্যেই।

এই তো আতর বউ! চিরকালের সেই আতর বউ! হাসলেন ডাক্তার। কিন্তু সে হাসি অর্ধপথেই একটা বিচিত্র শব্দে বাধা পেয়ে থেমে গেল। সঙ্গে

সঙ্গে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল স্থানটা। ডাক্তার এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। আতর বউ লণ্ঠনটার শিখা বাড়িয়ে দিয়েছিল—বোধ হয় মাত্রা অনেক পরিমাণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কথাবার্তার উত্তেজনার মধ্যে কেউই লক্ষ্য করেন নি। সশব্দে লণ্ঠনের কাচটা ফাটিয়ে দপ ক'রে নিভে গেল আলোটা।

* * * *

সশব্দ হাসিও হঠাৎ থেমে গেল তাঁর। মনের ছিন্ন চিন্তা আবার জোড়া লাগল। আতর বউ বলে গেল—বিধাতা তাঁকে চোখের জল দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান নি। কথাটা মনে হতেই, হাসি থেমে গেল তাঁর।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার মনে মনেই বললেন—পাঠিয়েছিলেন, অনেক, অজস্র—তুমি অনুমান করতে পার না আতর বউ, সমুদ্রের মত এত অথৈ লবণাক্ত চোখের জল ভগবান তাঁকে দিয়েছিলেন। তার সংবাদ তুমি জান না। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞানযোগ অগস্ত্য ঋষির মত গণ্ডূষে সে-সমুদ্র পান করে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছে। শুষ্ক সমুদ্রগর্ভের মত অন্তর এখন বালুময় প্রান্তর। অনেক প্রবাল অনেক মণি-মাণিক্য হয় তো আছে; কিন্তু তার সর্বাঙ্গে আছে চোখের জলের লবণাক্ত স্বাদ। তুমি তো কোনদিন সে বুঝলে না, বুঝতে চাইলে না। তুমি, মঞ্জরী—তোমরা দুজনেই যে মৃত্যু; অমৃত তো তোমরা চাও নি কোন দিন। চাইলে—তাঁর আছে আসতে, বুঝতে পারতে। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জীবন ডাক্তার।

মঞ্জরী আতর বউকেই বা শুধু দোষ দিচ্ছেন কেন তিনি? তাঁর নিজের কথা? তিনি নিজে? নিজেই কি তিনি জীবনে অমৃত পেয়েছেন ব'লে অনুভব করেছেন কোনদিন? এ কথা অন্য কেউ জানে না, জানতেন দুজন, তাঁরা আজ নাই। একজন তাঁর বাবা, প্রথম শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু।

জগত মশায় জানতেন তাঁর এ অতৃপ্তির কথা। অমৃত অপ্রাপ্তিই হ'ল অতৃপ্তি। মৃত্যুকালে জগত মশায় একথা তাঁকে ডেকে বলেছিলেন। জীবনকে চিকিৎসা শাস্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আরও দশবৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন। জ্ঞানগঙ্গা গিয়ে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেছিলেন তিনি। জীবনের মা তখন গত হয়েছেন। মাও খানিকটা জানতেন। কিন্তু তিনি এ অতৃপ্তির হেতু সন্ধান

করেছিলেন একেবারে বাস্তব সংসারে। বাবার মত গভীর ভাবে এটাকে সন্ধান করেন নাই।

মা যা বুঝেছিলেন—সে একেবারে গোড়া থেকেই বুঝেছিলেন। বিবাহের পর থেকেই তিনি বধূ কৃষ্ণভামিনীকে ছেলের জীবনের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, মিলিয়ে দুজনকে এক ক'রে দিতে চেয়েছিলেন।

বিবাহের পর জীবন আয়ুর্বেদ শিক্ষায় মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিল। যে পড়াশুনা তার ইস্কুল জীবনে ভাল লাগে নাই সেই পড়াশুনায় যেন ডুবে গেল। জগৎমশায় নিজেও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। জীবন নিজেও কম বিস্মিত হয় নাই। জগতমশায় বলতেন—ইস্কুলে পড়াশুনার রকমসকম দেখে ভাবতাম জীবনের বুদ্ধি বোধ হয় মোটা। কিন্তু আয়ুর্বেদে দেখছি ওর বুদ্ধি ক্ষুরধার!

জীবন নিজেও ভাবত তাই।

ঠাকুরদাস মিশ্র মশায় বলতেন—ওহে ওটা যে ওর রক্তে রয়েছে। বংশগত বিদ্যেতে তাই হয়। আমার ওই হারামজাদা বেটাটার বিবরণ জান?

অর্থাৎ সুরেন্দ্রের। উচ্ছ্বাস ভরে বলেই গেলেন ঠাকুরদাস মিশ্র।

—হারামজাদা বেটা মদ ধরেছে তা তো জান। লেখাপড়াও ছেড়েছে অনেক দিন। ভেবেছিলাম ও বেটাকে আর জমিদারী সেরেস্তার কাজে লাগাব না। পুজো-আর্চার মন্তরগুলো মুখস্থ করিয়ে বেটাকে লাট দেবগ্রামের বিশ্বেশ্বরী মায়ের পুজারী ক'রে দেব। ওখানকার পুজারী বেটার বংশ নাই। পুজারীই সেবায়েত, পনের বিঘে জমি আছে চাকরাণ, তা ছাড়া বিশ্বেশ্বরী হল রেশমের পলু পোকা চাষের 'রাখে হরি মারে কে'র মত দেবতা! বিশ্বেশ্বরীর পুজো না দিয়ে পুষ্প না নিয়ে ও চাষই হয় না। পাওনা অঢেল। তা কিছুতেই না। ও বলে—ও মন্তর আমার মুখস্থ হবে না। তারপর ব্যাপার শোন—বেটা সে দিন দশবছর আগের এক জমাওয়াশীল বাকী নিয়ে এসে আমাকে দেখিয়ে বলে—এটাতে যে ভুল রয়েছে। শোন কথা! ভুল অবিশ্যি আমি জানি—ও ভুল আমারই কলমের ডগায় পুকুর লোপাট। কিন্তু দশ বছরের মধ্যে কেউ ধরতে পারেনি। জমিদারের ঘরে আর ধরাও পড়বে না। কিন্তু বেটার বিদ্যে দেখ। গোপনে গোপনে পুরানো কাগজ দেখে

হিসেব বুঝেছে, বাপের ভুল ধরেছে। আমি তো বেটার মাথায় চড় মেরে বললাম, চুপরে বেটা চুপ !

জগত মশায় এবং ঠাকুরদাস মিশ্র বাল্যবন্ধু, বাল্যবন্ধু কেন শৈশবকাল থেকেই এক সঙ্গে খেলা করেছেন একসঙ্গে হাতে খড়ি নিয়েছেন, বাড়ী পাশাপাশি, দুই পরিবারের মধ্যে অন্তরঙ্গতাও গভীর। তবুও বংশগত পেশার পার্থক্যে দুই পরিবারের ধ্যান ধারণা আচার-আচরণ বাকভঙ্গি সবই ছিল আলাদা। তার উপর দুই পরিবারের একের সাধনার গতি উর্ধ্বমুখে, অন্যটি তখন পড়ছে। দীনবন্ধু মশায়ের কালে যে সাধনার সুরু সে সাধনা জগত মশায়ের আমলে গভীর এবং বিশাল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ কুলের মিশ্র পরিবারের জ্ঞান-হোমের সমিধ ফুরিয়েছে, কোন রকমে অশুদ্ধ উচ্চারণে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে যজমান ঠকিয়ে চালকলা ও কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য সংগ্রহ ক'রেই পরিতৃপ্ত। তারপর পুঁথির রাশি ভাঙা পেটরায় বোঝাই ক'রে গোয়াল ঘরের মাচায় তুলে শুভঙ্করী এবং জমাওয়াশীলের হিসেবের পথে জমিদার নন্দন এবং হতভাগ্য চাষী প্রজাকে ঠকিয়ে শুধু তাদের পথ প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর করার নেশায় মেতেই উঠল না—জমিদার প্রজা দুই কুলকে ঠকিয়ে এবং খেয়ে যে আনন্দের স্বাদ পেলে তাতেও মশগুল হয়ে উঠল। কাজেই দুই বন্ধুর বাক্যে উপলব্ধিতে অনেক পার্থক্য। ঠাকুরদাস মিশ্র পুত্রগৌরবে যে ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন জগত মশায় তা' হন নি। ঠাকুরদাস আঘাত পেতে পারে বলে শুধু একটু হেসেছিলেন, বাধাও দেন নি। শুধু একটু হেসেছিলেন। জগদ্বন্ধু ছিলেন জ্ঞানযোগী। সেই বাপের ছেলে এবং তাঁরই শিষ্য হয়েও আসল বস্তুটি তিনি আয়ত্ত করতে পারলেন না। বাবা বলেছিলেন—আয়ুর্বেদে তাঁর বুদ্ধি ক্ষুরধার।

বুদ্ধি তাঁর ক্ষুরধার ছিল, রোগ উপসর্গ এমন কি রোগ ও উপসর্গের পশ্চাতে অন্ধ বধির পিঙ্গলকেশী মৃত্যু তার হিমশীতল হাত দুখানি জীবনকে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছে কি হয় নি তাও তিনি অনুমান করতে পারতেন। আজ তুমি তরুণ ডাক্তার জীবন ডাক্তারকে উপহাস করেছ, তিরস্কার করেছ, নূতন কালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অহঙ্কারে তাকে অবহেলা করেছ। কর, কিন্তু সেকালে কেউ সাহস করত না।

স্মৃতি স্মরণ করতে করতে জীবন মশায় যেন বহু বৎসরের স্থবির অজগরের মত ফুলে উঠলেন; একটা তরুণ বিষধর তার তারুণ্যের ক্ষিপ্রগামিতা আর বিষদন্তের তীক্ষ্ণতার অহঙ্কারে ছোবলের পর ছোবল মেরে গেল; বার্ধক্যের জীর্ণতায় তাঁর বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছে, স্থবিরতায় তাঁর বিপুল দেহে গতিবেগ মন্থর হয়েছে; অগত্যা তাঁকে সহ্য করতে হল।

নারায়ণ, নারায়ণ! পরমানন্দ মাধব হে!

বেশ স্ফুট স্বরেই উচ্চারণ করলেন জীবন ডাক্তার।

মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে জগদ্বন্ধু মশায় তাঁকে বলেছিলেন—জীবন, বল আমাকে যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে?

জীবন মশায় নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারেন নি, রুদ্ধ আবেগ চোখের জলের ধারায় পথ ক'রে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। মুখে বলতে কিছু পারেন নি।

জগত মশায় বলেছিলেন—তুমি কাঁদছ? তোমার দীক্ষা আয়ুর্বেদে। জীবন এবং মৃত্যুর তথ্য তো তুমি জান; রোগের পশ্চাতে মৃত্যুর আগমন বার্তা শুনবার শক্তি তুমি আয়ত্ত করেছ। তবু তুমি কাঁদছ? ছি! আমাকে দুঃখ দিয়ো না; তুমি কাঁদলে এই শেষ সময়ে আমাকে বুঝে যেতে হবে যে আমার শিক্ষা সার্থক হয় নি। তা ছাড়া, মৃত্যুতে আমার তো কোন দুঃখ নাই। আক্ষেপ নাই, পরম শান্তি অনুভব করছি আমি, সুতরাং তুমি কাঁদবে কেন?

জীবন ডাক্তারের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল।

জগত মশায় বলেছিলেন—আমি জানি তোমার মনে কোথায় আছে গভীর অতৃপ্তি। থাকা উচিত নয়। তোমার জীবনের কোন দিক তো অপূর্ণ নয়!

কয়েক মুহূর্ত পরে বলেছিলেন—অবশ্য এর উপর মানুষের হাত নাই আমি জানি। কিন্তু এ অতৃপ্তি থাকতে তো অমৃত পাবে না বাবা। পরমানন্দ মাধবকে অনুভব করতে পারবে না। অতৃপ্তি অবশ্য কামনার বস্তু না পেলে মেটে না। কিন্তু কামনা যে কি তাই কি কেউ জানে? শোন, আশীর্বাদ ক'রে যাই কামনার বস্তু পেয়েই যেন তোমার সকল অতৃপ্তি মিটে যায়, অমৃত আস্বাদন করতে পার। দুঃখে স্থির থাকতে পার, পৃথিবীতে মৃত্যুর

মধ্যে অমৃতকে অনুভব করতে পার ; আর আনন্দে সুখে কাঁদতে পার। নাই পাও তৃপ্তি। তবে বাবা জ্ঞানযোগে ডুব দিয়ো। ওই আয়ুর্বেদে। বড় কঠিন এবং শুষ্কপথ। হোক। পাহাড়ের মত স্থির থাকতে পারবে।

সেই পাহাড়ই হয়ে গেছেন তিনি।

কিম্বা জ্ঞানযোগ-রূপী অগস্ত্যের গণ্ডূষপানে শুকিয়ে-যাওয়া সমুদ্রের বালির মত তাঁর জীবন বালুময়। কিন্তু তার প্রতি বালুকণায় সমুদ্রের জলের লবণাক্ত স্বাদ। আতর বউ কোন দিন একবার আস্বাদন করেও দেখলে না, কেবল মরুভূমি বলেই তাঁকে উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে উত্তপ্ততর ক'রে তুললে।

* * *

বাপের মৃত্যুর পর এই জ্ঞানযোগে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার জন্যই জীবন দত্ত ডাক্তারী পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তখন ডাক্তারী শাস্ত্রের বিলাতী চিকিৎসার অভিনবত্বে দেশ চকিত হয়ে উঠেছে। রঙলাল ডাক্তারের পাল্কীর বেহারাদের হাঁকে হাঁকে দেশের পথঘাট মুখরিত, নবীন মুখুজ্জে ডাক্তারের ঘোড়ার খুরের ধুলোয় ধূসর পথের দুই ধার। শুধু পথ ঘাটেই নয় কবিরাজদের মনের মধ্যেও এর সাড়া উঠেছে। এই বিদ্যা আগে থেকেই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, বাপের মৃত্যুর পর তিনি সুযোগ পেলেন। আদেশও তিনি পেয়েছেন।

বৃদ্ধ জীবন মশায় অন্ধকারের মধ্যে আবার একবার হাসলেন, দাড়িতে হাত বুলালেন।

হায়রে হায়! মানুষ সংসারে নিজেকে নিজে যত ছলনা করে প্রতারণা করে মিথ্যা বলে তার শতাংশের একাংশও বোধ হয় পরকে করে না।

বৃদ্ধ বারবার মাথা নাড়লেন। ছোট ছেলের অপটু মিথ্যা বলার চাতুরীকে ধরে ফেলে কতকটা হতাশায় কতকটা স্নেহবশে কতকটা ধরে-ফেলার আনন্দে যেমন প্রবীণেরা মাথা নাড়ে তেমনি ভাবেই মাথা নাড়লেন বারবার। সে দিনের আত্মপ্রতারণার কথাই আজ ধরে ফেলেছেন তিনি।

শুধু জ্ঞান লাভের জন্য, জ্ঞান যোগের মধ্যে নিজেকে সমাহিত করবার জন্য ডাক্তারী শিখতে চেয়েছিলেন? নিজে ঘোড়ায় চড়ে, আতর বউকে

পাল্কীতে চাপিয়ে কাঁদীতে ভূপী বোসের বাড়ী যাওয়ার কামনার তাড়নার কথাটা সত্য নয় ?

শুধু কি এই ? জগত মশায়ের মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই কতকগুলি বাঁধা ঘর কি হাত ছাড়া হয় নাই তাঁর ? লোকে—এইবার মশায়দের বাড়ীর পশার গেল,—বলে নাই ?

নবগ্রামে কি প্রথম এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার এসে বসে নি ? তার প্রায় মাস দু'য়েক পর ওই কিশোরের বাপ কৃষ্ণদাসবাবুর আশ্রয়ে কি হরিশ ডাক্তার আসে নি ? তিনি কি নিজেই শঙ্কিত হন নি ?

অবশ্য গুরু রঙলাল ডাক্তার এর অন্য অর্থ করেছিলেন। বলতেন—জীবন, তোমাকে আমি ভালবাসি কেন জান ? তোমাকে ভালবাসি তুমি জীবনে হার মান নি এই জন্যে। এ দেশের কবিরাজরা হার মেনে এই শাস্ত্রটাকে শুধু ঘরে বসে শাপ শাপান্তই করলে। না পারলে নিজেদের শাস্ত্রের উন্নতি ক'রে এর সঙ্গে পাল্লা দিতে, না চাইলে এর মধ্যে কি আছে সেই তত্ত্বকে জানতে। আধমরারা এমনি করেই মরে হে। তুমি জ্যান্ত মানুষ। তাই তোমাকে ভালবাসি। হার মানার চেয়ে আমার কাছে অপমানের বিষয় আর কিছু নাই। হার মানা মানেই মরা। ডেডম্যান, dead man, বুঝেছ ?

লম্বা একটা চুরুট ধরিয়ে খালি গায়ে একখানা খাটো কাপড় প'রে রঙলাল ডাক্তার ময়ূরাক্ষীর দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন আর পা দোলাতেন।

রোগী আসত। একথা যেদিন বলেছিলেন সে দিনের কথা মনে পড়ছে। একজন জোয়ান মুসলমানকে ডুলি ক'রে নিয়ে এসেছিল। পেটের যন্ত্রণায় ধড়ফড় করছিল জোয়ানটা। রঙলাল ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে দেখে নির্বিকার ভাবেই বলেছিলেন, শুয়ে পড় চিত হয়ে—এই আমার পায়ের তলায় শুয়ে পড়।

জীবন ডাক্তারকে বলেছিলেন, দেখবে নাকি নাড়ী ? দেখ, তোমার নাড়ীজ্ঞান কি বলে দেখ। অম্বল না অম্বলশূল না পিলের কামড় দেখ।

রোগী চীৎকার ক'রে উঠেছিল, ওগো ডাক্তারবাবু তুমি দেখ গো, তুমি দেখ ! মরে গেলাম, আমি মরে গেলাম ! নইলে একটুকুন বিষ দেন মাশায়—

খেয়ে আমি মরে বাঁচি। আঃ কোথায় কিছু হ'ল না গো, কবরেজ হাকিম পীর কালীস্থান বাকী রাখি নাই মাশায়।—

বাধা দিয়ে রঙলাল বলেছিলেন, ঠাকুর দেবতা কি করবে রে ব্যাটা? গোগ্রাসে গোস্ত খাবি তো তারা কি করবে? কতখানি গোস্ত খাস একবারে—দেড় সের না দু সের? কৃমী হয়েছে তোর পেটে, তিন চার হাত লম্বা কৃমী।

—হেই বাবা ওষুদ দেন বাবু। যাতনায় আর বাঁচি না বাবা।

—তা দেব কিন্তু টাকা কই? এঁ্যা? দুটো টাকা দে ফিজ আর ওষুধের দাম। দে আগে! টাকা না হলে হবে না।

—একটাকা এনেছি বাবা—

জীবন বলেছিলেন, কাল তা' হ'লে দিয়ে যেয়ো।

রঙলাল বলেছিলেন, ইউ আর এ ফুল। বিনা ফিজে চিকিৎসা করো না। ধারে ওষুধ দিয়ো না, মরবে তুমি। তা ছাড়া ওরা ভাববে এ লোকটার পশার নেই ভাল। মানুষের বেঁচে থাকতে টাকা চাই। মানুষ খাটে ওই বাঁচার মূল্য উপার্জন করতে; তাতেও যে দাক্ষিণ্য দেখাতে যায় সে শুধু fool ই নয় সে অপরাধী। তাকে জীবনের যুদ্ধে হারতেই হবে। Just like the Hindoos; ইতিহাসে পাবে হিন্দুরা প্রবল যুদ্ধ ক'রে জিতে এল প্রায়, মুসলমানেরা যুদ্ধ বিরতি প্রার্থনা করলে; ব্যস, হিন্দুরা বিরত হ'ল। আচ্ছা, বিশ্রাম ক'রে নাও কাল আবার যুদ্ধ হবে। কিন্তু রাত্রে মুসলমান আক্রমণ করলে বিনা নোটিশে, অপ্রস্তুত হিন্দুরা হারল, মরল কিন্তু স্বর্গে গেল। আমি স্বর্গকামী নই। বুঝেছ? বলেই রোগীর সঙ্গের লোকদের বলেছিলেন, যাও আর একটা টাকা নিয়ে এস। যাও। রোগী থাকুক এখানে। ভয় নেই। মরবে না। যাও।

তারা চলে গেলে বলেছিলেন, জীবনে টাকা চাই জীবন। টাকা চাওয়াটা অপরাধ নয়। কারও কাছে ভিক্ষা করো না, কাউকে ঠকিও না, কারও চুরি করো না, কাউকে সর্বস্বান্ত করে নিও না, কিন্তু তুমি যার জন্যে খাটবে তার মজুরি—ফিজ, এ নিতে সংকোচ ক'র না, করলে তুমি মরবে—স্বর্গে যাবে কিনা জানি না।

(তের)

অদ্ভুত মানুষ।

সাধারণ মানুষের সমাজে মহাদাম্ভিক অর্থপিপাসু হৃদয়হীন বলেই পরিচিত ছিলেন রঙলাল ডাক্তার। ঠিক তাঁর বাবার প্রকৃতির বিপরীত।

ভাষা ছিল রূঢ়, আপ্যায়নহীন অসামাজিক মানুষ।

জীবন ডাক্তারের সঙ্গেও প্রথম পরিচয়ে এমনই ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন তিনি।

জগত মশায়ের মৃত্যুর পর। মনে তখন গভীর অশান্তি। সুপ্ত অতৃপ্তি যেন প্রচণ্ড তৃষ্ণায় জেগে উঠেছে জগত মশায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে, তাঁর গুরুগম্ভীর অস্তিত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে। তাঁর স্নেহ যেমন প্রসন্ন এবং গাঢ় ছিল তাঁর নির্দেশ এবং পরোক্ষ শাসনও ছিল তেমনি গুরুগম্ভীর অলঙ্ঘ্যণীয়। জীবনের যে অসন্তোষ ছিল চাপা সে যেন চূড়া ভেঙ্গে পড়া পাহাড়ের বুকের আগুনের মত বেরিয়ে পড়ল।

ওঃ—প্রথম দিনের অগ্ন্যুদ্গারের কথা মনে পড়ছে।

আতর বউ সেদিন প্রথম মাথা কুটেছিল। আতর বউও চিরকালের অসন্তোষের আগুন বুকে বয়ে নিয়ে চলেছে। বিবাহের পর সেই ফুলশয্যার রাত্রি থেকেই জীবন ডাক্তার সে আগুনের উত্তাপ সহ্য ক'রে আসছেন।

বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীনা মেয়েটি মামার বাড়ীতে মানুষ। চিরদিনের মুখরা। চিরদিনের—। কি বলবেন? প্রচণ্ডা ছাড়া বোধ করি বিশেষণ নাই; চিরদিনের প্রচণ্ডা। অদ্ভুত জীবনী-শক্তি, অত্যুগ্র তার ক্ষুধা। সেই বাল্যকাল থেকেই সে মাথা কুটে আসছে। যত শাসন কঠিন হয়েছে তত সে মাথা কুটেছে। তত চীৎকার ক'রে কেঁদেছে। তারপর কৈশোরে সে দিনের পর দিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছে মামা মামীর ঘরে, দিনেকের জন্য বিশ্রাম নিত না। কিন্তু মুখরাপনার আর সীমা ছিল না। তার সঙ্গে উপবাস। মাসের মধ্যে অন্তত সাতটা আটটা দিন সে উপবাস করত; অন্যপক্ষের শাসনের নামে নির্যাতন ক্লান্ত হয়ে হার মানলে সে সুরু করত আত্মনির্যাতন।

বিবাহের ফুলশয্যাতেই এমন মেয়ের বুক থেকে অগ্নিজ্বালা না হোক অগ্নি-তাপ বিকীর্ণ হবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। তবুও নতুন বউ হিসেবে সংসারে সে সুনাম কিনেছিল। দিনের বেলা দূর থেকে জীবন ডাক্তার আতর বউকে প্রসন্ন-প্রশান্ত হাস্যময়ী দেখেছেন। অবশ্য শাশুড়ীর সমাদর তার একটা বড় কারণ। মা তাকে বড় সমাদর করতেন। মায়ের ধারণা ছিল আতর বউয়ের মত পয়মন্ত মেয়ে আর হয় না। বিয়ের পর বাপের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষায় জীবনের মন প্রাণ সমর্পণ করা দেখে এই ধারণা হয়েছিল তাঁর। তিনি বলতেন—আমার বউয়ের পয়ে এমনটা হল। নইলে সেই জীবন, যে মাথাটা নিচু করে ঢুঁ মেরে বড় বড় জোয়ানকে ঘায়েল করেছে, বোশেখ মাসের দিনে সকালে বেরিয়ে বেলা দুপুর পার করে তাল খেয়ে ফিরেছে, মোলকিনী পুকুর বিশবার এপার-ওপার করে পাঁক তুলে কাদা করে তবে উঠেছে, তার এই মতি-গতি হয়! এ যেন সে মানুষই নয়! বউ-মার পয় ছাড়া আর কি বলব? বউ-মা বাড়ীতে পা দেওয়ার পর এই হল!

এ কথা শুনে সেকালে আতর বউয়ের মুখ স্মিতহাস্যে ভরে উঠত।

এই সময়টাই জগত মশায়ের জীবনের প্রবীণতম কাল, প্রবীণতার সঙ্গে সঙ্গে বিচক্ষণতা এবং বহুদর্শিতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল; জগত মশায় নিজে আর সাধারণ রোগী দেখতে বের হতেন না, জীবন ছিলেন সে জন্য। রোগ কঠিন হলে তবে যেতেন। নইলে বলতেন, আমার যাবার দরকার নাই বাবা, আমার জীবন যাচ্ছে। ও আমারই যাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসতেন।

কথাটার ভিতরের অর্থ যে না বুঝত, তাকে তিনি ওর অর্থ বুঝাতে চেষ্টা করতেন না, রসিকতা যে বোঝে না তার সঙ্গে রসিকতা তিনি করতেন না, সাদা কথায় বলতেন, জীবন দেখে এসে আমাকে বলবে তাতেই হবে। জীবনকেই আমি বলে দেব যা করতে হবে, যে ওষুধ দিতে হবে, তার জন্যে ভেবো না।

যেতেন, জীবন যখন বলত তখন। আর যেতেন অন্য চিকিৎসকের হাতের রোগী দেখবার জন্য ডাক এলে তখন। আর যেতেন যে ক্ষেত্রে নিদান হাঁকতে হবে সেই ক্ষেত্রে।

একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এই ঘটনায় জগত মশায়ের খ্যাতি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নবগ্রামের বরদাপ্রসাদ বাবুর কঠিন অসুখ। বরদাবাবুরা নবগ্রামের প্রাচীনতম জমিদার বংশ; এক পুরুষকাল আগে এই বংশেরই বড় তরফের কর্তার বাড়ীতে জগত মশায়ের বাবা দীনবন্ধু মশায় খাতা লিখতেন এবং ছেলেদের পড়াতেন। এই কর্তার ছেলের রোগে সেবা করে, দীনবন্ধু মশায় প্রথম চিকিৎসা বিদ্যার আস্বাদ পেয়েছিলেন এবং কর্তার ছেলের আরোগ্যের পর বিখ্যাত কবিরাজ কৃষ্ণদাস সেন গুপ্ত নিজে ডেকে তাঁকে আয়ুর্বেদে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এই কৃতজ্ঞতায় দীর্ঘকাল, জগত মশায়ের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, এই বংশের যে কোন বাড়ীতে ডাকলে সসম্ভ্রমে বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করেছেন। কিন্তু এরা তাঁর সম্ভ্রমকে বজায় রাখত না, উপরন্তু পদে পদে অসম্ভ্রম করত, এমন কি ওষুধের দামও দিত না; বলত খাজনায় কাটছিট করে দেব; এই কারণেই জগত মশায় স্বগ্রামের কয়েক পয়সা জমিদারী কিনে অসম্ভ্রমের হাত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিলেন। এবং রক্ষাও পেয়েছিলেন। নবগ্রামের রায়চৌধুরী বংশ তাঁকে আর ডাকত না। তাঁরা হরিহরপুরের কবিরাজ হীরালাল পাঠককে গৃহ-চিকিৎসক করেছিলেন। রোগ কঠিন হলে ডাকতেন রাঘবপুরের গুপ্ত কবিরাজদের। বরদাবাবুর অসুখে বাধ্য হয়ে তাঁর ছেলে জগত মশায়কে ডেকেছিলেন। বরদাবাবুর ছেলে কলকাতায় ব্যবসায় করতেন। বাপের অসুখের সংবাদ শুনে গ্রামে এসেই ডাকলেন রাঘবপুরের গুপ্তকে। গুপ্ত এসে বললেন—তিনদিন এক সপ্তাহ বা নবম দিনে মৃত্যু অনিবার্য।

ছেলে বললেন—আমি কলকাতা নিয়ে যাব।

গুপ্ত বললেন—তাতে পথে মৃত্যু হবে। তিনদিন পরমায়ুও তাতে ক্ষয়িত হবে।

ছেলে এরপর রঙলাল ডাক্তারকে ডাকলেন, বললেন, কবিরাজ হাত দেখে বলছেন—; রূঢ়ভাষী রঙলাল ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন—ও বিদ্যেটা আমি বুঝি না, বিশ্বাসও করি না।

ছেলে বললেন—মানে উনি বলছেন তিনদিন, একসপ্তাহ বা নবম দিনে মৃত্যু অনিবার্য।

রঙলাল বললেন—সেও আমি বলতে পারব না। তবে ওঁর কাছে লিখে নিতে পারেন। মৃত্যু না-হলে নালিশ করতে পারবেন। আমাকে লিখে দিলে আমি নালিশ করব।

ছেলে বললেন—এখন আমি চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই।

—তবে আমাকে কেন ডেকেছেন? নিয়েই যান।

—কবিরাজ বলছেন—তাতে তিন দিনও বাঁচবেন না, পথেই ত্রিশূন্যে অর্থাৎ গাড়ীতেই মারা যাবেন।

—তা পারেন। আবার নাও পারেন। আমি ওষুদ দিয়ে যাচ্ছি। রোগ কঠিন। মৃত্যু হবে কি বাঁচবেন সে আমি জানি না।

রঙলাল ডাক্তার চলে গেলে—অগত্যা জগত মশায়কে তাঁরা ডেকেছিলেন।

জগত মশায় নাড়ী দেখে বলেছিলেন—সুচিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে যাবেন, বাধা দেব না; নিয়ে যান। চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি দায়ী রইলাম।

ছেলে বলেছিলেন—দেখুন—ভাল করে বুঝুন—

—না বুঝে কি এতবড় কথা বলতে পারি রায়চৌধুরী মশায়? নিয়ে যান। আমার কথার অন্যথা হ'লে আমি দশের সম্মুখে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, চিকিৎসা আমি ছেড়ে দেব। আর—।

হেসে বলেছিলেন—

—আর এ যাত্রায় কর্তার রোগভোগ আছে, দেহরক্ষা নাই। সে এখানেই রাখুন—আর কলকাতাই নিয়ে যান।

তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। বরদাবাবুকে কলকাতা নিয়ে পৌঁছুতে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই এবং তিনি সেবার রোগমুক্ত হয়ে দেওঘরে শরীর সেরে বাড়ী ফিরেছিলেন।

বরদাবাবুর বাড়ীতে কোন দক্ষিণা তিনি গ্রহণ করেন নি। বরদাবাবু বাড়ী ফিরে তাঁকে কিছু উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। দেওঘরের পেঁড়া, একটি ভাল গড়গড়া ও নল, কিছু ভাল তামাক এবং একখানি বালাপোষ।

এই ঘটনার পরই জীবন তাঁকে বলেছিল—এবার ফিজ বাড়াতে হবে আপনাকে। চারটাকা ফিজ করুন।

জগত মশায় তাতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু জীবন ছাড়ে নাই। বলেছিল—গরীব যারা তাদের বাড়ী আপনি বিনা ফিজে যাবেন। কিন্তু যে যা দেবে—এ করলে—আপনার মর্যাদা থাকবে না।

এই সময়টিই দত্ত মশায়দের বাড়ীর সর্বোত্তম সুসময়।

জীবনের মা বলতেন, এ সব আমার বউয়ের পয়।

আতর বউ নিজেও তাই ভাবত।

সেকালে জীবন ডাক্তার রোগী দেখতে বের হবার সময় নিয়মিতভাবে আতর বউ সামনে এসে দাঁড়াত। তার মুখ দেখে যাত্রায় শুভফল অবশ্যম্ভাবী।

* * *

জগত মশায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—দত্ত মশায়দের খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠায় ভাঁটা পড়ল স্বাভাবিক ভাবে।

অনেক বাঁধা ঘর—চার পাঁচখানা গ্রাম তাঁকে ছেড়ে কামদেবপুরের মুখুজ্জে কবিরাজের এবং হরিহরপুরের পাঠক কবিরাজের কাছে গিয়ে পড়ল। ওদিকে নবগ্রামের বাবুরা নিয়ে এলেন একজন ডাক্তার। দুর্গাদাস কুণ্ডু। জীবন মশায় তখন শুধু জীবন দত্ত। কবিরাজও কেউ বড় একটা বলত' না। ওদিকে ডাক্তারীর একটা সুবিধে আছে। বয়স যেমনই হোক, অভিজ্ঞতা থাক—আর না-থাক, ডিগ্রী আছে; ডিগ্রীর জোরেই ডাক্তার খেতাব তাদের প্রতিষ্ঠিত।

জীবন দত্তের সুপ্ত কামনা—এই দুঃসময়ের ঝড়ে—ছাই উড়ে যাওয়া আগুনের মত গনগনে হয়ে উঠল। তিনি ডাক্তার হবেন। সম্মুখে রঙলাল ডাক্তারের দৃষ্টান্ত। ওদিকে নবগ্রামে আরও একজন নতুন ডাক্তার এল। তাঁরই বন্ধু কৃষ্ণদাসবাবু—ওই কিশোর ছেলেটির বাপ—নূতন ডাক্তারকে আশ্রয় দিলেন। আরও শোনা গেল, নবগ্রামের নবীন ধনী ব্রজলালবাবু এখানে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী—এ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করছেন। তিনি গোপনে গোপনে আরম্ভ করে দিলেন। অনেক সন্ধান

ক'রে দুখানি বই আনালেন—ডাক্তারী শিক্ষা ও বাঙলা মেটিরিয়া মেডিকা। ইচ্ছা সত্ত্বেও রূঢ়ভাষী রঙলাল ডাক্তারের কাছে যেতে সাহস হল না।

মাস তিনেক পর—হঠাৎ রঙলাল ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর দেখা হল, তাঁর সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র রচিত হবার প্রথম গ্রন্থি পড়ল।

ওই কিশোর ছেলেটিকে তিনি এই জন্যই এত ভাল বাসেন। এই গ্রন্থিটি পড়েছিল তাকে উপলক্ষ্য করেই।

হঠাৎ একদিন শুনলেন—নবগ্রামের কৃষ্ণদাসবাবুর ছেলে কিশোরের বড় অসুখ। আজ দশ দিন একজ্বরী। দেখছিল ওই নতুন ডাক্তারটি, আজ মাসখানেক যে নবগ্রামে এসেছে। কৃষ্ণদাসবাবুই যাকে আশ্রয় দিয়েছেন। পাশ-করা ডাক্তার—পাটনা স্কুল থেকে পাশ করে এসেছে। পসার না হওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণদাসবাবুই তার সকল ভার বহন করবেন বলেছেন। হরিশ ডাক্তার। সেই দেখছিল—আজ রঙলাল ডাক্তার দেখতে আসবেন।

জীবন দত্ত বিস্মিত হলেন, শঙ্কিতও হলেন। নিজেকে একটু ধিক্কার দিলেন। খবরটা তাঁর রাখা উচিত ছিল। কৃষ্ণদাসবাবু তাঁর চেয়ে বয়সে বড় হলেও বন্ধু। এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেপালের পরমাত্মীয়—সম্বন্ধী। তা-ছাড়া এই কিশোর ছেলেটিকেও তিনি বড় ভালবাসতেন। এই নতুন ডাক্তারটি কৃষ্ণদাসবাবুর বাড়ীতে আসবার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ চারমাস আগে পর্যন্তও তাঁরাই পুরুষানুক্রমে ওঁদের বাড়ীতে চিকিৎসা ক'রে আসছিলেন। তাঁর তো একবার যাওয়া উচিত ছিল। চিকিৎসক হিসেবে না-ডাকতে যাওয়ায় মর্যাদায় বাধে কিন্তু তার উপরেও যে একটা অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক আছে। কৃষ্ণদাসবাবুর সঙ্গে আছে, ওই কিশোর ছেলেটির সঙ্গেও আছে। ও পাড়ায় গেলেই তিনি কিশোরের খোঁজ করে দু চারটি কথা বলে আসেন। ছ-সাত বছরের এই শ্যামবর্ণ ছেলেটি আশ্চর্য রকমের দীপ্তিমান। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং রসবোধে সরস বুদ্ধি।

এই তো সেদিন।

নেপালের বাড়ী থেকে তিনি নেপালকে সঙ্গে নিয়েই বের হচ্ছিলেন। পথে যাচ্ছিল কিশোর। দুপুরবেলা শ্যালকপুত্রকে একা দেখে পাগলা নেপালের কর্তব্যবোধ জেগে উঠল। কিশোরের গতিপথ দেখে যে কেউ

বুঝতে পারত যে, সে নিজেদের বাড়ীর দিকেই যাচ্ছে ; পাগ্‌লা নেপাল—সেই হিসেবে অকারণেই প্রশ্ন করলে—কোথায় যাবি ? আমাদের বাড়ী ?

—না।

—তবে ? দুপুরবেলা যাবি কোথায় ?

কিশোর উত্তর দিয়েছিল—যাব তোমার শ্বশুরবাড়ী !

নেপাল বুঝতে পারে নাই রসিকতাটুকু। জীবন হা-হা করে হেসেছিলেন।

জীবন ডাক্তার নিজেও অপ্রতিভ হয়েছেন তার কাছে। এই তো মাস কয়েক আগে। তখনও তিনিই চিকিৎসা করতেন ওদের বাড়ীতে। কিশোরেরই জ্বর হয়েছিল। নাড়ীতে দেখলেন অম্লদোষ। কৃষ্ণদাসবাবুর ভগ্নী বললেন—এই জ্বর অবস্থাতেও কাল মোয়া ক্ষীর চুরি করে খেয়েছে। অম্লদোষের আর দোষ কি ?

জীবন ডাক্তার বলেছিলেন—এঁ্যা ? তুমি চুরি করে খেয়েছ ?

কিশোর অপ্রস্তুত হয় নি—বলেছিল—হ্যাঁ।

—জান, চুরি করে খেলে পাপ হয়।

কিশোর ঘাড় নেড়ে বলেছিল—হয়। কিন্তু মোয়া ক্ষীর খেলে হয় না।

জীবন ডাক্তার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন—বলেছিলেন—কে বলেছে তোমাকে ?

কিশোর বলেছিল—ভাগবতে শুনেছি। কৃষ্ণ নিজে মোয়া ক্ষীর, ননী, মাখন চুরি করে খেতেন। তবে কেন পাপ হবে ?

জীবন ডাক্তারকে হার মানতে হয়েছিল। অতঃপর চিকিৎসা শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝাতে হয়েছিল। ছেলেটি মন দিয়ে শুনেছিল এবং শেষে বলেছিল—আচ্ছা আর বেশী খাব না। কম করে খাব।

এর পর জীবন ডাক্তার কিশোরকে দেখলেই পুরাণ-সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। কিশোর প্রায়ই উত্তর দিয়েছে এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছে। রাবণের কটা মাথা কটা হাত জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল—দশটা মাথা কুড়িটা হাত। জানেন, রাবণ কখনও ঘুমোত না !

—কেন ?

—শুয়ে পাশ ফিরবে কি করে ?

এইভাবেই ছেলেটির সঙ্গে একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতা জমে উঠেছিল। তার অসুখ—বেশী অসুখ, রঙলালবাবুর মত ডাক্তার আসছেন—জীবন ডাক্তার আর থাকতে পারলেন না। তিনি এসে উঠলেন কৃষ্ণদাসবাবুর বাড়ী। কৃষ্ণদাস অপ্রস্তুত হয়েছিলেন—কিন্তু জীবন স্মিতহাস্যে বলেছিলেন—কিছু না কৃষ্ণদাস দাদা, আপনারা ব্রাহ্মণ আমি কায়স্থ হলেও তো আমি আপনার ভাই। খুড়ো হিসেবে দেখতে এসেছি। চলুন, একবার কিশোরকে দেখব।

কিশোর প্রায় বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিল। গলায় মৃদু সর্দির শব্দ উঠছে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। দু-চারটে ভুলও বকছে। ভাদ্র মাসে গরম কাপড় দিয়ে তাকে প্রায় মুড়ে রাখা হয়েছে। নতুন ডাক্তার বললেন—বুকে সর্দির দোষ রয়েছে; জ্বর উঠেছে এক শো তিন। নিউমোনিয়া এতদিন পূর্ণমাত্রায় দেখা দিত, কিন্তু আমি গোড়া থেকেই বেঁধেছি। তবু যে কেন জ্বর কমছে না, বুঝছি না।

জীবন ডাক্তার দুটি হাতের নাড়ী দীর্ঘক্ষণ ধরে মনঃসংযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলেন। জিভ, চোখ দেখলেন, পেট টিপে পরীক্ষা করলেন। তারপর উঠে হাত ধুয়ে কৃষ্ণদাসবাবুর কাছে বসে বললেন—একুশ দিন বা চব্বিশ দিনে জ্বর ত্যাগ হবে কৃষ্ণদাস দাদা। ভয়ের কোন কারণ নাই, তবে জ্বরটা একটু বাঁকা। আগন্তুক জ্বর, সান্নিপাতিক দোষযুক্ত; তবে প্রবল নয়; মারাত্মক নয়। শ্লেষ্মা দোষ—ডাক্তার বাবু যেটা বলছেন—।

হরিশ ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললেন—ওটা আনুসঙ্গিক, আসল ব্যাধি ওটা নয়।

হরিশ ডাক্তার প্রায় তাঁর সমবয়সী; জীবন দত্তের থেকে পাঁচ বছরের ছোট। কর্মজীবনে এটা খুব পার্থক্যের বয়স নয়। তার উপর সে পাশ-করা ডাক্তার। সে বলেছিল—নাঃ। আমি স্টেথেসকোপ দিয়ে দেখেছি। সর্দির দোষটাই মূল দোষ। আর সান্নিপাতিক মানে টাইফয়েডের কথা যা বলছেন—ওটা আমার মতে ঠিক নয়।

জীবন দত্ত ধ্যানস্থের মত নাড়ী ধরে অনুভব করেছেন, যা বুঝেছেন তা-ভুল হতে পারে না। তিনি মৃদু হাসির সঙ্গে ঘাড় নেড়েছিলেন। ঠিক এই সময়েই বাইরে পাল্কীর বেহারাদের হাঁক শোনা গিয়েছিল।

হরিশ ডাক্তার ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল—ওই। উনি এসে গিয়েছেন।

জীবন দত্তও বাইরে যাবার জন্য উদ্যত হলেন, হঠাৎ নজরে পড়ে কিশোরের শিয়রে বসে অবগুণ্ঠনবতী তার মা। জীবন দত্ত গভীর বিশ্বাসে আশ্বাস দিয়ে আবার বলেছিলেন—কোন ভয় নাই। যে যা বলবে বলুক, মা, একুশ দিন বা চব্বিশ দিনে জ্বর ছেড়ে যাবে, ছেলে সেরে উঠবে।

রঙলাল ডাক্তারের সঙ্গেও সংঘর্ষ বাধল—ওই একুশ দিন চব্বিশ দিন নিয়ে।

রঙলাল ডাক্তার রোগী দেখলেন।

প্রথমেই বললেন—বাজে লোক—বেশী লোক ঘরে থাকা আমি পছন্দ করি না। যে ডাক্তার দেখছে আর রোগীর—যে সেবা করছে আর এক আধজন।

জীবন দত্তও বেরিয়ে যাচ্ছিলেন—কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবু বললেন—তুমি থাক জীবন।

তিনি তাঁর হাত ধরলেন। জীবন মশায়ের মনে আছে—ভীত কৃষ্ণদাস-বাবুর হাত ঘামছিল; জীবন দত্ত মৃদু স্বরে সাহস দিয়ে বলেছিলেন—ভয় কি?

রোগী দেখে রঙলাল ডাক্তার কিছু বললেন না। প্রেসক্রিপসন চাইলেন। পড়ে দেখলেন। সেগুলি ফিরিয়ে দিয়ে নিজে প্রেসক্রিপসন লিখে হরিশ-ডাক্তারের হাতে দিলেন—বললেন—ও সব পালটে এই দিলাম। পথ্য—বালি, ছানার জল, বেদানার রস চলতে পারে। কোন শক্ত জিনিষ নয়। ছেলের টাইফয়েড হয়েছে।

হরিশ ডাক্তারের মুখ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জীবন দত্তের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়েছিল—এ জীবন মশায়ের মনে আছে। জীবন দত্ত কিন্তু হরিশ-ডাক্তারের মুখের দিকে ওই একবার ছাড়া তাকান নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রঙলাল ডাক্তার হরিশকে ভাল করে সব বুঝিয়ে দিলেন।

জীবন দত্তের কবিরাজী পদ্ধতির সঙ্গে তাতে কয়েকটিতে গরমিল ছিল। তবুও তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর অধিকার কি? তারপর রঙলাল ডাক্তার

ওষুধ তৈরী করতে বসলেন। ওইটি ছিল তাঁর একটি বিশেষত্ব। নিজে কলবাক্স থেকে ওষুধ তৈরী করে দিতেন। অন্য কোন ডাক্তার কি ডাক্তারখানার তৈরী ওষুধ তিনি রোগীকে খেতে দিতেন না। এমন কি হঠাৎ যে বিপদ বা পরিবর্তন আসতে পারে, তারও, ওষুধ তৈরী করে দিয়ে বলতেন—এই রকম হলে এই দেবে। এই রকম হলে এটা। একদিন পর অবস্থা লিখে লোক পাঠাবে আমার কাছে। তবে যে ডাক্তার দেখছে, তার কাছে গোপন রাখতেন না কিছু। বিশ্বাসের পাত্র হলে তারপর তাকে দিতেন প্রেসক্রিপসন—সে ওষুধ তৈরী করে দিত। বলতেন—বিষ মিশিয়ে রোগীর অনিষ্ট করবে না, সে আমি জানি; বিষের দাম আছে। আমার সইকরা প্রেসক্রিপসন আছে—আমাকে দায়ী করতে পারবে না। কিন্তু জলো দেশে জলের দাম লাগে না, ওষুধের বদলে জল দিলে কি করব? ছটা ওষুধের তিনটে না দিলে কি করব? পচা পুরনো দিলে কি করব? বদনাম আমার হবে।

ঠিক এই সময়। ওষুধের শিশি দুটি ঝাঁকি দিয়ে একবার নিজে ভাল করে তার রঙ এবং চেহারাটা দেখে হরিশ ডাক্তারের হাতে দিলেন—দু রকম ওষুধ থাকল। এইটাই এখন চলবে। যদি ভুল বকে বা জ্বর বাড়ে;—জ্বর বাড়লেই ভুল বকবে, ভুল বকলেই জানবে জ্বর বেড়েছে, তখন এইটে দেবে। বুঝেছ? আর ওই লেপ কাঁথাগুলো খুলে দাও। ও তো চাপা দিয়েই বাচ্চাটাকে খতম করবে। এমন করে জানালা দরজা বন্ধ করো না। আলো বাতাস আসতে দাও। বুঝেছ?

উঠলেন তিনি।

কৃষ্ণদাসবাবু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—রোগ কি টাইফয়েড?

—হ্যাঁ, কঠিন রোগ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই জিজ্ঞাসা করছি—

—বাঁচা-মরা ঈশ্বরের হাত, সে আমি বলতে পারি না।

কৃষ্ণদাসও সাহসী লোক ছিলেন—তিনিও মুখে মুখে জবাব দিতে পটু ছিলেন। বলেছিলেন, সে কথা আপনি কেন, আমরাও বলতে পারতাম। আপনার দেখে কেমন মনে হল? টাইফয়েড সান্নিপাতিক

হলেই তো অসাধ্য হয় না। রোগেরও প্রকার-ভেদ আছে। মৃদু, মধ্যম—কঠিন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে রঙলাল বলেছিলেন—আপনিই তো কৃষ্ণদাসবাবু? ছেলের বাবা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রোগ মধ্যম রকমের বলশালী। তবে কঠিন হতে কতক্ষণ! উপযুক্ত সেবা, নিয়মিত ওষুধ এ না হলে রোগ বাড়তে পারে। এ রোগে সেবাটাই বড়।

—তার জন্যে দায়ী আমরা। এ রোগ সারতে কতদিন লাগবে?

—সে কি করে বলব আমি? সে আমি জানি না।

জীবন কবিরাজের এতটা অসহ্য মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, কৃষ্ণদাস দাদা, বাইশ থেকে চব্বিশ দিনের মধ্যে আপনার ছেলের জ্বর ত্যাগ হবে, আপনি উতলা হবেন না।

হেঁট হয়ে কল বাক্স ওষুধ গুছিয়ে রাখছিলেন রঙলাল ডাক্তার—তিনি খোঁচা-খাওয়া প্রবীন গোক্ষুর সাপের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালেন।

—আপনি কে? গণক?

—না। উনি আমাদের এখানকার কবিরাজ। জগদ্বন্ধু মহাশয়ের নাম বোধ হয় জানেন।

—নিশ্চয় জানি। বিচক্ষণ কবিরাজ ছিলেন তিনি। রোগ নির্ণয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। এখানকার বরদাবাবুর কথা মনে আছে আমার।

—উনি তাঁরই ছেলে। জীবন দত্ত।

রঙলাল আবার একবার তাকালেন জীবন দত্তের দিকে, বললেন, বাইশ থেকে চব্বিশ দিন কি থেকে বুঝলে? নাড়ী দেখে?

—হ্যাঁ, নাড়ী দেখে তাই আমার অনুমান হয়। জ্বর চব্বিশ দিনে ছাড়বার কথা। তিন অষ্টাহ। তবে প্রায়ই আমাদের দেশে এ রোগে প্রথম একটা-দুটো দিন শা হ্যাক-হ্যাকের সামিল হয়ে ছুট হয়ে যায়। সেই কারণেই বলেছি—বাইশ থেকে চব্বিশ দিন।

—তোমার সাহস আছে। অল্প বয়স—তাজা রক্ত। হেসেছিলেন রঙলাল ডাক্তার। তোমাদের বংশের নাড়ীজ্ঞানের প্রশংসা শুনেছি, বরদাবাবুর বেলা দেখেছিও। কিন্তু ওটা তো আমাদের শাস্ত্রের বাইরে!

ঠিক চল্লিশ দিনেই কিশোরের জ্বর ছেড়েছিল!

কৃষ্ণদাসবাবু জীবন দত্তকে ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। রঙলাল ডাক্তারের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন—আজ চল্লিশ দিনেই জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। ইহার পর ঔষধ এবং নির্দেশ দিলে সুখী হইব। আসিবার প্রয়োজন বোধ করিলে কখন আসিবেন জানাইবেন।

রঙলাল ডাক্তার আর আসেন নি। এ ক্ষেত্রে আর প্রয়োজন বোধ করেন নি। শুধু নির্দেশ এবং ওষুধ পাঠিয়েছিলেন। তার সঙ্গে লিখেছিলেন, জগদ্বন্ধু মশায়ের ছেলেটিকে আমার আশীর্বাদ দিবেন।

জীবন দত্ত উৎসাহিত হয়ে চার মাইল পথ হেঁটে তাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন।

বহ্নিগর্ভ দুটি শমীবৃক্ষ পরস্পরের সান্নিধ্যে আসবামাত্র দু'জনের ভিতরের বহ্নিই উৎসুক হয়ে উঠল।

* * *

সেই রঙলাল ডাক্তার তাঁর পিঠে সে দিন হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। সে হাতের স্পর্শের মধ্যে জীবন দত্ত স্নেহ অনুভব করেছিলেন। সে এক বিস্ময়। তান্ত্রিক শবসাধকের মত মানুষ রঙলাল ডাক্তার। বামাচারীর মত কোন আচার নিয়ম মানেন না, কঠিন রূঢ় প্রকৃতি, নিষ্ঠুর ভাষা; ময়ুরাক্ষীর জলে ভেসে যাওয়া মড়া টেনে নিয়ে ফালি ফালি করে চিরে দেখেন, কবর থেকে মড়া টেনে তোলেন, মায়ের কোলে সন্তানকে মরতে দেখেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, পৃথিবীর কারও কাছে মাথা হেঁট করেন না;—এই মানুষটিকে এই তন্ত্রপ্রধান অঞ্চলের লোকে বলত, আসলে রঙলাল ডাক্তার হলেন প্রচ্ছন্ন তান্ত্রিক। বামাচারী।

কেউ কেউ বলত পাথর। নাস্তিক্যবাদী—লোকটা পাথর হয়ে গিয়েছে।

সে দিন ওই পাথর-কাটা জল—ভোগবতীর ধারার মত শীতল নির্মল—জীবন দত্ত অঞ্জলি ভরে পান করেছিলেন।

রঙলাল ডাক্তার তাঁকে প্রথম কথাই বলেছিলেন—তুমি যদি ডাক্তারী পড়তে হে! বড় ভাল করতে। তোমার মধ্যে একজন জাত চিকিৎসক রয়েছে। কবিরাজী শাস্ত্রে কিছু নেই এ কথা আমি বলছি না। কিন্তু আমাদের জাতের মত শাস্ত্রটি কালের সঙ্গে আর এগোয় নি। যে কালে এ শাস্ত্রের সৃষ্টি—চরম উন্নতি—সে কালে কেমেস্ট্রির এত উন্নতি ছিল না। তা ছাড়া আরও অনেক কিছু আবিষ্কার হয় নি। তারপর ধর কত দেশ থেকে কত মানুষ আমাদের দেশে এসেছে। তাদের সঙ্গে তাদের দেশের রোগ এ দেশে এসেছে—জল বাতাস মাটির পার্থক্যে বিচিত্র চেহারা নিয়েছে। তা ছাড়া আয়ুর্বেদ আগন্তুজ ব্যাধি বলে যেখানে থেমেছে, ইউরোপের চিকিৎসা বিদ্যা মাইক্রোসকোপের কল্যাণে জীবাণু আবিষ্কার ক'রে অনুমান এবং উপসর্গের সীমানা ছাড়িয়ে চলে এসেছে বহুদূর এগিয়ে।

আধুনিক কালের রোগ চিকিৎসা নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। জীবন দত্ত তন্ময় হয়ে শুনেছিলেন। বারবার মনে পড়েছিল নিজের বাপ এবং মহাগুরু জগত মশায়কে। পার্থক্যের মধ্যে জগত মশায় শিক্ষার মধ্যে বারবার উল্লেখ করতেন—অদৃষ্টের, নিয়তির, ভগবানের; এবং সমস্ত বক্তব্যই যেন রোগ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্য একটি ভাব ব্যাখ্যা জড়িত বলে মনে হত, যেন, কথার অর্থ ছাড়াও একটি ভাব থাকত; রঙলাল ডাক্তারের বক্তব্যের মধ্যে ঈশ্বর ছিল না, অদৃষ্ট ছিল না, এবং সমস্ত বক্তব্য ছিল শুষ্ক, কেবল মাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য, কথার মানে ছাড়া কোন ভাববাষ্পের অস্তিত্ব ছিল না। রঙলাল ডাক্তার বলতেন—মানুষ মরে গেলে আমরা আর কোন দিকে তাকাই না। বুঝেছ—ওই দেহপিঞ্জর করি ভঙ্গ—প্রাণ-বিহঙ্গ কোন দিকে ফুড়ুৎ করে উড়লেন সে দেখতে আমরা চেষ্টা করি না। মধ্যে মধ্যে হেসে বলতেন—আরে, প্রাণ যদি বিহঙ্গ হয় তবে নিশ্চয় বন্দুকধারী শিকারীও আছে, তারা নিশ্চয় পক্ষী-মাংস ভক্ষণ করে। তা হ'লেই তো পুনর্জন্ম খতম।

সেই দিনই জীবন সুযোগ বুঝে বলেছিলেন, আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমাকে যদি দয়া ক'রে ডাক্তারী শেখান!

—তুমি ডাক্তারী শিখবে? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন রঙলালবাবু। অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কপালে সারি সারি কুঞ্চন রেখা।

বিস্ময় প্রশ্ন অনেক কিছু তার মধ্যে ছিল। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন, কবিরাজী ভাল চলছে না ?

হেসে জীবন দত্ত বলেছিলেন, লেখাপড়া জানা বাবুদের সমাজে কবিরাজীর চলন কম হয়েছে বটে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ভালই চলে।

—তবে ?

—আমার ছেলেবেলা থেকেই ডাক্তারী পড়বার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু—। জীবন দত্ত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন।

—তবে পড়নি কেন ? তোমার বাবার তো অবস্থা ভাল ছিল।

জীবন দত্ত ম্লান হেসে বলেছিলেন—আমরা ভাগ্য মানি—তাই বলছি আমার ভাগ্য। আর কি বলব ? নইলে বাল্যকাল থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল আমি ডাক্তারি পড়ব। কিন্তু—

—তোমার বাবা দেন নি পড়তে ?

—আজ্ঞে না। অপরাধ আমার।

মঞ্জরীর কথাটা বাদ রেখে ভূপী বোসের সঙ্গে মারামারির কথা বলে বললেন—গ্রামে ফিরলাম—বাবা বললেন, আর না। আর তোমাকে বিদেশে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না। কৌলিক বিদ্যায় তুমি দীক্ষা গ্রহণ কর।

কথাটা শুনে ন্যাড়া পাহাড়ের মত মানুষ রঙলাল ডাক্তার অকস্মাৎ হা-হা-হা শব্দে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন কৌতুকে ; যেন তৃণহীন লতাপাতা-হীন কালো পাথরে গড়া পাহাড়টা এই কাহিনী শুনে কৌতুকে ফেটে গেল এবং ভিতর থেকে ঝর ঝর শব্দে বেরিয়ে এল স্নিগ্ধ-শীতল ঝর্ণাধারা। এমনভাবে রঙলাল ডাক্তারকে হাসতে বড় কেউ একটা দেখে নি।

বেশ খানিকক্ষণ হেসে বললেন—সেই ভূপী বোস ছেলেটার সুডৌল নাকটা এমন করে তুমিই ভেঙ্গে দিয়েছ ? আরে, তাকে যে আমি দেখেছি। চিকিৎসা করেছি। তার শ্বশুর নিজের বাড়ীতে এনেছিল চিকিৎসা করাতে, সংশোধন করতে। অপরিমিত মদ্যপান করে লিভারের অসুখ। আমাকে ডেকেছিল। ছোকরার মাকাল ফলের মত টুকটুকে চেহারায় পোকাধরার কালো দাগের মত নাকে ওই খুঁত।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন রঙলালবাবু—বললেন আমি কিন্তু সন্দেহ করেছিলাম—ওটা হয়েছে সিফিলিস থেকে। বড় লোকের ছেলে দুর্দান্ত মাতাল! সন্দেহ হওয়ারই কথা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম। কিছুতেই স্বীকার করে না। তারপর স্বীকার করলে। যা এদেশের লোকের স্বভাব। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রঙলাল ডাক্তার—হাতের চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন—অদ্ভুত, এ দেশটাই অদ্ভুত! লজ্জায় রোগ লুকিয়ে রাখবে। বংশাবলীকে রোগগ্রস্ত করে যাবে! নিজে ভুগবে। কিছুতেই বুঝবে না তুই দেবতা নস। তুই রক্তমাংসের মানুষ। ক্ষুধার দাস, লোভের দাস, কামের দাস!

উঠে দাঁড়ালেন রঙলাল ডাক্তার, বললেন—সেই শূয়ারটা কি বলেছিল জান? বলেছিল, কি ক'রে হল তা জানি না। আমার স্ত্রী ছাড়া আর কারও সংশ্রবে তো আমি কখনও আসি নি। আপনি বিশ্বাস করুন। আমি আর থাকতে পারি নি। প্রচণ্ড এক চড় তুলে বলেছিলাম—মারব এক চড় উল্লুক!

কিছুক্ষণ পায়চারি করে শান্ত হয়ে রঙলাল ডাক্তার এসে বসেছিলেন তাঁর আসনে। চুরুট ধরিয়ে দুটো টান দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, ওটা তাহ'লে তোমার ওই মুদ্গর সদৃশ হস্তের মুষ্ঠ্যাঘাতের চিহ্ন? তুমি তো ভয়ানক লোক। তবে ভূপীবোসের বন্ধুর কাজ করেছ। ওই চিহ্ন থেকে ওর ওই পাপ রোগটাকে ধরার সুযোগ করে দিয়েছ।

তখনও রক্তপরীক্ষার প্রণালী জানা ছিল না। অন্তত এদেশে ছিল না।

তারপর রঙলাল ডাক্তার বলেছিলেন—হ্যাঁ, তোমাকে আমি শেখাব। যতটা পার নিয়ে নাও তুমি আমার কাছ থেকে! কি? কি ভাবছ তুমি?

সে দিন তখন জীবন দত্ত ভাবছিলেন—ভূপী বোসের কথা, মঞ্জরীর কথা। যতক্ষণ রঙলাল ভূপীবোসের কথা বলছিলেন জীবন দত্ত অবশ্য চিন্তাশক্তিহীন মানুষের মত তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। রঙলালবাবু তাকে ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কথা শেষ করলেন, জীবন দত্ত তার উত্তরে প্রশ্ন করলেন—ভূপীর লিভারের দোষ হয়েছে? সেরেছে?

রঙলাল ডাক্তার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভূপীর জন্যে যেন তোমার মমতা রয়েছে জীবন?

জীবন এবার সচেতন হয়ে উঠলেন; লজ্জিত হলেন।

রঙলাল বললেন—তোমরা তো বৈষ্ণব ?

—হ্যাঁ।

—তাই। তারপর বললেন—ভূপীর অসুখ আপাতত সেরেছে। আবার হবে। ওটা বাঁচবে না বেশীদিন। ওতেই মরবে। যোগাযোগ যে ভারী বিচিত্র। ছোকরার স্ত্রী,—এক ধরণের মা আছে দেখেছ, রোগা ছেলেকে খেতে দেয় লুকিয়ে, ঠিক সেই রকম! ডাক্তার বারণ করেছে, ভূপী মদের জন্য ছটফট করছে—স্ত্রী গোপনে লোককে বকশিশ দিয়ে মদ আনিয়ে স্বামীকে দিচ্ছে, বলে—বেশী খেয়ো না, একটু খাও। আশ্চর্যের কথা হে, নিজের গহনা বিক্রী ক'রে করছে। অদ্ভুত। পুরাণে আছে, সতীস্ত্রী মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বামীকে বাঁচায়। আর এ মেয়েটা, ভালবাসায় তো তাদের চেয়ে খাটো নয়, কিন্তু এ মৃত্যুকে ডেকে এনে স্বামীকে তার হাতে তুলে দেয়। অদ্ভুত!

এর পর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন জীবন ডাক্তার। স্থান, কাল, পাত্র সব তিনি ভুলে গেলেন, মুছে গেল চোখের সম্মুখ থেকে। অর্থহীন একাকার হয়ে গেল। রঙলাল ডাক্তার সচেতন ক'রে তুললেন জীবন দত্তকে। বললেন—ছেড়ে দাও ওই পচা ধনীর ছেলেটার কথা। ওসব হল মানুষের নিজের পাপে সৃষ্টির অপব্যয়। এখন শোন যা বলছি। শিখবে তুমি ডাক্তারি? আমার মত কঠিন নয় তোমার পক্ষে। তুমি চিকিৎসা জান—রোগ চেন। তোমার পক্ষে অনেক সহজ হবে। আমি এদেশের জন্যে অনুবাদ করেছি ওদের চিকিৎসাশাস্ত্র। পড়ে ফেললেই তুমি পারবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব। শেখাব। পড়াব।

এবার জীবন দত্তের কান এড়াল না। মুহূর্তে তাঁর সব উদাস অবসন্নতা দূর হয়ে গেল। আগুন জ্বলে উঠল জীবনে।

মঞ্জরী আর ভূপী বোস একদিন মেঘ আর বাতাসের মত মিলে তার জীবনের সদ্য প্রজ্বলিত বহ্নির উপর দুর্যোগের বর্ষণ ঢেলে নিভিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বনস্পতির কাণ্ড থেকে শাখাগ্র পর্যন্ত প্রসুপ্ত বহ্নির ধারা নেভেনি। সে আবার জ্বলল! ভুলে গেলেন মঞ্জরীকে—ভূপীকে। আতর বউকেও মনে ছিল না। সেদিন সামনে ছিলেন রঙলাল ডাক্তার। হাতে ছিল—মোটা বাঁধানো খাতা—চোখের সামনে ছিল ভবিষ্যৎ। উজ্জ্বল দীপ্ত।

(চোদ্দ)

এরপর চার বৎসর—জীবন দত্তের জীবনের বোধ করি উদয়লগ্ন।

নূতন জন্মান্তর। অথবা নূতন জন্ম লাভের তপস্যা।

রঙলাল ডাক্তার মধ্যে মধ্যে রহস্য করতেন। একবার বলেছিলেন—তাই তো হে জীবন; মনে বড় আক্ষেপ হচ্ছে। মনে হচ্ছে বিবাহ একটা করলাম না কেন?

এ কথা হত রাত্রে। বারান্দায় বসে নিয়মিত পরিমাণ ব্রাণ্ডি খেতেন আর চুরুট টানতেন; জীবন দত্ত থাকলে—জীবনের সঙ্গে গল্প করতেন, নইলে বই পড়তেন, কোন কোন দিন মনা হাড়িকে ডেকে তার সঙ্গেই গল্প বলতেন। তিনি গল্প বলতেন না, গল্প বলত মনা, তিনি শুনতেন। ভূতের গল্প; তিনি শুনতেন আর মধ্যে মধ্যে অট্টহাস্যে ফেটে পড়তেন।

জীবন দত্তকে তাঁর খাতাপত্র দিয়েছিলেন—দত্ত সে সবগুলি পড়তেন নিজের বাড়ীতে, যথারীতি কবিরাজী পদ্ধতিতে চিকিৎসাও করে যেতেন, দু-চারদিন অন্তর সকালের কাজ সেরে খাওয়াদাওয়া ক'রে চলে যেতেন রঙলাল ডাক্তারের ওখানে। যা বুঝতে পারতেন না বুঝিয়ে নিতেন। যে অংশটুকু পড়েছেন তাই বলে যেতেন, ডাক্তার শুনতেন। এই অবস্থাতেই—কোন কোন দিন আসন্নমৃত্যু রোগীর বাড়ীর অবিলম্ব আহ্বান জানিয়ে ডাক আসত; ডাক্তার বিবরণ শুনে কোনটাতে যেতেন না; যেটাতে যেতেন—জীবন দত্ত সঙ্গে যেতেন। গুরু যেতেন পাল্কীতে, জীবন দত্ত যেতেন হেঁটে। সবল সুস্থ দেহ—আটত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, ওজনে দু মণের উপর, বিরাট মুগুর-ভাঁজা শক্ত শরীর—জীবন দত্ত জোয়ান হাতীর মতই ভারী পা ফেলে সমানে বেহারাদের সঙ্গে চলে যেতেন।

সেদিন সন্ধ্যাতেই একটি ডাক এসেছিল।

তার কয়েক দিন আগে থেকে গুরু শিষ্যের মধ্যে গুরুর মনে অন্তত বিরক্তির সুর বেজে উঠেছিল। ক'দিন থেকেই রঙলাল ডাক্তার জীবন দত্তকে তাঁর সেই কাচের ঘরে মড়া কাটবার জন্য বলছিলেন। জীবন দত্ত প্রথম দিন মড়া কেটেছিলেন কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় রাত্রে খাওয়ার পর বমি

করে ফেলেছিলেন। তারপর দিন পাঁচেক আর গুরুগৃহের দিকে পা বাড়ান নাই। ছ দিনের দিন—ভেবেছিলেন সেই পচা মড়াটা নিশ্চয় ডাক্তার ফেলে দিয়েছেন। সে দিন যাওয়া মাত্র তিরস্কার করেছিলেন গুরু। এবং মনাকে হুকুম করেছিলেন—আর একটা নিয়ে আয় মনা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মনা একটা বছর পাঁচেকের মেয়ের শব এনে হাজির করেছিল। এ অঞ্চলে হিন্দুরাও পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শব দাহ করে না, মাটিতে পুতে দেয়। সেদিন জীবন দত্ত হাত জোড় ক'রে বলেছিলেন—এ আমি পারব না। ওই শিশুর দেহের উপর—। ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন—বিশ্বাস করুন—আমার মেয়েটা ঠিক এমনি দেখতে। ঠিক এমনি। এমনি চুল—এমনি গড়ন—!

রঙলাল ডাক্তার তার দিকে যে চোখ তুলেছিলেন—সে চোখ উগ্র-বিস্ফারিত। কিন্তু দেখতে দেখতে সে দৃষ্টি কোমল হয়ে এসেছিল। বলেছিলেন—আচ্ছা থাক। চল চল। তুমি বাংলায় গিয়ে বস—এটাকে আমি ডি-সেকসন করে যাই। মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে—অত্যন্ত হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। রোগের কোন চিহ্ন নেই।

সত্যই মেয়েটি দেখতে অনেকটা জীবন ডাক্তারের প্রথম সন্তান—সুষমার মত। আতরবউয়ের তখন দুটি সন্তান হয়েছে; বড়টি মেয়ে সুষমা, তারপর ছেলে বনবিহারী।

জীবন দত্ত কাচের ঘর থেকে বেরিয়ে আর অপেক্ষা করেন নাই, বাড়ী চলে এসেছিলেন। গুরুর মনে বিরক্তির সুর বেজে উঠেছিল এই কারণে। জীবন দত্ত আশঙ্কা করছিলেন—রঙলাল ডাক্তার এইবার বলবেন—আর এস না তুমি। তোমা থেকে এ হবে না!

আবার দিন কয়েক পর জীবন দত্ত যেতেই গুরু সেই কথাই বলেছিলেন, বস। কয়েকটা কথা বলব তোমাকে। জীবন শঙ্কিত হয়ে বসেছিলেন। ডাক্তার চুরুট টেনে চলেছিলেন। কিছুক্ষণ পর চুরুটটা নামিয়ে রেখে বলেছিলেন—জীবন, তোমাকে যেমনটি গড়ে তুলব ভেবেছিলাম—তা হ'ল না। তোমার মধ্যে সে শক্তি নাই। তা ছাড়া ইংরেজী ভাল না জানলে এ শাস্ত্রে গভীর

করে দেব। কিন্তু সেও দেখছি সহজ নয়। আমার বিরক্তি লাগে এবং তোমার পক্ষেও এ বিদ্যার শিক্ষা-পদ্ধতির একটা বড় অংশ অত্যন্ত অরুচিকর। সে অরুচি কাটানো তোমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

ডাক্তার চুপ করেছিলেন।

আবার বলেছিলেন—তোমার বাবা তোমার ধাতুকে পুড়িয়ে পিটিয়ে শক্ত করে গড়ে গিয়েছেন—তাকে নূতন করে না গালিয়ে আর নতুন কিছু করা যাবে না। তলোয়ার আর খড়্গ দুটোই অস্ত্র, কিন্তু প্রভেদ আছে। তলোয়ার দিয়ে মহিষ বলি হয় না—আর খাঁড়া দিয়ে এ যুগের যুদ্ধ হয় না। বুঝেছ?

ঠিক এই মুহূর্তেই এল একটি ডাক। এ অঞ্চলের একটি নাম করা বাড়ী থেকে ডাক। বাড়ীটির সঙ্গে রঙলাল ডাক্তারের প্রথম চিকিৎসার কাল থেকেই কারবার চলে আসছে। তারও চেয়ে যেন কিছু বেশী। একটি প্রীতির সম্পর্কও বোধ করি আছে। এ দেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে রঙলাল ডাক্তারের একটা অবজ্ঞা আছে। কিন্তু এ বাড়ী সম্পর্কে ঠিক অবজ্ঞা নাই। বাড়ীর গৃহিনীর কঠিন অসুখ। বিচিত্র অসুখ। মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রোগ মারাত্মক হয়ে উঠেছে। মহিলাটি আগে থেকেই অম্বলের ব্যাধির রোগিনী। তিনি আজই ঘণ্টা দুয়েক আগে পায়ে হুঁচোট লেগে বাড়ীর উঠানে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এই অবস্থা। ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছেন। নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। কথাও প্রায় বলতে পারছেন না। চোয়াল পড়ে গিয়েছে।

রঙলাল ডাক্তার বিস্মিত হলেন। কতক্ষণ আগে পড়ে গেছেন বলছ?—

—এই ঘণ্টা দুয়েক।

—মাত্র দু ঘণ্টা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাই তো। এত শিগ্‌গির? মনা, বেহারাদের ডাক।

জীবন ডাক্তারও নীরবে গুরুর অনুসরণ করছিলেন।

রঙলাল ডাক্তার প্রথমটা লক্ষ্য করেন নাই; মধ্যপথে জীবনকে [illegible]।

[illegible]র্ক চুকিয়ে দেওয়ার জন্যই কথা সুরু করেছিলেন। কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই এই ডাকটি এসে পড়েছিল।

আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে সে ছবি।

বর্দ্ধিষ্ণু ঘর, রাঢ় অঞ্চলের মনোরম মাটির কোঠা অর্থাৎ দোতালা, প্রশস্ত, [illegible]কা মেঝে, চুণকাম করা দেয়াল। উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল—সে আমলের শৌখীন শেড দেওয়া চব্বিশ-বাতী টেবিল ল্যাম্প!

অনেকগুলি লোক—আত্মীয় স্বজন—দূরে বসে রয়েছে।

একটি বিছানায় রোগিণী ছিলায় টান দেওয়া ধনুকের মত বাঁকা অবস্থায় পড়ে [illegible]ছেন। এর উপরেও কেউ যেন টান দিচ্ছে; অদৃশ্য কেউ যেন মেরুদণ্ডে [illegible]টু লাগিয়ে সবল বাহুর আকর্ষণে টঙ্কার দিয়ে টানছে। রোগিণীর ওষ্ঠাধর [illegible]চবদ্ধ। চোয়াল পড়ে গিয়েছিল এ কথা সত্য কিন্তু তবু জীবন দত্ত বুঝতে পারলেন—অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে ওই ক্ষীণকায়া মেয়েটি এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা [illegible]হ্য করে চলেছেন। শুধু ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে যন্ত্রনার পরিচয় বেরিয়ে আসছে। তার সঙ্গে একটু অস্ফুট শব্দ। সেটুকুকে আর চাপতে পারছেন না ভদ্রমহিলা।

রঙলাল ডাক্তারও স্থির দৃষ্টিতে রোগিণীকে দেখছিলেন। বোধ হয় পাঁচ মিনিট পর বললেন—আজই হুঁচোট লেগে দু'ঘণ্টার মধ্যে এমন হয়েছে?

—হ্যাঁ, দু'ঘণ্টাও ঠিক হবে না।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল রঙলাল ডাক্তারের,—কই কোথায় হুঁচোট লেগেছে? রক্ত পড়েছে?

—ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে। রক্তপাত হয় নি।

রঙলাল ডাক্তার পায়ের বুড়ো আঙুলে হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানাই যেন শিউরে উঠল; নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় রোগিণী পাশবদ্ধ পশুর মত একটা অবরুদ্ধ আর্তনাদ করে উঠলেন। জীবন তখনও অবাক বিস্ময়ে রোগিণীকে দেখছিল—কি অপরিসীম ধৈর্য! চোখের দৃষ্টিতে সে যন্ত্রণার পরিচয় ফুটে উঠেছে; চোয়াল পড়ে গেছে; কণ্ঠ দিয়ে আর্তস্বর বের হচ্ছে, তাকে প্রাণপণে [illegible]

ক্ষত কোথাও হয়নি, রক্তপাতের চিহ্ন নাই; বেঁকে যাচ্ছেন অসহ্য যন্ত্রণায়; শুধু তাই নয়—শরীরের কোন স্থানে পাথীর পালকের স্পর্শেও অসহ্য যন্ত্রণায় রোগিণী থর থর করে কেঁপে উঠছেন। কণ্ঠ দিয়ে অবাধ আর্তস্বর বের হচ্ছে—উঃ—!

নাড়ী দেখলেন রঙলাল। রোগিণী আবার যন্ত্রণাকাতর অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন। স্নায়ু শিরাগুলি এমনই কঠিন টানে টান হয়ে উঠেছে যে, সামান্য স্পর্শেই ছিঁড়ে যাবার মত যন্ত্রণায় অধীর ক'রে তুলছে।

রঙলাল ডাক্তার ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন। গম্ভীর মুখে বললেন—দেখ তো জীবন; তোমার নাড়ী জ্ঞানে তুমি কি পাচ্ছ?

স'রে দাঁড়ালেন তিনি।

সন্তর্পণে এসে বসলেন জীবন দত্ত। আশঙ্কায় একবার বুকটা কেঁপে উঠল। শুক্রাচার্যের মত রঙলাল ডাক্তারের কাছে আজ পরীক্ষা দিতে হবে। নাড়ী অনুভবের অবকাশ তিনি পান নি, যেটুকু পেয়েছেন তার মধ্যে নাড়ীর স্পন্দন আছে কি নাই তাও বুঝতে পারেন নি। রঙলাল ডাক্তার রোগীর মণিবন্ধ মোটা আঙুলে টিপে ধরে নাড়ী পরীক্ষা করেন। স্পন্দনের সংখ্যা গুণে দেখেন। মধ্যে মধ্যে তাতে ছেদ পড়ছে কি না দেখেন। এর বেশী কিছু না। বেশী বুঝতে কোন দিন চেষ্টাও করেন না।

রোগিণীর হাতখানি বিছানার উপরে যেমন ভাবে ছিল—তেমনি ভাবেই রইল; জীবন দত্ত শুধু মণিবন্ধের উপর আঙুলের স্পর্শ স্থাপন করলেন। চোখ বন্ধ ক'রে পারিপার্শ্বিকের উপর যবনিকা টেনে দিলেন। প্রায় রিক্ত-পত্র অশ্বত্থ গাছের একটি সরু ডালে একটি মাত্র পাতা, অতি ক্ষীণ বাতাসের প্রবাহে দৃষ্টির অগোচর কম্পনে কাঁপছে; সেই কম্পন অনুভব করতে হবে; অথচ অসতর্ক রূঢ় স্পর্শ হলেই পাতাটি ভেঙে ঝরে যাবে। অতিসূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতিকে প্রবুদ্ধ করে তিনি বসলেন। ধ্যানস্থ হওয়ার মত।

তাঁর বাবা বলতেন—শক্তির ধর্মই হল ব্যবহারে সে সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ হয়। অনুভূতি হল পরম সূক্ষ্ম শক্তি।

ক্ষীণ ও অতি ক্ষীণ স্পন্দন অনুভব করলেন তিনি। কখনও কখনও হারিয়ে যাচ্ছে যেন।

কাণে এল রঙলাল ডাক্তারের কণ্ঠস্বর—পাচ্ছ ?

অতি সন্তর্পণে ঘাড় নেড়ে জীবন দত্ত জানালেন—পাচ্ছি। যেন তাঁর ঘাড় নাড়ার সঙ্গে হাত না নড়ে ওঠে। দেহ-চাঞ্চল্যে মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে কোন কম্পন-তরঙ্গের আঘাত না লাগে।

—কিছু বুঝতে পারছ ? দেখ, ভাল ক'রে দেখ !

জীবন এবার কোন ইঙ্গিত জানালেন না। তিনি ধ্যানযোগকে গভীর এবং গাঢ় করে তুলতে চেষ্টা করলেন। জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রদীপের শিখাকে উজ্জ্বলতর করে তুলে ধরে—রোগের অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। বাবা শিখিয়েছিলেন—

জ্ঞান বুদ্ধি প্রদীপেন যো নাহ বিশতি তত্ত্ববিৎ
আতুরস্যান্তরাত্মানাং ন স রোগাং চিকিৎসতি।

কতক্ষণ অনুভব করেছিলেন নাড়ী তাঁর নিজের ঠিক হিসাব ছিল না।

অনুভব করলেন নাড়ী যত ক্ষীণই হয়ে থাক এ নাড়ী অসাধ্য নয়। উচ্চস্থান থেকে পড়ে গেলে বা ভগ্ন অস্থি সংযোজন-কালে, অতিসারে, অজীর্ণ রোগে, বাতরোগে এমন হয়। কিন্তু অসাধ্য নয়। এখানে দুটি কারণ একসঙ্গে জুটেছে। অকস্মাৎ একটা নদীর বন্যার সঙ্গে আর একটা নদীর জল মিশে দেহ-ক্ষেত্রখানাকে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়েছে। অজীর্ণ রোগে জীর্ণ-দেহে পড়ে যাওয়ার আঘাতের ফলে এমন হয়েছে। প্রয়োজন এখন আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় কুপিত বায়ুর প্রভাবে শরীরের স্নায়ু-শিরাগুলির সংকোচন দূর করা।

—কি দেখলে ? রঙলাল ডাক্তার প্রশ্ন করলেন এবং ব্যগ্রতার সঙ্গেই করলেন।

—আজ্ঞে ? সবিনয়েই জীবন বলেছিলেন,—নাড়ী দেখে তো একেবারে অসাধ্য মনে হচ্ছে না। তিনি নিজের নির্ণয়ের কথা বলে বলেছিলেন, ধনুষ্টঙ্কার নয়।

রঙলাল ডাক্তার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন—হাঁ, টিটেনাস তো নয়ই এবং তুমি যা বলছ তাই খুব সম্ভব ঠিক। তুমি বলছ অসাধ্য

নয়। জীবনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—কিন্তু সাধ্য হবে কি করে? চোয়াল পড়ে গেছে—ওষুধ যাবে না। শরীরের কোথাও হাত দেবার উপায় নাই, মালিশ করা যাবে না। সাধ্য হবে কিসে?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এলেন রঙলাল ডাক্তার।

বাইরে একান্তে জীবন বলেছিল—আপনি ওষুধ দিন, চামচ বা ঝিনুকে ক'রে ফোঁটা ফোঁটা মুখে দেওয়া হোক। আর—আপনি অনুমতি করলে আমি একটা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করি। তাতে ওই বায়ুপ্রকোপের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসবে। স্নায়ুশিরার টানভাবটা কমে আসবে। চোয়ালও খুলবে বোধ হয়।

—মুষ্টিযোগ?

—আমাদের বংশের সংগ্রহ করা মুষ্টিযোগ। আমার পিতামহ পেয়েছিলেন এক সন্ন্যাসী চিকিৎসকের কাছে। তাল গাছের কচি মাজপাতা, যা এখনও বাইরের আলোবাতাস পায় নি, তাই গরম জলে সিদ্ধ করে, সেই জলের ভাপ—

—দিতে পার, দেখতে পার। আমার কাছে ও মরার সামিল। ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। জীবন রইল। আশা আমি করছি না। তবে এ অবস্থা কাটলে, চোয়ালটা ছাড়লে—আমাকে খবর দিয়ো। জীবন একটা মুষ্টিযোগ দেবে। ঠিক মত সব হয় যেন। বুঝলে?

সমস্ত রাত্রি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন জীবন ডাক্তার।

গরম জলের ভাপ-দেওয়ার তত্ত্বাবধান করলেন। রাত্রি বারোটার পর অসহনীয় যন্ত্রণা কমল। জীবন নাড়ী দেখলেন। মুখ প্রফুল্ল হ'ল। প্রশ্ন করলেন—এবার একটু দেখুন তো—গায়ে সেঁক নিতে পারেন কি না?

নিজেই জল নিঙড়ানো গরম কাপড়ের টুকরাটা সন্তর্পণে রোগিণীর হাতের উপর রাখলেন। লক্ষ্য করলেন—দেহে কম্পন ওঠে কি না। উঠল না। প্রশ্ন করলেন—পারবেন সহ্য করতে? কষ্ট হবে জানি, কিন্তু সহ্য করতে হবে।

অসাধারণ রোগিণী। মূর্তিমতী ধরিত্রীর মত সহ্যশক্তি। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন তিনি। উৎসাহিত হলেন জীবন। নিজেই বসলেন সেঁক দিতে। ওষুধ চলছিল ফোঁটা ফোঁটা। ঘণ্টাখানেক পর রোগিণীর অবস্থা

লক্ষ্য ক'রে বললেন—একটু বেশী বেশী দিয়ে দেখুন তো। ওষুধ মুখে দিচ্ছিলেন—আর একটি মহিলা। নীরবে চলছিল জীবন মৃত্যুর যুদ্ধ।

ক্রমে তৃতীয় প্রহর শেষ হল। জীবন ডাক্তার এবার লক্ষ্য করলেন—প্রচণ্ড শক্তিতে গুণ দিয়ে বাঁকানো ধনুকের দণ্ডের মত দেহখানি, ধীরে ধীরে সোজা হচ্ছে, সন্তর্পণে সভয়ে রোগিণী সোজা হতে চাচ্ছেন; যেন ধীরে ধীরে গুণ শিথিল করে দিচ্ছে কেউ।

জীবন মৃদুস্বরে বললেন—দেখুন তো মা, হাঁ করতে পারেন কি না?

পারলেন, স্বল্প হলেও তার মধ্যে জিহ্বা সঞ্চালিত হবার স্থান পেলেন, চাপা উচ্চারণে বললেন—পারছি।

এবার পূর্ণ এক দাগ ওষুধ খাইয়ে সেঁকের ভার রোগিণীর ছেলের উপর দিয়ে বললেন—বাইরের বারান্দায় আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিন। একটু বিশ্রাম করব। আমার বিশ্বাস সূর্য উদয় হলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন উনি—আর ভয় নাই।

প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েই বললেন জীবন দত্ত। বায়ুর কাল চলে গিয়েছে; এবার কাল হয়েছে অনুকূল। ঝড় থেমেছে; অনুকূল মৃদু বাতাসে নৌকার মতই জীবনতরী এবার পৃথিবীর কূলে এসে ভিড়বে।

তাই হয়েছিল। সেদিনের আনন্দ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ।

গুরু রঙলাল ডাক্তারকে বিস্মিত করতে পেরেছিলেন তিনি।

বেলা তখন আটটা। রঙলাল ডাক্তার রোগী দেখছিলেন। এ সময় তিনি ফিজ নিতেন না। রোগী দেখতে দেখতেই তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকালেন।

কান থেকে স্টেথেসকোপটা খুলে প্রশ্ন করলেন, বাঁচাতে পেরেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিপদটা আপাতত কেটে গিয়েছে।

—বাঃ। আজ এইখানে থাক। বিশ্রাম কর।

দুপুর বেলা নিজে রোগিণীকে দেখে এসে খুশী হয়ে বলেছিলেন, এর ক্রেডিট বারো আনা তোমার জীবন। আমার ওষুধে এমন কিছু ছিল না। যা ছিল তার পাওনা সিকির বেশী নয়। মেয়েটির এখন কবিরাজের চিকিৎসার প্রয়োজন। আমি বলেছি কবরেজী মতে চিকিৎসা করাতে। তুমি ব্যবস্থা কর।

সেইদিন রঙলাল ডাক্তার রাত্রে ব্র্যাণ্ডির রঙীন আমেজের মধ্যে মৃদু হেসে ওই কথাটা বলেছিলেন; বলেছিলেন, আক্ষেপ হচ্ছে হে জীবন—একটা বিয়ে করি নি কেন? তারপর হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন।

হাসি থামিয়ে আবার বলেছিলেন—কেন বললাম জান?

স্নেহে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন জীবন। অভিভূত ভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আজ্ঞে?

—তুমি আমাকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের সঙ্গে তুলনা কর সেটা আমি শুনেছি। আমি তাতে রাগ করি না। শুক্রাচার্য বিরাট পুরুষ। হোক এক চোখ কানা। হাসতে লাগলেন আবার। তারপর বললেন—আজ আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে কচের সঙ্গে তুলনা করতে।

হা-হা ক'রে হাসতে লাগলেন।—বিয়ে করলে একটা দেবযানী পেতাম হে

(পনেরো)

আরও একবৎসর পর রঙলাল ডাক্তার তাঁকে বিদায় দিলেন।

হঠাৎ চিকিৎসা ছেড়ে দিলেন। বললেন—আর না। এইবার শুধু পড়ব আর ভাবব। জীবন এবং মৃত্যু। লাইফ এ্যাণ্ড ডেথ, তার পিছনের সেই প্রচণ্ড শক্তি—তাকে ধারণা করবার চেষ্টা করব। আর দেশী গাছ-গাছড়া নিয়ে একখানা বই লিখব।

জীবনকে বলেছিলেন—তোমার ডাক্তারি শেখাটা বোধ হয় ঠিক হল না জীবন। ওই সব বিচিত্র অবিশ্বাস্য মুষ্টিযোগ নিয়ে যদি গবেষণা করতে পারতে? কিন্তু তাও ঠিক পারতে না তুমি। তোমার সে বৈজ্ঞানিক মন নয়। কার্য হলেই তোমার মন খুশী। কেন হল—সে অনুসন্ধিৎসা তোমার মনের নেই। যাক। তুমি বরং ডাক্তারি, কবিরাজী, মুষ্টিযোগ তিনটে নিয়েই তোমার ট্রাইসাইকেল তৈরী কর। ওতে চড়েই যাত্রা সুরু কর। নিজেরই একটা স্টেথোসকোপ তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন; থার্মোমিটার দেন নি, কিনতেও বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন—ওর দরকার নেই তোমার।

এরপরও জীবন দত্ত মধ্যে মধ্যে যেতেন। রঙলাল ডাক্তার দেখা করতেন কিন্তু চিকিৎসা সম্পর্কে কোন আলোচনা করতেন না। প্রশ্ন করলে বলতেন—ভুলে গিয়েছি। এখন বাগান করছি, গাছ-গাছড়ার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে কর।

আসল উদ্দেশ্য ফুলের বাগান নয়, রঙলাল ডাক্তার নিজের সমাধি ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন। ওইখানেই তাঁকে মৃত্যুর পর সমাধিস্থ করা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছানুসারেই হয়েছে। তিনি উইল ক'রে গিয়েছিলেন। সেই উইলে তিনি লিখেছিলেন—তাঁকে যেন সমাধি দেওয়া হয়। এই বাগানের মধ্যে।

একা ঘরের মধ্যে মরেছিলেন। মৃত্যুকালে ঘরের মধ্যে—কাছে কেউ ছিল না। সেও তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে। মনা হাড়ি ছিল দরজায় পাহারা। মনা অঝোর-ঝরে কেঁদেছিল কিন্তু ঘরে ঢুকতে কাউকে দেয় নি। বলেছিল—সে পারব না। বাবার হুকুম নাই।

ওই রঙলাল ডাক্তারের দেওয়া স্টেথেসকোপ নিয়ে—তিনি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সুরু করলেন। কবিরাজী ত্যাগ করলেন না। মুষ্টিযোগও রইল। সেই-বারই দত্ত মশায়দের চিকিৎসালয়ের নামকরণ করলেন—'আরোগ্য-নিকেতন'।

নবগ্রামে তখন হরিশ ডাক্তার খুলেছে—হরিশ ফার্মেসী।

ধনী ব্রজলালবাবু দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে নাম দিয়েছে—পিয়ারসন চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী।

হোমিওপ্যাথ এসেছে একজন—পাগল ছিল লোকটা—নামে বলত—কে-এম-ব্রারোরী—অর্থাৎ ক্ষেত্র মোহন বাড়ুড়ী। তার ডিসপেন্সারীর নাম ছিল—"ব্রারোরী হোমিও হল"।

জীবন দত্ত কলকাতায় এলোপ্যাথিক ওষুধ কিনতে গিয়ে—ওই সাইন-বোর্ডটা লিখিয়ে এনেছিলেন।—'আরোগ্য-নিকেতন'।

ওঃ—উদ্যোগপর্বে আতর বউয়ের সে কি রাগ!

এ্যালোপ্যাথিক ওষুধ—আলমারী—এবং সরঞ্জামপাতি কিনবার জন্য পাঁচশো টাকায় পাঁচবিঘে জমি বিক্রী করেছিলেন তিনি। রাগ ক্ষোভ তাঁর সেই জন্যে।

ক্ষোভের দোষ ছিল না। জগতমশায়ের আমল থেকে তাঁর আমলে তখন পর্যন্ত ওষুধের দাম পাওনা হাজার টাকারও বেশী। গরীবদের কাছে পাওনা ছিল—সে কম। স্বচ্ছল অবস্থার লোকের কাছেই পাওনা বেশী। কিন্তু তার মধ্যে শতখানেক টাকার বেশী আদায় হল না।

এর জন্য ক্ষোভ তাঁর নিজেরও হয়েছিল। কিন্তু আতর বউয়ের ক্ষোভ স্বতন্ত্র বস্তু। সে ক্ষোভ তাঁর উপর—এবং ক্ষমাহীন; আতর বউয়ের উপর ক্ষোভের আপাত উপলক্ষ্য যাই হোক, ক্ষোভ প্রকাশ হলেই মুহূর্তে মূল কারণ বেরিয়ে পড়ে, সেটা তাঁর উপর ক্রোধ। একটা অনির্বাণ চিতার মত অসন্তোষের বহ্নিদাহ! কোন উপলক্ষ্যে ক্ষোভের সুযোগ হলেই সেই ফুৎকারে হু হু করে জ্বলে ওঠে।

তখন ওই জমি বিক্রীর উপলক্ষ্য নিয়ে তার মনের আগুন জ্বলেছিল। মনে পড়ছে, পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়ে—টাকা পাওয়া দূরে থাক কটু কথা শুনে তখন তাঁর নিজের মনেও ক্ষোভ জমেছিল। ওষুধের বাকীর প্রসঙ্গে লোকে বলেছিল—পঞ্চাশ টাকা? ওষুধের দাম? কি ওষুধ হে? সোনাভস্ম না মুক্তাভস্ম না মাণিকভস্ম—কি দিয়েছিলে? পঞ্চাশটাকা? গাছ-গাছড়া আর গিয়ে এটা-ওটা টুকি-টাকি—আর তো তোমার "রসসিন্দুর"—এর দাম পঞ্চাশ টাকা? যা ইচ্ছে-তাই খাতায় লিখে রেখেছ? হরি-হরি-হরি!

এ নিয়ে আর বাদপ্রতিবাদ করেন নি জীবন ডাক্তার। ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। এবং ফিরবার পথেই সাহাদের শিবু সাহাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরেছিলেন। ডাক্তারখানা তিনি করবেনই। বুকের ভিতর তখন অনেক আশা। অনেক আকাঙ্ক্ষা! রঙলাল ডাক্তারের স্থান তিনি পূর্ণ করবেন। তিনি যাবেন—রোগীর বাড়ীতে আশার প্রসন্নতা ফুটে উঠবে। তিনি নাড়ী ধরবেন—রোগীর দেহে রোগ সচকিত হয়ে উঠবে। নবগ্রামের অহঙ্কারী জমিদার সমাজ সম্ভ্রমে বিনত হবে; শুধু নবগ্রাম কেন? সারা অঞ্চলের ধনী সমাজ জমিদার সমাজ বিনত হবে। বড় ঘোড়া কিনবেন। সাদা ঘোড়া। পাল্কীও রাখবেন একখানা। বেশী দূরের পথে যাবেন পাল্কীতে। এ অঞ্চল বলতে সীমানা তো কম নয়—পূর্বে গঙ্গার ধার পর্যন্ত—

কান্দী-বজান—পাঁচথুপি। এ দিকে অজয়ের ধার পর্যন্ত। কান্দী গেলে ভূপীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসবেন। চিকিৎসা ক'রে তাকে সারিয়ে তুলবার নতুন আকাঙ্ক্ষা হয়েছে তাঁর। জীবনের তখন অনেক আশা। ছেলে বনবিহারীর বয়স মাত্র বছর তিনেক। তাকে ডাক্তারী পড়াবেন। বড় ডাক্তার ক'রে তুলবেন। মেডিকেল কলেজ থেকে এল-এম-এস পাশ ক'রে আসবে সে।

আজ যারা অবজ্ঞা ক'রে তাঁর পাওনা টাকা দিলে না, উপরন্তু ইঙ্গিতে অসাধুতার অপবাদ দিলে—তারাই তাঁর কাছে আসবে বিপদের দিনে। সে দিন তিনি তাদের—! না—ফিরিয়ে দেবেন না, কটু বলবেন না। যাবেন। তাঁর বংশের নাম হয়েছে 'মশায়ের বংশ'—বংশের মহদাশয়ত্ব ক্ষুন্ন করবেন না।

তিনি পথেই দাম-দর ক'রে জমি বিক্রীর কথাবার্তা পাকা করে বাড়ীতে এসে বললেন,—তুমি বস শিবু। আমি দুটো মুখে দিয়ে নি। তারপর বের হব। কাগজ কিনে লেখাপড়া শেষ ক'রে বাড়ী ফিরব। রেজেস্ট্রীর সময় তো তিন মাস—।

শিবু বলেছিল—দেখুন দেখি, লেখাপড়ারই বা তাড়া কিসের গো? আপনি মশায়ের বংশের সন্তান, আজ আপনিই মশায়। আমি টাকা এনে গুণে দিয়ে যাচ্ছি—লেখাপড়া রেজেস্টী হবে পরে!

শিবু পাঁচশো টাকা এনে দিয়ে গিয়েছিল সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা।

ওদিকে বাড়ীতে তখন আতর বউ আগুন ছড়াতে সুরু করেছে। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! সবই অদৃষ্ট! মা খেয়েছি, বাপ খেয়েছি, সারা বালিকা বয়েস মামা মামীর—বাঁদী-গিরি করেছি বিনা মাইনেতে। শ্বশুরবাড়ীতে শাশুড়ী খেলাম, শ্বশুর খেলাম। এইবার লক্ষ্মী বিদেয় হবেন তার আর আশ্চর্যি কি? আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—মেয়ে হয়েছে ছেলে হয়েছে—ওদের হাত ধরে ভিক্ষে করতে হবে আমাকে। পথে বসতে হবে।

জীবন দত্তের মাথার মধ্যেও আগুন জ্বলে উঠেছিল। তবু সে আগুনকে কঠিন সংযমে চাপা দিয়ে তিনি বলেছিলেন—ছি আতর বউ! ছি!

—কেন? ছি কেন? আমার অদৃষ্ট তো এই বটে। কোনখানটা মিথ্যে বল? শ্বশুর দেহ রাখবার আগের মাসেও এ বাড়ীতে জমি এসে

ঢুকেছে। আজ সবে চার বছর তিনি গিয়েছেন—এরই মধ্যে জমি বেরিয়ে গেল।

—এই বছর যেতে-না-যেতে আমি পাঁচ বিঘের জায়গায় দশ বিঘে কিনব।

—তা আর কিনবে না? কত বড় ডাক্তার হয়ে এলে, একবারে বিলাতী পাশ সায়েব ডাক্তার!

এবার আর সহ্য করতে পারেন নি জীবন ডাক্তার। কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন—আতর বউ!

চমকে উঠেছিল আতর বউ সে ডাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর—সুরু করেছিল কান্না। জীবন ডাক্তার সে কান্না গ্রাহ্য করেন নি। কাঁদুক, কাঁদতেই ওর জন্ম। ওই তার বোধ করি প্রাক্তন। কাঁদুক সে। তিনি কি করবেন?

সেই রাত্রেই তিনি কলকাতা রওনা হয়েছিলেন।

কলকাতা থেকে ওষুধ—আলমারী কিনে এনে—ওই সাইনবোর্ডটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন—আরোগ্য-নিকেতন।

সেতাব মুখুজ্জে এনে দিয়েছিল একটি গণেশ মূর্তি।

সুরেশ সিন্দুর দিয়ে তার নিচে লিখেছিল—শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

পাগলা নেপাল তাঁকে একখানা সে আমলের বাঁধানো নোটবুক এনে দিয়েছিল। নেপাল তখন কাজ করত নবগ্রামের ধনী ব্রজলালবাবুর বাড়ীতে। ব্রজলালবাবুর জামাই ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার; তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল নেপালের। খাতাখানা সে তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছিল। বলেছিল—নে, রঙলাল ডাক্তারের মত নোট ক'রে রাখবি। আরও এসেছিল সে দিন স্থানীয় ডাক্তারেরা। কৃষ্ণলালবাবুর বাড়ীর ডাক্তার হরিশ ডাক্তার এসেছিল; হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ক্ষেত্র বাড়ুড়ী—কে এম ব্যারোরি এসেছিল; এখানকার ইস্কুলের হেডমাস্টার এসেছিল। থানার দারোগা এসেছিল।

আর এসেছিল—শশীকে নিয়ে শশীর পিসীমা।

—বাবা জীবন!

—আপনি? কি হয়েছে? জীবন দত্ত ভেবেছিলেন—শশীরই কোন অসুখ হয়েছে।

—বাবা, শশীর বড় ইচ্ছে, খানিক আধেক চিকিৎসা শেখে। লেখাপড়া তো হল না। একটু আধটু শিখিয়ে দিলে ক'রে কম্মে খাবে।

শশী তখন নিতান্ত কচি। কত বয়স হবে? সতের আঠারো বছর। একটু পাগলাটে ভাব। ওই নেপালের মত। ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসত।

ওঃ—সে এক মনোহর রাত্রি। খাওয়া-দাওয়া, খেলা-ধূলা গান-বাজনা। এরই মধ্যে পাগল নেপাল এক কাণ্ড করেছিল। ওষুধের সঙ্গে কয়েক বোতল গোলাপ জল ছিল। নেপাল লুকিয়ে গোলাপ জল মাখতে গিয়ে—তাড়াতাড়িতে মাথায় দিয়েছিল ক্রেঞ্চ বার্ণিশ! আসবাবে দেবার জন্য জীবন দত্ত ওটা এনেছিলেন। তারপর সে এক কাণ্ড! মাথার চুলগুলিতে গালা জমে নেপালের আর দুর্গতির সীমা ছিল না! সে কি হাসি সকলের।

* * * *

—মশায়! কে যেন ডাকলে।

বৃদ্ধ জীবন দত্ত চকিত হয়ে ফিরে তাকালেন। অন্ধকার স্থানটায় আলোর ছটা পড়েছে। কে তাঁকে ডাকছে। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। অতীতকাল, বিশেষ ক'রে গৌরবময় অতীতকালের স্মৃতি বড় মধুর। তিনি একেবারে যেন ডুবে গিয়েছিলেন। এতক্ষণে বর্তমানে ফিরে এলেন। লোকটার হাতের আলোটা নিচের দিকে আলো ফেলেছে। হ্যারিকেনের মাথার ঢাকনির ছায়া পড়েছে উর্ধ্বাঙ্গে। আগে প্রদীপের তলায় থাকত অন্ধকার। এখন উপর নিচে দুই দিকেই।

—কে? প্রশ্ন করলেন জীবন দত্ত। পরক্ষণেই মনে হল সম্ভবত রতনবাবুর বাড়ীর লোক। বিপিনের অসুখ হয় তো বেড়ে উঠে থাকবে।

না। রতনবাবুর বাড়ীর লোক ত' নয়। যে গন্ধ লোকটির শরীর এবং কাপড়-চোপড় থেকে ভেসে আসছে তাতে মনে হচ্ছে সাধু-সন্ন্যাসী গোষ্ঠীর কেউ। গাঁজা-ভস্ম ধূলির ধোঁয়া-রুখু দেহচর্ম এবং চুলের গন্ধ মিশিয়ে একটা বিশেষ রকমের গন্ধ ওঠে এদের গায়ে, এ ঠিক সেই গন্ধ। সম্ভবত চণ্ডীমায়ের

মহান্তের দূত। কিছুদিন থেকেই বুড়া সন্ন্যাসীর অসুখের কথা শুনেছেন জীবন দত্ত।

জীবন দত্তের অনুমান মিথ্যা নয়। লোকটি চণ্ডীমায়ের মহান্তের চেলাই বটে। বললে—সাধুবাবাকে একবার দেখতে যেতে হবে।

—এই রাত্রে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্ধ্যা থেকে রক্ত ভেদ হচ্ছে। বড় কষ্ট। দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বললেন—জীবনকে একবার খবর দে! মালুম হোয় কি আজই রাতমে ছুটি মিলবে। সে একবার দেখুক।

বৃদ্ধের প্রাণ বড় শক্ত প্রাণ। কতবার যে এমন হল! অন্তত বিশ পঁচিশ বার। রক্তভেদ—নিদারুণ হিক্কা—নাড়ী ছেড়ে যাওয়া, এ সব হয়েও বৃদ্ধ বেঁচে উঠেছে।

একমাত্র কারণ গাঁজা। কিন্তু গাঁজা বুড়ো কিছুতেই ছাড়বে না। মদ খায় না এমন নয়। খায় কিন্তু পর্বে পার্বণে অতি সামান্য। তন্ত্রের নিয়ম রক্ষা করে। মদ্য পানকে বলে—চুক চুক! জীবন দত্তই তাকে বরাবর ভাল করেছেন। ডাক্তারি ওষুধ বুড়ো খায় না। ইনজেকশনকে বড় ভয়। মশায়-বাড়ীর টোটকার উপরেই তার একমাত্র বিশ্বাস। তাও খুব কঠিন হয়ে উঠলে তবে বুড়া জীবনকে ডাকে বলে, দেখ্ তো ভাই জীবন। তলব কি আইল ?

জীবন দত্ত উঠলেন।

বৃদ্ধ বয়স, রাত্রি প্রহর পার হয়ে গিয়েছে; বোধ হয় সাড়ে দশটা। শ্রাবণ মাস, দিন বড় রাত্রি ছোট, হবে বৈ কি সাড়ে দশটা। তবু যেতে হবে। উপায় কি ? চল।

—আতর বউ!

—কি ? রুক্ষ স্বরেই জবাব দিলেন আতর বউ।

—বেরুতে হচ্ছে। ঘুরে আসি একবার।

—এই রাত্রে কোথায় যাবে ? কার বাড়ী ? না, যেতে হবে না তোমাকে। অনেক ডাক্তার আছে। অল্প বয়েস, বিদ্বান, বড় বড় পাশ করা। তারা যাক। এই বয়েস তোমার—তোমাকে ডাকতে এসেছে শুধু টাকা দেবে না মশায়। যেয়ো না তুমি।

জীবন ডাক্তার কোমল স্বরেই বললেন—চণ্ডীতলার সাধুবাবার অসুখ আতর বউ।

ওই কথাতেই অনেক কিছু বলা হয়ে গেল। আতর বউও মুহূর্তে নরম হয়ে গেলেন। তাই বা কেন? একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। বললেন—সাধুবাবার অসুখ? কি হয়েছে?

—কি হবে? সেই যা হয়। রক্তভেদ—পেটে যন্ত্রণা।

—এবার তা হলে বাবা দেহ রাখবেন। বয়স তো কম হ'ল না।

—দেখি! বলে তো পাঠিয়েছেন—জীবনকে ডাকো—তলব আইল কি না দেখুক। দেখি!

ভারী জুতোর শব্দে স্তব্ধ পল্লীপথের দুপাশের বাড়ীর দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে বৃদ্ধ হস্তীর মত জীবন ডাক্তার চললেন—গ্রাম পার হয়ে—স্বল্প বিস্তৃতির একখানি মাঠ পার হয়ে—নবগ্রামের পূর্বপ্রান্তে ঘন জঙ্গলে ঘেরা দেবাশ্রমের দিকে। বর্ষার রাত্রি—অবশ্য অনাবৃষ্টির বর্ষা—তবুও রাস্তা পিছল, একটু সাবধানেই পথ চলতে হচ্ছিল। আলো নিয়ে সাধুর অল্পবয়সী চেলাটি দ্রুত পদেই চলেছে—ডাক্তার প্রায় অন্ধকারেই চলেছেন। তাতে ডাক্তারের অসুবিধে নাই। অন্ধকারে ঠাওর করে পথ চলা তাঁর অভ্যাস আছে। কিন্তু সাধুর চেলার হাতের আলোটা দুলচে, অসুবিধে হচ্ছে তাতেই। মধ্যে মধ্যে চোখে এসে লাগছে। ডাক্তার বললেন—আলোটা এমন ক'রে দুলিয়ো না হে ভোলানাথ। চোখে লাগছে। চল-চল, দাঁড়াতে হবে না। চল তুমি। আলোটা দুলিয়ো না।

—কে? মশায় না কি?

সম্মুখের দেবস্থলের প্রবেশপথের ঠিক মুখ থেকে কে প্রশ্ন করলে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ঠস্বরটা চেনা। তবু জীবন দত্ত ধরতে পারলেন না। অন্যমনস্ক হয়ে ওই সাধুর কথাই ভাবছিলেন তিনি। বহুকাল এখানে আছেন সাধু। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

—রোগীকে আমি ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। হাসতে লাগল সে।

—শশী! চমকে উঠলেন ডাক্তার।—কি দিয়ে ঘুম পাড়ালি?

পাগলা শশী হাসতে লাগল,—অসুরের চিকিৎসা আসুরিক।

—কিন্তু তোকে খবর দিলে কে?

—এসে পড়লাম হঠাৎ। গিয়েছিলাম—গলাই চণ্ডী, রামহরি লেটকে দেখতে। বেটার খুব অসুখ। দুপুরবেলা আপনাকে কল দিতে গিয়েছিলাম যে। বউঠাকরুণ বলেন নি আপনাকে? কাল নিয়ে যাব আপনাকে।

—সে তো পরের কথা। কাল হবে। এখানকার খবর বল।

—আর কি। গলাই চণ্ডী থেকে ফিরবার পথে ঢুকলাম এখানে—শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আর কেমন ছমছম করছিল—তাই বলি মাকে একবার প্রণাম করি আর শরীরটাকে তাজা করে নি।

—হুঁ। তারপর?

—দেখলাম বুড়ো ধুঁকছে। রক্ত দাস্ত হয়েছে। নাড়ী নাই। যাতনায় ছটফট করছে। শুনলাম তিন দিন গাঁজা খায় নাই। বললাম—যেতে তোমাকে হবে। তা গাঁজা না-খেয়ে যাবে কেন—একটান গাঁজা খেয়ে নাও। তা বললে—না। তু বেটা বদমাস শয়তান। আরে ওহি গাঁজা তো আমার মরণ আসবার পথ তৈয়ার করেছে। এক পাও পথ বাকী; সে আসুক নিজেই ওটুকু পথ তৈয়ার করে। আর গাঁজা কেনো? আমি মশায়—একডোজ ক্যানাবিসিণ্ডিকা দিয়েছি। সঙ্গেই ছিল। আমি খাইতো। বাস—খেয়ে দুতিন মিনিটের মধ্যে বুড়ো ঘুমিয়ে পড়ল। দেখুন, বোধ হয় নাড়ীও টিপ টিপ্ করে উঠছে। গাঁজা খাওয়া ধাত তো। লেগে গিয়েছে।

হি-হি করে হাসতে লাগল পাগলা।

কি যে ওকে বলবেন জীবন ডাক্তার! ছি-ছি!

(ষোল)

মিথ্যে বলে নি পাগলা। এক ডোজ ক্যানাবিসিণ্ডিকাতে বৃদ্ধ সাধুর ঘুম এসেছে; ঘুম যখন এসেছে তখন যন্ত্রণারও উপশম হয়েছে এবং নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে কিছু পারা গেল না।

সাধু সন্ন্যাসীর ধাতু-প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। আশ্চর্য সহন-শক্তি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে অনেক প্রভেদ। তেমনি আশ্চর্য ক্রিয়া করে ওষুধ। সুতরাং বলা তো যায় না। মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হয়েও এদের প্রাণশক্তির কাছে হার মেনে ফিরে যায়। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখেছেন জীবন দত্ত। তাঁর বাপও এ কথা তাঁকে বলে গেছেন। বলেছিলেন—এদের নাড়ী দেখে সহজে নিদান হেঁকো না বাবা। আগে জেনে নিয়ো—তাঁদের নিজের দেহ রক্ষার অভিপ্রায় হয়েছে কি না।

সাধু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ডাক্তার বললেন—রাত্রিটা সজাগ থেকো ভোলানাথ। রাত্রে যদি ঘুম ভাঙে—তবে জল খেতে দিয়ো। আর কিছু না। আমি ভোর বেলা আসব।

শশী খুব হাসতে লাগল। আত্মপ্রসাদের আর অবধি নাই তার। ডাক্তার তাকে ডেকে সঙ্গে নিলেন।—আয় এক সঙ্গেই যাই।

শশীও সঙ্গ ধরলে—বললে—চলুন—রামহরির কেসটা বলে রাখি। কাল আপনাকে যেতেই হবে।

ডাক্তার বললেন—শশী আজ যা করেছ-করেছ, এমন কাজ আর করো না।

—কি? বুড়োকে ক্যানাবিসিণ্ডিকা দেওয়া?

—হাঁ। অন্যায় করেছ।

—অন্যায় করেছি তো বুড়ো সুস্থ হল কি করে?

—কি ক'রে তা বলা শক্ত। গাঁজা খাওয়া অভ্যেস আছে; সেই গাঁজা না খাওয়ার জন্যেও একটা যন্ত্রণা ছিল রোগের যন্ত্রণার সঙ্গে—সেটা উপশম হয়েছে—তার উপর মাদকের ক্রিয়া আছে। এখন ঘুম ভেঙে এর ফল হয়তো মারাত্মক হবে।

—উঁহু! বুড়ো সেরে উঠবে এ আমি বলে দিলাম। কুড়ো বাউড়ীর মেয়েটার নিউমোনিয়ায় কেরোসিনের মালিশ দিলে—সবাই আপনারা গাল দিয়েছিলেন—কিন্তু সেরে তো গেল।

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন—শশী এ সব পাগলামী ছাড়। শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়বি।

—আমি পাগল?

—হ্যাঁ। তুই পাগল। আমার আর কোন সন্দেহ নাই।

একটু চুপ ক'রে থেকে শশী বললে—তা বেশ। পাগলই হলাম আমি। তা বেশ। আবার খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে—কাল কিন্তু রামহরিকে দেখতে যেতে হবে। আমি কল্ দিয়ে রাখলাম।

—রামহরির কি হ'ল?

—সে সাতদুগুনে চৌদ্দখানা ব্যাপার। এবার যাবে।

—যাবে তো আমাকে টানাটানি কেন? যাক না। এ বয়সে গেলেই তো খালাস। না—যেতে চায় না কামারবুড়ীর মত? তা রামহরির এ ইচ্ছে স্বাভাবিক। আবার যেন মালাচন্দন করেছে এই বয়সে!

—হ্যাঁ। বছর পঁচিশেক বয়স মেয়েটার। কিন্তু রামহরি বাঁচবার আশায় আপনাকে ডাকছে না। ডাকছে, নিদান দিতে হবে, বলে দিতে হবে—জ্ঞানগঙ্গা যেতে পারে কি না। বড় ইচ্ছে জ্ঞানগঙ্গা যায় উদ্ধারণপুর কি কাটোয়া। জ্ঞানগঙ্গা গিয়ে বেশীদিন বাঁচলে তো মুস্কিল! কণ্ট্রোলের বাজার। এ জেলার চাল ও জেলায় যাবার হুকুম নাই। কিনে খেতে গেলে অনেক টাকা লাগবে।

বক বক ক'রে বলেই চলল শশী।

—চোরের রাজ্য বুঝেছেন, সব চোর। আপাদ মস্তক চোর। রাজা চোর রাণী চোর কোটাল চোর সব চোর। আমি চোর তুমি চোর সব চোর। চালের দর ষোল টাকা? তাও এ জেলায় ষোল তো ও জেলায় ছাব্বিশ, আর দু পা বাড়াও ছত্রিশ—আর এক পা ওদিকে চল্লিশ।

ডাক্তার ঠিক কথাগুলি শুনছিলেন না। তিনি ভাবছিলেন। ভাবছিলেন রামহরির কথা। শশী আপন মনেই বকে চলেছিল। হঠাৎ একবার থেমে—আবার আরম্ভ করলে। এবার কথার সুর আলাদা। দেশের সমালোচনায়

কথা বন্ধ করে অকস্মাৎ সরস রসিকতায় সুরসিক হয়ে উঠল শশী। বললে—রামহরি জ্ঞানগঙ্গা যাবে—কিন্তু বেহিসেবী কাণ্ড ক'রে তো যাবে না; কদিন বাঁচবে—আপনাকে বলে দিতে হবে; সেই হিসেব ক'রে চাল ডাল বেঁধে নিয়ে যাবে। বলে, ঠাকুর, তোমার কি বল? দশদিন বেশী বাঁচলে—চাল কম পড়বে। তখন নগদ দামে কিনতে হবে। পাঁচদিন কম বাঁচলে চাল বাড়বে। সে চাল ঘরে ফিরে নিতে নাই, বেচে দিতে হবে। সে সব তো আমার হাত দিয়ে হবে না। হবে পরের হাত দিয়ে। পাঁচভূতে সব তচনচ করে দেবে আমার। বুঝুন ব্যাপারটা—রামহরি যে হিসেব নেবে তার উপায় থাকবে না। ব্যাটা বলে—তাতে আমার স্বর্গে গিয়েও শান্তি হবে না। আমি বলি—স্বর্গে যাওয়াই হবে না তোর;—রথে চড়ে বলবি—রোখো-রোখো-রোখো। আমি নামব। রথ ফিরিয়ে দিয়ে—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখবি। মহামুস্কিল। গঙ্গাতীরে মৃত্যু—ভূত হবার উপায় থাকবে না, সে হলেও না হয় সান্ত্বনা থাকত রামহরির—ঘাড় ভাঙতে পারত। পিছু পিছু গিয়ে খোনাস্বরে বলতে পারত—দেঁ—আমার টাঁকা ফিঁরে দেঁ!

হা-হা করে হাসতে লাগল শশী।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রির মধ্যে দু জনে পথ হাঁটছিলেন।

বৃদ্ধ জীবন ডাক্তার আপনার মনে রামহরির কথা ভাবছিলেন। এমনটা কি ক'রে হল? কেমন ক'রে হয়? জ্ঞানগঙ্গা যেতে চায় রামহরি? বিনা ভাবনায় বিনা কামনায় বৈরাগ্যযোগ—মুক্তি-পিপাসা কি জাগে? আমি মরব এই কথা ভেবে প্রসন্ন মনে সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে অভিসারে চলার মত চলতে পারে! দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর যুবতী বধূর স্বামী সন্দর্শনে যাওয়ার কালে বাপের ঘরের উঠানে পাতা খেলাঘর ফেলে যাওয়ার মত যেতে পারে?

রামহরি প্রথম জীবনে ছিল ছিঁচকে চোর; তারপর হয়েছিল পাকা ধান-চোর; বার দুয়েক জেল খাটার পর হঠাৎ রামহরির দেখা গেল ঘোরতর পরিবর্তন; রামহরি কপালে ফোঁটা তিলক কেটে গলায় কণ্ঠী মালা পরে হয়ে উঠল ঘোরতর ধার্মিক। জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসা সুরু করলে। তরকারির ব্যবসায়। চাষীর ক্ষেত থেকে তরকারি কিনে হাটে হাটে ঘুরতে লাগল। অর্থাৎ ফড়ে হয়ে উঠল। মুখে রামহরি চিরকালই ফড়ে অর্থাৎ

কথা সে বেশী চিরকালই বলত—এবার ব্যবসায়েও তাই হয়ে উঠল। লোকের বাড়ী ক্রিয়াকর্মে বরাত এবং বায়না নিয়ে তরকারি সরবরাহ করত। কিন্তু ওর অন্তরালে ছিল তার আসল ব্যবসা। নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে দস্তুরমত পাকা কবিরাজের মৃতসঞ্জীবনী চোলাইয়ের পদ্ধতিতে মদ তৈরী করত। জঙ্গলের মধ্যেই বোতল এবং টিন-বন্দী করে পুঁতে রাখত। ওখানেই শেষ নয়, নদীর চরের পলিমাটিতে সে গাঁজার গাছ তৈরী করে গাঁজাও উৎপন্ন করত এবং তার কাটতিও ছিল প্রচুর। দেশটা তান্ত্রিকের দেশ ছিল—মন্ত্র হোক বা না হোক, জানুক বা না জানুক কারণ লোকে করত। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, মুখে কালী কালী, তারা-তারা রব আর কারণকরণে শতকরা নিরেনব্বুই জন ছিল সিদ্ধ পুরুষ। সুতরাং হাজার দরুণে সিদ্ধ-পুরুষের প্রসাদে রামহরির লক্ষ্মীলাভের পথে সিংহদ্বার না হোক, বেশ একটা প্রশস্ত ফটক খুলে গিয়েছিল। উদ্যোগী পুরুষ রামহরির সাহস ছিল অপার, নবগ্রামে থানার সামনে রাস্তা দিয়ে কুমড়োকাঁকুড়ের বোঝার তলায় অন্ততঃ চার-পাঁচটা বোতল নিয়ে সে সহাস্য মুখে চলে যেত। এবং হাটে বসে তাই বিক্রী করত। কুমড়োর মুখ কেটে ভিতরের শাঁস বীজ বের করে নিয়ে তার মধ্যে আনত গাঁজা। বাড়ীতে দেব-প্রতিষ্ঠা করেছিল, সুপবিত্র নিম্ব কাঠের গৌরহরি। কিন্তু ঠাকুরটির বক্ষ-পঞ্জর ছিল ফাঁপা। দস্তুরমত মাথা খাটিয়ে বুক এবং পিঠের দুদিক দুখানি স্বতন্ত্র কাঠে গড়ে ভিতরে গহ্বর রেখে পাকা মিস্ত্রী দিয়ে এই দৈব গুদামটি সে তৈরী করিয়ে ছিল। এবং পিঠের দিকের কাঠে নিচে উপরে দুটি ঢাকনিযুক্ত মুখ রেখেছিল। উপরেরটি খুলে গাঁজা পুরত, এবং প্রয়োজন মত বের করে নিত। এরপর আর এক ধাপ উপরে উঠে রামহরি রীতিমত দাসজী হয়ে উঠেছিল। তরকারির ব্যবসা তুলে দিয়ে মুদীর দোকান এবং ধান কেনার ব্যবসা সুরু করে—ভেক নিয়ে দাস উপাধি নিয়ে গণ্যমান্য হয়ে উঠেছিল কয়েকখানা গ্রামের মধ্যে। শুধু ভেকই নেয় নাই, নিজের স্বজাতীয়া স্ত্রী এবং পুত্রকে দূর করে দিয়ে একটি উচ্চবর্ণের বিধবাকে ঘরে এনে বৈষ্ণবী করেছিল। ক্রমে ক্রমে আরও বোধ হয় দু-তিনটি। এদের জন দুই প্রৌঢ় বয়সে দুয়োরাণীর মত ঘুঁটে কুড়িয়ে মরে পরিত্রাণ পেয়েছে। একজন পালিয়েছে। শেষেরটি তরুণী—সেইটিই এখন রামহরির সুয়োরাণী।

সেই রামহরি সজ্ঞানে মৃত্যু কামনা করে গঙ্গাতীরে চলেছে? মুক্তি চায় সে? বিস্ময় লাগে বই কি!

শশী তামাক টেনে শেষ করে কল্কেটা নামিয়ে দিয়ে বললে—তা হলে চলুন একবার। আমি বেটাকে বলেছি, ফি পাঁচ টাকা লাগবে। ডাক্তার-বাবু তো আর কলে যান না, তবু বলে কয়ে রাজী করাব। তা তাতেই রাজী।

কথাটা ডাক্তারবাবুর কানে গেল না। তাঁর মনোরথ চলেছিল ছুটে। পলকে যুগান্তর অতিক্রম করে পিছনের পরিক্রমা সেরে বর্তমানে এসে সেই মুহূর্তেই স্থির হল বোধ করি। তিনি হাসলেন।

শশী বললে—হাসছেন যে?

জীবন বললেন—নবগ্রামের কর্তাবাবুর চিকিৎসার জন্যে কলকাতা যাওয়া মনে আছে তোর শশী?

—তা আবার নেই। বাড়ী থেকে পাল্কী করে বেরিয়ে—সব ঠাকুরবাড়ীতে প্রণাম করে—

—সে তো জ্ঞান-গঙ্গা যাঁরাই গিয়েছেন—তাঁরা সবাই তা করেছেন রে। সে নয়।

—তবে?

—কর্তা কাশী গেলেন না, উদ্ধারণপুর গঙ্গাতীর গেলেন না, গেলেন কলকাতা। কলকাতাও গঙ্গাতীর। কিন্তু গঙ্গাতীরে দেহ রাখতে ঠিক যান নি। গিয়েছিলেন চিকিৎসা করিয়ে বাঁচতে।

—তা হবে না? বিশাল সম্পত্তি, অগাধ ধন, এত কীর্তি—এ সব ছেড়ে মরতে কেউ চায় না কি?

—হ্যাঁ রে, তাই তো বলছি। আর রামহরির সেই বাসনা হল। রামহরি যা করেছে তার পক্ষে তো সেও কম নয় রে। অনেক। তার উপর তরুণী পত্নী।

এবার হাঁ করে শশী জীবন ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জীবন মশায় হেসেই বললেন—হাঁ ক'রে আর তাকিয়ে থাকিস নে। বাড়ী যা। রাত্রি অনেক হয়েছে। কাল যাব। দুপুরের পর গাড়ী পাঠাতে বলিস।

শশী বললে—দু রাস্তার মোড় বুঝি এটা ?

—হ্যাঁ।

এইখান থেকেই পাকা রাস্তা থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে জীবন ডাক্তার যাবেন নিজের গ্রামে। পাকা রাস্তায় শশী যাবে নবগ্রাম।

জীবন মশায় বললেন—নেশা ভাঙ একটু কম করিস শশী।

শশী মাথা চুলকে লজ্জা প্রকাশ ক'রে বললে—ভাবি তো। পারি না। তারপর অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললে—চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়েই যাই। ভারী অন্ধকার আর রাত্রি অনেক হয়েছে।

—হতভাগা। আমাকে দাঁড়াতে হবে না। যা—বাড়ী যা। আমাকে দাঁড়াবে ? তোকে দাঁড়াবে কে ? পরক্ষণেই একটা কথা মনে ক'রে জীবন দত্ত সচকিত হয়ে উঠলেন, বললেন—আচ্ছা আয়—আয়। নন্দাকে ডেকে বরং তোর সঙ্গে দেব। তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

মনে পড়ল—মাস কয়েক হ'ল—শশীর মা মারা গেছে। শশী হয় তো এত রাত্রে ভয় পাচ্ছে একলা যেতে। একটু আগেই বলছিল—গলাই চণ্ডী থেকে ফিরবার পথে ওর গা ছম ছম করেছিল অর্থাৎ ভয় পেয়েছিল শশী। সেই জন্যেই সে দেবস্থানে ঢুকেছিল!

(সতের)

জীবন দত্ত ডাকে গেলে আতর বউ ঘুম পেলে ঘুমকে বলেন—চোখের পাতায় অপেক্ষা কর, এখন চোখে নেমো না। সে আসুক, তারপর। শুয়ে শুয়েও জোর ক'রে জেগে থাকেন। চোখের পাতা ঢুলে নেমে আসে, আতর বউ জোর করে চোখ মেলেন—পাশ ফেরেন, রাধাগোবিন্দ বলে ইষ্ট নাম করেন; বেশী ঘুম পেলে উঠে বসে পান দোক্তা খান—মধ্যে মধ্যে নন্দকে তিরস্কার করেন ; নন্দকে নয় নন্দর নাকডাকাকে—বলেন, নাক মানুষের ডাকে কিন্তু তাই বলে এমনি ক'রে ডাকে ? শিঙের ডাক হার মানে। শুধু শিঙের ডাক ? মনে

হচ্ছে কেউ যেন করাত দিয়ে দরজা কাটছে। নন্দ, অ-নন্দ! শুনছিস, একটু কম ক'রে নাক ডাকা বাপু! পাশ ফিরে শো।

জীবন দত্ত এলেই এ সব সমস্যার সমাধান হয়। তিনি কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন—কেমন দেখে এলে গো? কোন দিন কোন প্রশ্নই করেন না, নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়েন—এবং আধমিনিটের মধ্যেই তাঁর নিজের নাক ডাকতে সুরু করে।

নন্দ উঠে হাত মুখ ধোবার জল দেয়, ডাক্তার নিজেই খাবারের ঢাকা খুলে খেয়ে নেন, নন্দ তামাক সাজে, হুঁকো কল্কে হাতে দিয়ে নন্দও গিয়ে শুয়ে পড়ে; ডাক্তার তামাক খান—আর ভাবেন। রোগের কথা। কোন দিন মৃত্যুর কথা। যে দিন রোগী মারা যায়—সে দিন ফিরে এসে চিকিৎসা পদ্ধতির কথাটা ভেবে দেখেন, ক্রটি মনে হলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন; না-হলে মৃত্যুর কথাই ভাবেন। তারপর গোবিন্দ স্মরণ ক'রে শুয়ে পড়েন। যে দিন ডাক থাকে না, সেতাবের সঙ্গে দাবা খেলে কাটে, সে দিন ভাবেন—দাবার চালের কথা। ঘুম আসতে একটা দেড়টা। ওর আগে আর কোন দিনই হয়ে উঠল না। ঘুম ভাঙতে আটটা, নটা।

সাড়ে নটায় দশটায় আরোগ্য-নিকেতনের রোগী দেখা। আজ আরোগ্য-নিকেতন জীর্ণ, জীবন মশায় পুরাতন হয়েছেন, নিজেরও স্পৃহা নাই; ওই দুজন চারজন কোন কোন দিন সাত আটজন আসে—তাদের দেখে একটি দুটি রোগীর বাড়ীর কল সেরে দিনের কর্ম শেষ করেন। আগে কিন্তু আরোগ্য-নিকেতনের সামনে রোগীর ভিড়ে স্থান সঙ্কুলান হ'ত না। চল্লিশ পঞ্চাশ সোত্তর পঁচাত্তর জন পর্যন্ত। গাড়ী ডুলি; পাল্কী পর্যন্ত আসত মধ্যে মধ্যে।

মহাশয় বংশের কবিরাজখানায় রোগী সমাগমে ভাঁটা পড়েছিল। জগদ্বন্ধু মশায়ের তিরোধানের পর জীবন দত্ত আত্মগ্লানি অনুভব করেছিলেন। নানা জনে নানা কথা বলেছিল। দত্তবংশের অর্জিত মহাশয়ত্বের মশায় উপাধি কেড়ে নিতে চেয়েছিল। তাঁকে বলত জীবন দত্ত। মুখের সামনে কবিরাজ বলত কিন্তু অন্তরালে তাও বলত না।

হরিহরপুরের পাঠক কবিরাজেরা তাঁর বাপের মৃত্যুর পর সামাজিকতা রক্ষা করতে এসে বলেছিল—বড় টাট তোমার, দু পুরুষ ধরে বাপ পিতামহ

গ'ড়ে গিয়েছেন—ওতেই তোমার চলে যাবে জীবন! তবে বুঝে চলতে হবে।

রাঘবপুরের মুখুজ্জে কবিরাজ বলেছিলেন—খুব সাবধান বাবা জীবন, কাল বড় খারাপ পড়েছে। বিলিতী চিকিৎসা, পাশ করা ডাক্তার এসেছে দেশে; সাবধানে চলতে হবে। লোকজন কমিয়ে দিয়ো। জগত মশায়ের দান ধ্যান খাটিয়ো। এই আর কি!

নবগ্রামের প্রথম এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার দুর্গাদাস কুণ্ডু তাঁকে ব্যঙ্গ করত, বলত—আরে ওটা একটি ঘাস পাতা জড়িবুটির চিকিৎসক।

হরিশ ডাক্তার—কিশোর ছেলেটির অসুখের সময়, রোগ নির্ণয়ে তাঁর কাছে ঠকেছিল, জীবন দত্তের রোগ নির্ণয় সঠিক বলে রায় দিয়েছিলেন রঙলাল ডাক্তার—সেই হরিশ ডাক্তার তাঁকে বলত—হাতুড়ে।

কে-এম ব্যানার্জী—কেত্র বাড়ুজ্জীর হোমিওপ্যাথের কথা মনে হলে জীবন মশায়ের হাসি পায়; ভাল লোক, সরল মানুষ, তবে মহা দাম্ভিক, সে বলত—ওদিকে হরিশডাক্তার এদিকে আমি, মাঝখানে জীবন দত্তটা চাপা পড়ে মারা গেল! ওকে আর কেউ ডাকবে? নাড়ী দেখে কেমন আছে—এর জন্যে ওকে কে ডাকবে? ফুঃ!

এর পর রঙলাল ডাক্তারের কাছে তিন বছর শিক্ষার সময় তাঁর পসার আরও কমে গিয়েছিল। সময় পেতেন না।

সুরেন সেতাব নেপাল এরা বলত—জীবন, এ তুই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছিস। পসার ভেঙে দিচ্ছিস ইচ্ছে ক'রে, সে পসার কি আর জমাতে পারবি? ঘর ভাঙলে—ফাট ধরলে কি আর জোড়া লাগে?

লাগে না। কিন্তু পাকা ভিতের উপর গড়া দত্তবাড়ীর কবিরাজখানাকে তিনি ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন। এক-মহলাকে দো-মহলা করে গড়েছিলেন। ডাক্তারী কবিরাজী দু-মহলা।

লোকে বলত—সেই লোকের কথা ধরেই তিনি রহস্য করে লোককে জিজ্ঞাসা করতেন—কি ওষুধ খাবে? জগত খাবে না জীবন খাবে? অর্থাৎ কবিরাজী, না ডাক্তারী! আরোগ্য-নিকেতন নাম দিয়ে সেই পুরানো চিকিৎসাপীঠে নতুন ক'রে বসবার তিন বৎসরের মধ্যেই জীবন ডাক্তারের পসার জমে উঠল।

শশী তখন কম্পাউণ্ডার—শশী বলত—রম্‌রম্‌ প্র্যাক্‌টিস।

মদ শশী অল্পবয়স থেকেই খায়; ওর দৌরাত্ম্যে ডাইনামগ্যালেসিয়ার বোতল লুকিয়ে রাখতে হত ডাক্তারকে। বোতল পেলেই শশী আউন্স দুয়েক মুখে ঢেলে খানিকটা জল ঢেলে দিত বোতলে।

মদ খেয়ে শশী বলত—জীবন ডাক্তারের প্র্যাক্‌টিস—শা—, পান্‌সী চলছে সন-সন্‌, সন-সন্‌, সন-সন্‌!

শশী মিথ্যে ঠিক বলে নি। জীবন দত্তের আকাঙ্ক্ষা যোল আনা পরিপূর্ণ হয় নি—তিনি রঙলাল ডাক্তারের স্থান গ্রহণ করতে পারেন নি, সে স্থান পূর্ণ করেছিলেন নবীন মুখুজ্জে এবং জেলার সদরে তখন এসেছেন একজন কৃতী ডাক্তার; তবুও জীবন দত্তের খ্যাতিরও সীমা ছিল না।

দুর্গাদাস কুণ্ডু এখান থেকে চলে গেল। হোমিওপ্যাথ ক্ষেত্র বাড়ুজ্জে পালাল। হরিশ ডাক্তার রইল কেবল। সেও ব্রজলালবাবুর চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর চাকরীর জোরে। জীবন দত্তের আহার নিদ্রার অবকাশ রইল না।

আরোগ্য-নিকেতন—সে কি ভিড়! চল্লিশ—পঞ্চাশ—ষাটজন রোগী।

হিন্দু, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, মুসলমান, পুরানো মহগ্রামের খাঁয়েরা, পশ্চিম-পাড়ার শেখেরা, ব্যাপারীপাড়ার ব্যাপারীরা, মীরপাড়ার মিয়ারাও এসেছেন গরুর গাড়ী করে। ডুলি এসেছে, গাড়ী এসেছে, পাল্কী এসেছে। একবার পাঁচ ক্রোশ উত্তর থেকে এসেছিলেন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের গৌরহরি মিত্র। খোলা দরজার ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে পাল্কীতেই শুয়ে ছিলেন। শীর্ণ শরীর কিন্তু রোগ আছে বলে মনে হয় নি জীবন দত্তের। মিত্র বলেছিলেন, একটু নিরালা হলে ভাল হয়।

নিরালায় বলেছিলেন—কন্যার বাড়ী যাচ্ছি। শেষ বয়সে তারই ঘাড়ে ভার হয়ে পড়তে হল। বিষয় সম্পদ সব গিয়েছে মামলায়। স্ত্রী গিয়েছেন। এটা ওটা করেই চালাচ্ছিলাম, মদ্যপান করি প্রচুর। আত্মহত্যা করতে পারি না ভয়ে। কন্যা নিয়ে যাচ্ছে, আমারও না গিয়ে উপায় নাই। পথে বের হয়ে ভাবলাম আপনাকে একবার দেখিয়ে যাই। কতদিন বাঁচব বলতে

পারেন? আপনার নাড়ী জ্ঞানের প্রশংসা শুনেছি। দেখুন তো আমার হাতটা।

দমে গিয়েছিলেন ডাক্তার। বলেছিলেন—আমার সে শক্তি নাই। সে শক্তি কদাচিৎ কারও শোনা যায়—রোগ নাই—

—রোগ আছে। লিভারে বেদনা। মাথায় গোলমাল হয়।

—ও মদ্যপানের ফল। মদ্যপান করলে বাড়বে। ছাড়লে কমে যাবে।

নীরবে দুটি টাকা রেখে গৌরহরি উঠলেন। জীবন বললেন—আমাকে মাফ করবেন। ফি আমি নিতে পারব না। বাড়ীতে এই আরোগ্য-নিকেতনে—ফি নেওয়া আমাদের পূর্বপুরুষের নিষেধ আছে।

—কোন গরীব রোগীকে দুটো টাকা ছেড়ে দেবেন। আমি তো ফি না দিয়ে দেখাই না। দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ ঈষৎ কুব্জ মানুষটি ধীরে ধীরে চলে গিয়েছিলেন।

ঠাকুরপাড়ার মিঞা এসেছিলেন।

—আদাব গো ডাক্তার।

—আদাব, আদাব বসুন। কি ব্যাপার?

এককালে মিঞা সাহেবরা ছিলেন এ অঞ্চলের অধিপতি—নবাব। খেতাব ছিল ঠাকুর। তাঁরা নাকি যোগীর বংশ। মুসলমান সমাজের গুরু। কিন্তু পরবর্তী কালে সম্পদে বৈভবে বিলাসে হয়েছিলেন ভ্রষ্ট। তখন সর্বস্বান্ত। শুধু তাই নয়—বংশধারা পর্যন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে মিঞা বলেছিলেন—গায়ে যে চাকা-চাকা দাগ দেখা দিচ্ছে ডাক্তার। পিঠে জানুতে—এই দেখেন পায়ের ডিমিতে একটা হয়েছে। পা-জামাটা তুলে দেখালেন মিঞা সাহেব।

—হুঁ। সাড় আছে?

—উঁহু।

ডাক্তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। চোখে পড়ে—কানের পেটি নাকের ডগা ঈষৎ লাল হয়েছে। বংশের অভিশাপ। সেই ব্যাধি। তাতেই মৃত্যু হয়েছে কয়েক জনের। দুজন এখনও ভুগছেন।

—ডাক্তার!

—মীঞা সাহেব !

—বলেন ?

—কি বলব ? বংশের রোগ বলেই মনে হচ্ছে। আপনি সময় থেকে চিকিৎসা করান। আমাদের এখানে ওষুধ নাই। তৈরী করতে অনেক খরচ। আপনি কলকাতা থেকে ওষুধ আনিয়ে ব্যবহার করুন।

—তাই লিখে দেন ডাক্তার।

উঠলেন মীঞা সাহেব।

ডুলি করে এসেছেন নারায়ণপুরের ভটচাজ মশায়।

বহুমূত্র হয়েছে।

বহুমূত্র, বাত, নব জ্বর, পুরানো জ্বর, গ্রহণী, অতিসার।

প্রহ্লাদ বাগ্দী এসেছে। দুধর্ষ লাঠিয়াল। ডাকাত। জেলখাটা আসামী।

—কিরে তোর আবার কি ?

—আর কি ডাক্তারবাবু—জল ঘা।

—আবার ? জল ঘা অর্থাৎ উপদংশ। এবার বোধ হয় প্রহ্লাদের পঞ্চমবার।

মাথা চুলকে প্রহ্লাদ বলে—যে গরু অখাদ্যি খায়, সে কি ভুলতে পারে মশায় ?

হাসলেন ডাক্তার।

নবগ্রামের বড় কর্তার বাড়ী যেতে হবে ডাক আছে। তাঁর ছোট ছেলের চতুর্থবার প্রমেহ দেখা দিয়েছে।

তাঁর বাবার কথা মনে পড়ত। তিনি বলতেন—জীবনে আয়ু আর পরমায়ু কথা দুটো—শুধু কথার মার প্যাঁচ নয় বাবা। ওর অর্থ হল নিগূঢ়। দীর্ঘ আয়ু হলেই পরমায়ু হয় না, আর আয়ু স্বল্প হলেই সেটা পরমায়ু হয় না এমন নয়। যার জীবন পবিত্র পরমানন্দময় পরমায়ু হল তার। নইলে বাবা—শক্তি চর্চা করেও মানুষ দীর্ঘায়ু হয়। রোগকে সহ্য করে, এমন কি জয় করে।

কথাটা তিনি এই প্রহ্লাদ সম্পর্কেই বলেছিলেন। প্রথমবার উপদংশের আক্রমণের প্রহ্লাদ চিকিৎসা করায় নি। এটা ওটা মলম-ব্যবহার করেছিল।

দ্বিতীয়বার এসেছিল জগত মশায়ের কাছে। সেই উপলক্ষেই বলেছিলেন। প্রহ্লাদ সেবার বলেছিল—লোকে দেখাতে বলছে, তাই—। নইলে—ও আপুনিই ভাল হয়!

প্রহ্লাদ আজও বেঁচে আছে। আজও লাঠি খেলে বেড়ায়। আজও মাটির উপরে বাহু ঠুকে আছাড় খেয়ে পড়ে।

প্রহ্লাদ বলত—তবে চিকিৎসাতে তাড়াতাড়ি সারে। তা ওষুধ দেন!

তখন ইনজেকসন ওঠেনি। ওষুধ নিয়ে—টাকা দিয়ে প্রণাম করে চলে যেত প্রহ্লাদ। একটাকা ফি-ও দিত।

ডাক্তার বলতেন—ও কিরে? ফি কেন? বাড়ীতে আমি ফি নিই কবে?

—এই দেখেন বদ্যিপেণামী না দিলে রোগ যে দেহ ছাড়ে না'?. আর তো দোব না!

এত কালের খাতার মধ্যে প্রহ্লাদের নামে বাকী হিসাব নাই।

তারপর একের পর এক আসত রোগী। আমাশয়, জ্বর, ম্যালেরিয়া, রেমিটেণ্ট, টাইফয়েড দু'একটা আসত; গ্রহণী, তা ছাড়া কত রোগ। এক এক রোগীর তিন চারটে রোগে মিশে সে এক জটপাকানো জটিল ব্যাপার। তাঁর বাবা বলতেন—শাস্ত্রে আছে সকল বিকারের অর্থাৎ রোগের আবিষ্কার আজও হয় নি। যদি কোন রোগ নূতন মনে হয় তবে তার নাম জান না বলে সংকুচিত হবে না, লজ্জিত হবে না। লক্ষণ্ দেখে তার চিকিৎসা করবে। এ যুগে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে ল্যাবোরেটারী হয়েছে। সে যুগে তাঁদের সে সুযোগ ছিল না।

তারপর আরম্ভ হ'ত 'পাইকিরি দেখা'। এ নামটা শশীর আবিষ্কার।

রোগীরা এলে—কার কি অসুখ জেনে কম্পাউণ্ডারেরা দুই ভাগে ভাগ করে রাখত। সহজ রোগীদের আলাদা ক'রে একদিকে বসাত। অবশ্য অবস্থাপন্ন মান্যগণ্য রোগীদের রোগ সহজই হোক আর কঠিনই হোক তাদের দেখার কাল ছিল প্রথমেই।

পাইকিরি দেখার সময় ডাক্তার এসে বাইরে দাওয়ার উপর বসতেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকত গোপাল কম্পাউণ্ডার। রোগী দেখে ডাক্তার প্রেসক্রপশন বলতেন—সে লিখত। শশীর উপর তিনি নির্ভর করতে পারতেন না।

অন্যমনস্ক শশী কি লিখতে কি লিখবে কে জানে? তা ছাড়া লেখার পর শশী নিজেই পড়তে পারত না কি লিখেছে। ডাক্তারকেই এসে জিজ্ঞাসা করত—কি বলেছেন বলুন তো। লেখাটা ঠিক পড়তে পারছি না।

আরোগ্য-নিকেতনে তখন তিনজন কম্পাউণ্ডার। শশী—গোপাল—আর কবিরাজী বিভাগে ছিল বাপের আমলের বুড়া চরণদাস সিং। নীরবে ঘরের মধ্যে বসে শুঁঠ আমলকী চূর্ণ করত, মোদক পাকাতো, পুরিয়া বাঁধত।

ডাক্তার বলে যেতেন—কুইনিন সালফেট—১০ গ্রেণ, এ্যাসিড সাইট্রিক—২০ গ্রেণ, ম্যাগসালফ—১০ গ্রেণ, স্পিরিট এনেসি—৫ ফোঁটা—জল—।

আগে এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে দাও।

সে যেত। আর একজন আসত। আমাশয়। অনেক দিনের। ডাক্তার ডাকতেন—সিংমশায়। চরণদাস এসে দাঁড়াত।

—একে 'রেসা খাদ্‌মে' দেবেন তো। ওটা তাঁদের মুষ্টিযোগ।

—তোমার কি?

—সূর্যি ফোড়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে মাথা ধরা সুরু হয়—সূর্যাস্তের পর ছাড়ে। এর মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা।

জীবন দত্ত আবার ডাকতেন—সিং মশায়।

এরই মধ্যে হঠাৎ ডাক্তার একটু যেন চকিত হয়ে রোগীর প্রতি মনযোগী হয়ে বসেন।

তিনদিন অল্প জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা। একজ্বরী। জিভ দেখেই ডাক্তার সতর্ক হয়ে বসেন।—দেখি, নাড়ী দেখি!

—এস তো বাপ ঘরে। টেবিলের উপর শুয়ে পড়। পেটটা দেখি। কাঁপ আছে কি না?

—তুমি বাপু একটু সাবধানে থাকবে। তোমাকে দুদিন ভোগাবে বোধ হয়। বুঝেছ"?

নাড়ীতে যেন সান্নিপাতিক লক্ষণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। স্পষ্ট বিকাশ এখনও হয়নি। তবে মনে হচ্ছে। জিভ পেটও তাই সমর্থন করছে। টাইফয়েড।

—গোপাল—কাগজ আন।

প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতেই ডাক্তার বললেন—দেখ, দুবার জ্বর ওঠানামা করে কিনা লক্ষ্য করো।

—আজ্ঞে না। জ্বর তো বেশী নাই। ওই একভাবে—সূতোর সঞ্চারে—

—না না। ভাল করে লক্ষ্য করো। ভাত মুড়ি—এসব খেয়ো না। সাগু খাবে। সাগু। দুধ? উঁহু—দুধ খেয়ো না। আর নিজে এমন ক'রে এসো না। বুঝেছ? হ্যাঁ! ঘোরাতে পারে দুদিন।

ব্যস। এইবার গ্রামের কটা রোগীর বাড়ী যেতে হবে। তারপর নবগ্রাম। সাহাদের বাড়ীতে একটা নিউমোনিয়া কেস, সুবর্ণবাবুর ছেলের রেমিটেণ্ট ফিবার, রমেন্দ্রবাবুর ছোটছেলের প্রমেহ, বন্ধু নেপালের স্ত্রীর সূতিকা।

পথে আরও কত জন কত বাড়ী থেকে তাঁকে ডাকত!—মশায়, একবার আমার ছেলেকে দেখুন। ছেলে কোলে নিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকত।

—মশায়, একবার যদি আমার মাকে দেখে যান!

—জীবন, একবার বাপু যোগী বাঁড়ুজ্জেকে দেখে যা। ছেলেপুলে নাই, আমাকেই বললে যোগী—যদি জীবন মশায়ের সঙ্গে দেখা হয় তো বলো, একবার যেন দেখে যান আমাকে। চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর ওষুধে তো কিছু হল না।

সেতাব নেপাল এরা দুজনে এই সব রোগীদের পৃষ্ঠপোষক ছিল। ওরা তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে থাকত।

জীবন দত্ত হাসিমুখেই যেতেন। ওদের বলতেন—বলিস, বুঝলি, খবর নিয়ে বলিস। আমি দেখে যাব।

নেপাল খবর আনত—হরিহর ডোম খুব ভুগছে। চল একবার যাবি। গোপ্‌লা বাউড়ীর মায়ের জ্বর, তাকেও একবার দেখে যাবি চল।

হরিহরের অসুখ ভাল হলে তার কাছে একটা পাঁঠা আদায় করবে নেপাল। সে জীবন দত্ত জানতেন। এবং সেই পাঁঠাটা নিয়ে চাল ডাল ঘি মশলা তরি-তরকারী নেপাল নিজে দিয়ে একদিন ফিস্ট করবে। জীবন দত্তকে দিতে হবে মাছ-মিষ্টি।

বাড়ী ফিরতে অপরাহ্ন। পকেটে টাকায় আধুলিতে দশ বারো টাকা। কি ছিল তখন এক টাকা। দিনান্তে কি একবার। দ্বিতীয়বারে ফিরের

রেওয়াজ ছিল না। জামাটা খুলে দিতেন আতর বউকে। ছেলে বনবিহারী মেয়ে সুষমা এসে দাঁড়াত।

—বাবা পয়সা।

জীবন দত্ত ফেরবার পথে চারটি পয়সা ভাঙিয়ে নিয়ে ফিরতেন। বনুর দুটি, সরমার দুটি।

নোট বইটা খুলে লিখে রাখতেন—রমেন্দ্রবাবুর বাড়ীর ফি বাকী রইল।

বাড়ীর বাইরে আরোগ্য-নিকেতনের সম্মুখে বামনি গাঁয়ের শেখেদের গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণপুরের লোক এসেছে। কায়স্থপ্রধান সমাজ কৃষ্ণপুর। মিত্রদের বাড়ীর চিঠি নিয়ে এসেছে—"দত্ত মহাশয়—একবার দয়া করিয়া আসিবেন। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের একজ্বরী জ্বর। রাঘবপুরের কবিরাজ দেখিতেছিলেন কিন্তু কিছু হইতেছে না। ইতি সুরেশ চন্দ্র মিত্র।"

* * *

দিন যায়, ফেরে না। দিনের সঙ্গে কাল যায়, কালের সঙ্গে যা পুরাতন যা জীর্ণ তা যায়। তাঁরও খ্যাতি গিয়েছে। আক্ষেপ তাতে নাই।

আজ আরোগ্য-নিকেতনে রোগী আট জন।

জীবন ডাক্তার উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে বেরিয়ে আরোগ্য-নিকেতনে এলেন না। নন্দকে ডেকে বললেন—আমার একটু দেরী হবে, বসতে বলবি ওদের। আর পরান খাঁকে বলবি, আজ আর ওর বাড়ী যাব না। বিবি তো ওর ভালই আছে!

—নবগেরামের রতনবাবুর বাড়ীর লোক এসেছে। তাকে কি বলব?

—এসেছে? আমি সেখানেই যাচ্ছি। এই গলিপথ ধরে আমি বের হচ্ছি। ওকে গ্রামের বাইরে সঙ্গ নিতে বলে দে। ওখান থেকে আমি মহাপীঠে যাব গোঁসাইকে দেখতে। তারপর ফিরব।

নন্দ বললে—বসে তো থাকবে সবাই—চেঁচাবে সেই দাঁতু ঘোষাল!

—দাঁতু এসেছে? কেন? তাকে তো এক সপ্তাহের ওষুধ দিয়েছি।

—বলছে—গাঁজা বন্ধ করেছে মশায়—তাতে ওর ঘুম হয় না। হয় গাঁজা খেতে বলুক নয় ঘুমের ওষুধ দিক।

(আঠারো)

রতনবাবুর ছেলে বিপিনবাবুর হেঁচকি থামে নি, তবে কমেছে। রক্তের চাপও খানিকটা নেমেছে। রতনবাবু প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গেই বললেন—তোমার ওষুধে ফল হয়েছে জীবন। তুমি একবার নাড়ীটা দেখ। আমার তো ভালই লাগছে।

জীবন মশায়ও একটু হাসলেন। হাসির কারণ খানিকটা কথাগুলি ভাল লাগার জন্য; খানিকটা কিন্তু ঠিক বিপরীত হেতুতে। হায়রে, সংসারে ব্যাধি-মুক্তি যদি এত সহজে সম্ভবপর হত! এত সহজে যদি ভাল হয়ে উঠত মানুষ!

হাসির কারণ আরও খানিকটা আছে। রতনবাবুর মত মানুষ। পণ্ডিত মানুষ, জ্ঞানী ব্যক্তি, একমাত্র সন্তানের এই ব্যাধি হওয়ার পর তিনি ডাক্তারী বই আনিয়ে এই ব্যাধিটি সম্পর্কে পড়াশুনা ক'রে সব বুঝতে চেয়েছেন, বুঝেছেনও; এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের মর্মান্তিক তত্ত্বও তিনি ভাল ক'রেই জানেন—তাঁকেও এইটুকুতে আশান্বিত হয়ে উঠতে দেখে হাসলেন।

রতনবাবু আবার বললেন—দেখ, আমার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল যে, কবিরাজী মতেই চিকিৎসা করাই। বিলাতী চিকিৎসায় অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে কিন্তু ওদের ওষুধগুলো আমাদের দেশের মানুষের ধাতুর পক্ষে উগ্র। আমাদের ঠিক সহ্য হয় না। ক্রিয়ার চেয়ে প্রতিক্রিয়ার ফল গুরুতর হয়।

বৃদ্ধ এই নৈরাশ্যের তুফানের মধ্যে একগাছি তৃণের মত ক্ষীণ আশার আশ্রয় পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন, কথা বলতে তাঁর ভাল লাগছে।

—তবে আমার মনের কথা আমি কাউকে বলি না। বুঝেছ ভাই। ওটা আমার প্রকৃতিধর্ম নয়। বিপিনের নিজের বিশ্বাস নাই। বউমার নাই। বিপিনের বড় ছেলে এম এ পড়ছে, সে তো একটু বেশী রকমেরই আধুনিকপন্থী। তাদেরও বিশ্বাস নাই। আমি বললে—তারা কেউ আপত্তি করবে না, সে আমি জানি; মুখ ফুটে কেউ কোন কথা

বলবে না কিন্তু অন্তরে অন্তরে তো সায় দেবে না; মনের খুঁতখুতুনী তো থাকবে! সে ক্ষেত্রে আমি বলি না, বলব না। তবে কাল যখন ডাক্তারেরা সকলেই বললেন যে, হেঁচকি থামাবার আর কোন ওষুধ আমাদের নেই, তখন আমি তোমার কথা বললাম। আজ সকালে ডাক্তারদেরও ডেকেছি, তাঁরাও আসবেন; হাসপাতালের প্রদ্যোত ডাক্তার, হরেন সবাই আসবেন। সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে একটা ব্যবস্থা কর ভাই।

গম্ভীর হয়ে উঠলেন জীবন মশায়। বললেন—দেখ রতনবাবু, শুধু হেঁচকি বন্ধ করবার জন্য আমাকে তোমরা ডেকেছ। আমি ভাই তার ব্যবস্থাই করেছি। তা কমে এসেছে, হয় তো আজ ওবেলা পর্যন্ত হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর একটা পথ ধরতে হবে। আমি কবিরাজীও জানি—এ্যালোপ্যাথিও করি। আমিই বলছি ভাই—দু নৌকায় দু পা রেখে চলা তো চলবে না। হয় কবিরাজী নয় এ্যালোপ্যাথি—দুটোর একটা করতে হবে। ওঁরাও ঠিক এই কথাই বলবেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—আর আজ এখন তো আমি অপেক্ষা করতে পারব না। আমাকে একবার চণ্ডীতলায় যেতে হবে। গোঁসাইয়ের খুব অসুখ দেখে এসেছি রাত্রে, বলে এসেছিলাম সকালে খবর দিতে। খবর পাই নি। হয় তো গোঁসাই দেহ রেখেছেন। তবু একবার যেতে হবে। আমি বিপিনকে দেখে যাই, তারপর ওঁরা আসবেন দেখবেন, পরামর্শ করে যা ঠিক হবে আমি ও-বেলা এসে শুনব।

বৃদ্ধ রতনবাবু বিষণ্ণ হলেন, তবুও যথাসম্ভব নিজেকে সংযত ক'রে—প্রসন্নভাবেই বললেন—বেশ! তাই দেখে যাও তুমি। তুমি যা বলবে ওঁদের বলব।

বিপিন সত্যই একটু ভাল আছে। নাড়ীতে ভাল থাকার আভাস পেলেন জীবন দত্ত। কিন্তু ভাল থাকার উপর নির্ভর ক'রে আশান্বিত হয়ে উঠবার মত বয়স তাঁর চলে গেছে। বললেন—হ্যাঁ, ভালই যেন মনে হচ্ছে। তবে ভাল থাকাটা স্থায়ী হওয়া চাই রতন।

—বাড়ী কেমন দেখলে, বল।

—যা দেখলাম তাই বলেছি রতনবাবু। তোমার মত লোকের কাছে রেখে-ঢেকে তো বলার প্রয়োজন নাই এবং তা আমি বলবও না। তোমাকে আমি জানি।

রতনবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

জীবন মশায় হেসে বললেন—আমি কিন্তু নৈরাশ্যের কথা কিছু বলি নি রতন। এই ভাবটা যদি স্থায়ী হয় তা হ'লে ধীরে ধীরে বিপিন সেরে উঠবে। হেঁচকি আজই থামবে। তারপর আর যদি কোন উপসর্গ না বাড়ে তাহলে দশ বারো দিনের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি হবে। ভাল-থাকাটাকে স্থায়ী ভাব বলব, বুঝেছ? বলব—হ্যাঁ আর ভয় নাই। তবে সাবধানে থাকতে হবে। আর এখান ওখান প্র্যাক্‌টিস করে বেড়ানো চলবে না। ওই বাড়ীতে বসে যা হয়, তাও বেশী পরিশ্রম চলবে না।

—ওই তো! ওই তো রোগের কারণ! বার বার বারণ করেছি! বারবার! কিন্তু শোনে নি। কি বলব? কি করব? উপযুক্ত ছেলে। গণ্যমান্য ব্যক্তি। জীবনের কোনখানে কোথাও কোন দোষ নাই, অমিতাচার নাই, অন্যায় নাই; আহারে লোভ নাই, অন্যায় পথে অর্থোপার্জনের মতি নাই, কোন নেশা নাই; সিগারেট পান পর্যন্ত খায় না, ক্রোধ নাই; বিলাসী নয়; শুধু ওই প্র্যাক্‌টিস। প্র্যাক্‌টিস আর প্র্যাকটিস। তাও তোমাকে বলছি ভাই, প্র্যাকটিস যে অর্থের জন্যে তাও নয়। ওই মামলা জেতার নেশা। এ জেলা ও জেলা, এ কোর্ট ও কোর্ট সে কোর্ট। তারপর মাসে দুবার তিনবার হাইকোর্টে কেস নিয়ে গিয়েছে। ওই মামলা জেতার নেশা, যে মামলায় হার হয়েছে, হাইকোর্ট থেকে তাই ফিরিয়ে আনতে হবে। তা এনেছে। ও নেশা কিছুতেই গেল না। ঘর দেখেনি সংসার দেখে নি, ছেলেপুলে স্ত্রী নিয়ে আনন্দ করেনি; আমার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে ওই নিয়ে থেকেছে। আমি কতবার বলেছি—বিপিন এও তোমার রিপু। রিপুকে প্রশ্রয় দিয়ো না। প্রশ্রয় পেলে রিপুই ব্যাধি হয়ে দেহমনকে আক্রমণ করে, হয় তো—। বাপ হয়ে কথাটা তো উচ্চারণ করতে পারতাম না ভাই!

জীবন দত্ত বললেন—থাক এবার সেরে উঠুক। সাবধান আপনিই হবে।

একটি কিশোর ছেলে এসে দাঁড়াল, আপনার ফি। এইটিই বিপিনের বড় ছেলে। চমৎকার ছেলে।

—এ কি? চারটাকা কেন? আমার ফি দু টাকা!

দুটি টাকা তুলে নিয়ে জীবন মশায় পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়লেন। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। বললে—আপনি কি ডাক্তাররা যখন আসবেন তখন থাকবেন না?

—আমি? আমি থেকে কি করব?

—আপনার মতামত বলবেন।

—আমি তো শুধু হিক্কার জন্য ওষুধ দিয়েছি। ওটা একটা উপসর্গ। মূল চিকিৎসা তো ওঁরাই করছেন। হাসলেন জীবন ডাক্তার।

ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ বললে—ওবেলা একবার আসবেন না?

—আসব? আচ্ছা আসব।

ডাক্তার চলে গেলেন।

বিপিন বোধ হয় বাঁচবে না। ভাল খানিকটা মনে হল বটে কিন্তু আজ যেন স্পষ্টই তিনি নাড়ী দেখে অনুভব করেছেন—মৃত্যু আসছে। আসছে কেন—ইতিমধ্যেই এসে দাঁড়িয়েছে। ছায়া পড়ছে তার। রতনবাবুর কথা ভাবলেন। বড় আঘাত পাবে রতন। নিজের কথা মনে পড়ল। তাঁর ছেলে বনবিহারী মারা গেছে। বিপিনেরই বয়সী সে। একান্ত তরুণ বয়সে বনবিহারী মারা গেছে; নিজের অমিতাচারে মদ্যপান এবং তার আনুষঙ্গিক অনাচার করে নিজেকে জীর্ণ করেছিল, তার উপর ম্যালেরিয়ায় ভুগে নিজেকে ক্ষয় করেছিল সে। বিপিন যাচ্ছে,—অতিরিক্ত কর্মভারে পীড়িত করে নিজেকে ক্ষয় করেছে সে।

রতনবাবুর কথাগুলি মনে পড়ল। 'ঘর দেখে নি, সংসার দেখে নি, ছেলে-পুলে স্ত্রী নিয়ে আনন্দ করেনি। শুধু কাজ, কাজ, মামলা মামলা মামলা। কতবার রতনবাবু বলেছেন—'বিপিন এও তোমার রিপু'—!'

রিপুই বটে। বড় ভয়ঙ্কর রিপু। বড় ভয়ঙ্কর। তিনি নিজে ভুগেছেন যে! জীবন্তে মৃত্যু ঘটেছে বলে তিনি তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন।

বনবিহারীর মৃত্যুর পর তিনি চিকিৎসায় অমনোযোগী হয়েছেন এবং কাল অগ্রসর হয়ে তাঁকে পুরানো জীর্ণ বলে ঘোষণা করেছে। আজ তাঁর অবস্থা গজভুক্তকপিত্থের মত। অন্তত লোকে তাই ভাবে। তাই তিনি রিপুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

—কেমন দেখে এলি? রতনবাবুর ছেলেকে?

—সেতাব?

সেতাবের বাড়ী এসে পড়েছেন, খেয়াল ছিল না।

—কি দেখলি?

—দেখব আর কি? আমি তো দেখছি না। দেখছে ডাক্তাররা। আমাকে ডেকেছিল। হিক্কা বন্ধের জন্যে। তা কমেছে। বোধ হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত হিক্কা থেমে যাবে।

—কিন্তু নাড়ী দেখলি তো?

—দেখেছি। কিন্তু—।

—কিন্তু কি?

—প্রদ্যোত ডাক্তার শুদ্ধ যখন দেখছে তখন কি দেখলাম তা বলা তো ঠিক হবে না সেতাব। ছোকরা বদমেজাজী—যদি ঝগড়া করে!

—হুঁ। সেটা অবিশ্যি ঠিক হবে না। তা তুই ঠিক বলেছিস। তবে রতনবাবু তো আমাদের গাঁয়ের লোক, ঘরের লোক—সেই জন্যে। বুঝলি না, অবস্থা আছে, চিকিৎসা করাতে পারেন। কলকাতা নিয়ে যেতে পারেন।

—কলকাতা থেকে আসাটাই ভুল হয়েছে। কলকাতায় থাকলেই ভাল করতেন। এলেন বিশ্রাম হবে বলে। কিন্তু হঠাৎ রোগ বাড়লে কি হবে সেটা ভাবলেন না। ওই হয় রে। সংসারে দীর্ঘকাল চিকিৎসা ক'রে এইটেই দেখলাম যে, ভ্রম হয়, সেবার ত্রুটি হয়, এটা-ওটা হয়। কলকাতা নিয়ে যাওয়া আর চলবে না। মানে—।

—তা-হলে? কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে সেতাব কথা বলে উঠল; কিন্তু নিজেও কথাটা শেষ করতে পারলে না, নিজেই থেমে গেল।

—না-না। সে বলি নি, বলবার মত কিছু পাইনি! তবে—বুঝলি না—। তবু যেন ভরসা পাচ্ছি না।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন ডাক্তার।

এরপর দুজনেই চুপ ক'রে বসে রইলেন।

ডাক্তার হঠাৎ উঠে বললেন—চললাম—রোগী বসে আছে বাড়ীতে। চণ্ডীতলা হয়ে যাব। গোঁসাই এখন-তখন, জানিস?

—শুনেছি কাল। আজ বোধ হয় ভাল আছেন একটু। নিশি ঠাকরুণ গিয়েছিল চণ্ডীতলা—মায়ের স্থানে জল দিতে; সে বলছিল। শশী নাকি ভাল করেছে গোঁসাইকে একদাগ ওষুধে। বলছিল—কাল জীবন মশায় ডাইঝিটাকে দেখে বললে, জলবারণ খাওয়াতে হবে। তা—শশীকেই দেখাব আমি।

হাসলেন জীবন দত্ত। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে উঠলেন, হতভাগিনী মেয়েটার মুখ মনে পড়ল। কচি মেয়ে। কত সাধ কত আকাঙ্ক্ষা মনে। মেয়েটাকে হত্যা করবে। শশী একটা পাপ হয়ে দাঁড়াল!

সেতাব বললেন—তুই কাল নিশির ডাইঝিকে দেখেছিলি নাকি? জলবারণের কথা বলেছিলি?

—বলেছিলাম। ও—।

না। থাক। নিদানের কথা উচ্চারণ করবেন না। এ যুগ নিদানের যুগ নয়, থাক। সে অধিকার তাঁরও বিগত হয়েছে। জীবন ডাক্তার উঠলেন। কথাটা চাপা দিয়ে বললেন—বিকেলে একবার যাস। ক'দিন দাবা খেলিনি।

—যাব। আমারও ভাল লাগে না। কি করব? বেরুতে তুই বারণ করেছিস।

—আজ যাস।

সন্ন্যাসী ভাল আছেন, সুস্থ ভাবেই অল্প মাথা তুলে শুয়ে রয়েছেন। বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। জীবন দত্তকে দেখে বললেন—আইসো রে ভাই মহাশয় আইসো! কাল রাতে তুমি আসিয়েছিলে ভাই, আমি তখুন ঘুমাইয়েছি। ওহি—শশী বেটা কী একঠো দাওয়াই দিলে—বাস্, পাঁচমিনিটকো ভিতর বে-হোঁস হইয়ে গেলাম।

—আজ তো ভাল আছেন। ওষুধে তো ভাল ফলই হয়েছে। হাসলেন জীবন।

—কে জানে ভাই। ঘাড় নাড়লেন।

—কেন! কোন যন্ত্রণা রয়েছে এখন? আর অসুখ কি?

—ঠিক সমঝাতে পারছি না। হাতটা তুমি দেখো ভাই। দেখতো দাদা, ছুট্টি মিলবে কিনা?

—ছুটি নিতে ইচ্ছে হলেই মিলবে। ইচ্ছে না-হলে তো আপনাদের ছুটি হয় না।

—সে পুণ্য আমার নাই ভাই।

সে পুণ্য সন্ন্যাসীর নাই সে জীবন দত্ত বুঝেছেন। থাকলে বুঝতে পারতেন—কালকের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে গাঁজা না-খাওয়ার যন্ত্রণাটাই ছিল ষোল আনার মধ্যে বারো আনা কি চৌদ্দ আনা। সে সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁর গিয়েছে, মন জীর্ণ হয়েছে বেশী। যাঁদের যোগের সাধনা থাকে—তাঁদের মন অদ্ভুত শক্তিশালী মন, দেহের জীর্ণতা তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না, মনে তখন বাসনা জাগে জীর্ণ দেহ ত্যাগ ক'রে নূতন দেহ লাভের। এ কথা এ দেশের পুরানো কথা—বাবার কাছে শুনেছেন, আরও অনেক প্রবীণদের কাছে শুনেছেন। প্রদ্যোতেরা একথা বিশ্বাস করবে না—হাসবে—কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন। মশায় সন্ন্যাসীর হাতখানি তুলে নিলেন।

সন্ন্যাসী ক্ষীণ কণ্ঠেই বললেন—মনে নিছে ভাই কি ছুটি মিলবে। কাল রাতে যেন মনে হইলরে ভাই কি—উধার থেকে দশ বারোঠো খড়মকে আওয়াজ উঠছে। আউর মনে হইল—রঘুবরজীর আওয়াজ মিলছে। ওহি-জঙ্গলের পঞ্চতপার আসনসে হাঁকছে, আও ভাইয়া! আও।

কথাগুলির অর্থ বুঝতে জীবন মশায়ের বিলম্ব হল না।

ও ধারে—জঙ্গলের মধ্যে এখানকার পূর্বতন মহান্তদের সমাধি আছে। সেখান থেকে খড়মের আওয়াজ শুনেছেন সন্ন্যাসী। অর্থাৎ তাঁরা এসেছিলেন তাঁকে আহ্বান জানাতে। রঘুবরজী এই সন্ন্যাসীর গুরুস্থানীয় এবং এঁর ঠিক আগের মহান্ত। তিনি ছিলেন সত্যকারের যোগী। যোগ সাধনায় দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলিকে যেমন শক্তিশালী করেছিলেন, বিচিত্র ব্রত পালন করে

বাইরের প্রকৃতির প্রভাব সহ্য করবার শক্তিও তিনি তেমনি আয়ত্ত করেছিলেন। বৈশাখে পঞ্চতপা ব্রত করতেন—সূর্যোদয়ের সঙ্গে পাঁচটি হোম কুণ্ড জ্বেলে—ঠিক মাঝখানে আসন গ্রহণ করতেন, সারাদিন সেই আসনে বসে পর পর কুণ্ডে কুণ্ডে আহুতি দিয়ে—সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর সে দিনের মত হোম শেষ ক'রে উঠতেন। আবার শীতে ওই গাছতলায় অনাবৃত দেহে বসে জপ করতেন; প্রথম পাখীর ডাকের পর আসন ছেড়ে হিমশীতল পুষ্করিণীতে নেমে সূর্যোদয় পর্যন্ত অর্থাৎ উত্তাপ সঞ্চারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকতেন। তিনিই তাঁকে ডেকেছেন বলছেন।

সাধারণ মানুষ মৃত্যুর পূর্বে মৃত স্বজনকে দেখেন। তাঁরা নাকি নিতে আসেন। সন্ন্যাসীর স্বজন বিস্মৃতির গহনে হারিয়ে গিয়েছে। এখানকার মহান্তেরাই তাঁর স্বজন পূর্বপুরুষ—তাঁদেরই তিনি দেখেছেন।

নাড়ী দেখে হাত নামিয়ে দিয়ে জীবন দত্ত বললেন—হ্যাঁ বাবা। ছুটি আসছে আপনার। আজ সন্ধ্যার পর। কাল যখন অসুখ খুব বেড়েছিল—সেই সময়।

এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল সন্ন্যাসীর বিশীর্ণ বার্ধক্যশুষ্ক ঠোঁট দুটিতে। আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাসও ফেললেন তিনি।

* * * *

সন্ন্যাসীর সঙ্গে কত স্মৃতিই যে জড়িত রয়েছে জীবনের!

আজ চল্লিশ বৎসর সন্ন্যাসী এখানে আছেন। তিরিশ বৎসরের উপর তিনি এই দেবস্থানের মহান্ত। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে এখানে প্রথম এসেছিলেন তিনি। কিন্তু দেখে মনে হ'ত তিরিশ বছরের জোয়ান! লম্বা চওড়া কুস্তী করা পালোয়ানী শরীর। শাস্ত্র-টাস্ত্র জানতেন না, গাঢ় বিশ্বাস আর কয়েকটি নীতিবোধ নিয়ে মানুষটির সন্ন্যাস। সন্ত না-হোক সাধু মানুষ ছিলেন।

প্রথম পরিচয় হয়েছিল বিচিত্র ভাবে।

দেশের তখন একটা ভয়াবহ অবস্থা। মড়ক চলেছে, মহামারী কলেরা লেগেছে দেশে। একগ্রাম থেকে আর একগ্রাম—সেখান থেকে আর একগ্রাম; বৈশাখের দুপুরে খড়ের চালের আগুনের মত—লেলিহান গ্রাস বিস্তার করে

ছড়িয়ে পড়ল। সেকালে তখন কলেরার কোন ওষুধ ছিল না। ক্লোরোডাইন সম্বল। কবিরাজীতে ওলাউঠার ওষুধ তেমন কার্যকরী নয়। ক্লোরোডাইন দেবারও চিকিৎসক নাই। যারা আছে—তারা নিজেরাই ভয়ে ত্রস্ত। হরিশ ডাক্তার কলেরায় যেত না। হোমিওপ্যাথ ব্রারোরি তখন পালিয়েছে। থাকলে সেও যেত না। নতুন একজন ডাক্তার এসেছিল নবগ্রামে—সেও একদিন রাত্রে পালিয়ে গেল—কলেরা কেসে ডাকের ভয়ে।

চারিদিকে নানা গুজব। সেকালের বিশ্বাসের ভয়ঙ্কর গুজব।

সাক্ষাৎ কলেরাকে না কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার মুখে তাকে দেখা যায়। শীর্ণ কঙ্কালসার শরীর, চোখে আগুনের মত দৃষ্টি, পিঙ্গল রুক্ষ চুল, দন্তুর একটি মেয়ে; পরণে তার একখানা ক্লেদাক্ত জীর্ণ কাপড়, বগলে একটা মড়াবওয়া তালপাতার চ্যাটাই নিয়ে সেই পথ ধরে গ্রামে ঢোকে—যে পথ ধ'রে গ্রামের শব নিয়ে শ্মশানে যায়। সন্ধ্যায় ঢোকে, যার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়—সেই হতভাগ্যই সেই রাত্রেই কলেরায় আক্রান্ত হয়। মরে। তারপর রোগ ছড়ায় ঘরে ঘরে—পাড়ায় পাড়ায়।

লোকে পালাতে লাগল গ্রাম ছেড়ে।

অবস্থাপন্নেরা আগে পালাল। নবগ্রামের বাবুরা তার মধ্যে সর্ব প্রথম। তারপর সাধারণ লোকেরা।

থাকল গরীবেরা আর অসমসাহসী জনকয়েক, তার মধ্যে মাতাল গাঁজালেরা সংখ্যায় বেশী। মদ খেয়ে গাঁজা টেনে ভাম্ হয়ে বসে থাকত। কালীনাম হরিনাম ক'রে চীৎকার করত।

তিনিও হরিনাম করতেন।

চিরকালই তিনি সংকীর্তনের দলের মূলগায়েনী করেন। গলা তাঁর নাই, সুকণ্ঠ তিনি নন, তবে গান তিনি বোঝেন এবং গাইতেও তিনি পারেন। হ্যাঁ, তা পারেন। দশকুশীতে সংকীর্তন এখনও তিনি গাইতে পারেন। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেবার লোক এখন আর নাই। থাকবে কোথায়? এ সব বড় তালের গানের চর্চাই উঠে গেল। কতই দেখলেন! হারমোনিয়ম—গ্রামোফোন, এখন রেডিয়ো। নবগ্রামে কয়েক জনের বাড়ীতেই রেডিয়ো এসেছে। শুনেছেন

তিনি। সে গান আর এ গান! সেই—"দেখে এলাম শ্যাম—সাধের ব্রজধাম—শুধু নাম আছে।" হায় হায়! "শুধু নামই আছে আর কিছু নাই গো শ্যাম। রাধা স্বর্ণলতা তমালকে শ্যাম ভেবে জড়িয়ে ধ'রে ক্ষতবিক্ষত দেহে ধুলায় ধুসরিতা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে হতচেতন হয়ে।"

তিনি প্রতি সন্ধ্যায় সংকীর্তনের দল নিয়ে পথে পথে ঘুরতেন। বিশ্বাস করতেন এই নামকীর্তনে অকল্যাণ দূর হয়। গ্রামে গ্রামে মদ্যপায়ীরা রক্ষাকালী পুজা করাত। তাদেরও সে বিশ্বাস ছিল গভীর।

গভীর রাত্রে পথ-কুক্কুরে চীৎকার করে চিরকাল। সে চীৎকার যেন বেশী হয়েছে। এবং সে চীৎকারের একটি যেন গূঢ় অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। চীৎকারের মধ্যে ক্রোধ নাই—ভয় আছে। তারা রাত্রে ওই পিঙ্গলকেশিনীকে পথে বিচরণ করতে দেখতে পায়। ভয়ার্ত চীৎকার করে তারা। ঘরে ঘরে অর্ধ ঘুমন্ত মানুষেরা শিউরে ওঠে।

জীবন ডাক্তারের মৃত্যুভয় ছিল না। তিনি ঘুরতেন। কিন্তু কি করবেন ঘুরে?

ছুটে গেলেন রঙলাল ডাক্তারের কাছে। বলুন—ওষুধ বলে দিন।

দীর্ঘকাল পরে বৃদ্ধ রঙলাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মেডিকেল জার্ণাল পেড়ে বসলেন। তারপর প্রেসকৃপশন লিখে দিলেন—ওয়ান সিক্সথ গ্রেণ ক্যালোমেল আর সোডা বাইকার্ব। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াও। এ ছাড়া এখানে এ অবস্থায় আর কিছু করবার নাই।

অনেক প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল ওই ওষুধে। দিন নাই রাত্রি নাই জীবন মশায় ঘুরতেন। পিতৃবংশের সম্মান। গুরু রঙলালের আদেশ, নিজের প্রাণের বেদনা!

রঙলাল ডাক্তার প্রেসকৃপশন দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভাল কথা জীবন! তুমি না কি খুব তারস্বরে চীৎকার ক'রে হরিনাম সংকীর্তন ক'রে কলেরা তাড়াচ্ছ?

অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন।

জীবন লজ্জিত যে একেবারে হন নি তা নয়। তা হলেও অপ্রতিভ হন নি। বলেছিলেন—কি করব? লোকেরা বিশ্বাস ক'রে ভরসা পায়।

—তুমি নিজে ?

জীবন একটু বাঁকা উত্তর দিয়েছিলেন—সবিনয়ে বলেছিলেন—আপনি তো জানেন, আমি কোনদিনই নাস্তিক নই।

—তাতে আমি অসন্তুষ্ট নই, আপত্তিও করি না জীবন। নাম সংকীর্তন করলেও আপত্তি করব না, তবে সে সংকীর্তন শুধু সপ্রেমে কীর্তনের জন্য হওয়া উচিৎ। আমাকে দাও আমাকে বাঁচাও আমার শত্রু নাশ কর, এই কামনায় সংকীর্তন আমি পছন্দ করি না। ওতে ফলও হয় না।

জীবন বলেছিলেন—আগুন লাগা বনের পশুর মত মানুষ ছুটে বেড়াচ্ছে। জানেন, আমি যেন চোখে দেখছি—। উত্তেজিত হয়ে আবেগের সঙ্গেই জীবন সে দিন রঙলাল ডাক্তারের সামনে দার্শনিকতা করে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন—মরণ তেড়ে নিয়ে চলেছে জীবনকে। একেবারে এলোকেশী—এক ভয়ঙ্করী—হাত বাড়িয়ে ছুটেছে, গ্রাস করবে, অনন্ত ক্ষুধা! আর পৃথিবীর জীবকুল ভয়ে পাগলের মত ছুটছে। ছুটতে ছুটতে এলিয়ে পড়ছে, মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে। অহরহই ওই তাড়ায় তেড়ে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যু! এখানে ভগবানের নাম করে তাকে ডেকে ভরসা সঞ্চয় করা ছাড়া করবে কি মানুষ ?

রঙলাল ডাক্তার এর উত্তরে সেদিন ব্যঙ্গ করেন নি, প্রসন্ন হেসে বলেছিলেন, ব্যাপারটা তাই বটে জীবন। হার জিতের একটা লড়াই-ই বটে। কিন্তু ওইটেই যেমন চোখে পড়েছে—তেমনি চোখ যদি আরও তীক্ষ্ণ হ'ত—তবে দেখতে পেতে—এক একটা মানুষ কেমন করে ঘুরে দাঁড়ায়, বলে,—এস! তুমি যে ওই ভয়ঙ্কর বেশে আসছ, তোমার আসল রূপটা দেখি। কিংবা বলে—তোমাকে আমি ধরা দিচ্ছি কিন্তু যারা পালাচ্ছে তাদের বাঁচতে দাও। তখন মরণের ভয়ঙ্কর মুখোসটা খসে যায়। দেখা যায় সে বিশ্ব-বিমোহিনী। তা ছাড়া তুমি জান না, মরণ যত গ্রাস করছে তার দ্বিগুণ জীবন জন্ম নিয়ে চারদিক থেকে কুক দিয়ে বলছে—ধরতো! হারছে না জীবন। আরও একটা কথা বলি। মানুষ হারে নি। মহামারীতে কতবার কত জনপদ নষ্ট হয়েছে। আবার কত জনপদ গড়েছে। শুধু গড়েই ক্ষান্ত হয়নি। সে রোগের প্রতিষেধক বার করে চলেছে। ওইখানেই তাকে হারানো যায়নি। সে হারেনি।

মরবে সে। কিন্তু এইভাবে সে মরবে না। মহাগজের মত মরবে সে। যেদিন বৃদ্ধ হবে, জীবনের আস্বাদের চেয়ে মৃত্যুর আস্বাদ ভাল লাগবে, সেই দিন মহাগজ যেমন নিবিড় অরণ্যে গিয়ে বহু শত বৎসরের এক খাদের মধ্যে আকাশ বিদীর্ণ করে ধ্বনি তুলে, আমি চললাম বলে দেহত্যাগ করবে। হাতীরা এই-ভাবে পুরুষানুক্রমিক শ্মশানভূমিতে গিয়ে দেহত্যাগ করে থাকে। কেন জান? পাছে তার রোগ বা পচনশীল দেহ থেকে রোগ উৎপন্ন হয়ে অন্য হাতীদের আক্রমণ করে।

ওঃ, কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছেন তিনি। পথ থেকে দূরে চলে এসেছেন। বৃদ্ধ জীবন মশায় পাকা দাড়ীতে হাত বুলালেন।—খানিকটা বাঁদিকে গিয়ে ঠিক পথ ধরলেন তিনি।—এই মহামারী থামবার পর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ। এই মহামারীর পর এখানে তিনি সমাজের প্রধান হয়ে উঠেছিলেন! নবগ্রামের বাবুদের উপেক্ষা করে সরকার তাঁকে প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত মনোনীত করেছিলেন। সেই প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত হিসাবেই—একটি কলহের মীমাংসায় তিনি এসেছিলেন এই মহাপীঠে।

সন্ন্যাসী এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আরে ভাইয়া—তুমহার নাম জীওন মহাশা? তুমি না কি বড়া ভারী বীর? আও তো ভাই পাঞ্জা লড়ে এক হাঁত।

পাঞ্জার লড়াইয়ে তিনি হেরেছিলেন কিন্তু সহজে হারাতে পারে নি সন্ন্যাসী। বেশ খানিকটা বেগ পেতে হয়েছিল।

তারপর কত দিন কত কথা আলাপ হয়েছে।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। এই চণ্ডীতলার মেলায়—জুয়া খেলার আসরে শেষ কপর্দক হেরে—সন্ন্যাসীর কাছে এসে বলেছিলেন—আমার একশো টাকা দিতে হবে গোঁসাই জী। কাল পাঠিয়ে দেব।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে—একটু হেসে—গোঁসাই টাকাটা তাকে দিয়েছিলেন—এই দেবস্থলের তহবিলের টাকা। ডাক্তার এসে আবার বসেছিলেন জুয়ার তক্তাপোষে। ঘণ্টা খানেক পরেই গোঁসাই এসে—তাঁকে হাত ধরে টেনে বলেছিলেন—আব উঠো ভাই। বহুত হুয়া।

জুয়ারীকে বলেছিলেন—জানতা হ্যায় ইন্ কোন হ্যায়? হিঁয়াকে বড়া ডাগডর বাবু, আওর প্রেসিডেন পঞ্চায়েত। ইনকা রূপেয়া যো লিয়া—দে দেও ইনকে।

ডাক্তার বলেছিলেন—না। আর মাত্র কুড়ি টাকা হেরে আছি। ওটা ওর প্রাপ্য। চলুন।

পথে সন্ন্যাসী বলেছিলেন—কথাটা তাঁর অন্তরে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে—বলেছিলেন—কাহে ভাই মহাশা—তুম্ মহাশা বন্শের সন্তান মহাশা—তুম ভাই জুয়া খেলো—রাত ভর দাবা খেলো, খানাপিনামে এইসা হল্লা করো—এ কেয়া ভাই? ভগবান তুমকো কেয়া নেহি দিয়া, বলো? কেঁও তুমহারা ঘরকে মতি নেহি?

ওঃ! সে একটা সময়, দেহে অফুরন্ত সামর্থ্য—মনে দুরন্ত সাহস—বিপুল পসার, মান-সম্মান; ঘর-কন্না সংসার কোন কিছুই মনে থাকত না। তবে কোন অন্যায় করতেন না। জুয়ো খেলাটা ছিল শখ! ওটা সে আমলের ধারা! তবে সংসারে যদি—।

অকস্মাৎ তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

একটা প্রশ্ন জেগে উঠল মনের মধ্যে।—বিপিন—রতনবাবুর ছেলে বিপিনের জীবনে কি—? সংসার জীবনে কি বিপিনের গোপন দুঃখ ছিল? অশান্তি? বাইরে ছুটে বেড়াত—প্রতিষ্ঠা যশ কুড়িয়ে বেড়াত কিন্তু তবু তৃষ্ণা মিটত না, ক্ষুধা মিটত না! ছুটত—ছুটত—ছুটত!

(উনিশ)

দাঁতু ঘোষাল চীৎকার করছিল।

এসেছে সকালবেলা—আটটা না-বাজতে। এখন সাড়ে দশটা। নবগ্রাম ইস্টিশানে সাড়ে দশটার গাড়ী চলে গেল, এখনও বসে থাকতে হয়েছে! কেন? এত গুমোর কেন জীবন মশায়ের? কি মনে করে মশায়? দেশে ডাক্তারের অভাব? না—দাঁতু ঘোষাল এতই অবহেলার মানুষ!

নবগ্রামে চারটে ডাক্তার বসে ফ্যা-ফ্যা করছে। চ্যারিটেবল ডিসপেন্‌সারী ছিল—চার বিছানার হাসপাতাল—তারপর যুদ্ধের সময় দেশে 'মন্বন্তরা' হলে দশ বিছানার হাসপাতাল হয়েছিল—এখন পঞ্চাশ বিছানার হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে। একটা ছোট ডাক্তার ছিল—এখন দুটো ডাক্তার হয়েছে—নার্স এসেছে। সেখানে গিয়ে 'এলাম' বলে একটা বিছানায় শুয়ে পড়লেই হ'ল। সময়ে খাওয়া—সময়ে ওষুধ—য'বার খুশী ডাকলেই ডাক্তার। কেবল জাত থাকবে না—আর মান থাকবে না—ব'লে যায় না। এ ছাড়া ক'বরেজ দুজন, তার মধ্যে ভূদেব কবরেজ দস্তুরমত পাশ করা, হোমিওপ্যাথ দুজন—আলি মহম্মদ আর বাঙাল ডাক্তার। দোকানে গেলে কেউ পয়সা নেয় না। জীবন মশায়ের মতিভ্রম হয়েছে, নইলে রোগীদের এমন অবহেলা কখনও করত না। কেবল পুরানো লোক—ধাত চেনে, মশায় বংশের বংশধর—তাই আসে। আর আসবে না। কালই হয় ভূদেব কবরেজের কাছে নয় হরেন ডাক্তারের কাছে যাবে। যে দেশে গাছ থাকে না—সে দেশে ভেরেণ্ডা গাছই 'বিরিক্ষি'। সে কালে ডাক্তার বৈদ্যের অভাব ছিল তাই জীবন মশায় ছিল ধন্বন্তরী—নিদান হাঁকত। যেটা ফলত, সেটাই জাহির করত; যেটা ফলত না—সেটার বেলা চুপচাপ থাকত। মরার বদলে বাঁচলে কে আর তা' নিয়ে ঝগড়া ক'রে? এবার এই বাধা প্রদ্যোত ডাক্তারের হাতে পড়েছে, এইবার মজাটা বুঝবে। এই তো মতি কর্মকার বর্ধমান হাসপাতালে মাকে ভর্তি ক'রে দিয়েছে; পায়ের ফটো নিয়েছে, ভিতরে হাড়ের কুচি আছে কেটে বার করবে—বাস্‌—ভাল হয়ে যাবে। প্রদ্যোত

ডাক্তার বলেছে, আসুক ফিরে মতির মা; তারপর নাড়ী দেখার—নিদান হাঁকার ফাঁপা বেলুন ফুটিয়ে দেব।

ঘরে এদিকে রোজগারের অভাবে—হাঁড়ি ঢনঢন—আর রোগীদের অবহেলা! বকেই চলেছে দাঁতু।

নন্দ বার কয়েকই বলেছে—এই দেখ ঠাকুর, ভাল হবে না। যা-তা বোলো না বলছি। কিন্তু দাঁতু ঘোষাল গ্রাহ্য করে নি। বলেছে—তুই বেটা বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়, পীর চেয়ে খাদিম জিন্দে—সকাল থেকে পাঁচবার বলেছি তামাক দিতে; গ্রাহ্যই করলি না! তোর কি, মাস পোহালেই মাইনে নিবি। চুরি করে মশায় বাড়ীর যাও ছিল শেষ করলি; এইবার রোগী তাড়িয়ে লক্ষ্মী ছাড়িয়ে তুই ছাড়বি।

পরাণ খাঁও প্রতিবাদ করছিল—দেখ ঘোষাল, কথাগুলান তুমি অন্যায় বলছ। কঠিন রোগী দেখতে গেলছেন মাশায়, তাতে দেরী যদি হয়েই থাকে—তবে ই সব কথা তুমি কি বলছ? ছি। আর কারে কি বলছ?

—বলুক খাঁ, ওকে বলতে দাও। ওই কথা ছাড়া অন্য কথা এখন ওর মুখে আসবে না। ওর বুদ্ধিই এখন বিপরীত বুদ্ধি! সর্বনাশ কালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়। আর মৃত্যু কালের চেয়ে সর্বনাশের কাল তো মানুষের আর হয় না। ঘোষাল যাবে, যাবার কাল যত কাছে আসবে—তত এইটা ওর বাড়বে।

হেসেই কথাগুলি বললেন জীবন মশায়। তিনি আরোগ্য-নিকেতনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। চণ্ডীতলা থেকে গ্রামে ঢুকবার পথটাই সদর রাস্তার উল্টো দিকে। সেই পথে কবিরাজখানার পিছন থেকে ঢুকে তিনি বেরিয়ে এলেন সামনে।

দাঁতু ঘোষাল এক মুহূর্তে যেন জমে পাথর হয়ে গেল। ভয়ার্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল জীবন মশায়ের দিকে। হতবাক হয়ে গিয়েছে সে। হাত দুটো শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে।

জীবন মশায় চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসলেন—বললেন—দেরী একটু হয়ে গেল আজ; চণ্ডীমায়ের স্থানের গোঁসাইজীর অসুখ। হয় তো-বা যাচ্ছেন গোঁসাই। সেখানে যেতে হয়েছিল—সকালে উঠেই। কি করব?

দাড়ীতে হাত বুলাতে লাগলেন জীবন মশায়। রোগীর দল তবুও কেউ কোন কথা বলতে পারলে না। দাঁতু ঘোষালের দিকেই তারা তাকিয়েছিল। দাঁতু দাঁড়িয়েছিল মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর মত।

অকস্মাৎ সে ভাঙা গলায় বলে উঠল—কি বললে মশায়? আমি বাঁচব না? আমি মরব?

জীবন মশায় নিস্পৃহ নিরাসক্তের মত বললেন—এ রোগ তোমার ভাল হবে না ঘোষাল। এই রোগেই তোমাকে যেতে হবে! এ তোমার ভাল হবার রোগ নয়। তবে দু'মাস কি ছ'মাস কি দু'বছর পাঁচ বছর—তা কিছু বলছি না আমি।

দাঁতু এবার চীৎকার ক'রে বলে উঠল—তুই গো-বদ্যি—তুই গো-বদ্যি—হাতুড়ে, মানবুড়ে।

জীবন মশায় বলেই গেলেন—এ যদি তোমার ভাল হবার হত ঘোষাল তবে দুদিন যেতে না-যেতে তুমি কি খাব কি খাব ক'রে ছুটে আসতে না, তামাক গাঁজার জন্যে তুমি ক্ষেপে উঠতে না। মৃত্যু-রোগের এ হ'ল একটা বড় লক্ষণ। রোগের সঙ্গে রিপুর যোগাযোগ হলে আর রক্ষে থাকে না। তোমার তাই হয়েছে।

দাঁতু এবার পট্ ক'রে তার পৈতেগাছটা ছিঁড়ে ফেলে চীৎকার করে উঠল—আমি যদি বামুন হই তবে ছ মাস যেতে-না-যেতে তোর সর্বনাশ হবে। বামুনের মেয়ের অভিশাপে তোর ব্যাটা মরেছে—এবার ব্রহ্মশাপে তোর সর্বনাশ হবে।

বলেই সে হন হন করে নেমে পড়ল আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ার উপর থেকে। খানিকটা গিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—চললাম আমি হাসপাতালে বড় ডাক্তারের কাছে। আজই আমি হাসপাতালে ভর্তি হব। বাঁচি কিনা দেখ।

মশায় হাসলেন। তারপর বললেন—কার কি বল!

এসে দাঁড়াল একটি লোক কামলা—জণ্ডিস হয়েছে। মানুষটা যেন হলুদ মেখে এসেছে। প্রতিবিধান অনেক করেছে। কামলার মালা নিয়েছে—মালাটা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হয়েছে; তাতে সারে নি। হাসপাতালে

গিয়েছে—তাতেও বিশেষ কিছু হয় নি। অবশেষে মশায়ের কাছে এসেছে।

জীবন দত্ত বললেন—তাই তো বাবা। হাসপাতালে যখন কিছু হয় নি তখন সময় নেবে। আর ওষুধ যদি কবিরাজী মতে খাও—বোধ হয় তাই ইচ্ছে, নইলে আমার কাছে আসতে না,—তাহলে মুস্কিল হচ্ছে আমি তো ওষুধের কারবার তুলে দিয়েছি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আমি মোটামুটি চিকিৎসা করাই ছেড়ে দিয়েছি। নতুন কাল, নতুন চিকিৎসা, নতুন রুচি এতো আমার কাছে নাই! তা ছাড়া আমার নিজেরও আর ভাল লাগে না। তবু এককালে চিকিৎসা করতাম; দু চারজন পুরণো লোক আজও ছাড়ে না, তাই তাদের দেখি! বুঝেছ না?

একটু হাসলেন। বোধ করি দাঁতু ঘোষালের প্রসঙ্গটা তাঁর মনের মধ্যে তখনও ঘুরছিল।

—তুমি বরং ভূদেব কবরেজের কাছে যাও। সে ওষুধপত্র রাখে। আর নূতন কালে কবিরাজী শিক্ষার কলেজ হয়েছে, সেখানে পাশ করেও এসেছে। বুঝেছ না? কবিরাজীতে নিজের ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা ক'রে ফল হয় না।

—আজ্ঞে না ডাক্তারবাবু, আপনি দেখুন আমাকে! নইলে আমি হয় তো বাঁচব না! আমার বাবা দাদা সবাই ঠিক এই বয়সে মারা গিয়েছে। এই পঁয়তিরিশ থেকে চল্লিশের ভিতর। আমাকে বাঁচান।

—না-না। না বাঁচবার মত তোমার কিছু হয় নি বাপু। আর, বাঁচা মরার ব্যাপারটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ওর উপরে যদি মানুষের হাত থাকত'—! হাসলেন ডাক্তার। শুনলে না, দাঁতু বলে গেল—আমার ছেলের কথা! সে নিজেও ডাক্তার ছিল।—এ কি, কাঁদছ কেন তুমি? আচ্ছা—আচ্ছা! আমিই দেখব। বস তুমি, বস। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ভূদেবের কাছে কিনে নিয়ে যাও। তারপর আমি ঘরে তৈরী ক'রে দেব। বুঝেছ! ভয় নেই। ভাল হয়ে যাবে। এত ভয় পেয়েছ কেন?

দাড়ীতে হাত বুলাতে লাগলেন ডাক্তার। লোকটি বড় ভয় পেয়েছে। ভয় রোগের জন্য নয়! বাবা দাদা ঠিক এই বয়সে মরেছে বলে ও বেচারীও ভয় পেয়েছে। ভয়টা খুব অহেতুকও নয়। এমন হয়। বিচিত্রভাবে হয়!

পরাণ হেসে লোকটিকে বললে—আর কিছু ডর তুমি করিয়ো না বেটা। মশায় বলেছেন ভয় নাই। উ একেবারে বেদবাক্যি!

পরাণ তাঁর মন রাখছে সে জীবন মশায় জানেন—কিন্তু এ মন রাখাটুকু তাঁর ভাল লাগে। পরাণ লোক ভাল। কৃতজ্ঞতা আছে। সেই তার প্রথম জীবনে জীবন দত্ত তাকে টাইফয়েড থেকে বাঁচিয়েছিলেন; তখন পরাণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, দিন মজুরী করত। জীবন দত্তের বাড়ীতেই মজুরী খেটেছে; তখন তিনি তার বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছিলেন—সে কথা পরাণ আজও ভুলে যায় নি। সে এখন বড় ডাক্তার ডাকতে পারে। দৈনিক চারটাকা ফি দিতেও তার গায়ে লাগে না, তবু সে জীবন দত্ত ছাড়া কাউকে দেখায় না। শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়,—জীবন-মরণ প্রশ্ন নিয়ে রোগ আসে মানুষের শরীরে, সেখানে কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্র খুব বড় নয়, বড় বিশ্বাসের কথা—সেই বিশ্বাস আছে পরাণের। যে তাঁকে এত বড় বিশ্বাস করে তাকে স্নেহ না করে কি পারেন তিনি? তবে বিবির জন্য পরাণের ভাবনায় ডাক্তার কিঞ্চিৎ কৌতুক বোধ না ক'রে পারেন না। একবার তিনি নিজেই বলেছিলেন, 'পরাণ! বিবিকে একবার না হয় কলকাতা নিয়ে যাও। এখন সব নানা রকম পরীক্ষা হয়েছে—পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে এস।' ডাক্তার কথাটা গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন। কৌতুক করেন নি।

ডাক্তার বলেছিলেন—তা হ'লে এক কাজ কর, হাসপাতালের ওই বড় ডাক্তারকে একদিন কল দাও। ওঁকে দেখাও। উনি বলে দেবেন—চিঠি দিয়ে দেবেন—কোথায় কার কাছে দেখাতে হবে।

প্রদ্যোত ডাক্তার রোগিণীকে দেখে একটু হেসেছিলেন। বলেছিলেন—অসুখ মনের, শরীরের নয়। এবং—। একটু থেমে বলেছিলেন—কোন মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারকে দেখালে ফল হ'তে পারে।

ডাক্তার কথাটা বুঝেছিলেন, পরাণ বুঝতে পারে নি ; কিন্তু তবুও পরাণ ওই নতুন ডাক্তারের উপর বিরক্ত হয়েছিল। তার বিবি তার চোখের সামনে রোগে ভুগছে—সে তার সেবা করছে, চোখে দেখে স্পর্শ দিয়ে সে অসুখ অনুভব করছে—আর ডাক্তার বলছে অসুখ নয়!

সে শুধু প্রদ্যোত ডাক্তারকেই বাতিল করেনি—কলকাতা যাওয়ার কথাও বাতিল করে দিয়েছিল। শুধু প্রশ্ন করেছিল—আপুনি কি বুঝছেন বলেন। যদি বুঝেন কি পরাণের ডর আছে—মিত্যু হতে পারে—তা হ'লে না হয়—!

—না, সে ভয় নেই। তবে ভুগতে পারে। বুঝছ না?

—তা ভুগুক। না হয় ভুগবে কিছু দিন। আপুনি ছাড়া কারুর দাওয়াই আমি খাওয়াব না।

সেই অবধি এই চলছে। ডাক্তার তিন দিন অন্তর যান। কিন্তু পরাণের ইচ্ছা রোজ যান তিনি। ডাক্তার তা যান না। পরাণ রোজ আসে। খবর বলে যায়, বলে—কিছু বদল করবেন না কি?

—না—না। ওই যা চলছে—চলুক।

—এই পোস্টাই যদি কিছু দিতেন। আর এই ঘুম হবার ওষুদ! রাতে একবার চোখ বোজে না, ছট-ফট করে। এ পাশ আর ও পাশ। আর ঢুক্-ঢুক্ ক'রে জল খাবে।

একটা কিছু দিলেই পরাণ খুশি।

আজও পরাণের একটা ওষুধ চাই। সে ভয়ার্ত জোয়ানটিকে জীবন মশায়ের অদ্ভুত চিকিৎসা-পারঙ্গমতার কথা বুঝাতে বসেছে, সেই উদ্দেশ্যেই।

ডাক্তার রোগীর পর রোগী দেখে চলেছেন।

—কি? তোমার কি হে—পালোয়ানের কি হ'ল?

—কি হ'ল বুঝতে তো পারছি না? কাশী সর্দি—মধ্যে মধ্যে জ্বর; কিছুতেই ছাড়ছে না।

হাতখানা বাড়িয়ে দিলে—ছফুট লম্বা—তেমনি কাঠামো—এক পরিণত বয়সের জোয়ান। ঘাট মহেশপুরের রাণা পাঠক। এ অঞ্চলে রাণা পাঠক শক্তিশালী জোয়ান; লাঠি খেলা—কুস্তি করা—বর্ষার ঘাটে নৌকা খেয়া দেওয়া—

দেবস্থানে বলিদান করা তার কাজ। বছর কয়েক আগে পর্যন্ত প্রতিবৎসর অম্বুবাচীতে কুস্তিপ্রতিযোগিতায় রাণা পাঠকের নাম একবার কয়েক দিনের জন্য মুখে মুখে ফিরত। আর একবার রাণার নাম শোনা যেত কালীপুজার সময়। রাণার মহিষবলির কৃতিত্বের গল্প করত লোকে। বাড়ীতে কিছু জমি-জেরাত ছিল—তার ধানে পানে আর খেয়াঘাটের নৌকার আয়ে রাণা পাঠকের বেশ ভালই চলে যেত। মহেশপুরের ঘাটের ডাক তার একচেটে। ও ঘাটে অন্য কেউ ডাক নিয়ে নৌকা পার করতে পারে না। রাণা পাঠকের অসুখ কখনও বড় একটা হয় না। কিন্তু আজ রাণাকে দেখে জীবন মশায় বিস্মিত হলেন। এ কি চেহারা হয়েছে রাণার? চোখের কোলে কালি পড়েছে, শক্ত বাঁশের গোড়ার দিকের মত মোটা কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে—জামার ফাঁক দিয়ে কণ্ঠা দেখা যাচ্ছে!

—রাণা, বাবা এ তুমি ভাল ক'রে দেখাও। তুমি বরং বর্ধমানে গিয়ে দেখিয়ে এস। নয় তো এখানেই আজকালকার ভাল ডাক্তারদের দেখাও। এ তোমার টোটকাতে কি মুষ্টিযোগে যাবে না।

রাণা মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে বললে—উঁহু! ওরা গেলেই বলবে যক্ষ্মা হয়েছে। বুঝলেন না—ওদের এইটে বাতিক। তার পরে ফর্দ দেবে ইয়া লম্বা। বুকের ফটো তোলাও, গয়ের থুথু পরীক্ষা করাও—এই কর—তা' কর। চিকিৎসা তারপর। যক্ষ্মা হয় তো আমার হয়েছে। বুঝেছেন—একটা মেয়েছেলের কাছ থেকে ধরার কথাই বটে। তার আবার পরীক্ষা কিসের? এত পরীক্ষাই যদি করতে হবে তো—ডাক্তারী কিসের? আপনি হাত দেখুন। বলে দেন কি করতে হবে। ওষুদ দেন। সে সব আমি ঠিক ঠিক করব। তারপরে আমার পেরমাই আর আপনার হাতযশ! আর ওই সব—কৌড়াকুঁড়ি আমার ধাতে সইবে না মশায়। যক্ষ্মার ওষুদ তো আপনাদেরও আছে।

—আছে। কিন্তু এখন যে সব ওষুধ বেরিয়েছে—সে সব অনেক ভাল ওষুধ রাণা। অনেক ভাল।

—আপনি বলছেন?

—বলছি রাণা। তাতে তো লজ্জা নাই বাবা। তুমি বরং হরেন ডাক্তারের

করানো ভালো। এক্সরে করলে—বোঝা যাবে—চোখে দেখা যাবে—কতখানি রোগ হয়েছে। আবার ভাল হলে—একবার এক্সরে করলে বুঝতে পারবে—একেবারে নির্দোষ হল কি না। এখন—ধর—হয় তো একটু থেকে গেল; শরীর ভাল হয়েছে—সেটা ধরা গেল না। সেই একটুই আবার বাড়বে—কিছু দিন পর।

রাণা ঘাড় নাড়লে।

বার কয়েক ঘাড় নেড়ে বললে—উঁহু। তা হ'লে আমি ভূদেব কবরেজের কাছে যাই। উ সব কড়া ডাক্তারী ওষুদ আমার ধাতে সইবে না। তাছাড়া মশায়, ডাক্তারদের কথা বড় চ্যাটাং চ্যাটাং। বুঝেছেন—আমাদিগে যেন মানুষই মনে করে না। আপনি দেখতেন সেকালে—সে পসার তো দেখেছি আমি।—এরা টাকা রোজগার করে অনেক, ফী বেশী। ফী ছাড়ে না। কিন্তু সে পসার নাই। আপনারা—রোগীর সঙ্গে আপনার লোকের মত কথা বলতেন। ঘরের লোকের মত। আমার আবার মেজাজ খারাপ। কে জানে ঝগড়া হয়ে যাবে কবে! তার চেয়ে কোবরেজী ভাল। লোহাতে মাথা বাঁধিয়ে তো কেউ আসে নাই সংসারে, মরতে তো হবেই। আজ নয় কাল! তা' কড়া কথা শুনে—খারাপ কথা শুনে মরি কেন?

রাণা উঠে চলে গেল।

—রাণা। অ রাণা!

—আজ্ঞে!

—কবিরাজীই যদি করবে বাবা তবে তুমি পাকুড়িয়া যাও। সেন মশায়দের বংশ বড় বংশ—বড় আটন! বিচক্ষণ বৈদ্য আছেন—ভাল ওষুদ রাখেন—সেখানে যাও। বুঝেছ। এ অবহেলার রোগ নয়!

—পাকুড়ে যাব বলছেন?

—হ্যাঁ। তাই যাও। ভূদেব এখনও ছেলেমানুষ। বুঝেছ? ইচ্ছে করতো ভূদেবকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

—দেখি। টাকাতে কুলানো চাই তো! হাসলে রাণা।—আপনার কাছে আসা—সে জন্যেও বটে যে! কম টাকার চিকিৎসা—এ আর কোথায় হবে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জীবন মশায়। কথাটা মিথ্যা বলে নি রাণা। কিন্তু—। কিন্তু ডাক্তারেরাই বা করবে কি? তারা খাবে কি? নিজের অবস্থা ভেবেই কথা বলছেন জীবন মশায়! আজ সকাল থেকে দুটি টাকা ফী পেয়েছেন। তাঁর পিতামহ পিতা—তিনি—এতকাল পর্যন্ত যে সম্পত্তি করেছিলেন—তার অনেক চলে গিয়েছে এই পনের কুড়ি বছরের মধ্যে। আজ তিনি প্রায় নিঃস্ব। লোকে বলে ভাগ্য। আতর বউ নিজের কপালে করাঘাত করে। কিন্তু তিনি তো জানেন—দায়ী তিনি নিজে! তা ছাড়া আর কে দায়ী?

সশব্দে একখানা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল।

—কই, গুরুদেব কই? নামল শশী। শশীর চোখ লাল। মদ খেয়েছে এই দিনে দুপুরে। রামহরিকে দেখবার জন্য নিতে এসেছে। রামহরি মৃত্যু-কামনায় জ্ঞানগঙ্গা যাবে। ডাক্তার একটু হাসলেন।

—দাঁতু ঘোষাল বেটার নিদান হেঁকে দিয়েছেন? হাসতে লাগল শশী।—বেটা হাসপাতালে গিয়ে হাউ মাউ ক'রে কাঁদছে—প্রদ্যোত ডাক্তারের কাছে। তা—চলুন—বেটা রামহরেকে একবার নিদান দিয়ে আসবেন। আজ আবার বেটা যেন কেমন কেমন করছে। বুঝলেন! বেটা নিজেও যেন বুঝেছে। সকাল বেলা থেকে—উইল ফুইল এই সব সারছে। বললে—মশায়কে আজ আনা চাই-ই।

চারটি টাকা নামিয়ে দিলে শশী।

—আমি বলেছি, চার টাকা দিয়ে সারলে হবে না রামহরি। জীবন মশায়কে শেষ দেখা দেখাবে, আরও লাগবে বাবা। আমাদিগে বরং সে কালে চোলাই মদ খাইয়েছ—পাঁটা খাইয়েছ; জীবন মশায়কে তো কিছু খাওয়াও নি। খাইয়ে থাকলে বড় জোর লাউ কুমড়ো!

হাসতে লাগলো শশী।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে—দাঁতু ঘোষাল বেটা মরত—মরত—ও বেটার নিদান হাঁকলেন কেন? বেটা কাঁদছে—প্রদ্যোত ডাক্তার তড়পাচ্ছে।

প্রদ্যোত ডাক্তার সত্যই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে জীবন দত্তের উপর।

ক্রুদ্ধ হবার কারণ—সহজ দাহ্য উপকরণের মত সংগৃহীত হয়ে থাকার মত জমা হয়েই ছিল, তাতেই যেন আগুন ধরে গেল। মতি কর্মকারের

মায়ের পা এক্স্‌ রে করানো হয়েছে, তারই বিশদ বিবরণ নিয়ে মতি কর্মকার গতকাল সন্ধ্যায় বর্ধমান থেকে ফিরে এসেছে। বর্ধমানের হাসপাতালের ডাক্তার প্রদ্যোতের চেয়ে সিনিয়র হলেও তার সঙ্গে প্রদ্যোত ডাক্তারের বেশ একটি সম্প্রীতি আছে। সে তাকে লিখেছিল—"আমাকে যেন সমস্ত রিপোর্ট অনুগ্রহ ক'রে জানাবেন। কারণ এই কেসটিতে আমি খুবই interested; এই বুড়ীকে 'মরনংধ্রুব' বলে খোল করতাল সহযোগে নাম সংকীর্তন করে জ্ঞানগঙ্গা পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল—এখানকার সে আমলের এক জ্ঞানবৃদ্ধ বৈদ্য মহাপ্রভু নিদান হেঁকেছিল—কয় মাস কয় দিন কয় দণ্ড কয় পলে যেন বৃদ্ধার প্রাণ বিহঙ্গপিঞ্জর ত্যাগ করবে; এই পায়ের-ব্যথা রোগেই মরবে; সেই কেস আমি জোর ক'রেই হাসপাতালে পাঠাচ্ছি। এখানকার লোকেরা না কি মনে মনে হাস্য করছে এবং বলাবলি করছে—জীবন দত্ত যখন নাড়ী দেখে বলেছে বুড়ী মরবে তখন ওকে বাঁচায় কে?"

এই কারণেই সেখানকার ডাক্তার রিপোর্টের পুরো নকল মতির হাতে পাঠিয়েছেন। সেই রিপোর্ট পড়ে প্রদ্যোতের মুখে ব্যঙ্গ হাস্য ফুটে উঠেছিল—তার সঙ্গে বিরক্তিও জমা হয়েছিল। পড়ে গিয়ে বুড়ীর একটা পায়ের গাঁঠে আঘাত লেগেছে, খানিকটা হাড়ের কুচি ভেঙে সেখানে থেকে গিয়েছে, সেই হেতুই বৃদ্ধার এই অবস্থা। ওই জায়গাটা কেটে হাড়ের কুচিটাকে বের ক'রে দিতে হবে, এবং হাড়ের যদি আর কোন অংশ বাদ দিতে হয় দিতে হবে, দিলেই বুড়ী সেরে উঠবে। এতে আশঙ্কার কোন কারণই নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাল সন্ধ্যার পর থেকে অনেকের কাছেই প্রদ্যোত ডাক্তার বক্রহাস্য সহকারে এই রিপোর্টের কথা বলেছে। দাঁতু ঘোষাল সেই কথাই শুনেছিল। সে সন্ধ্যায় বসেছিল—বিজয় দে'র ওষুধের দোকানে। নবগ্রামে দু তিনটি ওষুধের দোকান আছে, তার মধ্যে বিজয় দে'র দোকানই বড়। এবং বিজয় বেশ মজলিশি মানুষ; দাঁতু বলে—বিজয়ের দিল আছে বাপু! অর্থাৎ বিজয় দাঁতুকে মধ্যে মাঝে অমলে এক-আধ দাগ হজমী ওষুধ দেয়, জোলাপের বড়ি দেয় এবং মোদক দেয়; যা খেলে শরীর

মন চনমন করে, অম্বল কোথায় যায়, খিদেতে প্রায় ব্রহ্মাণ্ড খেতে ইচ্ছে করে।

প্রদ্যোত ডাক্তার ওখানে এসেছিল—একটা বিশেষ জরুরী ইনজেকসনের অর্ডার দিতে। কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত পাওয়া চাই-ই। তার সঙ্গে আরও দু' চারটে ওষুধ। বিজয়ের দোকানের এইটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে যে, প্রতিদিন রাত্রি দশটার ট্রেনে তার লোক কলকাতা যায়, সকালে পৌঁছে বরাতি জিনিষ কিনে কেটে দুপুরে রওনা হয়ে সন্ধ্যার সময় নবগ্রাম ফিরে আসে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টাও লাগে না। এর জন্য সে হাওড়া পর্যন্ত মান্থলী টিকিট করেছে।

ওদের ওখানে মজলিশের মাঝখানেই প্রদ্যোত কথাটা বলেছিল। বলার বিশেষ একটা কারণও ছিল; বিজয় দে নিজে ওষুধের দোকান করে, লাভও করে প্রচুর কিন্তু নিজে এ্যালোপাথিতে খুব বিশ্বাসী নয়, কবিরাজীতেই তার নিজের রুচি এবং মধ্যে মধ্যে ডাক্তারদের বলে—আপনাদের এ আমলের চিকিৎসা—ও তো কানাতেও পারে মশায়। রক্ত পরীক্ষা, মল মূত্র থুথু গয়ের পরীক্ষা, এক্সরে, এ সব হবে তারপর আপনারা চিকিৎসা করবেন। সে আমলে—নাড়ী টিপে ধ'রেই বলে দিত এই হয়েছে। বলে দিত—আঠারো মাস কি ছ মাস কি সাতদিন মেয়াদ। এই আমাদের জীবন মশায়—।

জীবন মশায়ের নিদান হাঁকার কথা বলে যায়।

বিজয় সংসারে সম্পদের বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে—সেই অধিকারেই প্রগল্‌ভের মত গল্প ক'রে যায়। অর্ধশিক্ষিত প্রগল্‌ভ হলে যা হয় তাই। তার উপর সে বলে—আমার কাছে তো অজানা কিছু নাই! ডাক্তার আমি নই কিন্তু ওষুধের দোকানী তো বটে। কিসে কি হয় তা তো জানি! ঢাক বাজিয়ে শিঙে বাজিয়ে কাগজে লিখে বাহির হয়—অব্যর্থ ঔষধ। কিন্তু যে মরবার সে ঠিক মরে, যে বাঁচবার সে বাঁচে। তবে হ্যাঁ—যে বাঁচে তার রোগের ভোগটা কমে বটে।

প্রদ্যোত ডাক্তার এ সব শুনেই যান—প্রতিবাদ করেন না। করতে তাঁর ঘৃণা বোধ হয়। অন্য ডাক্তারেরা পরিহাস সহকারেই বিজয়ের

সঙ্গে তর্ক করেন, বিজয়কে বেশ খানিকটা খাতির ক'রে চলেন তাঁরা ; বিজয়ের ঘর থেকে মাসে মাসে—কেউ পঁচিশ কেউ তিরিশ কেউ পঞ্চাশ টাকা কমিশন পেয়ে থাকেন প্রেসক্রপশনের উপর। প্রদ্যোত ডাক্তারও কমিশন পান কিন্তু তিনি খাতিরও করেন না তর্কও করেন না। বিজয়ের কথা শুনেই যান—জবাব দেন না।

আধুনিক কালের প্রতিষ্ঠাকামী শিক্ষিত অথচ দরিদ্র পরিবার, সরকারী কেরাণী ইস্কুল মাস্টার প্রাইভেট টিউটারের বাড়ীর ছেলে প্রদ্যোত ডাক্তার। মেডিকেল কলেজে ফার্স্ট সেকেণ্ড না হ'লেও বেশ ভাল ছাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর নয়, প্রথম শ্রেণীর। কলকাতায় স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিসের ক্ষমতার অভাবের জন্য এবং ট্রপিক্যাল ডিজিজ সম্পর্কে ঝোঁক আছে বলে সে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের চাকরী নিয়ে মফস্বলে এসেছে। এ ছাড়াও একটা পারিবারিক কারণও আছে—বিবাহ করেছে সে বাড়ীর সকলের মতের বিরুদ্ধে। এখানে এসেছে সে মাস ছয়েকের উপর।

জায়গাটি তার ভালও লেগেছে। লোকগুলি মোটামুটি শিক্ষিত এবং অনেকটা আধুনিক। দু চারজন বেশ ভাল লোক আছেন। কিশোর-বাবু তার মধ্যে প্রধান। ইস্কুল আছে, থানা আছে, সাবরেজিস্ট্রি আপিস আছে, এখন আবার একটা একটা করে অনেক নতুন আপিস বসছে ; খাদ্য বিভাগের আপিস, কৃষি বিভাগের আপিস, সেচ বিভাগের আপিস ইতিমধ্যেই বসে গিয়েছে। এখানকার হাসপাতাল বড় হচ্ছে। মস্ত বড় খোলা জায়গায় বাড়ীগুলি প্রায় শেষ হয়ে এল। পুরনো বাড়ীতে কাজ চলে। প্রথমে উনিশশো এক সালে তৈরি হয়েছিল—চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী। এখানকার প্রধান ধনী ব্রজলালবাবু ডিসপেনসারী স্থাপন করেছিলেন—তারপর পঁচিশ সালে ব্রজলালবাবুর স্ত্রী মারা গেলে—তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল একটি চারখানি রোগশয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল। তারপর মহাযুদ্ধের আমলে—দেশময় মড়ক সুরু হলে—তার সঙ্গে খোলা হয়েছিল সাময়িক একটি পনের বেডের হাসপাতাল ; এখন তৈরী হচ্ছে পঞ্চাশ-বেডের থানা স্বাস্থ্য-কেন্দ্র ; প্রদ্যোত এই স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ভার

নিয়েই এসেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্তব্যপরায়ণ ভদ্র এবং মার্জিত হলেও কড়া চরিত্রের সত্যবাদী মানুষ প্রদ্যোত। কোন ভণ্ডামি সে সহ্য করতে পারে না। এইটিই এখানে তার পক্ষে একটু অসুবিধার কারণ হয়েছে। রোগীকে দেবতার চরণামৃত, প্রসাদ এ সব দেওয়া সে বরদাস্ত করতে পারে না, রোগীর ঘরে 'আপদোদ্ধার পাঠ' এ-ও সে পছন্দ করে না। এই নিয়ে তার সঙ্গে রোগীর অভিভাবকদের মতান্তর হয়। কিন্তু মন রাখতে মত পাল্টাবার লোক সে নয়। সে জানে রোগ কঠিন হলে তাকে ডাকতেই হবে। তার তুলনায়—এখানকার ডাক্তারেরা সকলেই সেকেলে। এবং তার বিশ্বাস স্বাস্থ্য-কেন্দ্র খোলা হ'লেই এখানকার আবহাওয়া অনেক পাল্টে যাবে। রক্ত পরীক্ষা মল মূত্র পরীক্ষার সহজ সুযোগ আসবে। সুযোগ পেলে মানুষ গ্রহণ করতে কখনই পিছিয়ে থাকতে পারে না।

সব থেকে বড় বাধার সৃষ্টি করে রয়েছে ওই জীবন মশায়।

জীবন মশায়ের জন্যে এখানে মেপাক্রিন চালানো আজও কঠিন হয়ে রয়েছে। মেপাক্রিনের প্রতিক্রিয়ায়—প্রথম কালে জন কতকের মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল—ঘামের সঙ্গে একটু হলদে রঙ বের হয়েছিল, তার জন্য জীবন মশায় বলেছিলেন ওটা কেউ ব্যবহার করো না বাপু। তার থেকে—নিয়মিত শিউলি পাতার রস খাও। সেটা মহাযুদ্ধের সময়। কুইনিনের তখন দারুণ অভাব। বলেছিলেন—কুইনিন তো চিরকাল ছিল না দেশে। তখন যাতে চলেছে তাই ব্যবহার কর।

মেপাক্রিনের সে সব দোষ আজ আর নাই। এবং মেপাক্রিনও বাতিল হতে চলেছে। পলুড্রিন উঠেছে। তবু জীবন মশায়ের নিষেধের ক্রিয়া আজও শেষ হয় নি। এইটেই ডাক্তারের অসহ্য মনে হয়।

পালাজ্বরে, যাহিক জ্বরে লোকে ছুটবে জীবন মশায়ের কাছে। কি একটা দেয় বৃদ্ধ হলুদ রঙানো ন্যাকড়ায় একটা চটকানো পাতা বেঁধে শুঁকতে—তাতে যাহিক জ্বর ভাল হয়। কি একটা বাঁধতে দেয় হাতে—পালা জ্বর বন্ধ হয়। বিস্ময়কর হতে পারে ব্যাপারটা কিন্তু ও পদ্ধতিকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারে না প্রদ্যোত ডাক্তার।

জেলেদের নোটনের স্ত্রীর পিঠে একটা বড় ফোড়া হয়েছিল। প্রদ্যোত ডাক্তার বলেছিলেন—অপারেশন করতে হবে। জীবন দত্ত তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিষয়পুরের ভাণ্ডারীদের বাড়ী—মা-মনসার স্বপ্নাদ্য প্রলেপ এবং মলম দিয়ে তারা চিকিৎসা করে। বুড়ীর ফোড়াটা সেরেছে বটে—কিন্তু ওই ওষুধের মধ্যে নিশ্চয় অশোধিত পারা অর্থাৎ মার্কারী আছে বলেই প্রদ্যোতের বিশ্বাস; কিছুদিন পরই বুড়ী তারই প্রতিক্রিয়ায় জর্জর হয়ে পড়বে, সে তিনি যেন প্রত্যক্ষ করতে পারছেন, চোখে দেখছেন।

এর উপর এই নাড়ী দেখে নিদান হাঁকা! এটা তাঁর কাছে অতি ক্রূর নিষ্ঠুরতা। দৈবজ্ঞতারই একটু বাস্তব সংস্করণ।

এর গল্প তিনি অনেক শুনেছেন বিজয়ের কাছে, আরও অনেকের কাছেই শুনেছেন। কিশোরবাবু রতনবাবুর মত শিক্ষিত লোক পর্যন্ত জীবন মশায়ের নাড়ী দেখায় বিশ্বাস করেন।

অবশ্য প্রদ্যোত জানে যে, বিগত কালের লোকেরা যেমনই শিক্ষিত হোন না কেন—তাদের কালের লোকের মত বিজ্ঞান-বিশ্বাসী হতে পারেন না, কিছুতেই পারেন না। অবশ্য বড় বড় প্রতিভাধর মানুষ যাঁরা তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা যে কালেই জন্মান কোন কালের সত্যের সঙ্গেই তাঁদের বিরোধ হয় না।

জীবন মশায়ের নিদান হাঁকার রোগী প্রথম দেখলেন প্রদ্যোত ডাক্তার ওই মতির মাকে।

মরবে শুনে মতির মায়ের সে কি বাঁচবার আকুলতা! প্রদ্যোত ডাক্তার ভেবেই পাচ্ছিলেন না—এ রোগী এই রোগে ম'রে কি ক'রে? বড় জোর পায়ের ফুলো জায়গাটা পাকতে পারে। তার উপর বৃদ্ধার ওই নিদারুণ অবস্থা দেখে প্রদ্যোত বেদনা অনুভব না-করে পারে নি। এবং জীবন ডাক্তারের উপরও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন স্বাভাবিক ভাবে।

সত্য হলে নিষ্ঠুরতাকে সহ্য না করে সংসারে উপায় নাই, কিন্তু মিথ্যা ভ্রান্তিকে নিষ্ঠুর সত্য বলে জাহির ক'রে মানুষকে পীড়ন করলে ব্যাপারটা হয় অসহনীয়। যে সহ্য করে তার পক্ষেই শুধু নয়—যে কোন মানুষই এর প্রতিবাদ করবে—অন্যায় বলবে।

বিজয়ের এই ভুল ভাঙবার জন্যই প্রদ্যোত ডাক্তার সে দিন মতির মায়ের রিপোর্টের কথা বলে বলেছিলেন—দেখুন—আমাদের দেশের নাড়ী জ্ঞানের কথা শুনি নি তা নয়। এখনও ডাক্তার রায় আছেন—দু হাতে দুখানা হাতের নাড়ী ধ'রে বলেন—এই হয়েছে। সে সব প্রতিভাধরদের কথা। এরা হল অতি সাধারণ, হাতুড়ে বললে রাগ করবেন না। দেশের সর্বনাশ করছে এরা।

দাঁতু সেই কথাই বলেছিল জীবন মশায়ের কাছে।

জীবন মশায়ের কথা শুনে—সে হাউ মাউ ক'রে কেঁদে এসে পড়ল হাসপাতালে—প্রদ্যোত ডাক্তারের প্রায় পা চেপে ধরে বললে—ডাক্তারবাবু গো! আমাকে বাঁচান আপনি।

—কি হয়েছে? উঠুন। ভাল ক'রে বলুন। চেঁচাবেন না মেলা।

—ওগো আমাকে বাঁচান গো। আমি আর বাঁচব না।

—কি হয়েছে যে তাই বাঁচবেন না?

—মশায় বললে গো! জীবন মশায়!

—কে? জীবন দত্ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে এই তোর মৃত্যু রোগ। শিবের বাবা এলেও বাঁচাতে পারবে না।

—জীবন ডাক্তারের সঙ্গে শিবের বাবার আলাপ পরিচয় আছে তা' হ'লে? না—মাথা খারাপ হয়েছে লোকটার?

—আজ্ঞে? ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল দাঁতু ঘোষাল।

—উঠুন, কি হয়েছে দেখি। চলুন ওই ঘরে, টেবিলের উপরে শুয়ে পড়ুন। বলুন কি হয়েছে।

সমস্ত শুনে ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন—এই সমস্ত লিখে আপনি আমাকে দিতে পারবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। হাজার বার। এখুনি লিখে দিতে পারি। বেটা কায়েত—

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন—ও সব কি বলছেন? 'বেটা কায়েত' কি? জানেন আমিও কায়স্থ?

জিভ কেটে দাঁতু বললে—আপনাকে তাই বলতে পারি!' আমি বলছি ওই জীবনকে। বেটা হাতুড়েকে। কিন্তু আমি বাঁচব তো। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে দাঁতু।

—কি হয়েছে তাই বাঁচবেন না? ওষুধ খান—নিয়ম করে চলুন—

কম্পাউণ্ডার মণ্ডল পাশের ঘরে ওষুধ তৈরী করছিল—সে বললে—সে দাঁতু পারবে না। রোগ তো ওর ডেকে আনা। খেয়ে খেয়ে করেছে। দুদিন ভাল থাকলেই ব্যস ছুটবে কারুর বাড়ী—আজ তোমাদের বাড়ী দুটো খাব। হাসতে লাগল সে।

ডাক্তার বললেন—হাসপাতালে থাকতে হবে আপনাকে। থাকবেন?

—তাই থাকব।

দাঁতু বাঁচতে চায়। সে মরতে পারবে না।

—ওকে ভর্তি করে নিন। বলেই ডাক্তার একটা কাগজ টেনে নিলেন—ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখবেন এই কথা। এই ধরণের নিদান হেঁকে মানুষের উপর মর্মান্তিক পীড়ন—এ যুগে এটা অসহনীয় ব্যাপার। এর প্রতিকার করা প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ পর আধলেখা দরখাস্তখানা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। থাক!

লোকটিকে যেন একটা বাতিকে পেয়েছে। মৃত্যু ঘোষণা করে আনন্দ পাচ্ছে! আশ্চর্য! মৃত্যু পৃথিবীতে নিশ্চিতই বটে, সে কে না জানে? তাকে জয় করবার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। সে সাধনা অব্যাহত চলে আসছে। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার হয়ে চলেছে। আজও তাকে রোধ করা যায় নি। আজও সে ধ্রুব—তবু তো মর্মান্তিক—বিয়োগান্ত ব্যাপার! তার মধ্যে যেন একটা আধ্যাত্মিক কিছু আরোপ ক'রে এই মৃত্যুদিন ঘোষণা—চমকপ্রদ বটে, রোমান্টিকও বটে—কিন্তু নিষ্ঠুর। ঠিক পশুকে বলি দেওয়ার মত। পুজা-অর্চনার আড়ম্বরে আধ্যাত্মিকতার ধূম্রজালে আচ্ছন্ন এক কল্পলোক সৃষ্টি করে মৃত্যুকে মুক্তি বলে ঘোষণা করে খড়্গাঘাত করার মতই নিষ্ঠুর প্রথা। জীবন দত্ত তারই পুরোহিত সেজে বসে আছে।

He must stop; থামতে হবে তাকে। না থামে—থামাতে হবে তাকে, He must be stopped.

লোকটা নিজের ছেলেরও নাকি মৃত্যু ঘোষণা করেছিল এবং করেছিল মায়ের অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর সম্মুখে। উঃ কি নিষ্ঠুর! কল্পনা করা যায় না।

প্রদ্যোত ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—সিগারেট ধরিয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে নার্সদের অফিসের দিকে গেলেন। নার্সকে ডাকলেন—বললেন—নতুন ওই পেশেন্ট—ওই বুড়ো বামুনকে ভর্তি করা হয়েছে। ভাল ক'রে নজর রাখবে। ওর স্টুল একজামিনেশন দরকার। আজই করে রাখবে।

তারপর সমস্ত ওয়ার্ডটা ঘুরে বেড়িয়ে এসে দাঁড়ালেন ফাঁকা মাঠে—নতুন বাড়ীটার সামনে। সুন্দর হচ্ছে বাড়ীখানা। ডিসেন্ট বিল্ডিং। চারদিকে চারটে উইং থাকলে আরও সুন্দর হ'ত। হবে, স্কীম আছে। পরে হবে।

লোকে বলে—বিশেষ করে একটা দল আছে—তারা বলে—হাসপাতাল না ক'রে, বাড়ী বাড়ী ফ্রি ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা হলে অনেক বেশী উপকার হত। হাসপাতালে ভদ্রলোকে যাবে না।

যাবে না! তাড়িয়ে নিয়ে আসবে। আসবে না! হাসপাতালের কল্যাণের ও আরামের স্বাদ পেলেই আসবে।

ডাক্তার বাড়ীর দিকে চললেন।

গানের সুর এসে কানে ঢুকল। মঞ্জু অর্থাৎ ডাক্তারের স্ত্রী গান গাইছে। বেলা প্রায় একটা। রান্নাবান্না হয়ে গেছে—কাজ নাই—গান গাইছে মঞ্জু। এইটেই ডাক্তারকে একদিন অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। এই স্থান কাল পাত্র কিছু না-মেনে উচ্ছ্বসিত আবেগে ছুটে চলার ধরণটাই তাকে আকর্ষণ করেছিল। বহু যুদ্ধ করে ডাক্তার তাকে জয় করেছেন। তাঁর বাড়ীতে এই কারণেই মঞ্জুকে পছন্দ করে না। বলে—এত দুলালীপনা কি ভাল!

ডাক্তারের ভাল লাগত। আজও লাগে। মঞ্জুকে ডাক্তার সাইকেল চড়া শিখিয়েছেন। বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়েছেন। মোটর ড্রাইভিং শেখাবেন। বাধা তিনি দেবেন না।

এইতো—এই তো জীবন! গতিশীল-উল্লাসময়, ওইখানেই তো আছে সবল জীবনের আনন্দ!

সিঁড়ির উপর ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো আছে। তাই মাড়িয়ে ডাক্তার জুতোর তলা পরিশুদ্ধ করে নিয়ে উপরে উঠলেন। ওদিকে সাবান, জল, লোশন, তোয়ালে সাজানো রয়েছে।

মন্থর গতিতে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ তুলে একখানা ছইওয়ালা গাড়ী আসছে। হাসপাতালের পাশ দিয়েই রাস্তা। শ্রাবণের আকাশে মেঘ ঘুরছে—ছায়াচ্ছন্ন ম্লান দ্বিপ্রহর—; টিপ টাপ বৃষ্টি পড়ছে মধ্যে মধ্যে। গাড়ীখানার ছইয়ের ভিতর ঠিক সামনেই বসে কে ? পাকা দাড়ী, পাকা চুল, স্থূল স্থবির—মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে, গাড়ীর চাকা খালে পড়ছে, ইটে হুঁচোট খাচ্ছে, তার সঙ্গে দেহখানা ঝাঁকি খাচ্ছে—ভ্রূক্ষেপ নাই।

জীবন ডাক্তারই তো! ডাকে চলেছে কোথাও।

(কুড়ি)

জীবন ডাক্তারই বটে। গলাই চণ্ডী গ্রামে ডাকেই চলেছেন। শশীর রোগী রামহরি লেটকে দেখতে চলেছেন। আকাশের দিকেই চেয়ে আছেন। গাড়ীর ঝাঁকি খাচ্ছেন—ভ্রূক্ষেপ নাই। এই ধারাই জীবন দত্তের চিরকালের ধারা। গরুর গাড়ীতে চড়লেই এমনই ভাবে গভীর চিন্তামগ্ন বা শূন্য মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

পিছনে বসে শশী বকেই চলেছে। সে বলছিল, মেয়ে ছেলেদের ওই বটে গো। টাকা লোকসান ওদের সয় না।

জীবন মশায় কথা বলেন না। বের হবার আগেই একটা কটু ঘটনা ঘটে গেছে। সেই কথারই জের টেনে চলেছে শশী।

শশী একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, তা ওরা যখন নিজে থেকেই দিতে এল তখন নিলেন না কেন? তাতে কি দোষ হ'ত?

রতনবাবু চারটাকা ফী দিতে এসেছিলেন—জীবন মশায় দু টাকা নিয়ে দু'টাকা ফেরত দিয়েছেন, এই কথাটা আতর বউয়ের কানে উঠেছে। আতর বউ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলার দায়ে জীবন মশায়কে অভিযুক্ত ক'রেছেন, পরিশেষে দিয়েছেন নিজের ভাগ্যকে গালাগালি। শশীই কথাটা কানে তুলে দিয়েছে।

জীবন মশায়ের মেজাজ চিরকাল এই টাকা পয়সার ব্যাপারে তিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি ভেবে পান না এতে আতর বউয়ের কথা বলবার অধিকার কি ক'রে থাকতে পারে? অবশ্য কোন দিনই মুখে কথা তিনি বলেন নি কিন্তু তাঁর মুখের থমথমে ভাবের মধ্যে—ভুরুর ঈষৎ কুঞ্চনের বক্ররেখায় প্রশ্নটা ইঙ্গিতে এবং চিহ্নে ফুটে ওঠে। এবং বাস্তবক্ষেত্রে নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত কাজ ক'রেই পরোক্ষে জানিয়ে দেন—সে অধিকার আতর বউয়ের নাই।

শশী বললে—তবে রাগলে আর বউঠাকরুণের মুখের আগল থাকে না। ওই দোষটা ওঁর আর গেল না!

আজই আতর বউ এই দু টাকা না-নেওয়ার সূত্র ধরে শুরু করে শেষ পর্যন্ত বলেছেন—দু টাকা কি আর টাকা শশী। মুঠো মুঠো টাকা ছুয়ে

আসরে দিয়ে এসেছে। লক্ষ্মীকে যাকে বলে ঝাঁটা মেরে তাড়ানো তাই করেছে। ওষুদ দানছত্র করেছে। ধার দিয়েছে। মোটা মোটা পাওনার খাতা। হাজারে হাজারে পাওনা টাকা। খাতা ছিঁড়ে গেল—উইয়ে খেলে। তবু গ্রাহ্য নাই।

জীবন মশায় আকাশের দিকেই তাকিয়ে আছেন। আতর বউয়ের কথাগুলি মনে রয়েছে—এইমাত্র শুনে এসেছেন; কথা নয় বাক্যবাণ; কিন্তু জীবন মশায় ও বাণে বিদ্ধ হয়েও আহত হন না। স্থবির হাতীর মত চলেন—বাণগুলি গায়ে বিঁধে থাকে কিন্তু কোন স্পর্শানুভূতি অনুভব করেন না, তারপর কখন খসে পড়ে যায়। সমস্ত দেহই তো কিছু কিছু ক্ষত চিহ্নে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

শশী কিন্তু বিরক্ত হয়। এই বুড়োর মেজাজটা চিরকাল একরকম গেল। একশোটা কথা কইলে একটা উত্তর দেয়! বুঝতে পারা যায় না কোন কথায় লোকটার মন নাড়া খাবে—সাড়া দেবে। বউঠাকরুণ মুখরা বটেন, কিন্তু সে ওই স্বামীর কারণেই মুখরা। ঝগড়া কলহ সবই জীবন মশায়ের সঙ্গে। বাইরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারে তার কোন পরিচয় নাই। শশীর প্রথম জীবনটা কেটেছে এই বাড়ীতে; মশায় এ্যালোপাথিক চিকিৎসা শুরু করে আরোগ্য-নিকেতন খোলার দিন থেকেই সে ঢুকেছিল চিকিৎসা শিখতে। পুরো তিন বছর ওই বাড়ীতে কেটেছে। বউঠাকরুণ সে সময় যে যত্ন যে আত্মীয়তা করেছেন সে তো তার মনে আছে। ডেকে জল খাইয়েছেন, না খেলে তিরস্কার করেছেন; কথাটি বড় ভাল বলতেন—রোজার ঘাড়েও ভূতের বোঝা চাপে শশী, ডাক্তার কবরেজেরও অসুখ করে। সময়ে খা। পিত্তি পড়াস নে।

শুধু এই নয়, বাড়ীতে যখন যে জিনিসটি তৈরী করেছেন, ডেকে খাইয়েছেন। বলতেন—খা তো শশী। দেখ তো ভাই কেমন হল!

ভাল জিনিস ন্যাকড়ায় বেঁধে দিয়েছেন—শশী নিয়ে যা বাড়ী। বউকে খাওয়াবি।

শশীর তখন নতুন বিয়ে হয়েছে। শশীর বউয়ের মুখ দেখে একটি আংটি দিয়েছিলেন বউঠাকরুণ।

বউঠাকরুণকে তেতো করে দিয়েছে এই বৃদ্ধ! এই মত্ত হস্তী!

মত্ত হস্তীই বটে। কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। বসে আছে দেখ তো? যেন একটা পাথর।

কি বলবে শশী! শশীর আজ নিজের গরজ! গা চুলকাতে চুলকাতে শশী আবার বললে—তবে হ্যাঁ। সে আমল মনে পড়লে দুঃখ হয়, আপশোষ হয়—হবার কথাই বটে। ওঃ, সে কি পসার, কি ডাক, দিনে রাত্রে খাবার শোবার অবসর নাই। সেই সাদা ঘোড়াটা, এতবড় ঘোড়া দু-বছরের মধ্যেই 'কুমুরে' ধরে গেল! আর দেশেও কি জ্বর! হোঁ-হোঁ করে কাঁপুনি—কোঁ-কোঁ করে জ্বর! তার ওপর তখন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত। ওরে বাবা রে বাবা! সে একটা আমল বটে! গঙ্গায় নৌকা চলা যাকে বলে। সেই হরিশ ডাক্তারের ছেলের মৃত্যু মনে আছে আপনার? এদিকে ঘরে ছেলের এখন তখন; ওদিকে মনের ভুলে মালিশের শিশিতে খাবার ওষুধ লিখে দিয়েছিল হরিশ—তাই খেয়ে নোটন গড়াঞীর পুত্রবধূ যায় যায়, রাত্রি বারোটায় খোকা চাটুজ্জে ছুটে এসে পড়ল—তার বোন গলায় দড়ি দিয়েছে। দারোগা পুলিশ হোঁক-হোঁক করছে ঘুষ খাবার জন্যে—আপনি ওদিকে মেলায় পাঞ্জাবী খেলোয়াড়ের ছকের সামনে বসেছেন—কোঁচায় খুঁটে টাকা নিয়ে, বাপরে বাপরে! সে কি রাত্রি! মনে আছে।

জীবন ডাক্তার একটা লম্বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। একটু নড়ে বসলেন।

না। সে দিনের কথা ঠিক মনে নাই, স্পষ্ট মনে পড়ে না; মনে পড়িয়ে দিলে মনে পড়ে: মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনি একটা অস্বস্তি জেগে ওঠে। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন। কেন এমন হয়েছিল? কেন?

সম্পদের একটা মত্ততা আছে। সেটা কি তাঁর সম্পদের মত্ততা? সম্পদের উল্লাসে প্রতিষ্ঠার উত্তাপে এমন হয়েছিলেন? হয় তো হবে। তাঁর বাবার শিক্ষা বংশগত আচার আচরণ ধ্যান তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। কিন্তু—!

চঞ্চল হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ।

অপরাধ তাঁরই বটে। তাঁর ছাড়া আর কার হবে? কিন্তু যেন একান্ত অসহায়ের মত এ অপরাধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাবা কিনেছিলেন

জমিদারীর অংশে। তার মোহ তাঁর চিত্তকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি—কিন্তু তাঁর কিশোর চিত্ত নিষ্কৃতি পায় নি। বীজটা যেন সেখানে ছিল। তারপর গুরু রঙলাল শিখিয়েছিলেন এ্যালোপ্যাথি—তার সঙ্গে আরও কিছু যেন ছিল, মনকে প্রভাবিত করেছিল, বংশগত শিক্ষার উপর বিস্মৃতির স্তর ফেলেছিল। প্রতিষ্ঠার মোহ; প্রতিষ্ঠার অহংকার ছিল বই কি তাঁর। তাঁর সংকল্প ছিল—ঘোড়া কিনে ঘোড়ায় চড়ে আতরবউকে পাল্কীতে চড়িয়ে একদিন কাঁদী যাবেন। ঘোড়া তিনি কিনেছিলেন। সাদা বড় ঘোড়া। আতরবউকে অলঙ্কারও দিয়েছিলেন অনেক। কিন্তু কাঁদী যাওয়া হয় নি। কেন যে যান নি তা আজও বুঝতে পারলেন না। সংকোচ না ভয় কে জানে? হয় তো বা দুই-ই। যে কারণেই হোক, পারেন নি। শুধু প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের মাদকতায় এ অঞ্চলটাতেই প্রমত্তের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। যা পেয়েছেন—তা দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। মনই তৃপ্তি পায় নি তো সঞ্চয় করবেন কোন আনন্দে? যদি বল—প্রতিষ্ঠার আনন্দে, বলতে পার, কিন্তু সেও ফাঁকিতে পরিণত হয়েছে। তাই তো হয়! বাবা বলতেন—রঙলাল ডাক্তারও বলতেন—প্রতিষ্ঠা যদি সত্যকারের আনন্দ না হয়, মনকে যদি ভরপুর ক'রে না দেয়, তবে সে জেনো মিথ্যে—তার আয়ু সামান্য কয়েকটা দিনের। সে দিন ক'টা গেলেই সে প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় ভুয়ো মিথ্যে। রঙলাল ডাক্তার হেসে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে বলতেন—এই এর নেশার মত! একদিন বলেছিলেন—নবদম্পতির আকর্ষণের মত। সেটা যদি নিতান্তই রূপ যৌবন ভোগের আনন্দের মত আনন্দ হয়—তবে রূপ যৌবন যাবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ বিস্বাদ হয়ে পড়ার মত তেতো হয়, মিথ্যে হয়। কিন্তু সে যদি ভালবাসা হয় তবে যায় না জীবন! প্রতিষ্ঠার আনন্দ প্রেমের আনন্দের মত হওয়া চাই। যদিও আমি ওদুটোর স্বাদ জানি না। বলে হা হা করে হেসেছিলেন।

বাবা বলতেন—পরমানন্দ মাধবের কথা। তাকে না পেলে কিছুই পাওয়া হয় না। তাকে পাওয়া যায় কি না জীবন মশায় ঠিক জানেন না। তবে তিনি পান নি। সম্পদের মধ্যে পান নি, প্রতিষ্ঠার মধ্যে পান নি, সংসারে আতরবউ ছেলেমেয়ে সুরমা সুষমা বিরূপমা বনবিহারী কারুর মধ্যে না।

আতরবউ বলে—শশী বলছে—জুয়ো খেলার কথা।

সে আমলে জুয়ো খেলাটা দোষের ছিল না, অন্তত বড়লোকের ছেলের দোষের ছিল না। ছেলে বয়স থেকে অভ্যাস ছিল কিছু কিছু। তারপর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। সেটাকে বাড়িয়ে দিলে আবার আতর বউ।

শশী বলছে একটা রাত্রির কথা। মনে পড়ছে বই কি! সব মনে পড়ছে। রাত্রি শুধু নয়—রাত্রি দিন, সে কাল, সে কালের মানুষ জন সকলকে মনে পড়ছে। সে কালের জলটলমল দিঘী, ধানভরা ক্ষেত খামার, শান্ত পরিচ্ছন্ন ছায়াঘন গ্রামগুলি, লম্বা চওড়া দশাসই মানুষ, মুখে মিষ্ট কথা, গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ, উঠানে মরাইয়ে ধান, ভাঁড়ারে জালায় জালায় চাল, কলাই মুগ মসুর-ছোলা অড়হর মাসকলাই, মণ মণ গুড়,—সে কাল—সে দেশ দেখতে দেখতে যেন পাল্টে গেল।

ম্যালেরিয়া ছিল না তা' নয়। ছিল। পুরনো জ্বর দু চারজনের হ'ত। শিউলিপাতার রস আর তাদের বাড়ির বড়িতে পাঁচনে তারা সেরে উঠত। হঠাৎ ম্যালেরিয়া এল সংক্রামক ব্যাধির মত।

শশী হি-হি ক'রে হাসছে। বলছে—হোঁ-হোঁ ক'রে কোঁ-কোঁ ক'রে জ্বর। শশীর প্রকৃতি অনুযায়ী ঠিকই বলেছে শশী। জীবন ডাক্তারের সে স্মৃতি মনে পড়লে সমস্ত অন্তরটা কাতর আর্তনাদ ক'রে ওঠে। উঃ কত যে শিশুর মৃত্যু হয়েছিল সেবার তার সংখ্যা নাই। শিশুমড়ক বলা চলে। মায়ের কান্নায় আকাশ ভরে উঠেছিল।

এ অঞ্চলে তখন তাঁর বিপুল পসার। তিনি ছাড়া ছিলেন হরিশ ডাক্তার। ব্রজলাল বাবুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার। শশী তখন তাঁর এখান ছেড়ে ওই দাতব্য চিকিৎসালয়ে কম্পাউণ্ডার। দেখতে দেখতে আর দুজন ডাক্তার এসে বসল। নবগ্রামের নরপতি রায় চৌধুরি একখানা হোমিওপ্যাথিক বই কিনে আর ওষুধ কিনে এক পাড়াগাঁয়ে গেল চিকিৎসা করতে। বরদা রায় চৌধুরির ছোট ছেলে ইস্কুলের পড়া ছেড়ে চলে গেল কলকাতা—আর-জি কর মেডিকেল ইস্কুলে পড়তে। পাগলা নেপালের ছোটভাই—সেও পাগল ছিল খানিকটা—সীতারাম [illegible]

বসল ওষুধের দোকান। নবগ্রাম মেডিকেল হল্। খুচরা ও পাইকারী ওষুধের দোকান।

আশ্চর্য মানুষ! এই মড়ক মহামারীর স্থায়ী সম্ভাবনা বুঝে মানুষ চিকিৎসা ব্যবসায়ে উপার্জনের প্রশস্ত পথ দেখতে পেয়েছে।

ঘরে ঘরে মানুষ শয্যা নিলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরতেন জীবন দত্ত। বাবুপাড়া, বণিকপাড়া, শেখপাড়া, মিস্ত্রাপাড়া, জেলেপাড়া, ডোমপাড়া, কাহারপাড়া, বাউড়ি পাড়া। হরিশ ডাক্তারের দু পকেট বোঝাই হত টাকায়। তাঁর হ'ত তিন পকেট—চার পকেটও হতে পারত। কিন্তু তিনি তা করতেন না। তিনি ডাকে বের হতেন—পথে যে তাঁকে ডেকেছে তার বাড়ীই যেতেন, যে যা দিত তাই না দেখেই পকেটে ফেলতেন; ক্ষেত্র বিশেষে সাহায্য করে আসতেন। হরিশ এখানে আগন্তুক, সে রোজগার করতেই এসেছে। জীবন দত্ত এখানকার তিনপুরুষের চিকিৎসক, মশায়ের বংশে, শুধু তাই নয়—নিজের গ্রামের তিনি শরিক জমিদার, তাঁর কাছে কি উপার্জন বড় হতে পারে? কখনও কোন দিন মনেও হয় নি। বরং পকেট থেকে মেকী এবং খারাপ আওয়াজ টাকা আধুলি সিকি বের করে আতরবউ বকাবকি করলে তিনি কৌতুক অনুভব করতেন। হাসতেন!

আতরবউ বলতেন—হেসো না! আমার গা জ্বালা করে।

জীবন মশায় তাতেও হাসতেন। কারণ আতরবউয়ের গাত্রজ্বালা চিরস্থায়ী ব্যাধি, বৈদ্য হিসাবে তিনি তা জানেন; ওই জ্বালা চিতাকাষ্ঠে সঞ্চারিত হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে তবে নির্বাপিত হবে।

সে সময় পর পর দুটো ঘোড়া কিনেছিলেন তিনি। একটা বড় একটা মাঝারি। পায়ে হেঁটে ঘুরে কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। বছর তিনেকের মধ্যেই দুটো ঘোড়াই অকর্মণ্য হয়ে গেল। কুমড়ি রোগ;—অর্থাৎ কোমরে বাত হল। জীবন ডাক্তারের বিপুল ভার বয়ে দুটো জীব প্রায় অক্ষম হয়ে গেল। জানোয়ার দুটোর শেষ জীবন—হাটের তামাক ব্যবসায়ীর তামাক বয়ে অতিবাহিত হয়েছে। এর পর আর ঘোড়া কেনেন নি জীবন ডাক্তার। তাঁর শক্তির তো অভাব হয় নি, অভাব হ'ত সময়ের, তা হোক, চারটের পাঁচটার খাওয়া—তাই খেয়েছেন। মাঠের পথ ভেঙে ডাক্তার হাঁটতেন;

লোকে বলত—হাতী চলছে। হাতীই বটে। একদিন সকালে জুতার কাদা ঘুচাতে গিয়ে ইন্দির লাফিয়ে উঠেছিল—বাপরে! সাপ! একটা মাঝারি কেউটে সাপের মাথা তাঁর জুতোর তলায় চেপ্টে লেগে ছিল। ঠিক জুতোর তলায় কে নিপুণ হাতে কেউটের মাথা এঁকে দিয়েছে। ভাগ্যক্রমে অন্ধকারে ভ্রূক্ষেপহীন মাতঙ্গপদপাতটি ঠিক সাপটার মাথার উপরেই হয়েছিল। ইন্দির জুতোটা এনে তাঁকে দেখাতে তিনি হেসেছিলেন। আতরবউ শিউরে উঠে মনসার কাছে মানত করেছিল—তাঁকে তিরস্কারও করেছিল। এমনিই কি মানুষের উপার্জনের নেশা। দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে টাকার জন্যে, তাতেও তিনি হেসেছিলেন—এই কদিন আগেই আতরবউ যে যা দেয়, ফি নেওয়ার জন্য বলেছিলেন, দাতা কর্ণদের ছেলের গলায় ছুরি দিতে হয় তা জান? তুমি তাই দেবে। সে আমি জানি।

বন্ধুরা তাঁদের রহস্য ক'রে বলত—দেশের লোকের সর্বনাশ আর ডাক্তারদের পৌষ মাস।

তাতেও তিনি হাসতেন। বন্ধুবান্ধবেরা বললে বলতেন—পৌষমাসে পিঠে পুলি খাবি তো! এই তো তোদের কথা!

—দে, টাকা দে!

সেতাব সুরেন্দ্র নেপাল ফিস্টের আয়োজনে লেগে যেত। গন্ধে গন্ধে শশী জুটত। জীবন দত্ত হরিশ ডাক্তারকেও নিমন্ত্রণ পাঠাতেন।

এ সব হ'ত রাত্রে। দিনে অবকাশ কোথায়? ভোরে উঠে আরোগ্য-নিকেতনে রোগী দেখে ডাক থেকে ফিরতেই হয়ে যেত অপরাহ্ন, বেলা চারটে। চারটের পর খাওয়া দাওয়া সেরে দূরান্তের ডাক। সেখান থেকে ফিরতে নটা-দশটা বারোটা। তিনটেও হত। বারোটা পর্যন্ত সেতাব সুরেন নেপাল তাঁর অপেক্ষায় থাকত। আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ায় আলো জ্বলত, ইন্দির জোগাতো চা আর তামাক,—তারা খেলত দাবা। আর বসে থাকত চৌকিদারেরা। জীবন মশায় তখন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত। জীবন মশায় ফিরে এসে অন্তত এক হাত দাবা খেলে চৌকিদারের হাজিরার খাতায় সই করে তবে বিশ্রাম করতেন। কতদিন রাত্রি প্রভাতও হয়ে যেত। খাওয়া দাওয়ায় দিকে ইন্দির আর শশী যেত

নবগ্রামের বাজার। ডাক্তার চিট্ দিতেন। তেল ঘি নুন মশলা এমন কি সাহাদের দোকান থেকে আসত মদ। সুরেন নেপাল হরিশ ডাক্তার শশী এদের মদ নইলে তৃপ্তি হয় না। নেপাল সুরেন যেত পাঁঠার খোঁজে। চৌকিদার যেত—জেলে ডেকে আনত—সে পুকুর থেকে মাছ ধরে দিত। ডাক্তার আত্মবিস্মৃতই হয়েছিলেন। সে যেন একটা নেশার ঘোর।

মনে পড়ছে—সে দিন বিকেলে বাড়ী থেকে বের হবেন—দেখলেন—আতরবউ জামা হাতড়াচ্ছে। টাকা বের ক'রে নিচ্ছে। মেলা চলছে সে সময়। ভাদ্র মাসে—নাগপঞ্চমীতে মনসাপুজোর মেলা। মেলার কর্তারা এসে নিমন্ত্রণও করে গেছে। জীবন মশায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে একটা রফা ক'রে জুয়ো খেলার বন্দোবস্ত করে দেবেন। এবং সেখানে জুয়ো খেলে জীবন মশায় দশ বিশ টাকা জুয়াড়ীকে দিয়েও আসবেন! সেইজন্য আতরবউ সাবধান হচ্ছেন। স্বামীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আতরবউয়ের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কোন কথা তিনি বলবার আগেই আতরবউ বলেছিলেন—জুয়ো খেলে টাকা দিয়ে আসবে সে হবে না। তোমার লজ্জা হয় না জুয়ো খেলতে? জীবন মশায় বলেছিলেন—জুয়ো খেলব না, টাকা বের ক'রে নিয়ো না। ছেলেদের দেব চাকরদের দেব—মেলা দেখতে যাবে; সেখানে কেউ চাইলে দিতে হয়! টাকা রাখ।

—রইলো পাঁচ টাকা।

—পাঁচ টাকায় কি হবে?

—না। আর দেব না।

—ভাল।

জামাটা টেনে নিয়ে পাঁচটা টাকার নোটটাও ফেলে দিলেন। তারপর জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে দাঁড়িয়েছিল ছেলে বনবিহারী, নতুন বাইসিক্ল হাতে নিয়ে বাপের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে, মেলা দেখতে যাবে টাকা চাই। গায়ে ডবলব্রেস্ট কোট, পায়ে পাম্প্‌স্‌। বনবিহারী বাবুদের ছেলেদের সমান বিলাসী। চাকর ইন্দির দাঁড়িয়ে, নন্দ তখন ছেলেমানুষ সে দাঁড়িয়ে; তারা জানে—মশায় মেলার বকশিশ দেবেন। সকলের দিকে তাকিয়ে মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল। আতরবউ পাঁচটাকার নোটখানা

কুড়িয়ে নিয়ে ছেলের হাতে দিলেন। জীবন মশায় বললেন—ইন্দির আমার সঙ্গে আয়।

তিনি ভুলে গেলেন—হরিশের ছেলের অসুখের কথা। শুনেছিলেন, ছেলেটির অসুখ করেছে। গত রাত্রে হরিশকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন খাওয়ার জন্য; হরিশ আসতে পারে নি, লিখেছিল—"ছেলেটার হঠাৎ কম্প দিয়া জর আসিয়াছে। মেয়েরা ভয় পাইতেছে, যাইতে পারিলাম না।" জীবন মশায় ভেবেছিলেন একবার খোঁজ নেবেন। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভুলে গেলেন। নবগ্রামে সাহাদের মদের দোকানে এসে সাহাকে ডেকে বললেন—পঞ্চাশটা টাকা চাই সাহা।

সাহা শুধু মদের দোকানই করত না, টাকা দাদনের কারবার করত, গহনার উপর টাকা দিত, সম্মানী ব্যক্তিকে দিত হ্যাণ্ডনোটে।

অবাক হয়ে গেল সাহা—মশায়ের টাকা চাই!

—চাই। কালপরশু চেয়ে নিস। আন টাকা।

টাকা নিয়ে ইন্দিরকে দুটো টাকা দিয়ে বাকী টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন—মেলা। মেলা ঘুরে গিয়ে বসেছিলেন জুয়োর আসরে। রাত্রি তখন আটটা।

দশটার সময় ছুটে এসেছিল—এই শশী। শশী তখন হরিশের অধীনে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর কম্পাউণ্ডার। তার মেলাতে থাকারই কথা কিন্তু হরিশের ছেলের অসুখের জন্য আসতে পারে নি। ছেলের অবস্থা সংশয়াপন্ন; ওদিকে হরিশের হাতের রোগী নোটন গড়াঞীর পুত্রবধূ মালিশ খেয়ে বসে আছে। ভুল হরিশের। ছেলের অসুখ বিভ্রান্ত-মস্তিষ্ক হরিশ মালিশের শিশি দিয়ে বলেছে—এইটে খাবার।

—এখুনি চলুন আপনি।

উঠেছিলেন তাই, তখন কোঁচার খুঁটে গোটা বিশেক টাকা অবশিষ্ট, ডাক্তার উঠেই টাকা কটা গোছ করে—জাহাজের ঘরে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—সই! জাহাজ ডোবে তো গেল, ওঠে তো রেখে দিয়ো—কাল নেব।

জাহাজ আর কাঁটা এই দুটো ছিল জীবন মশায়ের প্রিয় ঘর। ওই দুটো বেঁধেই তিনি জুয়ো খেলতেন।

যেতে যেতে হরিশের ছেলে শেষ হয়ে গিয়েছিল। জীবন মশায়কে দেখে বুক চাপড়ে কেঁদে উঠেছিল হরিশ। জীবন! এ কি হল আমার! জীবন! তুমি যদি সকালে একবার আসতে ভাই, তবে হয়ত বাঁচত আমার ছেলে।

জীবন মশায় মৃদু তিরস্কার করেছিলেন হরিশকে।—তুমি না চিকিৎসক হরিশ! ছি! তোমার তো এমন অধীর হওয়া সাজে না। 'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং' এ কথা জানেন যিনি নিয়ন্তা তিনি আর জানেন তত্ত্বজ্ঞানী, আর বিশ্বতত্ত্বের সমস্ত না-জেনেও এ কথা জানে চিকিৎসক। চুপ কর। মেয়েদের সান্ত্বনা দাও। আমি যাই নোটন গড়াঞীর বাড়ী।

আশ্চর্য সংসার! মুহূর্তে হরিশের শোকের উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—যা হয় করো ভাই! আমি বমির ওষুধ দিয়েছি। আমার সর্বনাশের উপর সর্বনাশ হয়ে যাবে।

গড়াঞীর বাড়ীতে তখন নানা গবেষণা চলছে। হরিশের ভাগ্য ভাল মেলার সময়। লোকজন সব মেলায়। জীবন মশায় এসে বসলেন। প্রথমেই শিশিটা হস্তগত ক'রে পকেটে পুরলেন। শশীকে বললেন—ডিসপেনসারীতে স্টমাকপাম্প আছে—নিয়ে আয়।

রাত বারোটায় খোকা চাটুজ্জে এসে কেঁদে পড়ল—মশায় রক্ষা করুন। আমার বোন গলায় দড়ি দিয়েছে।

জীবন মশায় প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত। তিনিই পারেন পুলিশ লাঞ্ছনার হাত হ'তে বাঁচাতে। বাঁচিয়েছিলেন তিনি। গড়াঞীর পুত্রবধূর পেটের মালিশ বমি করিয়ে বের করে তাকে নূতন ওষুধ দিয়ে রাত্রি আড়াইটার সময় খোকা চাটুজ্জের বাড়ী এসে বাইরের দাওয়ার উপর বসলেন। রিপোর্ট লিখে বললেন শ্মশানে নেবার ব্যবস্থা কর। আমি বলছি।

কানে কানে কে এসে যেন বললে—রাস্তায় দারোগা দাঁড়িয়ে আছে। জমাদারের সঙ্গে কি ফুসফাস করছে। মনে হচ্ছে আপনি চলে গেলেই ওরা এসে লাস আটকাবে। চালান দেবে সদরে।

জীবন মশায় সেতাবকে বললেন—দাবার ছক ঘুঁটি আন সেতাব। শুধু তো বসে থাকা যায় না। পাত ছক পাত।

সব মনে পড়ছে। মনে আছে সবই; মনে পড়ালেই মনে পড়ে। এইখানেই তো মানুষের সাধনার জয়। কালের গর্ভে যা লীন হয়েছে, মানুষের মনে তা' বর্তমান রয়েছে; পৃথিবীর বুকে পাথরে খোদাই ক'রে রেখেছে; স্তম্ভ গড়ে রেখেছে। পুরুষ পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে হারিয়ে-যাওয়া মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেদিন রাত্রি তিনটে পর্যন্ত দাবা খেলেছিলেন—বাজীর পর বাজী জিতেছিলেন তিনি। সেতাব বলেছিল—"তোর এখন চরম ভাল সময়রে জীবন! ডাঙ্গায় নৌকো চলছে।"

তাঁরও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু—!

এই মেলার পর কিন্তু বনবিহারী প্রমেহ রোগে আক্রান্ত হল। শুনলেন মেলায় সে নাকি মদও খেয়েছিল।

চমকে উঠেছিলেন জীবন মশায়।

এ কি হল? ডাঙ্গায় চলমান নৌকাটা অকস্মাৎ মাটির বুকের মধ্যেই ডুবে গেল।

দীর্ঘকাল পর মনে পড়েছিল মঞ্জরীকে। মদ্যপানের ফলে—ব্যাভিচারের পাপে ভূপী বোসের ব্যাধির কথা শুনে—মঞ্জরীর মন্দভাগ্যে তিনি মনে মনে আনন্দ পেয়েছিলেন বলেই কি—এমনটা ঘটল তাঁর ভাগ্যে? সব থেকে আশ্চর্যের কথা মঞ্জরীর কথাটা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল আতরবউ।

নইলে—এই প্রতিষ্ঠার উল্লাস মুখরিত সময়ের মধ্যে মঞ্জরীকে তাঁর বোধ করি দিনেকের জন্যও মনে পড়ে নি।

আত্মসম্বরণ করে সুস্থ চিত্তে অনেক ভেবে মনে হয়েছিল—এ তাঁর সম্পদের প্রতিষ্ঠার মোহান্ধতার প্রতিফল!

তিনি নিজেকে সংযত করবার সংকল্প করেছিলেন। পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন—দীনবন্ধু মশায়, জগবন্ধু মশায়ের সেই প্রাচীন অনাড়ম্বর পবিত্র জীবনধারাকে। তাঁর বাবা বলতেন—বাহিরটাকে বড় করে বাড়িয়ে তুলো না বাবা। তা' হলে ভিতরের যিনি তিনি তারই মধ্যে হারিয়ে যাবেন, বের হবার পথ পাবেন না! দেখ না বাবা, বড় লোকের

তিন মহলা চার মহলা বাড়ী, ঝঁাকজমক—সেপাই সান্ত্রী—সে কি শুধু বাইরের লোককেই আটক করে? ভিতরের লোকও আটক পড়ে। নানান বাধা নানান নিষেধ—কত নিয়ম কত কানুন—কত পোষাক কত কায়দা! ঠিক সোনার খাঁচার পাখী বাবা! সোনার খাঁচায় পাখী খায় ভাল থাকে ভাল কিন্তু পাখা পঙ্গু—আকাশের স্বাদ তার মেলে না; ঘেরা টোপেই ঢাকা থাকে, যে দিনমণি উঠলে আপনি কণ্ঠে ভাষা জোগায়,—তার আলোও সে পায় না তাপও পায় না, তাকে ছোঁবার জন্যে আকাশে ওড়া সে তো অনেক দূরের কথা!

তিনি আড়ম্বরের সম্পদের প্রতিষ্ঠার মহল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু আসতে চাইলেই আসা যায় না। জিনিষ গড়ে উঠে দাঁড়ায় আপনার একটা দৃঢ়তা নিয়ে। গড়ার হাঙ্গামা কম নয়। সে হাঙ্গামার চেয়েও বড় হাঙ্গামা বেধে ওঠে ওই মহলের মধ্যে বাইরের যাদের এনে আশ্রয় দেওয়া হয় তাদের নিয়ে। ভাঙার কাজে লাগার আগেই লড়াই বাধে তাদের সঙ্গে। তাই বাঁধন—এবং সে লড়াইয়ে জীবন মশায়কে হার মানতে হ'ল। আতরবউ এসে দাঁড়ালেন রূঢ় মূর্তিতে। না—সে হবে না; সে তিনি দেবেন না।

জীবন মশায় ছেলে বনবিহারীকে ডেকে বলছিলেন, নিজেদের মশায় বংশের ইতিহাস। মহাশয়ত্বের ব্যাখ্যা করছিলেন। এবং বলেছিলেন—বংশের রক্তধারাই হ'ল শ্রেষ্ঠ সম্পদ; সে ধারাকে যে কলুষিত ক'রে সে কুলাঙ্গার। বাপ লজ্জা পায়, মা লজ্জা পায়, ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ শিউরে ওঠেন—পরলোকের সমাজে তাঁদের মাথা হেঁট হয়। অতি সন্তর্পণে মৃদু তিরস্কার ক'রে সস্নেহেই তাকে বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন। জানতেন না, দরজার ওপাশে কখন আতরবউ এসে কান পেতে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—একটা ভুলের জন্য এতবড় কথা বললে তুমি ওকে? আমার গর্ভের দোষ দিলে! চোদ্দ পুরুষের মাথা হেঁট করেছে বললে। তুমি লজ্জা পেয়েছ বললে! তুমি নিজের কথা ভেবে দেখে কথাটা বলেছ? নিজে তুমি কর নি?

ও হয়তো সঙ্গ দোষে কোন ভ্রষ্টার পাল্লায় পড়ে একটা ভুল ক'রে ফেলেছে। তুমি? মঞ্জরীর জন্যে তুমি কি কাণ্ডটা করেছিলে—মনে পড়ে না?

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন জীবন মশায়।

আতরবউ ছেলের সামনে মঞ্জরীর কথা বর্ণনা শেষ ক'রে—ছেলের হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। উঠে আয়।

জীবন মশায় বসে রইলেন অপরাধীর মত। এবং যে মঞ্জরীকে তিনি অপরাধিনীর মত জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন—আতরবউ সেই মঞ্জরীকেই তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল মাথা তুলিয়ে; পাওনাদারের মত।

এরপর সম্পদ, প্রতিষ্ঠা, আড়ম্বরের তিনমহলা বাড়ীর ভিতর থেকে উন্মুক্ত সূর্যালোকে—মশায় বংশকে মুক্তি দেওয়া আর সম্ভবপর হয় নি। নিজে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তাও পারেন নি।

মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ভাবতেন, ভাবতে গেলেই মনে হত—আতরবউয়ের কথাই সত্য; মঞ্জরীর দুর্ভাগ্যে আনন্দ অনুভবের প্রতিফলই বটে। ওই সাদা ঘোড়ায় চড়ে, সালঙ্করা আতরবউকে পাল্কীতে চড়িয়ে কাঁদী যাবার গোপন বাসনাই তো এই তিন মহলা বাড়ীর প্রথম ইট। তারপর থাকে-থাকে ইটের পর ইট উঠেছে। আজ আর তাকে ভাঙবার উপায় নাই! তিনি প্রতীক্ষাই করেছিলেন—ভাঙুক তা' হ'লে আপনি ভাঙুক। কালের সঙ্গে জীর্ণ তাকে হতেই হবে, নোনা লাগুক, ভূমিকম্পে ফাটুক—তারপর ভাঙুক।

হঠাৎ জীবনমশায় সচেতন হয়ে উঠলেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। শশী এতক্ষণ পিছনে বসে বৃদ্ধ হস্তীকে আপন মনেই গালাগাল দিয়ে চলেছিল। এর মধ্যেই পকেট থেকে ক্যানাবিসিণ্ডিকা মেশানো পানীয়ের শিশি বের ক'রে সে এক ঢোক খেয়ে নিয়েছে। গাড়ীতে তামাক সেজে খাওয়ার বিপদ আছে। খড়ের বিছানায় আগুন লাগতে পারে। সেই ভয়েই ও ইচ্ছা সম্বরণ করে দুটো বিড়ি, চার পয়সায় দশটা ফ্লোকেক সিগারেটের একটা সিগারেট শেষ করেছে। এবং মধ্যে মধ্যে দাঁতে দাঁত ঘষে ভেবেছে—বুড়োর পিঠে গোটা দুয়েক কিল বসিয়ে দিলে কি হয়?

না-হয় তো—জ্বলন্ত সিগরেটের ডগাটা পিঠে টিপে ধরলে কি হয়? চুপ ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে?

মশায়কে ন'ড়ে চ'ড়ে বসতে দেখে—ছইয়ের বাইরে মুখ বের ক'রে তাকাতে দেখে—শশী বললে—নেমে একবার দেখব নাকি?

—কি?

—ব্যাটা দাঁতু সত্যিই ভর্তি হল কিনা হাসপাতালে?

ঠিক হাসপাতালের সামনে এসে পড়েছে গাড়ীখানা।

—না। কিন্তু গান গাইছে কে বল তো? গলাখানি বড় মিঠে। গাইছেও ভাল। গানখানিও চমৎকার! ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—ডাক্তার ছোকরা নয়?

উৎসাহিত হয়ে শশী ছইয়ের পিছন দিক থেকে ঝপ ক'রে লাফিয়ে নেমে পড়ল। বললে—হ্যাঁ ডাক্তারই বটে। ডাক্তারের পরিবার গান করছে। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। সে একবারে খাঁটি মেম সাহেব। বাইসিকিলে চড়ে গো। আর চলে যেন নেচে নেচে। গান তো যখন তখন!

হাসিতে ভ'রে উঠল জীবন মশায়ের মুখ। নেচে নেচে চলে? বাইসিকিলে চড়ে? গান গায়, যখন তখন গান গায়? ছোকরা তা' হ'লে সুখী লোক।

—অঃই! অঃই! অই দেখুন না।

ডাক্তারের তরুণী স্ত্রী এই মুহূর্তে গান শেষ করে ছুটে বেরিয়ে এসে ডাক্তারের হাত চেপে ধরেছে, হাত থেকে জলের মগটা কেড়ে নেবে। সে নিজে জল ঢেলে দেবে।

ডাক্তার দেবে না। সে তাকে নিরস্ত করতে বালতী থেকে জল নিয়ে তার মুখে ছিটিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি ছুটে চলে গেল ঘরের মধ্যে। আবার ছুটে বেরিয়ে এসে কিছু যেন ছুঁড়ে মারলে ডাক্তারের মুখে।

হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন জীবন মশায়।

ডাক্তারের মুখখানা সাদা হয়ে গিয়েছে। পাউডার! পাউডার ছুঁড়ে মেরেছে স্বামীকে।

শশী খুক খুক করে হাসতে লাগল।

ডাক্তারের মুখে একটি মৃদু হাস্য রেখা ফুটেই রইল। গাড়ী মন্থর গমনে চলতে লাগল।

সংসারে মনের মানুষ ওই পরমানন্দ মাধবের মতই দুর্লভ। যে পায়—সে ওই মানুষের মধ্যে দিয়েই পরমানন্দময়কে পায়। তার আর অন্য সাধনার প্রয়োজনই হয় না।

এই তো নবগ্রামের কানাইবাবু! তিনি আজ নাই, অনেকদিন মারা গেছেন; জীবন দত্ত তাকে দেখেছেন; মাতাল, চরিত্রহীন, দুর্দান্ত রাগী, কটুভাষী লোক ছিলেন তিনি। প্রথমপক্ষ বিয়োগের পর আবার বিবাহ করলেন—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর স্পর্শে লোহা সোনা হ'য়ে যাওয়ার মত আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। মদ ছাড়লেন—ব্যাভিচার ছাড়লেন—কথাবার্তার ধারা পাল্টালেন, সে রাগ যেন জল হয়ে গেল; শুধু তাই নয়, মানুষটি শুধু সদাচারেই শুদ্ধ হলেন না, পড়াশুনা শাস্ত্র চর্চা করে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন জীবনে।

হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে হল। তিনি মুখ বাড়িয়ে শশীকে ডাকলেন—লিউকিস্।

শশী ইতিমধ্যে রাস্তায় নেমে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে—তামাক সেজে হুঁকো টানছে! হুঁকোটা নামিয়ে সে সবিস্ময়েই জীবন মশায়ের মুখের দিকে তাকালে। হঠাৎ বুড়োর হ'ল কি? লিউকিস বলে ডাকে যে!

এ নাম তার সে আমলের নাম। ম্যালেরিয়ার আবির্ভাবের সময় পাগলা নেপালের ভাই সীতারাম খুলেছিল 'নবগ্রাম মেডিকেল হল্'—সেই সীতারামের দেওয়া নাম। সেও ছিল আধ পাগল। সত্তর বছরের বৃদ্ধ থেকে বোল বছরের ছেলে পর্যন্ত সবাই ছিল তার ইয়ার। সকলের সঙ্গেই সে তামাক খেতো। অথচ তার চরিত্রের মধ্যে কোথায় ছিল একটি মাধুর্য যে, এতটুকু বিরক্ত হত না কেউ।

সে কলকাতার বড় বড় সায়েব ডাক্তারের নাম নিয়ে এ অঞ্চলের ডাক্তারদের নাম করণ করেছিল।

জীবন দত্তের নাম দিয়েছিল—ডাক্তার বার্ড।

হরিশ ডাক্তারকে বলত—ডাক্তার ম্যানার্ড।

শশীকে বলত—লিউকিস।

নতুন ডাক্তার এসেছিল হাসপাতালে—কলকাতার মিত্তির বাড়ীর ছেলে—তাকে বলত—ডাঃ ব্রাউন!

সীতারামের এই রসিকতা সে কালে ভারী পছন্দ হয়েছিল লোকের। ডাক্তারেরা নিজেরাও হাসতেন এবং মেজাজ খুসী থাকলে—পরস্পরকে এই নামে ডেকে রসিকতা করতেন।

এতকাল পরে সেই নাম? বিস্মিত হল শশী। কিন্তু এই নামে সে-কালে ডাকলে যে-উত্তর সে দিত—সেই উত্তরটি দিতে ভুল হ'ল না তার। ঘাড়টা একটু হেঁট করে সায়েবী ভঙ্গিতে সে বললে—ইয়েস সব।

জীবন মশায় বললেন—সে আমলটা বড় সুখেই গিয়েছে, কি বলিস শশী?

—ওঃ তার আর কথা আছে গো! সে একেবারে সত্যযুগ।

হেসে ফেললেন ডাক্তার। শশীর সবই একেবারে চরম এবং চূড়ান্ত। ভাল তো তার থেকে ভাল হয় না, মন্দ তো—একেবারে মন্দ। হয় বৈকুণ্ঠ নয় নরক।

তারপরেই শশী বললে—সীতারাম বেটা শাপভ্রষ্ট দেবতা ছিল, বুঝলেন? তা—হঠাৎ সীতারামকে মনে পড়ল ডাক্তার বাবু?

—নাঃ। তোর নামটা মনে পড়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম রাম-হরির কথা।

—বললাম তো বেটার অবস্থা আজকে খারাপ, বোধ হয় অনিয়ম টনিয়ম করেছে। তা শুধাবার তো উপায় নাই। মারতে আসবে বেটা। বলে—মরার চেয়ে তো গাল নাই, মরতে তো বসেইছি, না খেয়ে মরব কেন, খেয়েই মরব।

—সে তো গিয়েই দেখব রে, আমি শুধুচ্ছি জ্ঞানগঙ্গা যাবার জন্যে হঠাৎ উদগ্রীব হল কেন রামহরি?

—বেটার মতিগতি কি রকম পালটেছে আর কি। মানুষ তো পাল্টায়।

—হুঁ। তা রামহরির এ পরিবর্তন হ'ল কদ্দিন? নতুন বিয়ে করে?

শশী একটু ভেবে চিন্তে বললে—তাই বোধ হয় হবে।

—হুঁ, ডাক্তার স্মিতহাস্য প্রসন্ন মুখে আবার আকাশের দিকে চোখ তুললেন।

নবগ্রামের বাজার সম্মুখে।

ডাক্তার বললেন—বাইরে বাইরে চল বাবা মাঠের পথে। ভিড় ভাল লাগে না।

(একুশ)

মাঠের পথেই গাড়ী ভাঙল।

জীবন মশায় এবার একটু দেহ এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। শশীর তাড়ায় স্নান খাওয়া স্থগিত রেখেই দেখতে চলেছেন রামহরিকে। খেয়ে একটু বিশ্রাম না-করলে চলে না। ও সময়টায় জীবনে বোধ করি কখনই বের হন নি। কোন ডাক্তারই যায় না। ডাক্তারেরাও তো মানুষ।

অনাবৃষ্টির শেষ শ্রাবণের দুপুর বেলা; মেঘাচ্ছন্নতা রয়েছে, বৃষ্টি নাই। মাঠ শুকনো না-হোক অনাবাদী পড়ে রয়েছে। ফসল নাই কিন্তু আগাছা বেড়েছে। মাঠের এখানে ওখানে বাঁশ উঁচু হয়ে রয়েছে। পুকুর থেকে দুনি করে জল তুলে চাষ করছে উদ্যোগী চাষীরা। একেবারে সব থেকে নিচু মাঠে চাষ চলছে। সেখানে মানুষ গরুর মেলা বসে গেছে। গাড়ীখানা চলেছে উঁচু মাঠের মাঝখান দিয়ে, দুচার জন চাষী এখানে কায়ক্লেশে কাজ চালাচ্ছে। দেহে আর কিছু নাই এদের। না-খেয়ে, রোগে ভুগে চাষীদের জীবন শেষ হয়ে গেল। দেশটা হয় তো শ্মশান হয়ে যাবে। এমন অবস্থা কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারে নি। তেরশো পঞ্চাশে মন্বন্তর হয়েছিল—দারুণ মড়ক সেবার—সেবারও এমন অবস্থা হয় নি। তেরশ উনপঞ্চাশে সাইক্লোন—তেরশো পঞ্চাশে মন্বন্তর। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের কথা পড়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে, বাল্যকালে প্রবীণদের কাছে গল্প শুনেছেন। নিজে চোখে দেখেছেন কয়েকটি 'আকাড়া' অর্থাৎ আক্রার বছর। তেরশো তের সালে টাকায় কাঁচি ওজনের বারো সের চালে আকাড়া হয়েছিল। তের শো তিরিশ একত্রিশের পর থেকে আকাড়া হতে সুরু হ'ল ঘন ঘন। তারপর যুদ্ধ। যুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীন হল—কিন্তু শ্মশানের মত অবস্থা। দেশে শস্য নাই, আকাশে মেঘ দুর্লভ, মেঘ যদি আসে তাতে বৃষ্টি আরও সুদুর্লভ। বৃষ্টি হলে রোগটা কম হয়। এ তিনি ভাল ক'রে লক্ষ্য করেছেন—যেবার বৃষ্টি ভাল হয়—সেবার ম্যালেরিয়া অন্তত কম হবেই। কত আবিষ্কার হ'ল; মশায় ম্যালেরিয়ার বীজ বয়ে নিয়ে বেড়ায়; কলেরার বীজাণু জলের মধ্যে বাড়ে, খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মানুষকে আক্রমণ করে—মাছিতে বয়ে নিয়ে বেড়ায় ছড়ায়; কলেরার টিকে আবিষ্কার

হল ; কালাজ্বরের চেহারা ধরা পড়ল ; কত কত রোগ কত আবিষ্কার ! হ্যাঁ দেখে গেলেন বটে। সাধ অবশ্য মিটল না ; বড় একজন চিকিৎসক হয়ে এর তত্ত্ব-তথ্য পুরো দেখা এবং বুঝে ওঠা ঘটল না, শুনলেন—বিশ্বাস করে গেলেন—কার্য-কারণের রহস্য দেখবার দিব্য দৃষ্টি লাভ হল না এ জন্মে—তবুও অনেক অনেক দেখে গেলেন। একটি সাধ হয় মধ্যে মধ্যে—অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বীজাণুগুলিকে চোখে দেখা যায়—তাদের বিচিত্র চেহারা বিচিত্র ভঙ্গি—সেই দেখবার ইচ্ছা হয়, আর ইচ্ছে হয় এক্সরে করানো যখন হয় তখনকার ব্যাপারটা। মানুষের রূপময় দেহ অদৃশ্য হয়ে যায়—দেখা যায় কঙ্কাল—অন্ত্রপাতি—তার ক্ষত।

—আরে ! ওটা কি হচ্ছে রে !

—আজ্ঞে ?

—ওটা কি ব্যাপার ডাক্তার লিউকিস ? ওই মাটির পাহাড় ? কি কাটছে ? রেলের লাইন পড়বে না কি ?

—এ্যাই দেখুন ! ক্যানেল গো ! আপনি ঘরে ঢুকে বের হবেন না—কি ক'রে জানবেন বলুন !

—আচ্ছা ! খুশি হলেন ডাক্তার ! বেশ-বেশ। ও পারে গিয়ে বাবা ঠাকুরদা রঙলাল ডাক্তার মশায়ের কাছে খুব গল্প করা যাবে—কি বলিস ?

—তারা বুঝি দেখছে না ? তারা সব দেখছে আর হাসছে। বুঝেছেন—যতই করুক মঙ্গল নাই।

শশী পরলোকতত্ত্ব সুরু ক'রে দিল। এবার তার মায়ের কথা শুরু করবে। শশী বলে—তার মরা মা না কি তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। অন্য সময় থাকে না কিন্তু শশী নেশা করে গ্রাম-গ্রামান্তরে যখনই একলা পথ হাঁটে—তখনই বুঝতে পারে মা সঙ্গে সঙ্গে চলছে। শশী বলে—'রামপ্রসাদের গানের সর্বনাশী এলোকেশীর মত সঙ্গে ফেরে।' সে নাকি কথাও শুনতে পায়। পথ ভুল হলে কি ধন্দ থাকলে—শশীকে সাবধান ক'রে দেয়। বিশেষ ক'রে রাত্রিকালে। দিনে শশী ভয় করে না। রাত্রে ভয় পায়। সেই কারণেই কাল রাত্রে রামহরিকে দেখে ফিরবার পথে চণ্ডীতলার

ঢুকেছিল। সেই কারণেই মশায়ের সঙ্গ ছাড়ে নি, জীবন মশায় ইন্দিরকে সঙ্গে দিয়ে বাড়ী পাঠিয়েছিলেন। একালের ডাক্তারেরা ছেলেরা শুনে হাসে জীবন মশায় হাসেন না।

শশীর মাকে ওরা জানে না যে। তিনি জানেন। এমন মা আর হয় না সন্তানকে স্নেহ করে না কোন মা? কিন্তু শশীর মায়ের মত এমন স্নেহ তিনি দেখেন নি।

শশীকে শুধু শশী বলে আশ মিটত না—বলতেন—শশীচাঁদ! শশীচাঁদ আমার পাগল গো! খানিক-আধেক মদ খায়, নেশা ক'রে—তা করবে কি বল?

যৌবনে শশী দুর্দান্ত মাতাল হয়ে উঠেছিল। দেশে ম্যালেরিয়া লাগল। শশী চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর কম্পাউণ্ডার। চার আনা আট আনা ফি। কুইনিন আর ম্যাগ্‌সালফ ওষুধ—ওই ডিসপেনসারী থেকেই নিয়ে আসে। রোজগার অনেক। তখন শশী চিকিৎসাও খারাপ করত না। ডিসপেনসারীর কাজ সেরে শশী প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে বের হ'ত। সর্বপ্রথম খেয়ে নিত আউন্স দুয়েক মদ। তার আগে ডিসপেনসারিতেও আউন্স দুয়েক হ'ত। খেয়ে বোতলে জল মিশিয়ে রেখে দিত। জিনিসটা না থাকলে খানিকটা রেক্টিফায়েড স্পিরিটই জল মিশিয়ে খেত। রোগী দেখা শেষ করে শশী ফিরবার পথে ঢুকত সাহাদের দোকানে। তারপর হয় সেখানেই শুয়ে পড়ত নয় তো পথে কোনখানে কোন গাছতলায়। শশীর মা দাঁড়িয়ে থাকতেন পথের ধারে গলির মুখে। এক পা এক পা করে এগিয়ে শেষে আসতেন সাহাদের দোকানে।

—সাহা!

—কে? মা ঠাকরুণ! এই আছেন—শশীবাবু আছেন।

—একটু ডেকে চেতন করিয়ে দাও বাবা।

মায়ের ডাকে শশী উঠে টলতে টলতে আসত। মা নিয়ে আসতেন তার জামা হুঁকো কল্কে স্টেথেসকোপ। শশীই বলত—ওগুলো নে।

বৈশাখের ঝাঁ-ঝাঁ করা দুপুরে গামছা মাথায় দিয়ে শশীর মায়ের ছেলের সন্ধানে বের হওয়ার একটি স্মৃতি তাঁর মনে আছে। জীবন মশায় কল থেকে

ফিরছেন গরুর গাড়ীতে। পৃথিবী যেন পুড়ে যাচ্ছে। রাস্তায় জনমানব নাই, জন্তু জানোয়ার নাই, কাকপক্ষীর সাড়া নাই, অস্তিত্ব নাই,—শশীর গৌরবর্ণা মোটাসোটা মা আসছেন—মধ্যে মধ্যে দাঁড়াচ্ছেন, এদিক ওদিক দেখছেন। সাহাদের দোকানে সেদিন ছেলের সন্ধান পান নি। সাহা বলেছে শশীদা আজ বাইরে কোথা খেয়ে এসেছেন; দোকানে ঢোকেন নি। গিয়েছেন এই পথ ধরে। মা খুঁজে বেড়াচ্ছেন; ভাবনা বেড়ে গেছে, তা'হলে নিশ্চয় রাস্তায় কোথাও পড়ে আছে।

পড়েই ছিল শশী, একটা গাছতলার ছায়ায় শুয়ে বমি করে জামায় কাপড়ে মুখে মেখে পড়ে আছে, পাশে ব'সে একটা কুকুর পরম পরিতোষের সঙ্গে তার মুখ লেহন করে উদ্গারিত মাদক মেশানো খাদ্য খেয়ে মৌজ করছে। মা তাকে ডেকে তুলতে চেষ্টা করে তুলতে পারেন নি। জীবন মশায় তাঁর গাড়োয়ানকে দিয়ে শশীকে তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শশী জীবন মশায়কে দেখে নমস্কার ক'রে বলেছিল—কথাটা আজও মনে আছে জীবন মশায়ের; বলেছিল—ডাক্তারবাবু, আমার মায়ের একবিন্দু চোখের জল পৃথিবী ডুবিয়ে দিতে পারে! Yes, পারে! আলেকজেণ্ডার দি গ্রেটের কথা sir! Antipodus does not know এ্যাণ্টিপোডাস জানে না—আমার মায়ের একবিন্দু চোখের জল—!

জীবন মশায় ধমক দিয়ে বলেছিলেন—যা-যা বাড়ী যা!

—যাব, নিশ্চয় যাব! নিজেই যাব! কারুর ধমক খাই না আমি।

খানিকটা দূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার বলেছিল—Who is to appreciate my merits? my mother! my mother!

মা লজ্জিত হয়ে শুধু একটি কথাই বারবার বলেছিলেন—বাড়ী চল শশী! বাড়ী চল! শশী! বাড়ী চল!

সেই মা যদি মরণেও শশীর মত ছেলের চিন্তা ছাড়তে না-পেরে থাকেন তাতে—।

হঠাৎ জীবন মশায়ের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। শশী হাত নিয়ে কি করছে? কাকে যেন কিছু বলছে ইসারায়?

—কি শশী?

—পুত্‌কী আর মাছির বাচ্ছা গো। ঝাঁকের মত উড়ছে মুখের চারিপাশে। বর্ষাতে বৃষ্টিবাদলের নাম নাই, এ বেটাদের পঙ্গপাল ঠিক আছে, বেড়েছে—এ বছর বেড়েছে।

—গাড়ীতে উঠে আয়।

—এই তো—আর এসে পড়েছি। সামনেই তো ডাঙ্গাটা। ডাঙ্গাতে এ আপদ থাকবে না।

সামনেই মস্ত বড় উঁচু টিলা। টিলার ওপারেই চালের উপর গলাইচণ্ডী ঢুকবার মুখেই রামহরির বাড়ী। এখন আখড়া। সিধে লাল রাস্তা চলে গিয়ে বেঁকেছে। একজন সাইকেল আরোহী চলেছে। পাড়াগাঁয়েও আজ সাইকেল হয়েছে। দু'চারখানা পাওয়া যাবেই। মশায়ের জীবনে একসময় দুটো ঘোড়া এসেছিল—তারপর গরুর গাড়ীতেই যাত্রা শেষ করলেন।

প্রদ্যোতদের সঙ্গে পারবার তাঁর কথা নয়! হাসলেন ডাক্তার। প্রদ্যোত ডাক্তার নাকি মোটর কিনবে। অন্ততপক্ষে মোটর সাইকেল। চার ঘণ্টায় সদর বিশ মাইল পথ গিয়ে আবার ঘুরে আসবে। লোক ছুটে আসছে।

গাড়ী দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—শিগ্‌গির আসুন!

* * *

রামহরির বাড়ীর দরজায় ক'জন শুষ্কমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

জীবন ডাক্তার দেখে বা শুনে চকিত হন নি। হার্টফেল ক'রে মৃত্যু হয়ে থাকবে। বিস্মিত হবার কি আছে? ভিতরে শশী তাঁর পিছনে বসে ছিল, সে সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলে—কি হ'ল? বলি—হ্যাঁ—হে?

—আপনি যাওয়ার পর বার দুই দাস্ত ক'রে কেমন করছে—ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার এবার বিব্রত হলেন। তিনি তাঁর কল-বাক্সটাও সঙ্গে আনেন নি। অবস্থা শুনে প্রয়োজন বোধ করেন নি—শশীও বলে নি। রোগী যখন বেঁচে আছে তখন একটা দুটো ইনজেকশন দেওয়া যে তাঁর কর্তব্য। শশী এ সব বিষয়ে নিধিরাম সর্দার। ইনজেকশন দেয় বটে, একটা সিরিঞ্জ তার আছে, কিন্তু সূচগুলো তার নিজের বেশভূষা শরীরের মতই অপরিচ্ছন্ন। যে পকেটে তামাক টিকে থাকে—সে-পকেটেও সময়ে সময়ে বাক্স রাখতে

শশী দ্বিধা করে না। তার উপর ওষুধ শশীর থাকে না। ওষুধ না থাকলে শশী একটা শিশি থেকে এ্যাকোয়া নিয়ে অম্লান বদনে ইনজেকশন দিয়ে দেয়।

তবে অবশ্য এ ক্ষেত্রে শশীকে দোষ দিয়েই বা লাভ কি? আর—। আর রামহরি যখন এতটাই প্রস্তুত তখন ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যু খানিকটা বিলম্বিত করেই বা হবে কি? জ্ঞানগঙ্গা? নাই বা হ'ল!

মৃত্যু স্থির জেনে তাকে বরণ করতে চাওয়ার মত মনটাই সবচেয়ে বড়। নেহাতই যদি প্রয়োজন হয়, তবে মধুর অভাবে গুড় দিয়েই কাজ চলবে। তীর্থপুণ্য-বিশ্বাসী নামপুণ্য-বিশ্বাসী রামহরির চোখের সামনে দেবতার মূর্তি এবং নাম-কীর্তন তীর্থের অভাব অনেকটা পূরণ করবে। তা ছাড়া জ্ঞান-গঙ্গার মুক্তির কথা মানতে গেলে ভাগ্যের কথাটাও তো ভাবতে হবে, মানতে হবে? রামহরির সে ভাগ্য হবে কি করে?

সঙ্কল্প প্রায় স্থির করেই ঘরে ঢুকলেন—জীবন ডাক্তার। রামহরিকে কি বলবেন তার খসড়াও মনে মনে করে নিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে রোগীকে দেখেই তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে উঠলেন। এ কি? একখানা তক্তাপোষের উপর রামহরি শুয়ে আছে—নিস্পন্দের মত। বিবর্ণ পাণ্ডুর দেহবর্ণ। চোখের পাতায় যেন আকাশভাঙা মোহ। দুর্বলতার ঘোর তার পাণ্ডুর দৃষ্টিতে। ক্ষণে ক্ষণে চোখের পাতা নেমে আসছে। আবার সে মেলছে। মেললেও সে দৃষ্টিতে ঔৎসুক্য নাই, প্রশ্ন নাই, কিছু চাওয়া নাই। এ কি অবস্থা? সমস্ত মিলিয়ে এই অবস্থা তো কয়েকটা দাস্তের ফলে সম্ভবপর নয়। তাঁর বহু অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে এক নজরেই যে বুঝতে পারছেন—এ রোগী তিলে তিলে—এই অবস্থার উপনীত হয়েছে। ঘরের গন্ধে, রোগীর আকৃতিতে এবং লক্ষণে রোগ যে পুরাতন অজীর্ণ অতিসার—তাতে আর তাঁর সন্দেহ নাই। এ্যালোপ্যাথরা আজকাল একে বলবেন, ইন্‌টেস্টাইন্যাল টিউবারকিউলোসিস্। অণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ক্ষয়রোগের বীজও পাওয়া যাবে। ক্ষয়রোগ—ধীরে ধীরে ক্ষয় ক'রে মানুষকে। এ অবস্থা আকস্মিক নয়। অন্তত দুদিন তিন দিন থেকে এই অবস্থাতেই আছে, তিলে তিলে বেড়ে আজ এই অবস্থায় এসেছে।

শশী নিজেই একটা মোড়া এনে বিছানার পাশে রেখে—রামহরির মুখের কাছে ঝুঁকে ডেকেবললে—রাম—রাম! ডাক্তারবাবু এসেছেন। রাম!

—থাক, শশী। ওর সাড়া দিতে কষ্ট হবে! সরে আয়—আমি দেখি।

শশী উঠল—উঠেই আবার হেঁট হয়ে বললে—এখন আবার দলিলপত্র কেন-রে বাপু। একখানা দলিল সে তুলে নিলে বিছানা থেকে। দলিলটা বিছানায় পড়ে ছিল।

এবার এগিয়ে এল রামহরির তরুণী পত্নীর ভাইটি। উচ্চবর্ণের বিধবা ভগ্নী রামহরিকে বরণ করে তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে থাকলেও রামহরির এই অসুখে ভগ্নীর বিপদের সময় না-এসে পারে নাই। পনের কুড়ি দিন হ'ল এখানে এসে রয়েছে। সে বললে—উইল ওটা। ওর ইচ্ছে ছিল ডাক্তারবাবু এলে—তার সামনে—টিপছাপ দেবে, ডাক্তারবাবুকে সাক্ষী করবে, তা হঠাৎ এই রকম অবস্থা হ'তে বললে—কি জানি যদি ডাক্তারবাবু আসবার আগেই কিছু হয়! বলা তো যায় না! বলে নিজে উইল নিয়ে বুড়ো আঙুলের টিপ দিলে, সাক্ষীদের সই করালে; তারপর দেখতে দেখতে এই রকম।

মাথার কাছে একটি তরুণী মেয়ে বেশ ঘোমটা টেনে বসে ছিল। সে গুণ গুণ ক'রে কেঁদে উঠল। ডাক্তার তার দিকে চাইলেন একবার। তারপর নাড়ী ধরে চোখ দুটি বন্ধ করলেন। ক্ষীণ নাড়ী, রোগীর মতই দুর্বল—মন্দ গতিতে বয়ে চলেছে, যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ওকে চলতেই হবে। থামবার অবকাশ নাই, অধিকার নাই, উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে যেন কাঁপছে; চন্দ্রে গ্রহণ লাগলে—চাঁদ যেমন কাঁপে—তেমনি কম্পন। মৃদু এবং অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি-সাপেক্ষ! অন্ত্রের মধ্যে যে ক্ষয়রোগের কীট অহরহ গ্রাস করে চলেছে, রেশম কীটের তুঁত পাতা খাওয়ার মত—তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে আপাত মৃত্যু লক্ষণ তিনি অনুভব করতে পারলেন না।

স্টেথেসকোপ দিয়ে হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করলেন। এ অবস্থা কোন মতেই আকস্মিক পরিণতি হতে পারে না। নাড়ীর গতির সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডের সঙ্গতি—ঠিক যেন মিত্রভাবাপন্ন যন্ত্রী ও বাদকের মত! দুর্বল হলেও সঙ্গত তো ব্যাহত হচ্ছে না!

ওদিকে শশী অনর্গল বকছিল, এ সব হ'ল খলব্যাধি। হঠাৎ দাস্ত হ'ল শ্বাস গেল, নাড়ী গেল। রোগী চোখ মুদল। আমি আজ সাত

দিন থেকে বলছি—ওরে বাপু যা ব্যবস্থা করবার ক'রে ফেল। গঙ্গাতীর যাবি তো চলে যা। ডাক্তারবাবুকে দেখাবি তাই ডাকি। তা রোজই বলে—কাল। নিত্য কালের মরণ নাই, ও আর আসে না। ভদ্রলোকের এককথা—কাল। নে, হ'ল তো?

মেয়েটি আবার কাঁদতে লাগল।

শশী আবার বকতে সুরু করলে।—হবে কেন? ভাগ্যে থাকলে তো হবে? কর্মফল কেমন দেখতে হবে? গঙ্গায় সজ্ঞানে মৃত্যু, এর জন্যে তেমনি কর্ম চাই। আমাদের বলে—চিকিৎসকেই বা কি করবে—হোক না কেন ধন্বন্তরী—নীলরতন বাবু কি ডাক্তার রায়? আর ওষুদেই বা কি করবে—সে হোক না কেন সুধা—আর দশ বিশ টাকা দামের টাটকা তাজা ওষুদ; আয়ু না থাকলে—কিছুতেই কিছু না। এও তেমনি ভাগ্য—কর্ম। সুগতি হলে কি হবে, মতিভ্রম ঠিক সময়ে এসে সুগতির ব্যবস্থা সব পাল্টে দেবে।

ডাক্তার উঠলেন। দেখা তাঁর শেষ হয়েছে।

এবার মেয়েটি এসে পায়ে আছড়ে পড়ল—ওগো ডাক্তারবাবু গো! আমার কি হবে গো!

ডাক্তার একবার সবারই মুখের দিকে চাইলেন। তারপর বললেন—ভয় নাই, ওঠ তুমি ওঠ। ওঠ।

শশী ব্যস্ত হয়ে বললে—ওঠ, ওঠ। উনি যখন বলেছেন ভয় নাই তখন কাঁদছ কেন? উনি দু কথার মানুষ নন! ওই হয়েছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। সর সর। ওঠ!

বাইরে এলেন ডাক্তার। এবার তাঁর সর্বাগ্রে চোখে পড়ল—সাইকেলখানা।

ডাক্তার ডাকলেন—শশী।

শশী বকছিল—হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই হবে ওঁর মত মানুষ উনি কি দেখবেন যে ওই অবলাটা ভেসে যাবে? ভাল ঘরের মেয়ে সৎ জাতের কন্যা, মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম—মতিভ্রমের বশে যা করেছে তার ফল শাস্তি সে ভগবান দেবেন। আমরা মানুষ—আমরা ওকে ভেসে যেতে দোব না। বাস।

ডাক্তার ডাকবার আগেই ক্রমশঃ তার স্বর নিস্তেজ হয়ে আসছিল। এবার স্তব্ধ হয়ে গেল।

—ওকে মেরেই ফেলেছিস শশী? ইচ্ছে করে? না জানিস নে, বুঝতে পারিসনি?

—আজ্ঞে?

—এ অবস্থা তো আজ তিনদিন থেকে হয়েছে। বুঝতে পারলি নে তো ডাকলিনে কেন?

—আজ্ঞে না! মা কালীর দিব্যি।

—শশী! ধমক দিয়ে উঠলেন জীবন ডাক্তার!

—মাইরী বলছি, ঈশ্বরের দিব্যি, গুরুর দিব্যি—

এবার মৃদুস্বরে ডাক্তার বললেন—তোদের ক'জনকে পুলিশে দেওয়া উচিত। থাম—চেঁচাস নে। যাক এখন শোন, ওই যে ছোকরা সাইকেল চেপে আমাদের গাড়ী দেখতে গিয়েছিল, সে কই? এই যে! ওহে ছোক্‌রা শোন। কই দোয়াত কলম দেখি। আমি লিখে দিচ্ছি ওষুধ। যাও, নিয়ে এস বিনয়ের দোকান থেকে। আর বাজারের ডাক্তার হরেনবাবুকে এই চিঠি দেবে। বুঝেছ? জলদি যাবে আর আসবে।

শশীকে দমানো যায় না। শশী ওই শক্তিতেই বেঁচে আছে। সে ছোকরার হাত থেকে প্রেসক্রিপশন এবং চিঠি দুই নিয়ে দেখলে। বললে গ্লুকোজ ইনজেকশন দেবেন? ইণ্টারভেনাস?

—হ্যাঁ! তা হলেই এতটা ঘোর কাটবে। তার আগে মকরধ্বজ দেব আমি।

—ঘোর কাটবে?

—হ্যাঁ। রামহরির রোগটা মৃত্যু-রোগই বটে। এতেই যাবে। তবে মৃত্যু-লক্ষণ এখনও হয়নি।

—হয়নি? আপনি ইনজেকশন দেবেন তো?

—হরেন ডাক্তারকে আসতে লিখলাম। সে দেবে। না আসে আমিই দেব।

—যদি মরে যায়?

—সে আমি বুঝব শশী। আমার মনে হচ্ছে রামহরি এখন বাঁচবে। অন্ততঃ মাস দেড়েক। তখন উইলটুইল যা করবার করবে। আমি বরং সাক্ষী হব। উইলটার জন্যেই রামহরির মাথা তুলে দাঁড়ানো দরকার।

শশী চুপ করলে এবার।

ডাক্তার আবার বললেন—উইলে কি আছে জানি না। এই শেষ পরিবারকেই এক রকম দানপত্র করেছে সব এই তো ?

একটু চুপ ক'রে ঘাড় নেড়ে বললে—সে তো হবে না শশী! রামহরির অভিপ্রায় জানতে হবে আমাকে। তার প্রথম পক্ষের ছেলে ছিল—সে মারা গেছে। কিন্তু তার ছেলে—রামহরির নাতি আছে; পুত্রবধূ আছে। সে তো হবে না। বাঁচবেই মনে হচ্ছে। কিন্তু তার জন্যও চিকিৎসা প্রয়োজন। চেষ্টা করতে হবে। করব আমি তা'।

রামহরি এই জ্ঞানগঙ্গা যেতে চেয়েছিল ?—হাসলেন ডাক্তার!

(বাইশ)

দিন পঁচিশেক পর।

মশায় এবং সেতাব দাবায় বসেছেন। ভাদ্র মাস—আকাশ এরই মধ্যে এবার নির্মেঘ নীল; অনাবৃষ্টির বর্ষা শেষ হয়েছে—প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে এবং এই এক সপ্তাহের মধ্যেই মাঝ-শরতের আবহাওয়া ফুটে উঠেছে আকাশে মাটিতে। আজ দাবা খেলার আসরও জমজমাট। সতরঞ্চির পাশে দুখানা থালা নামানো রয়েছে, চায়ের বাটি রয়েছে। জন্মাষ্টমী গিয়েছে—আতর বউ আজ তালের বড়া করেছেন—একটু ক্ষীরও করেছেন—সেই সব সহযোগে চা পান করে দাবায় বসেছেন। মশায় অবশ্য খান নি! অসময়ে তিনি কোন কালেই খান না। চা অবশ্য খান। ডাক্তারী শেখার পর ওটা সেকালে অভ্যাস করেছিলেন; লোককে কিছু খেয়ে চা খেতে উপদেশ দিলেও নিজে বিকেল বেলা খালি পেটেই চা খেয়ে থাকেন। খেতে তাঁর বেলা যায়—ক্ষিদে থাকে না একটা কারণ বটে, কিন্তু আসল কারণ অন্য। সন্ধ্যার পর অর্থাৎ দাবা খেলা অন্তে—সে সাতটাই হোক আর নটাই হোক আর বারোটাই হোক; মুখ হাত ধুয়ে কাপড় চোপর ছেড়ে ইষ্ট স্মরণ ক'রে তবে আহার করেন। পরমানন্দ মাধব!

আতর বউয়ের মেজাজ আজ ভাল আছে। গত কাল জন্মাষ্টমীর উপবাস করেছিল—আজ সেতাবকে নিমন্ত্রণ ক'রে দুপুরে ভোজন করিয়েছে; বিকেলে জলযোগ করিয়েছে। এবং, সেতাবের ভোজন-বিলাসিনী স্ত্রীর জন্য তালের বড়া ক্ষীর বেঁধে দিয়ে খুব খুশিমনেই আছে। শুধু ব্রাহ্মণ-ভোজন নয়, দম্পতি-ভোজন করানো হয়ে গেল। ব্রত উপবাস করলে আতর বউ ভাল থাকে। বোধ করি পরলোকের কল্পনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আয়োজনও ভাল ছিল। অভিযোগ করতে পার নি আতর বউ। মশায়ের পরমভক্ত পরাণ খাঁকে ডাক্তার কয়েকটি ভাল তালের কথা বলেছিলেন, খাঁ একঝুড়ি খুব ভাল এবং বড় চার আঁটি তাল পাঠিয়ে দিয়েছিল। এবং রামহরি লেটের বাড়ী থেকে এসেছিল একটি ভাল 'সিধে'; মিহি চাল—ময়দা—কিছু গাওয়া ঘি—কিছু দালদা—তেল তরিতরকারী এবং একটা মাছ। রামহরি সেই মরণাপন্ন

অবস্থা থেকে বেশ একটু সেরে উঠেছে। রামহরির পুত্রবধূ পৌত্র ফিরে এসেছে, তারাই সেবা শুশ্রূষা করছে। তাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। রামহরির মেজাজ অবশ্য খুবই খিটখিটে—তার সবটাই সে শশীর উপরে শব্দভেদী বানের মত চালায়। শশী আর ও মুখেই হাঁটে না কিন্তু খিটখিটে মেজাজের মধ্যেও রামহরি মশায়কে দেখে সজল চোখে বলে—বাবা আর জন্মে আপনি আমার বাপ ছিলেন!

সিধেটা বোধ করি সেই সম্বন্ধ ধরেই পাঠিয়েছে রামহরি। নইলে এ কালে চিকিৎসককে উপঢৌকন কি সিধে পাঠানো উঠে গিয়েছে। একালে নগদ কারবার। বুড়ো রামহরি পূর্ব জন্মের বাপের বন্দনা করেছে। মশায় হেসে শশীকে বলেছিলেন—শশী তা হ'লে কাকা ছিল—না কি বলিস? তোকে তো পথে বসিয়েছিল! এঁ্যা?

রামহরিও হেসেছিল। মশায় বলেছিলেন—দেখ—তোর আর জন্মের বাবা হয়ে যদি তোর উপর এত মায়া—তবে তোর এই জন্মের বেটার নাতির উপর কি এত বিরূপ হওয়া ভাল? তবে একটা কথা বলব বাবা। তুমি সেরে এখন উঠলে বটে—কিন্তু এ রোগ তোমার একেবারে ভাল হবে না। সাবধানে থাকবে। বুঝেছ! উইলটুইল যদি কর—তবে ক'রে ফেলো। আর একটি কথা, যে মেয়েটিকে তুমি শেষে মালাচন্দন করেছ তাকেও বঞ্চিত ক'র না।

রামহরির এই তরুণী স্ত্রীটিও এর মধ্যে খিড়কীর পথে আতর বউয়ের কাছে এসে ধর্ণা দিয়েছিল। পরামর্শ যে শশীর তাতে মশায়ের সন্দেহ নাই। বোধ হয় কিছু প্রণামীও দিয়ে গিয়ে থাকবে। বোধ হয় নয়, আতর বউ যখন ওকালতী করেছে তার জন্যে তখন নিশ্চয় নিয়েছে। মশায় এ নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু কোন প্রশ্ন করেন নি। তিনি নিজেই রামহরিকে এ কথা বলেছেন। আতর বউ যা ক'রেছে তার দায়িত্ব তার নিজের। তবে স্বামীকে যদি স্ত্রীর পাপের ভাগ নিতে হয় নেবেন; ইহলোকে আতর বউ-এর বুকে অগ্নিদাহের জ্বালার উত্তাপ জীবন ভোর সইতে পারলেন, পরলোকে আর পাপের ভাগের বোঝা বইতে পারবেন না?

খুব পারবেন!

হুঁকোটা হাতে ধরেই সেতাব চাল ভাবছিল।

মশায় বললেন—ও বাবা নো হরি ব্রহ্মা ন চ শঙ্কর! ওর নিদান হেঁকে দিয়েছি মাণিক। তিন চাল। তিন চালেই তোমার মন্ত্রী অকস্মাৎ গজের মুখে পড়ে কাত। মশায় সেতাবের মন্ত্রীকে নিজের গজের মুখে চাপা দিয়ে রেখেছেন। এদিকে কিস্তী দিয়েছেন। সেতাব ভাবছে।

মশায় সেতাবের হুঁকো থেকে কল্কেটা ছাড়িয়ে নিয়ে টানতে সুরু করলেন। তামাকটা কেন পোড়ে মিছিমিছি। সেতাব বল ফেলে দিয়ে—কল্কের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—দে! তোর পড়তা ভাল আজ।

মিথ্যে বলে নি সেতাব। মশায় আজ পর পর দু'বাজী জিতলেন। সেতাব কঠিন খেলোয়াড়। ওর সঙ্গে জেতা কঠিন। প্রায়ই চটে যায় বাজী। এক-শো বাজীর নব্বুই বাজী চটে যায়—দশ বাজীতে হার জিত হয়। সে-ও সমান সমান।

কঠিন রোগী থাকলে মশায় অনেক সময় খেলতে বসবার আগে ভাবেন—আজ যদি সেতাব হারে তবে রোগকে হারতে হবে; সেরে উঠবে রোগী। সঙ্গে সঙ্গেই হাসলেন। নাড়ী দেখার অনুভূতি মনে পড়ে যায়। ও মিথ্যা হয় না। হবার নয়। রোগের কথাই মাথায় ঘুরতে থাকে। যন্ত্রচালিতের মত খেলে যান, সেতাব একসময় বলে ওঠে—মাত্।

সেতাব তামাক খেয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলে—তোর পড়তা ভাল, সত্যিই ভাল জীবন। রামহরিকে তুই যা বাঁচালি! খুব বাঁচিয়েছিস। সত্যি কথা বলতে কি—আমার ভাই খুব ভাবনা হয়েছিল। তোকে ভালবাসি। খারাপ কথা শুনলে কষ্ট হয়। শশে তো তড়পাচ্ছিল। হরেন পর্যন্ত বলেছিল—জ্যাঠামশায়, এটা আবার কি করলেন জীবন মশায়? জোর গলায় হেঁকে বসলেন—রামহরি বাঁচবে। এতো ঠিক হয় নি। শশী অবিশ্যি অন্যায়—এমন কি—আদালতে সাজা হওয়ার মত অপরাধ করেছে কিন্তু ওই অবস্থা থেকে রামহরি বাঁচবে বলে তো মনে হয় না। ও দিকে প্রদ্যোত ডাক্তার মুখ বেঁকিয়ে হাসছে সব শুনে। তা—খুব রক্ষা হয়েছে! দেখিয়েছিস একটা চিকিৎসা!

জীবন মশায় বললেন—পরমায়ু পরম ঔষধি সেতাব। রামহরের আয়ু ছিল। সারাটা জীবন কুস্তী কসরত করেছে—সেও এক ধরণের যোগ।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের তফাৎ আছে। ওর সহ্যশক্তি কত! সেইটে-ই বিচার করেছিলাম আমি! বেঁচেছে ও নিজেই। শক্তিই হ'ল আয়ুর বড় কথা। রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে কি ওষুধ, করে জীবনীশক্তি, আয়ু।

সেতাব হেসে বললে—হ্যাঁ—তা হলেও হাতযশটা তো তোমার বটে। সে তোমার চিরকাল আছে। নতুন ছক সাজাতে লাগল সেতাব।

ডাক্তার হাসলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর কপালের দুপাশে রগের শিরা দুটো মোটা হ'য়ে ফুলে উঠল। ক্ষোভে থমথমে হয়ে উঠল স্থবির মুখখানা।

আজ আর সে হাতযশের কথা উপকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নূতন কালের ছোকরারা হাসে। ডাক্তারেরা হাসে মুখ বেঁকায়। যারা ডাক্তার নয় ইংরিজীনবীশ হাল আমলের তরুণ, তারাও হাসে। বলে— বায়ু পিত্ত কফ্! জীবন মশায়ের মধ্যে মধ্যে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হয়, ক্রোধও হয়—কিন্তু আত্ম-সম্বরণ করেন তিনি! ওরা নেহাতই পোষা পাখীর মত বুলি বলে। কিন্তু ডাক্তারেরা? তারাও তাকে বলে—ওল্ড ফসিল। ওর মানেটা জেনেছেন জীবন মশায়, রতন বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আসল মানে—বহুকাল আগে মাটিতে চাপা পড়া জৈব দেহ। কিন্তু ওরা যে অর্থে ব্যবহার করে সে হল—বৃদ্ধ জরদ্গব। বিশেষ ক'রে প্রদ্যোত ডাক্তার। মতির মায়ের এবং দাঁতু ঘোষালের কেস নিয়ে ব্যঙ্গ ক'রে ওই কথা বলে। শুধু তাই নয়। বলে—নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন!

প্রদ্যোতের এই কথায় আশ্রয় পেয়ে রামহরির রোগ নিয়ে শশীও প্রথমটা খুব লাফালাফি করেছিল! সেই প্রথম দিনই সে রামহরির ওখান থেকে এক-রকম পালিয়ে এসে মদ্যপান ক'রে সারা নবগ্রামের প্রতি ডাক্তারখানায় চীৎকার করে বেড়িয়েছিল—আমি তো তবু কম্পাউণ্ডার। বর্ধমানে রীতিমত পাশ ক'রে এসেছি। ওটা যে হাতুড়ে! পুঁজি তো রঙলাল ডাক্তারের খান-কতক প্রেসকৃপশন আর বাপ পিতামহের মুষ্টিযোগের খাতা! আর নাড়ী ধ'রে চোখ উল্টে—খানিকক্ষণ আঙুল তুলে টিপে—তারপর বায়ু পিত্ত কফ। মনে হচ্ছে দশ দিন। না হয় ঘাড় নেড়ে—তাই তো,—এই বলা! রামহরিকে বাঁচাবে! কই বাঁচাক দেখি! তাও তো গ্লুকোজ ইনজেকশন দিতে হয়েছে

ডাক্তারকে ডাকতে হয়েছে! আসল কথা রামহরির টাকা—বিষয়! সব সব বুঝি বাবা, সব বুঝি। রামহরে তো হরে হরে করবে, এখন বাঁচবে বাঁচবে রব তুলে ইন্‌জেকশন, ওষুধ, ফী, গাড়ী, ভাড়া, হেনো তেনো গোলযোগ বাধিয়ে পঞ্চাশ একশো দেড়শো যা মেলে—তাই বুড়োর লাভ। এ আর কে না বুঝবে! আমার নামে তো যা তা বলেছে। কিন্তু গোঁসাইকে—চণ্ডীতলার গোঁসাইকে—কে মারলে? উনি নন? আগের দিন রাত্রে এক ডোজ অসুখে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। সকালে ভাল রইল। উনি গিয়ে ফুস মন্তর দিয়ে এলেন—সন্ধ্যেতে যাবেন। ওষুদবিষুধ আর খাবেন না। সারাদিন ওষুধ না-পড়ে বিকেলে আবার দাস্ত হল। হবেই তো। বাস্। নিদান সার্থক হয়ে গেল।

চণ্ডীতলার মহান্ত সেইদিন সন্ধ্যার পরই দেহ রেখেছেন।

গলাইচণ্ডী থেকে ফিরবার পথে চণ্ডীতলায় এসে জীবন মশায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

সেদিনের দিনটি তাঁর বড় ভাল গিয়েছে। বড় ভাল। শুধু একটি কাঁটা মনের মধ্যে খচখচ করছে। সেটি ওই দাঁতু ঘোষালের স্মৃতিটুকু। নইলে সব পরিচ্ছন্ন-প্রসন্ন এবং পুণ্যময়। হ্যাঁ পুণ্যময়ই বলবেন। রামহরিকে বাঁচাতে পেরেছেন—শশীকে তিরস্কার করেও ক্ষমা করেছেন। রামহরি দুষ্ট লোক—তবুও তাঁর কর্তব্য তিনি করতে পেরেছেন—রামহরির পৌত্রকে কুটিল বঞ্চনা থেকে রক্ষা করেছেন। শুধু তাই নয়, রতনবাবুর ছেলে বিপিনের হিক্কা থেমে গেছে সেই দিন; থেমে বিপিন সুস্থ হয়েছে খানিকটা। খবরটা সে দিন ওই গলাইচণ্ডীতে ব'সেই পেয়েছিলেন।

গলাইচণ্ডীতে হরেনকে আনিয়ে রামহরিকে ইনজেকশন দিইয়েছিলেন। ইনজেকশন দেবার আগে একটু ভয় পেয়েছিল হরেন—এই অবস্থায় ইনজেকশন? তার থেকে রেক্‌টাল গ্লুকোজ দেওয়া ভাল মশায়।

কি যে একটা চিত্তবল পেয়েছিলেন তিনি—দৃঢ়চিত্তে বলেছিলেন—আমি বুড়ো হয়েছি হরেন, হাত ভারী হয়েছে—তার উপর দৃষ্টি একটু কমেছে

বই কি। নইলে আমিই দিতাম। আমি বলছি—তুমি দাও। আমি দায়ী হব হে। ভয় নেই তোমার।

হাতখানা আর একবার দেখেছিলেন—মকরধ্বজের উষ্ণতা এবং শক্তি তখন শরীরে কাজ করেছে। হাত নামিয়ে বলেছিলেন—দাও তুমি।

ইনজেকশন শেষ ক'রে হরেন হাত ধুয়ে রোগীর অবস্থা দেখে হাসিমুখেই বলেছিল—এইটি আপনার অদ্ভুত মশায়! অদ্ভুত!

জীবন মশায় হেসেছিলেন। আর কি করবেন? কথায় উত্তরই বা কি দেবেন।

হরেন বলেছিল—জানেন তো, বিপিন বাবুর হিক্কা থেমে গেছে? উঃ ভদ্রলোকের এই হিক্কা দেখে আমি তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আজ চার রাত্রি ঘুমুতে পারেন নি, পেটে খাদ্য থাকে নি। আমি আসবার আগে দেখে এলাম ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছেন। প্রদ্যোত ডাক্তারও এসেছিল। সেও বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছে। গম্ভীর হয়ে বললে—এ বিষয়ে এখনি কিছু বলতে পারি নে। আবার আরম্ভ হতে পারে, এবং এ ওষুধের রি-এ্যাকশন আছে; তবে এখন অবশ্য ক্রাইসিসটা কাটল বটে। তা বললেও আমরা তো বুঝেছি! বেশ আশ্চর্য হয়েছে প্রদ্যোত ডাক্তার। আসতে আসতে পথে বললে—বৃদ্ধের ব্যাপার ঠিক আমি বুঝিনে। এ ব্যাপারটায় আমার সন্দেহ হচ্ছে কেন জানেন—? আজ আবার একটা ডিসপেপসিয়ার রোগী—অবশ্য একটু শক্ত ধরণের বটে—তাকে বলেছে তুই আর বাঁচবি নে। কত দিনের মধ্যে যেন মরবে বলেছে। হরেন এবার মশায়ের দিকেই তাকিয়ে তাঁকেই প্রশ্ন করেছিল—তাই বলেছেন না কি?

জীবন মশায় হরেনের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরেই বলেছিলেন—আমি ভুল বলিনি বাবা হরেন। দাঁতু এই রোগেই মরবে। এই রোগই মৃত্যুরোগ হয়ে উঠবে। দাঁতুর এ রোগের সঙ্গে ওর প্রধান রিপুর যোগাযোগ হয়েছে। ঘরে আগুন লাগলেই সব ঘরটা পুড়বে তার মানে নাই, জল ঢাললে নিভতে পারে, নেভেও। কিন্তু আগুনের সঙ্গে বাতাস যদি সহায় হয় বাবা তবে জলের কলসী ঢাললে নেভে না, বাতাস আগুনের আঁচের ঝাপটায় ভিজে চাল শুকিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে। দাঁতুর রোগ উদরাময়—তার সঙ্গে

ওর লোভ রিপু হয়েছে সহায়; সহায় কেন? ওটা এখন রোগের অঙ্গ উপসর্গে পরিণত হয়েছে। আমার বাবা বলতেন—

জগত মশায় বলতেন—বাবা সংসারে মানুষ সন্ন্যাসীদের মত শক্তি না পেলেও সব রিপুগুলিকে জয় করতে না পারলেও গোটা কয়েককে জয় করে। কেউ দুটো কেউ তিনটে কেউ কেউ পাঁচটা পর্যন্তও জয় করে। কিন্তু একটা—।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—পারেনা। একটা থেকে যায়। ওইটেই হল দুর্বল প্রবেশ পথ। মৃত্যুবাহিনী ওই দ্বারপথেই মানুষের দেহে প্রবেশ করে। তার উপর বাবা যে দরজার রক্ষক সে যদি সেধে দরজা খুলে ডাকে তবে কি আর রক্ষা থাকে হরেন? রক্ষক তখন রিপু। প্রবৃত্তি তো খারাপ নয় বাবা। সংসারে প্রবৃত্তিই তো রুচি। প্রবৃত্তি যতক্ষণ সুরুচি ততক্ষণ সে রক্ষক। এই খাওয়ার ব্যাপারেই ধর, প্রবৃত্তি যতক্ষণ সুরুচি ততক্ষণ কুখাদ্য মানুষ খায় না, পেট ভরে গেলে সুরুচি তখন বলে—আর না। তৃপ্তিতে তার নিবৃত্তি আসে। আর প্রবৃত্তি যখন কুরুচি হয়—তখন সেই শত্রু, সেই রিপু। তখন তৃপ্তি তার হয় না; নিবৃত্তি তখন পালায়। তাই রিপুর যোগাযোগে যে রোগ হয় সে রোগ অনিবার্য রূপে মৃত্যুরোগ।

হরেন ডাক্তার চুপ ক'রে শুনেই যাচ্ছিল। মাটির দিকে চোখ রেখে পথ চলছিল। কথাগুলি শুনতে মন্দ নয়। অস্পষ্ট বা ভাবালুতা-মেশানো যুক্তি হলেও অসঙ্গত মনে হচ্ছিল না। কিন্তু এত বড় বিজ্ঞান পড়ে এসে এ সব কি পুরো মানা যায়? তবুও পাড়াগাঁয়ের ছেলে সে, বাল্যকালের সংস্কারে ঠিক এরই একটা চাপাপড়া স্রোত ভিতরে ভিতরে আছে; সেই মজ্জাখাতের চোরাবালিতে এই ভাবধারা বেমালুম শুষে যাচ্ছিল—মিশে যাচ্ছিল। এবং জীবন মশায়ের মত প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক করতেও তার অভিপ্রায় ছিল না।

হরেনের নীরবতায় কিন্তু জীবন মশায় উৎসাহিত বোধ করছিলেন। তিনি কয়েকটা গল্পও করেছিলেন।—ওই দেখনা বাবা রাণা পাঠককে। এতবড় শক্তি। একটা দৈত্য। রিপু হল কাম। বুঝেছ, ওর প্রমেহে চিকিৎসা করেছি, উপদংশ হয়েছে কয়েকবার, আমি কাটোয়ার মণিবাবু ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি—এবার যক্ষা হয়েছে।

বললে একটি মেয়েছেলের কাছ থেকে ধরিয়েছে। তার মানে মেয়েটাকে যক্ষ্মারোগী জেনেও নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি।

এবার হরেন মৃদু হাস্য করেছিল।

জীবন মশায় কিন্তু বলেই চলেছিলেন—তোমরা দেখ নি -নাম নিশ্চয় শুনেছ। মস্ত বড় কীর্তন গাইয়ে। সুন্দর দাস গো! নামেও সুন্দর, কাজেও সুন্দর, রূপে সুন্দর, গানে সুন্দর—লোকটিকে দেখলে মানুষের চোখ জুড়োত, মন সুন্দর হয়ে উঠত। লোকে বলত—সাধক। তা সাধনা লোকটার ছিল। নির্লোভ, অক্রোধ, মিষ্টভাষী, বিনয়ী—মোহ মাৎসর্য এও ছিল না; শুধু কাম। কামকে জয় করতে পারেন নি। শেষ জীবনে তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন—পঙ্গু হলেন। লোকে বললে—কোন সাধনা করতে গিয়ে এমনটা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ছিল তাই। কিন্তু গুরু রঙলাল ডাক্তারের কাছে যখন ডাক্তারি শিখছি তখন একদিন যে কথা তোমাকে বললাম—এই কথাই বললেন রঙলাল ডাক্তার—যেন আমার পিতৃ-পুরুষের কথার প্রতিধ্বনি করেই বললেন—জীবন, কথাটা তুমি হয় তো সত্যিই বলেছ হে। সুন্দর দাসকে দেখতে গিয়েছিলাম। মারা গেছে এই তো কিছুদিন। কিন্তু ওর কথাটা প্রায়ই মনে হয়। কখনও ওই বোষ্টম কীর্তনীয়াদের উপর রাগ হয়—কখনও কিছু। লোকটা অসহায় ভাবে রিপুর হাতেই মরেছে হে। ও পাগল হয়েছিল—উপদংশ বিষে, প্রমেহ বিষে।

মশায় আবার একটু থেমে বলেছিলেন—দেখ না বাবা, রতনবাবুর ছেলে বিপিনের কেস। বাবা, এখানেও সেই রিপুর যোগাযোগ। এক রিপু বাবা মাৎসর্য। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি যার নাই সে কি মানুষ বাবা? কিন্তু সে যখন রিপু হয় তখন কি হয় দেখ! আহারে-বিহারে, আচারে-আচরণে কোথাও অনিয়ম নাই লোকটির। শুধু প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা ক'রে বিপিন এমনি ছুটেছে যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। এ তো মানবেই যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে হয়েছে! এবং এত শ্রম করার কোন হেতু তার ছিল না। অর্থ উপার্জন করেছে কিন্তু অর্থগৃধ্নু নয় বিপিন। কতজনের কত মামলা এমনি করেছে! বিশ্রাম নেয় নি। ডাক্তারে বলেছে নিজে বুঝেছে কিন্তু মানতে পারে নি। একেই বলে রিপু।

চকিত হয়ে হরেন প্রশ্ন করেছিল—তা হ'লে বিপিনবাবু সম্পর্কে আপনি ?

প্রশ্নটা সে সম্পূর্ণ উচ্চারণ করতে পারে নি।

—না। সে কথা ঠিক বলি নি আমি। তবে বাবা—অত্যন্ত কঠিন—অত্যন্ত কঠিন।

—আজ তো ভালই আছেন। আমার ভালই লাগল। হিক্কাটা থেমে গেছে। সুস্থ হয়েছেন ঘুমুচ্ছেন।

—ভালই থাক। ভাল হ'য়েই উঠুক। কিন্তু ভাল হয়ে উঠেও তো ভাল থাকতে পারবে না ও হরেন। আবার পড়বে। প্রবৃত্তি রিপু হয়ে দাঁড়ালে তাকে সম্বরণ করা বড় কঠিন।

—এ যাত্রা তা হলে উঠতে পারেন বলছেন ?

—তাও বলতে পারছি না বাবা। মাত্র তো দুদিন দেখছি। তার উপর মন চঞ্চল হচ্ছে। রতনকে দেখছি। বিপিনের ছেলেকে দেখছি, বুঝেছ, ওই ছেলেটিকে দেখে বনবিহারীর ছেলেকে মনে পড়ে গেল।

ডাক্তার দীর্ঘ নিশ্বাসও ফেললেন—আবার হাসলেনও। এবং হঠাৎ বললেন—চণ্ডীতলায় যাব একবার। আসবে না কি ? মহান্ত আজ যাবেন। একবার দেখে যাই। আজ রাত্রেই যাবেন।

চণ্ডীতলায় ঢুকে মহান্তকে দেখে বলেছিলেন—হরেন, তুমি যাও। আমি থেকেই গেলাম।

মহান্ত তখন আবার বার তিনেক দাস্ত গিয়ে—অবসন্ন হয়ে পড়েছেন, আঙুলের ডগাগুলি ঠাণ্ডা হয়েছে, চোখের পাতা নেমে এসেছে একটা গভীর আচ্ছন্নতার ভারে। মধ্যে মধ্যে মুখ বিকৃত করছেন,—একটা যেন যন্ত্রণা হচ্ছে, নিষ্ঠুর যন্ত্রণা।

হরেন বলেছিল—বলেন তো একটা ইনজেকশন দিই।

মশায় বলেছিলেন—চিকিৎসক হয়ে আমি নিষেধ করতে পারি !

মহান্তের শিষ্য বলেছিল—বাবার নিষেধ আছে। তিনি বারবার নিষেধ করেছেন—সূই কি কোন ইলাজ যেন না-দেওয়া হয়। মশায় বলেছে আজ ছুটি মিলবে। ছুটি চাই আমার। ইয়ে শরীর বিলকুল রদ্দি হো গয়া।

সন্ধ্যার পরেই গিয়েছেন মহান্ত।

দীর্ঘকাল পরে জীবন মশায় নাম গান ক'রেছেন—খোল-করতালের সঙ্গে।

* * * * *

সেতাবের সঙ্গে দাবায় বসে কথা উঠে এমনই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন জীবন মশায় যে, এ দানটায় হেরেই গেলেন তিনি। খপ ক'রে দাবাটাই মেরে বসল সেতাব! বললে—এই বার!

তাই বটে। এই বারই বটে। বাঁকা পায়ে আড়াইপদ আড়ালে অবস্থিত একটা ঘোড়ার জোরে একটা বড়ের অগ্রগমন সম্ভাবনা তিনি লক্ষ্য করেন নি।

সেতাব হেসে বললে—দেখবি না কি?

ছকের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে মশায় বললেন—না। সবটাই এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। তুই কথা তুলে মনটা চঞ্চল ক'রে দিলি। নন্দরে, তামাক দে তো বাবা! আর একবার চা করতে বল। খেয়ে উঠি। দেরী হলে সে বুড়ী আবার পঞ্চ-উপচার সাজিয়ে বসবে।

অর্থাৎ রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা শুরু করবে। গৃহিণীর খাওয়ার আয়োজন সেতাবের পক্ষে প্রায় বিভীষিকা। যাবার পথে তাঁকে দোকান থেকে দালদা কিনে নিয়ে যেতে হয়। যা হোক্ কিছু রসনা তৃপ্তিকর তৈরী করেন তিনি। সেতাব উপলক্ষ্য। নিজেই সেতাব মধ্যে মধ্যে বলেন—বুঝলি জীবন—এ সেই ঝোল কইয়ের ব্যাপার! সেই যে একজন জোলা ঝোলটা কই মাছ কিনে এনে বউকে বলেছিল—ভাল ক'রে রান্না কর, বেশ পেঁয়াজ গরম মশলা দিয়ে—মাখো-মাখো ক'রে ঝোল রেখে, লঙ্কা বাটা দিয়ে—যেন জিভে দিলেই পরাণটা জুড়িয়ে যায়। বউ রান্না করতে লাগল—জোলা মাকু ঠেলতে বসল ঘরে। একটি করে ছ্যাঁক শব্দ উঠল—আর জোলা একটি ক'রে দাগ কাটলে মাটিতে। তারপর ছ্যাঁক শেষ হতেই উঠে গিয়ে বসল—দে খেতে। বউ খেতে দিলে কিন্তু একটি কই মাছ।

—এ কি, আর গেল কোথায়?

—একটা মাছ বেড়ালে খেয়ে গেল।

—তা হলেও তো পনেরোটা থাকে।

—খপ ক'রে গর্ত থেকে একটা ইঁদুর বেরিয়ে একটা নিয়ে গেল।

—চুটো গেল। বাকী থাকে চোদ্দটা।

—ভূতে নিয়েছে দুটো। ওই সাওড়া গাছের ভূত মাছের গন্ধে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে—

—তাই গেল। তবু থাকে বারোটা।

—ভয়ে নড়ে বসতে গিয়ে হাতের ধাক্কায় দুটো পড়ল আগুনে।

সেতাব হাসেন আর বলেন—বুঝলি, এই ভাবে জোলার বউ হিসেব দিলে পনেরটা কই মাছের। সেগুলি উনোন শালে রান্না করতে করতে গুব্ গুব করে তিনি ভক্ষণ করেছেন। তারপর পনেরোটা মাছের যথা বিহিত হিসেব দিয়ে তিনি চেপে বসে বললেন—

'আমি যে ভালোমানুষের ঝি—
তাই এত হিসেব দি।
তুই যদি ভালোমানুষের পো—
তবে ন্যাজাটা মুড়োটা খেয়ে মাঝখানটা থো।'

বলে পরম কৌতুকে সেতাব হা-হা ক'রে হাসেন। জীবন মশায়ও হাসেন, কিন্তু হা-হা শব্দে হাসতে পারেন না তিনি। রহস্যই করুক, নিন্দাই করুক, সেতাব বউকে ভালোবাসে। যত বুড়ো হচ্ছে তত সে ভালোবাসা গাঢ় হচ্ছে। ভাল খাবার-দাবার পেলে সেতাব—কৃপণ সেতাব কিছু কিনে চাদর বা গায়ের কাপড় আড়াল দিয়ে বাড়ী নিয়ে যাবেই। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ী হলে ছাঁদা নিয়েও যায়। তবে বেশী না। সে হিসেব আছে সেতাবের। অসুখ করলে ভুগতে হবে যে তাকেই।

জীবন মশায়কেও উঠতে হবে। রতনবাবুর বাড়ী বিপিনকে দেখতে যাবেন। বিপিনের হিক্কা থামিয়েছেন তিনি, অন্য চিকিৎসার ভার নেন নি; কিন্তু রতনবাবুর অনুরোধ দু বেলা এসে নাড়ী পরীক্ষা ক'রে যেতে হবে। না গেলে এখনি হয় তো বিপিনের ছেলেটিই বাইসিকেল চেপে এসে হাজির হবে। ওকে দেখলেই—বন-বিহারীর ছেলেকে মনে পড়ে তাঁর। তাঁর বংশধর অথচ সে আজ তাঁর কেউ নয়!

জামা গায়ে দিয়ে মশায় বললেন—চল। রতনবাবুর বাড়ী যাব আমি।

পথে হাসপাতালে প্রদ্যোত ডাক্তারের কোয়ার্টারের বারান্দায় একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলছে। চেয়ার টেবিল সাজিয়ে মজলিস বসেছে। অনেক ক'টি লোক।

কি ব্যাপার? মশায়ের মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। মজলিস করে প্রদ্যোত ডাক্তার তাঁর কথা নিয়ে পরিহাস করছে নাকি?—কে? কে দাঁড়িয়ে?

অন্ধকারে হাসপাতালের ফটকের ধারে কে দাঁড়িয়ে আছে।

চাপা গলায় সে বললে—মশায়! প্রণাম। আমি বিনয়।

বিনয়? নবগ্রামের সব থেকে বড় ওষুধের দোকানের মালিক বিনয়? সবিস্ময়ে ডাক্তার বললেন—এখানে—অন্ধকারে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে বিনয়?

—একটা ব্যাপার আছে মশায়। কাল যাব—আমি কাল যাব আপনার কাছে, বলব। কিশোরবাবু আজ আসবেন ক'লকাতা থেকে। কাল যাব।

কিশোর আজ ক'দিন কলকাতা গিয়েছে।

(তেইশ)

বিপিন সুস্থ আছে। নিজেই বললে—ভালই মনে হচ্ছে।

রতনবাবু বললেন—আজ ইউরিণ রিপোর্ট এসেছে—যে দোষটুকু ছিল—অনেকটা কমে গিয়েছে।

মশায় বললেন—ভাল হবার হলে—এই ভাবেই কমে। আমাদের সে আমলে একটা কথা ছিল রতন—তোমার নিশ্চয় মনে আছে—রোগ বাড়বার সময় বাড়ে তাল প্রমাণ, কমবার সময় কমে তিলে-তিলে।

—তুমি একবার নাড়ী দেখে আমাকে বল। কি বুঝছ? কি পাচ্ছ?

—রোজই তো বলছি রতন।

—না। আজ কেমন দেখলে—এখন কেমন আছে এ কথা নয়। সেই পুরানো আমলের নাড়ী দেখা! কত দিনে বিপিন উঠে বসতে পারবে।

বিপিন বললে—এ শুয়ে শুয়ে আর পারছি না। চাকাওয়ালা ইনভ্যালিড চেয়ারে যদি একটু বারান্দায় বসতে পাই কি একটু বাইরে ঘুরে আসতে পারি—তা হ'লে মনের অবসাদটা কাটে! তা ছাড়া এ যেন লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের করুণার পাত্র। লোকে আহা উহু করছে, গোটা সংসারের লোকের বোঝা হয়ে ঘাড়ে চেপে রয়েছি—এ আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

মশায় চমকে উঠলেন মনে মনে। প্রতিষ্ঠাবান বিপিনের অন্তরলোকের অবস্থাটা যেন রঞ্জনরশ্মির মতই কোন এক রশ্মিচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। মশায়ের কাছে এটি একটি উপসর্গ।

বিপিনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন। নাড়ীতে উত্তেজনার আভাস ফুটে উঠেছে।

হাতখানি নামিয়ে রাখতেই বিপিন বললে—কবে উঠতে দেবেন?

মশায় বললেন—কাল বলব। আজ তুমি নিজেই চঞ্চল হয়ে রয়েছ।

—চঞ্চল উনি অহরহই। সেইটেই আপনি নিষেধ করুন ওঁকে। বিপিনের খাটের ওদিকে দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে—বিপিনের স্ত্রী। রোজই থাকে। কথা বলে না। আজ সে বোধ করি থাকতে পারলে না, আজ সে কথা ব'লে ফেললে। প্রাণস্পর্শী সেবার মধ্যে এ উপসর্গটি তার হাতে-মনে কাঁটার মত

ঠেকেছে; সব থেকে গভীর ভাবে বিদ্ধ বলে মনে হয়েছে। তাই বোধ করি থাকতে পারে নি।

পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর বয়স; শান্ত শ্রীময়ী মেয়ে; কপালে সিঁদুরের টিপ—সিঁথীতে সিন্দুর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে; পরণে লালপেড়ে শাড়ি। ঘোমটা সরিয়ে আজ প্রাণের আবেগে তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ ক'রে দাঁড়িয়েছে।

তিনি উত্তর দেবার আগেই উত্তর দিলে বিপিন—দুর্বল কণ্ঠস্বর কাঁপছে, চোখ দুটি ঈষৎ প্রদীপ্ত—সে বলে উঠল—নিষেধ করুন। নিষেধ করুন। নিষেধ করলেই মন মানে? মেয়ে জাত—কি ক'রে বুঝবে তুমি আমার এ যন্ত্রণা।

মশায় ব্যস্ত হয়ে বললেন—বিপিন, বাবা! বিপিন!

রতনবাবু ডাকলেন—বিপিন! বিপিন!

দু'টি জলের ধারা গড়িয়ে এল বিপিনের দুটি চোখ থেকে।—শ্রান্ত ভগ্ন কণ্ঠে সে বললে—আমি আর পারছি না। আমি আর পারছি না।

রতনবাবু গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। বিপিনের স্ত্রী পাখা নিয়ে এগিয়ে এল; বিপিন অভিমানভরেই বললে—না। শ্রীমন্ত—তুমি বাতাস কর।

শ্রীমন্ত বিপিনের ছেলে। সে পাখাখানি নিলে মায়ের হাত থেকে।

মশায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন—রোগীর দিকে লক্ষ্য রেখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলস্যের ভারে চোখের পাতা দুটি ভেঙে পড়ল বিপিনের। হাতখানি স্পর্শ করলেন মশায়। বিপিন আরত চোখ দুটি মেলে দেখে আবার চোখ বুঝলে। স্তিমিত উত্তেজনা বিপিনের নাড়ীতে অনুভব করতে পারছেন মশায়। দীর্ঘক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা ক'রে তিনি বেরিয়ে এলেন।

—জীবন! পিছন থেকে মৃদুস্বরে ডাকলেন রতনবাবু।

—চিন্তিত হবার কারণ নাই রতন। অনিষ্ট কিছু ঘটে নি। কিন্তু সাবধান হতে হবে। এ রকম উত্তেজনা ভাল নয়, সে তো তোমাদের বলতে হবে না!

—এ রকম উত্তেজিত বিপিন হয় না। কিন্তু আমি যা জানতে চাইছি। তোমাদের বংশে নিদান দেবার মত নাড়ীজ্ঞানের কথা আমি জানি—বিশ্বাস করি। আমি তাই জানতে চাচ্ছি।

রাধা গোবিন্দ জয় রাধা গোবিন্দ!

ওটুকু ভুলে যান নি। মশায় বংশের বৈষ্ণব মন্ত্রের চৈতন্য তাঁর জীবনে হল না। পরমানন্দ মাধবকে পাওয়া তাঁর ভাগ্যে নাই—তবে স্মরণ কীর্তন করতে ভুলে যান নি। উদ্দাম-উদ্‌ভ্রান্ততার মধ্যেও ওইটুকু স্থিতি প্রশান্তি ছিল।

আতর বউ বারবার আপত্তি করত। বলত—পস্তাবে শেষে। বলে রাখছি।

হা-হা ক'রে হাসতেন মশায়—কাছাকাছি কেউ না-থাকলে বলতেন—আরে মঞ্জরীর জন্যে সে আমলে বাজারে ধার ক'রে খরচ ক'রেও পস্তাই নি আমি। তার বদলে তোমাকে পেয়েছি। আজ রোজগার ক'রে খরচ করছি—তাতে পস্তাব ?

—কত রোজগার কর শুনি ? আতর বউয়ের মুখ লাল হয়ে উঠত।

—কত দরকার বল না! কত টাকা ? আজই এখুনি দিচ্ছি তোমাকে। বল কি গয়না চাই! কি চাই ?

—কিছু চাই না। আমি তোমার কিছু চাই না। মেয়েদের বিয়ে—ছেলের লেখাপড়া হলেই হল। আমি দাসীবাঁদী হয়ে এসেছিলাম—তাই হয়েই থাকব।

—মিছে কথা বলছ। তুমি এসেছিলে শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে। সেই শাসনই চিরকাল করছ। বুঝছ না, তোমার ছেলের জন্যে বড় আটন উঁচু আসন তৈরী করে দিয়ে যাচ্ছি। ছেলে তো তোমার আমার মত হাতুড়ে হবে না। হবে পাশ করা ডাক্তার! কিন্তু আমাদের ঘর তো নবগ্রামের ব্রাহ্মণ বনেদী জমিদারদের চেয়ে খাটো হয়েই আছে আজও। তাকে উঁচুতে তুলে ওদের সঙ্গে সমান করে দিয়ে যাচ্ছি।

এইখানে আতর বউ চুপ করত। স্তব্ধ হয়ে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের দোলায় মধ্যে পড়ে স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত।

না-থেকে উপায় ছিল না। বনবিহারী ওই রোগাক্রান্ত হয়েই ক্ষান্ত হল না; রোগমুক্ত হওয়ার পরই সে লজ্জা সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিলে অশোভন বেশভূষার মত। বৎসর খানেকের মধ্যেই বাপ এবং মায়ের যুধ্যমান অবস্থার সুযোগে প্রায় স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে বসল। একদা সে এসে বললে—স্কুলে পড়া আর হবে না আমার দ্বারা।

মশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—হবে না ?

—না। সংস্কৃত অঙ্ক ও আমার মাথায় ঢোকে না।

—ততঃ কিম্ ? হেসেই জীবন মশায় প্রশ্ন করেছিলেন।

অন্তরালবর্তিনী জননী প্রবেশ ক'রে বলেছিলেন—কলকাতায় নতুন ডাক্তারী স্কুল রয়েছে—সেইখানে পড়বে ও। এখানে বছর বছর কত ফেল করবে ?

—সেখানেও যদি ফেল করে ?

—তখন তোমার মত ডাক্তার হবে। তুমিও তো না-পড়ে না-পাশ ক'রে মুঠো মুঠো টাকা আনছ। বাপ যখন তখন কুলবিদ্যেটা না হয় দয়া করে ছেলেকে শিখিয়েই দেবে।

—আমাদের কুলবিদ্যেতে যে সংস্কৃত বিদ্যে কিছু দরকার হয় ভদ্রে !

—কি, কি বললে আমাকে ?

—ভদ্রে বলছি। ভাল কথাই। মন্দ নয়।

—কিন্তু ঠাট্টা করে তো ! তোমার মত অভদ্র এ আমি দেখি নি। বাপ হয়ে ছেলের উপর মমতা নাই ?

চুপ করেই ছিলেন জীবন মশায়। কি বলবেন ? ছেলের উপর মমতা ? বনবিহারীকে এম-বি পড়াবার বাসনা ছিল তাঁর। সে বাসনার মর্ম আতর বউ বুঝবে না। ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা ছিল বনবিহারী এম্-বি, হ্যাঁ তখন এল-এম্-এস উঠে এম্-বি হয়েছে, পড়তে আরম্ভ করলে তার বিয়ের আয়োজন করবেন। ঘটক পাঠাবেন। কান্দীতে কোন জমিদার ঘরের মেয়ে আনবেন। গ্রামের জমিদারীর এক আনা অংশে নবগ্রাম জমিদারী বলে গ্রাহ্য হলেও কান্দীতে গ্রাহ্য হয় না ; বনবিহারী এম্-বি ডাক্তার হলে সে অগ্রাহ্য সাদর সাগ্রহ গ্রাহ্যে পরিণত হবে। কান্দী যাওয়ার বাসনা পূর্ণ করবেন। ওই ভূপীদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ঘরের মেয়ে আনবেন। থাক, সে থাক।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মশায় বলেছিলেন—ভাল, তাই হবে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—তুমি তো বেলগাছিয়া আর-জি-কর মেডিকেল স্কুলের কথা বলছ ?

—হ্যাঁ, সেখানে পাশটাশের দরকার হয় না।

—জানি বাবা জানি। কিন্তু সেখানেও ফেল হয়, আমাদের নবগ্রামের রায়-বাবুদের অতীন পাশ করতে পারে নি। স্কুলে পাশ করতে না-পার সেখানে পাশ করতে হবে তো। সেইটে যেন মনে রেখো।

—সে পাশ ঠিক করবে। তিন পুরুষ এই বিদ্যে ঘাঁটছে। দেখিস বাবা, ভাল করে পড়িস। হাতুড়ে বলে লোকে যেন মুখ না বাঁকায়। মশায় বংশের এই অখ্যাতিটা তোকে ঘুচোতে হবে।

ডাঃ আর-জি-কর মহাপুরুষ। অল্পবিদ্যা অল্প-সম্বল গৃহস্থ ছেলেদের মহা উপকার করেছিলেন। দেশে তখন ম্যালেরিয়ার মহামারণ চলছে—বিলাতী ডাক্তারীর হাঁকে ডাকে, সরকারী অনুগ্রহে তার পসারে—কবিরাজদের ঘরগুলি বন্ধ হতে শুরু হয়েছে। দেশে বৈদ্যের অভাব। সেই সময়ে এই সব আধা-ডাক্তারেরা অনেক কাজে এসেছিল। শতমারি ভবেদ্ বৈদ্য সহস্র মারি চিকিৎসক। হাজার হাজার লোক হয় তো এদের ভুলে ক্রটিতে মরেছে ভুগেছে—কিন্তু হাজারের পর লোকেরা বেঁচেছে সেরেছে।

হাসলেন বৃদ্ধ জীবন মশায়। আর-জি-কর মেডিকেল স্কুলে পড়তে গেল বনবিহারী। বনবিহারীর সঙ্গে গেল মামুদপুরের গন্ধবণিকদের ছেলে—বনবিহারীর অন্তরঙ্গ বন্ধু রামসুন্দর। মাসছয়েক পর বনবিহারী প্রথম ছুটিতে বাড়ী এল। গায়ে ডবল ব্রেস্ট কোট, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী, সে আর এক বনবিহারী। বনবিহারীর মুখে সিগারেট। গায়ে কাপড়ে জামায় সিগারেটের গন্ধ; ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দুটির আগায় হলদে রঙের দাগ ধরেছে। সিদ্ধ জ্যোতিষী যেমন মানুষের আচারে আচরণে বাক্যে রূপে কর্মে নিজের গণনার রূপায়ণ দেখতে পান, অনিবার্য অবশ্যম্ভাবীকে সংঘটিত হতে দেখেন এবং লীলাদর্শন কৌতুকে মৃদুহাস্য করেন, ঠিক তেমনি হাসিই তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। পর মুহূর্তেই সে হাসি বিস্ময়ে পরিণত হয়েছিল তাঁর। ইন্দির গাড়ী থেকে নামিয়ে রেখেছিল—হারমোনিয়মের বাক্স, এক জোড়া বাঁয়া তবলা, একটা পিতলের বাঁশী, জোড়া দুই মন্দিরা, একজোড়া ঘুঙুর।

তা-ভাল, তা-ভাল। নৃত্যগীত কলাবিদ্যা চৌষট্টি কলার শ্রেষ্ঠ কলা, তা আয়ত্ত করা ভাল। নাদ ব্রহ্ম। সঙ্গীতে ঈশ্বর সাধনা হয়, প্রেম জন্মায়;

তা ভাল! এবং দীনবন্ধু মশায় নাম সংকীর্তন করতেন—জগতমশায় পদাবলী শিখেছিলেন, জীবনকে শিখিয়েছিলেন, তিন পুরুষের তিনটে মৃদঙ্গ—আরোগ্য-নিকেতনেরই উপরের ঘরে যত্ন করে রাখা আছে। হাল আমলে তাঁর কেনা বড় খোলখানাই এখন ব্যবহার হয়, এর পর নূতন কালে—এবং কালের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে বংশের কর্মফলে—অর্থাৎ তাঁর কর্মফলে—পরবর্তী পুরুষ খোল তিনখানার সঙ্গে—বাঁয়া তবলা মন্দিরা বাঁশী হারমোনিয়ম ঘুঙুর যোগ করলে। তা-ভাল! তা-ভাল!

সময়টা ছিল সন্ধ্যা। আকাশে মাথার উপরে ছিল একাদশী দ্বাদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্না ফুটি-ফুটি করছে। স্থানে স্থানে গাছপালা ঘরবাড়ীর ছায়ার মধ্যে অন্ধকার যেখানে গাঢ় হয়েছে—সেইসব স্থানে ফাঁকে ফাঁকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফালি ফালি ধোয়া কাপড়ের মত এসে পড়েছে। কোথাও কোথাও মনে হচ্ছে ধোয়া কাপড় পরে কেউ যেন রহস্যময়ী আড়ালে গোপনে দাঁড়িয়ে সংকেত জানাচ্ছে। অতর্কিতে এই ছায়া দেখে চমকে উঠেছিলেন জীবন মশায়। প্রশ্ন করেছিলেন—কে? কে ওখানে?

পরক্ষণেই হেসেছিলেন—না কেউ নয়। জ্যোৎস্না পড়েছে দুটি ঘরের মাঝের গলিতে।

মঞ্জরী নয়; কৌতুকে সে হাসছে না।

মঞ্জরী তো মরে নি। সে ছায়ামূর্তি ধরে আসবে কি করে? তবে এ তারই অভিশাপ! তাঁর অভিশাপে মঞ্জরীর জীবন ব্যর্থ হয়েছে। মঞ্জরীর অভিশাপ তাঁকে লাগবে না? অথবা তাঁর নিজের অভিশাপ মঞ্জরীর মত একটা সামান্য মেয়ের জীবন পুড়িয়ে শেষ হয় নি—ফিরে এসে তাঁকে নিজেকেই লেগেছে!

মঞ্জরী বিধবা হয়েছে। ভূপী বোস মরেছে। ওই সেদিন আতর বউ ছেলের সামনে মঞ্জরীর কথা তুলে তাঁকে মনে করিয়ে দিলে নতুন ক'রে। তারপর তিনি খোঁজ নিয়েছিলেন। মঞ্জরী বিধবা হয়েছে। সন্তান বলতে একটি মেয়ে। সে পেয়েছে—বাপের সোনার মত রঙ আর মায়ের তনুমহিমা মুখশ্রী। ভূপী সর্বস্বান্ত হয়ে মরেছে। মেয়েটির কিন্তু ওই রূপের জন্য এবং বংশগৌরবের জন্য বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। মঞ্জরী এখন মেয়ের পোষ্য। মেয়ের মেয়েকে বিয়ে সে বাকি সব ভুলেছে। পরমানন্দে আছে।

দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন জীবন মশায়।

আতরবউ এসে ডেকেছিল—তাই, বাড়ীর মধ্যে এস! ছেলে এল। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে।

জীবন মশায় বলেছিলেন—আজ রাত্রে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটা খাওয়া-দাওয়া করব ভাবছি। বনু এল।

—তা কর না।

জীবন মশায় ইন্দিরকে ডেকে একটা ফর্দ তৈরী করে দিলেন—"কালাচাঁদ চন্দ্র রোকার অবগত হইবা। ফর্দ অনুযায়ী জিনিসগুলি ফর্দবাহককে দিবা। দাম পরে পাইবা।" ফর্দের শেষে পুনশ্চ লিখে লিখে দিলেন—"আমার নামে বরং একটা হিসাব খুলিবা। অতঃপর তোমার দোকান হইতেই জিনিস আসিবে এবং মাহ চৈত্র ও আশ্বিনে দুই দফায় হিসাব মত টাকা পাইবা।"

নন্দা তখন ছোট। নন্দাকে ডেকে বলেছিলেন—নোটন জেলেকে ডেকে আন, বল চারপাঁচজন জাল নিয়ে আসবে। মাছ ধরানো হবে পুকুরে।

আর ডাকতে পাঠালেন বিখ্যাত পাখোয়াজী বসন্ত মুখুজ্জেকে। গাইয়েও তিনি নিয়ে আসেন।

হোক, গান বাজনা হোক। বাকী যে ক'টা দিন আছে—সে কটা দিন হেসে খেলে হৈ হৈ করেই কাটুক। পরমানন্দ মাধবকে পাওয়া তাঁর ভাগ্য-ফলও নয়, কর্মফলও নয়।

গলির সেই লম্বা কালি জ্যোৎস্নাটা ধীরে ধীরে আকাশে চাঁদের অগ্রগতির সঙ্গে গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে গলির মুখে যেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঠিক মানুষের মত দাঁড়িয়েছে।

* * *

সেই বছরেই তিনি কোট তৈরী করিয়েছিলেন। এর আগে জামা পরতেন সে সব ছিল পিরান। নবগ্রামের লক্ষপতি ধনী তাঁদের গ্রামের বারোআনা অংশের জমিদার—এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁকে মধ্যে মধ্যে বলতেন—মশায়, কবিরাজীর সঙ্গে ডাক্তারী শুরু করেছ—এখানে তুমি ধন্বন্তরী হয়ে উঠেছ—তুমি ভালো পোষাক কর। সংসারে ভেক চাই হে।

ব্রজলালবাবু দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা—ডিসপেনসারীর ডাক্তার তাঁরই মাইনে খায়। তবু তিনি নিজের অসুখে জীবন মশায়কে ডাকতেন। সেই সূত্রে দেখা হলেই রহস্য করে বলতেন। বলতেন—তুমি বল, আমি ক'লকাতা থেকে ভালো কোট—চায়না কোট—তৈরী করিয়ে নিয়ে আসব।

জীবন মশায় বলতেন—আজ্ঞে কর্তাবাবু, ওসব যদি এ জন্মেই গায়ে দিয়ে শেষ ক'রে শখ মিটিয়ে যাব তবে আসছে জন্মে এসে শখ মিটাব কিসে?

কর্তাবাবু হা-হা ক'রে হেসে বলতেন—কোট-প্যাণ্ট পরবে মশায়, বিলেত-ফেরত সাহেব ডাক্তার হবে।

জীবন মশায়ও হটতেন না, বলতেন—সে ডবল প্রমোশন হবে কর্তাবাবু, সামলাতে পারব না। শেষে বলতেন—কর্তাবাবু আপনার কথা আলাদা। আপনার মুক্তি কর্মযোগে। বাড়ীতে কাশী প্রতিষ্ঠা করেছেন, বৃন্দাবন তৈরী করেছেন—ভগবানকে বেঁধেছেন, ইস্কুল দিয়েছেন, চিকিৎসালয় দিয়েছেন, মুক্তি আপনার করতলগত। আমরা সাধারণ মানুষ, ভক্তি-টক্তি ক'রে ত্রাণ পাব। ও সব জামা কাপড় পোষাকের গরমে ভক্তি উপে যায়, থাকে না। ও সব আমাদের নয়।

সেই কর্তাবাবুর বাড়ীতেই ডাকে গিয়েছিলেন ওই কোট গায়ে দিয়ে।

কর্তাবাবুর দৌহিত্রের অসুখ। আজ চার পাঁচ দিন জ্বর। একজ্বরী—জ্বর প্রায় একভাবেই আছে। অল্প কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে এসে এখানে জ্বরে পড়েছে। দেখছে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর ডাক্তার চক্রধারী। আজ উদ্বিগ্ন হয়ে কর্তা জীবন মশায়কে ডেকেছেন নাড়ী পরীক্ষার জন্য।

জীবন মশায়কে দেখে কর্তাবাবু বলেছিলেন—তাই তো জীবন কি হ'ল? ভক্তিকে উপিয়ে দিলে নাকি?

মশায় বলেছিলেন—আজ্ঞে, ভক্তিকে এ জন্মের মত শিকেয় তুলে রাখলাম কর্তাবাবু। সে যা হয় আসছে জন্মে হবে। তা ভক্তিই যখন শিকেয় তুললাম তখন কোট গায়ে দিতে দোষ কি বলুন।

ছেলেটির নাড়ী দেখবার আগে তাঁর কানে এসেছিল কয়েকটি মৃদুস্বরের কথা। কলকাতারই কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে পাশের ঘরে বলছিল—এ সব কি করছেন এঁরা? হাতুড়ে ডেকে হাত দেখানো একেবারে ভালো না!

জীবন মশায়ের পায়ের ডগা থেকে রক্তস্রোত বইতে শুরু করেছিল মাথার দিকে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে হাত দেখতে বসেছিলেন।

তাঁর বাবা বলেছিলেন—ধ্যানযোগে নাড়ী পরীক্ষা করতে হয়। সেদিন সেই যোগ যেন মুহূর্তে সিদ্ধযোগে পরিণতি লাভ করেছিল। কঠিন সান্নিপাতিক দোষদুষ্ট নাড়ী! মনে হয়েছিল তিনি যেন—।

নাড়ী ছেড়ে উঠে বাইরে এসে হাত ধুয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন—ছেলেটির জ্বর সান্নিপাতিক মানে টাইফয়েড কর্তাবাবু। এবং—

—কি জীবন?

—বেশ শক্ত ধরণের টাইফয়েড। ভাল চিকিৎসা চাই। সদর থেকে কাউকে এনে দেখান।

সদরের ডাক্তার এসে দেখে বলেছিলেন—যিনি বলেছেন তিনি বোধ হয় একটু বাড়িয়ে বলেছেন। টাইফয়েড বটে—তবে কঠিন কিছু নয়। সেরে যাবে।

জীবন মশায় তাঁর সামনেই ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—আজ্ঞে না।

কিশোর তখন তরুণ। সে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি ব্যাপার ডাক্তারবাবু?

মশায় তাকে বলেছিলেন—ব্যাপারটা জটিল শ্রীমান কিশোর। সদরের ডাক্তার বুঝতেই পারছে না। জিভের দাগ, পেটের ফাঁপ, দুবার জ্বর ওঠানামা, জ্বরের ডিগ্রি দেখে ও বিচার করছে। আমি নাড়ী দেখেছি। ত্রিদোষ দুষ্ট নাড়ী। এবং—। তুমি বলো না কিশোর এ রোগ আর ব্রহ্মা বিষ্ণুর হাতে নাই। এক শিব—যিনি নাকি মৃত্যুর অধীশ্বর, তিনি যদি রাখেন তো সে আলাদা কথা।

দশদিনের পর থেকে রোগ কঠিন হয়ে উঠল। শহরের ডাক্তার আবার এসে বললেন—হ্যাঁ, দ্বিতীয় সপ্তাহে এ রোগ বাড়ে। তাই বেড়েছে। তা হোক। ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি আমি। কমে যাবে এতেই।

তের দিনের দিন রোগ কঠিনতর হয়ে উঠল।

কিশোরকে ডাক্তার বললেন—বিকার আসছে কিশোর। আঠারো দিন অথবা একুশ দিনে ছেলেটি মারা যাবে। মনে হচ্ছে তার আগে

সান্নিপাত দোষে একটি অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যাবে। কিশোর আমি দেখতে পাচ্ছি। সান্নিপাতিক জ্বর এমন পূর্ণ মাত্রায় আমি আর দেখি নি বাবা।

চৌদ্দ দিনের দিন ছেলে অজ্ঞান হয়ে গেল। ম্যানেনজাইটিস যোগ দিলে। কলকাতায় লোক গেল, বড় ডাক্তার চাই। যা লাগে।

জীবন মশায় বললেন—তা হলে অবিলম্বে কর্তাবাবু। আজই। নইলে আক্ষেপ করতে হবে। রোগ বড় কঠিন কর্তাবাবু।

সে মুহূর্তেই চোখ পড়েছিল কলকাতার সেই আত্মীয়টির দিকে। একটু হেসে বলেছিলেন—আমার অবিশ্যি হাত দেখে মনে হচ্ছে। রোগ অত্যন্ত কঠিন। কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এসেছিলেন, এম-ডি; অল্প বয়স হলেও বিচক্ষণ চিকিৎসক। জাতিতে বৈদ্য; নাড়ী দেখার অধিকার রাখেন; ধীর স্থির মিষ্টভাষী। ডাক্তার সেনগুপ্ত সত্যকারের চিকিৎসক।

তিনি রোগের বিবরণ শুনে ফাজ নিয়ে এসেছিলেন। ফাজ সেই প্রথম ব্যবহার হল এ অঞ্চলে।

জীবন মশায়ের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেছিলেন। নাড়ী দেখে অনুমানের কথা শুনে বলেছিলেন—আপনার অনুমানই বোধ হয় ঠিক। তবু আমাকে চেষ্টা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। কর্তব্য ক'রে যেতে হবে। কি করব?

আঠারো দিনের দিনই ব্রজলালবাবুর দৌহিত্র মারা গিয়েছিল। আঠারো দিনের সকাল বেলা বাম অঙ্গ পড়ে গিয়েছিল, বাঁ চোখটি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

চারিদিকে জীবন মশায়ের নাড়ী জ্ঞানের খ্যাতি রটে গিয়েছিল এরপর।

শুধু খ্যাতিই নয়—একটা দৃষ্টিও তাঁর খুলে গিয়েছিল এরপর থেকে। তিনি বুঝতে পারতেন। সে আসছে কি না আসছে নাড়ী ধরলে অনুভব করতে পারতেন অনায়াসে। এবং সে কথা ক্ষেত্র বিশেষে অর্থাৎ রোগী প্রবীণ হলে স্পষ্টই বলতেন; মণি চাটুজ্জের মায়ের বেলা বলেছিলেন—বাবাজী, এবার বুঝি মাথা কামাতে হয় গো!

মণি চাটুজ্জের চুলের শখ ছিল অসাধারণ।

রাম মিত্তিরকে তার বাপের অসুখে প্রথম দিন দেখেই বলেছিলেন—রাম, বাবার কাছে যা জানবার শুনবার জেনে শুনে নিয়ো। উনি বোধ হয় এ যাত্রা আর উঠবেন না।

রোগী অল্পবয়সী হ'লে ইঙ্গিতে বলতেন—তাই তো হে, রোগটা বাঁকা ধরনের, তুমি বরং ভাল ডাক্তার এনে দেখাও।

কাউকে অন্যভাবে জানাতেন।

মশায় বংশের জ্ঞান গরিমার দীপ্তিকে সমুজ্জ্বল ক'রে তুলেছিলেন।

সমারোহের সঙ্গে জ্বেলেছিলেন আলো।

এরই মধ্যে একদিন সুরেনের ছেলে শশাঙ্কের বড় ভাই এসে বললে—মশায় কাকা, একবার শশাঙ্ককে দেখে আসবেন।

—কি হয়েছে শশাঙ্কের ?

—জ্বর হয়েছে আজ দিন চারেক।

—আচ্ছা যাব।

বনবিহারীর বন্ধু শশাঙ্ক। বছর খানেকের ছোট। জমিদারী সেরেস্তার হিসাবনবীশ সুরেনের ছোট ছেলে—বাল্যকালেই মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। সুরেন বেঁচে থাকতেই তার বিয়ে দিয়ে সংসারী ক'রে দিয়ে গেছে। ভাল ছেলে, মিষ্টভাষী ছেলে শশাঙ্ক।

(চব্বিশ)

সুরেনের গৃহিণীহীন সংসারে বধূরাই আপন-আপন স্বামী নিয়ে স্বাধীনা। তরুণী বধূটিই শশাঙ্কের শিয়রে বসে ছিল। সম্ভবত শশাঙ্কের জ্বরোত্তপ্ত কপালে নিজের মুখখানি রেখে শুয়েই ছিল। মশায়ের জুতোর শব্দে উঠে বসেছে। শশাঙ্কের কপালে সিন্দুরের ছাপ লেগে রয়েছে। একটু হাসলেন ডাক্তার। মেয়েটি ছেলেটি দুজনেই তাঁর স্নেহাস্পদ। বধূটিও তাঁর জানাশোনা ঘরের মেয়ে, বাল্যকাল থেকেই দেখে এসেছেন। স্নেহের বশেই মশায় মেয়েটির দিকে চাইলেন। চোখ তাঁর জুড়িয়ে গেল। লাল পাড় শাড়ী-পরা ওই গৌরতনু বধূটির নতুন রূপ তাঁর চোখে পড়ল। একটি অপরূপ ছবি দেখলেন যেন। তাঁকে দেখে মেয়েটির মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল। মাথায় ঘোমটা টেনে সরে বসল। মনে হল মেয়েটির এই বধূরূপেই তার সকল রূপের চরম প্রকাশ।

ডাক্তার বসে শশাঙ্কের হাত ধরলেন। তাঁর নিজের হাত কেঁপে উঠল, চোখ দুটি চকিতে যেন খুলে গেল, একবার বধূটির দিকে তাকালেন। আবার চোখ বুজলেন।

এ কি? আজ মাত্র তৃতীয় দিন। এরই মধ্যে এত স্পষ্ট লক্ষণ। আবার দেখলেন। না, ভ্রান্তি নয়! ভ্রান্তি তো নয়। এই বধূটির এমন অপরূপ রূপ মুছে দিয়ে শশাঙ্ককে যেতে হবে? দু' সপ্তাহ?

হ্যাঁ তাই! ভ্রান্তি নয়, তিনি বিমূঢ় নন, অন্যমনস্ক তিনি হন নাই। শশাঙ্ককে যেতে হবে। এমন স্পষ্ট মৃত্যুলক্ষণ তিনি কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করেছেন নাড়ীতে। শেষ রাত্রের পাণ্ডুর আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণাংশে অগ্নিকোণে শুক্রাচার্যের প্রদীপ্ত স্পন্দিত উদয় যেমন রাত্রি-শেষ ঘোষণা করে—এমন কি দণ্ড পলে উদয়কালের বিলম্বটুকু পর্যন্ত পরিমাপ করে দেয়, তেমনি ভাবে—ঠিক তেমনিভাবে—নাড়ী-লক্ষণ বলছে দু'সপ্তাহ! চৌদ্দ দিন।

মনে আর অশান্তির সীমা ছিল না। বেদনার আর অন্ত ছিল না। শশাঙ্ক বনবিহারীরই বয়সী, কিছু ছোট। মাতৃহীন ছেলেটা তাঁর ডাক্তারখানার সামনে খেলে বেড়াত। তাঁর চোখের সামনে বড় হল। আর এই বধূটি?

লালপাড় শাড়ীতে শাঁখাতে রুলিতে, সিঁথিতে সিঁদুরের রেখায় সুন্দর ছোট কপালখানির মাঝখানে সিঁদুরের টিপে লক্ষ্মীঠাকরুণের মত এই মেয়েটি ?

এই সমস্ত শোভার সব কিছু মুছে যাবে ? থান কাপড়, নিরাভরণা মূর্তি—কল্পনা করতে পারেন নি জীবন মশায়। মনে পড়েছিল মেয়েটির বাল্যকালের কথা। পাশের গাঁয়ের মেয়ে। এ অঞ্চলের জাগ্রত কালী ঠাকুরের সেবায়েতের মেয়ে। বড় সমাদরের কন্যা। মেয়েটিকে ছেলে বয়সে বাপ মায়ে বলত—বিল্লী। পুষি।

ওই আদর কাঙ্গালীপনার জন্য আর আমিষে রুচির জন্য। একখানি ডুরে কাপড় পরে কালীস্থানের যাত্রীদের কাছে সিঁদুরের টিপ নিয়ে বেড়াত আর পয়সা আদায় ক'রে পেঁয়াজ বড়া কিনে খেত। অন্তরটা বেদনায় টন্‌টন্ করে উঠল।

দু'দিন পর শশাঙ্কের নাড়ী দেখে তিনি একেবারে আর্ত হয়ে উঠলেন। স্থির জেনেছেন—শশাঙ্ককে যেতে হবে। নাড়ীতে যেন পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, সে আসছে। ওষুধ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

সেই আর্ত মানসিকতার আবেগে একটা কল্পনা করে আতর বউকে ডেকে বললেন—দেখ, কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি—মা কালীকে ভোগ দিচ্ছি, মা যেন সেই ভোগ নিজে হাত পেতে নিচ্ছেন। আর আশ্চর্য কি জান ? কালী মা যেন আমাদের শশাঙ্কের বউ।

আতরবউ বলেছিলেন—তা আর আশ্চর্য কি ; শশাঙ্কের বউ কালীমায়ের সেবাংশীর মেয়ে। হয় তো—।

—এক কাজ কর আতর বউ, শশাঙ্কের বউকে কাল নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াও।

—বেশ তো।

আমিষের নানা আয়োজন করে এই বধূটিকে খাওয়াতে চেয়েছিলেন। বড় একটা মাছের মুড়ো তার পাতে দিতে বলেছিলেন। শশাঙ্কের তখন ক'দিন জ্বর। জ্বরটা শুধু বেড়েছে। অন্য কোন উপসর্গ দেখা দেয়নি। বাকুলের কালীবাড়ী থেকে প্রসাদী মাংসও আনিয়েছিলেন। কি যে আন্তি তাঁর হয়েছিল। মাছের মুড়োটা নামিয়ে দিতেই বধূটি চমকে উঠেছিল।

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সমস্ত আয়োজনের দিকে তাকিয়ে হাত গুটিয়ে উঠে পড়েছিল। আতর-বউ ব্যস্ত হয়ে উঠে বসেছিলেন—কি হ'ল? কি হ'ল?

স্থির কণ্ঠে মেয়েটি বলেছিল—আমার শরীর কেমন করছে। আমি বাড়ী যাচ্ছি।

সন্ধ্যায় ডাক্তার শশাঙ্ককে দেখে বেরিয়ে এলেন বাড়ী থেকে। মৃত্যুলক্ষণ নাড়ীতে উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবলার বোলে—ঠিক মাঝখানে এসেছে। সেই গতিতে বাজছে। কাল সপ্তাহ শেষ—আর এক সপ্তাহ একদিন, অষ্টাহ।

বাড়ীর মুখেই একটা গলি।

ডাক্তারের ভারী পা আরও ভারী হয়ে উঠেছে। পিছন থেকে ডাক শুনলেন—দাঁড়ান। ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন। দেখলেন একটি কেরোসিনের ডিবে হাতে দাঁড়িয়ে আছে শশাঙ্কের বউ। ডিবের আলো তার মুখের উপর পড়েছে, গৌরবর্ণ মুখের উপর রক্তাভ আলো। সিঁথিতে সিঁদুর ডগডগ করছে। চোখে তার স্থির বিচিত্র দৃষ্টি। তাতে প্রশ্ন। মশায়েরও সে দৃষ্টি অসহ্য মনে হ'ল। চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি।

বললেন—কিছু বলছ?

—ও বাঁচবে না? লুকোবেন না আমার কাছে। আশ্চর্য ধীরতা তার কণ্ঠস্বরে।

প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না ডাক্তার।

মেয়েটি বললে—না যদি বাঁচে তো কি করব; আপনিই বা কি করবেন? কিন্তু এমনি করে আপনার নিজের ছেলের মৃত্যু জেনে—তাকে মাছের মুড়ো মাংস খাওয়াতে পারবেন? সেই কথা মনে পড়ছে মশায়ের।

অবশ্য সেদিন তিনি এতে বিচলিত হন নি। সেদিনের জীবন মশায় অন্য মানুষ ছিলেন। গরলাভরণ নীলকণ্ঠের মত দৃক্‌পাতহীন। লোকে বলত, মশায় সত্য কথা বলবেই, সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। অনেকে বলত, ডাক্তার কবিরাজেরা মৃত্যু দেখে দেখে এমনিই হয়ে পড়ে। ঘাঁটা পড়ে যায় মনে। অনেকে বলত, পসার বাড়ায় জীবন মশায় পাল্টে গিয়েছে—দাম্ভিক হয়েছে খানিকটা।

কারও কথাই মিথ্যে নয়। সবার কথাই সত্য। তবে এগুলি উপরের

সত্য ;—ফুলের পাপড়ির মত। মাঝখানে যেখানে থাকে মর্মকোষ—মধু এবং গন্ধের উৎসস্থান—ভাবীবীজাধার, মাঝখানের সেই সত্য কেউ জানত না। সেখানে ছিল পরাগকেশর ও গর্ভকেশরের মত বিষময়ী দু'টি নারী—মঞ্জরী এবং আতর বউয়ের বিষময় অস্তিত্ব। সে বিষে তাঁকে নাশ করতে পারে নি—কিন্তু জর্জর করেছিল; মূল বিকারের উৎপত্তি সেখানেই। মানুষ যেগুলো বাইরে থেকে অনুভব করেছিল, অনুমানে বুঝেছিল সেগুলো রোগের বাহ্য লক্ষণ—উপসর্গের মত।

জীবন মশায় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটিকে বলেছিলেন—মা, শশাঙ্ককে যদি বাঁচাতে পারি তবেই এর উপযুক্ত উত্তর হয়। কিন্তু—।

কথাটা পাল্টে নিয়েছিলেন—আমার ছেলের কথা বললে মা! শশাঙ্ক আর বনবিহারী একসঙ্গে খেলা করেছে, পড়েছে—সে সবই তুমি জান। শশাঙ্কও আমার ছেলের মতই। আজ তার কথাই যখন বলতে পারলাম ইঙ্গিতে তখন বনবিহারীকেও যদি অকালে যেতে হয়—আর আমি যদি জানতে পারি—তবে শশাঙ্কের বেলা যেমন জানিয়ে দিলাম তেমনি ভাবেই জানাব, রকমটা একটু আলাদা হবে। তোমাকে ইঙ্গিতে জানিয়েছি। বনুর বেলা—আতর-বউকে স্পষ্ট বলব—বনুর বউকেও জানিয়ে দেব এবং তার যদি কোন সাধ থাকে তাও মিটিয়ে নিতে বলব। আমার উপর মিথ্যে ক্রোধ করলে মা। মৃত্যুর কাছে আমরা বড় অসহায়।

এ ঘটনার কথা কেউ জানে না। আতর-বউ পর্যন্ত না।

বনবিহারীর মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে বিচলিত হয়েও একথা প্রকাশ করেন নি; বিহ্বল হয়ে মনে মনেও পুত্রশোককে ওই মেয়েটির অভিশাপ বলেও স্বীকার করেন নি। জীবন মৃত্যুর বিচিত্র রঙ্গের কথা তিনি তো ভাল ক'রেই জানেন। ওর কূলকিনারা নাই। তবে জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তাকে নিমন্ত্রণ না ক'রলে সে আসে না। অমিতাচারে উচ্ছৃঙ্খলতায়, জীবনের প্রতি উপেক্ষায় বিচিত্র ভাবে তাকে নিমন্ত্রণ জানায় মানুষেই। এক মাত্র শেষ পর্যন্ত আয়ু ভোগ ক'রে মৃত্যুকে উপলব্ধি ক'রে যে যায়—সেই যায় মৃত্যুর নিমন্ত্রণে সমাদরের

অতিথির মত। সেখানে চিকিৎসক মৃত্যুলগ্ন জানিয়ে দিয়ে ধন্য হয়। বিদ্যা সার্থক হয়।

দেখেছেন বই কি এমন রোগী। কদাচিৎ নয়—একটি দুটি নয়। অনেক অনেক দেখেছেন তিনি। এ কালের ডাক্তারেরা দেখতে পায় না, পাবে না। তিনি দেখেছেন। অনেক দেখেছেন, নিতান্ত সাধারণ মানুষের মধ্যেই দিয়েছেন।

নবগ্রামের রায় বংশের ভুবন রায়ের কথা মনে পড়ছে।

তখন মশায়ের বাবার আমল। জীবন মশায়ের তরুণ বয়স। ভুবন মশায় তখন প্রায় সর্বস্বান্ত। জগত মশায়কে ডেকে পাঠালেন—মশায়কে ব'লো, আমাকে যেন একবার দেখে যায়!

জগত মশায়ের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন ভুবন রায়। দরিদ্র বৃদ্ধ নিজের বাড়ীর ভাঙা দেউড়ীতে হুঁকো হাতে বসে থাকতেন। অভাব এমনই প্রচণ্ড যে, যে কোন পথচারীকে তামাক খেতে দেখলে তাকে ডাকতেন, কুশল প্রশ্ন করতেন, পরিশেষে বলতেন—দেখি, তোমার কল্কেটা একবার দেখি।

তরুণ জীবন দত্ত সে দিন ভুবন রায়ের ডাক শুনে মনে মনে হেসেছিল; অবশ্য জগত মশায়কে বলতে সাহস করেন নি। ভেবেছিলেন, উঃ মানুষের কি বাঁচবার লালসা! এই বয়স—সংসারের কোথাও কোন পূর্ণতার আকর্ষণ নাই—তবু ভুবন রায় মরতে চায় না!

জগৎ মশায়ের সঙ্গে তিনিও গিয়েছিলেন। ছেঁড়া ময়লা বিছানায় শুয়ে ভুবন রায় ক্ষীণ কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।—এস মশায় এস। বস।

—কি হ'ল?

—যেতে হবে কি না দেখ তো ভাই।

—যেতে তো হবেই রায় মশাই। বয়স মানেই কাল—

হেসে রায় বলেছিলেন—সে কথা ভুবন রায় ভুলে যায় নি জগত। সেই কাল পূর্ণ হল কিনা দেখ। কাল পূর্ণ না করে অকালে যাওয়া যে পাপ। সেও ভুবন রায় যাবে না। লোকে বলে গেলেই খালাস। তা'—অকালে জেলখানা থেকে পালালে কি খালাস হয় রে ভাই? পালিয়ে যাবেই বা

কোথা? আবার এনে ভরে দেবে। এখন খালাসের সময় যদি হয়ে থাকে—দেখ দেখি। এখানকার ক'টি কৃত্য আছে আমাকে সারতে হবে।

ভুবন রায়ের বিষয় থাকতে বন্ধুর কাছে পাঁচশো টাকা নিয়েছিলেন। সে টাকার দলিল ছিল না, বন্ধুও সর্বস্বান্ত ভুবন রায়কে কোনদিন তাগাদা করবেন না কিন্তু ভুবন রায় সেটি ভুলতে পারেন নি। অনেকবারই এ সম্পর্কে তাঁর কর্তব্য করবার চেষ্টা করেছিলেন—পারেন নি। কিন্তু কল্পনা ছিল! বন্ধুর কাছে মাফ্ চেয়ে নিতে হবে। কিন্তু সে কি সহজ? ভেবে রেখেছিলেন—মৃত্যুর পূর্বে সে বন্ধুরই হোক আর নিজেরই হোক—চেয়ে নেবেন মুক্তি। তাই নিজের মৃত্যুর কথা স্থির জেনে তবে বন্ধুকে ডেকে হাত জোড় ক'রে বলবেন—আমাকে মুক্তি দাও।

অবশ্য বিঘাখানেক নিষ্কর জমি রেখেছিলেন, সেইটুকু দেবারও সংকল্প ছিল ভুবন রায়ের।

একটি টাকা বালিশের তলা থেকে বের ক'রে মশায়ের হাতে দিয়েছিলেন। জগত মশায় হাত জোড় ক'রে বলেছিলেন—আমাকে মার্জনা করুন রায় মশাই।

—তা হয় না জগত। বৈদ্যপ্রণামী না দিলে—মুক্তি আসবে না আমার। তারপরই হেসে বলেছিলেন—আমার শ্রাদ্ধ তো একটা হবেই, তাতেই তুমি একটাকার জায়গায় দুটাকা নৌকুতো দিয়ো।

বন্ধুর কাছে মুক্তি নিয়ে ভুবন মশায়ের হাসি মুখে চোখ বোঁজার কথা অনেকদিন পর্যন্ত মানুষ স্মরণ করে জীবনে ভরসা সঞ্চয় করেছে। তিনি নিজেও করেছেন।

শুধু কি ভুবন রায়? গনেশ বায়েন! এ তো বিশ বছর আগের কথা। তাঁর আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ার সামনে খোলা একখানা গাড়ীতে চেপে আশী পঁচাশী বছরের বুড়ো গনেশের সেই আসার কথা আজও চোখের উপর ভাসছে! লম্বা লাঠিখানার ভর দিয়ে বুড়ো নেমে সোরগোল তুলেছিল সেদিন। চিরদিনের কালা গনেশের সোরগোল তুলে কথা বলাই অভ্যাস।—ছোটমশায় কই গো? আমাকে আগে দেখ। কই? পরের গাড়ী ছেড়ে চিত্তে

এসেছি। ওরা আবার চলে যাবে, নবগেরামের লটকোবের দোকানে জিনিস নেবে। বুড়োকে আগে বিদেয় কর।

লোকজন সকলেই অবাক হয়েছিল—গনেশের দাপট দেখে।

তারা জানে না, গনেশ দীনবন্ধু মশায়ের বৃষোৎসর্গে ঢাক বাজিয়েছে, জীবন মশায়ের মায়ের চন্দনধেনু ক্রিয়াতে ঢাক বাজিয়েছে, জগত মশায়ের বৃষোৎসর্গেও বাজিয়েছে। জীবন মশায়ের অন্নপ্রাশনে নহবৎ বাজিয়েছে। বিয়েতে ঢুলীর বাজনার দলের সেই ছিল মাতব্বর।

জীবন মশায় হেসে বলেছিলেন—কি রে গনেশ! তোর আবার অসুখ হ'ল না কি?

—কি বলছ? জোরে বল। কান দেখিয়েছিল গনেশ।

—তোর অসুখ হ'ল শেষে?

—হবে না? যেতে হবে না?

—হবে না কি?

—তাই তো দেখতে বলছি গো। দেখ। মনে যেন তাই লাগছে, বুঝেছ!

—অসুখটা কি তাই বল আগে।

—পেটের গোলমাল গো!

—পেটের গোলমাল?

—হ্যাঁ। হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে মুখর বৃদ্ধ বলেই গিয়েছিল—বুঝেছ, আরও হয় তো ছমাস একবছর বাঁচতাম। তা' সেদিন—চড়কে ঢাক বাজিয়ে ভাইপো একটা পাঁঠার চরণ এনেছিল; তা মনে হ'ল জীবনে এলাম পিথিমীতে মাংস তো খেলাম না। সারা জীবন বাদ্যি বাজিয়ে পেসাদী মাংস পেলাম অনেক, মুখে দিলাম না। অথচ সাধ তো আছে। ও না-খেলে তো ছুটি হবে না। তাই বাপু খেলাম। ভালই লাগল। কিন্তু ওতেই লাগল ফ্যাসাদ। পেটের ব্যামো হল—দুদিন খুব পেটে মোচড় দিলে, তা-পরেতে ঘাটে গেলাম একদিন; খুব সে ঘাটে যাওয়া। সেই সূত্রপাত। এখন তোমার দুমাস হয়ে গেল—সেই চলেছে! এখন আবার আমেশা হয়েছে।

জীবন মশায় ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন—এ অবস্থায় এলি কেন? আমা ঠিক হয় নি। খবর দিলেই তো পারতিস।

কে একজন রোগী বলেছিল—তোমার তো টাকা আছে শুনতে পাই। না হয় মশায়কে দু টাকা দিতে।

—কি ?

—বলি—তোমার তো টাকা আছে হে।

—আছে। সাতকুড়ি টাকা আমার আছে। পুঁতে রেখেছি। তাই তো এয়েচি মশাযের কাছে, মশায় বলুক। আমি তা হ'লে জীবন মচ্ছবটা ক'রে ফেলি। ছেলে নাই পরিবার নাই—ভাইপোরা টাকা কটা নেবে—কিছুই করবে না। জমি আছে—সে ওদের পাবার ওরা নিক। টাকাটা আমি জীবন মচ্ছব ক'রে আর মা চণ্ডীর পাটঅঙ্গন বাঁধিয়ে খরচ ক'রে যাব। তা দেখ। ভাল ক'রে দেখে বল কতদিন আর বাকী।

তাঁর নিজের গ্রামের গন্ধবণিকদের শরতের দিদিমার মৃত্যুশয্যায় মশায় তাকে প্রশ্ন করেছিলেন—কি খেতে ইচ্ছে হয় দে-বউ ?

জিভ কেটে দে বউ বলেছিল—আমার পোড়াকপাল। এই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করলে বাবা ?

—তবে কি সাধ হয় বল ?

—শরতকে দেখব শুধু। দেখে বল—ক'দিন বাচব। শরত ফিরে আসা পর্যন্ত থাকব ?

শরত তখন বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে। শরতের মা বলেছিল—বলুন টেলিগেরাপ করব কি না।

—নাঃ। দিন পনের দে-বউ আছে। শরত তো সাতদিন পরে আসবে ?

—হ্যাঁ।

—তা হলে ঠিক আছে। নাতি দেখতে তুমি পাবে দে-বউ। কিন্তু কষ্ট কি বল ? খোরাক কয়েক ওষুধ দেব।

—কষ্ট অস্বস্তি। আর কি ? মনে হচ্ছে—গেলেই সুখ। নিশ্চিন্দি। বাঁচি।

এমন অনেক অনেক মানুষকে দেখেছেন। এই যাওয়াই তো যাওয়া। মৃত্যুর সমাদরের অতিথি। একালে তেমন অতিথি বোধ করি মৃত্যু

পায় না। তাই একালের ডাক্তারেরাও দেখতে পায় না। নিদান হাঁকার মর্ম ওরা বুঝতে পারে না।

আতর-বউই বুঝলে না। শশাঙ্কের মৃত্যুর সময় শশাঙ্কের বউ যেমন অভিশাপ দিয়েছিল, বনবিহারীর মৃত্যুর আগে আতর বউ ঠিক তেমনি ভাবেই শাপান্ত করেছিল। বনবিহারী কেঁদেছিল। মাকে বলেছিল—অন্য ডাক্তার আন। বড় ডাক্তার।

সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন তিনি। কিন্তু যা হবে সে তিনি জানতেন!

কি করবেন? নিজে ডাক্তার হয়ে বনবিহারী মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করেছিল—মৃত্যু ফিরে যাবে কেন? শশাঙ্কের বউয়ের অভিশাপে বনবিহারী মরে নি। বনবিহারী মরেছে—নিজে মৃত্যুকে ডেকে এনে। ডেকে এনে তার সে কি ভয়! সেকি বাঁচবার ব্যাকুলতা! ওই দাঁতুর মত! ওই মতির মায়ের মত! যখন মনে পড়ে তখন শোকের চেয়ে দুঃখ হয় বেশী। যে মানুষ মরতে চায় না, জলমগ্ন মানুষের মত দুহাত শূন্যে বাড়িয়ে আমাকে বাঁচাও বলে ডুবে যায়—তার জন্যেই শোক হয় মর্মান্তিক। নইলে তো শোক তো শুভ্র শান্ত—জীবনের মহাতত্ত্ব; শান্ত শোক জীবনকে কয়েকটা দিনের জন্য বৈরাগ্যের গৈরিক উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে মনোহর করে তোলে। কানের কাছে সত্যসঙ্গীত ধ্বনিত করে তোলে—বাউল বৈরাগীর মত। "অহন্য অহনি—ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং"। অন্য বংশে অন্য কূলে এ হয়তো সম্ভব নয় কিন্তু মশায় বংশে—সে তো অসম্ভব ছিল না। মনে পড়েছিল প্রথম যৌবনে বিখ্যাত শখের দলের অভিমন্যু বধ পালার কথা। সেই প্রসঙ্গে চণ্ডীতলার সাধক মহান্ত রঘুবর গোঁসাই ক'য়েকটি কথা বলেছিলেন যাত্রাদলের অধিকারীকে—সেই কথাগুলি মনে গেঁথে আছে। সপ্ত রথীর অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে কুরুক্ষেত্রের মাটিতে পড়ে ষোল বছরের কিশোর অভিমন্যু কাতর স্বরে কেঁদেছিল; সুকণ্ঠ প্রিয়দর্শন ছেলেটি কান্না মেশানো সুরে গান ধরেছিল—

অন্যায় ঘোর সমরে অকালে গেল প্রাণ আমার—
তৃতীয় পাণ্ডব পিতা মাতুল গোবিন্দ যার।

একে একে মা সুভদ্রা, প্রিয়া উত্তরার নাম ধরে সে এক মর্মচ্ছেদী করুণ সঙ্গীত। সারা আসরের লোকের চোখের জলে বুক ভেসে গেল।

গান শেষ হল ; অভিমন্যু টলতে টলতে চলে গেল সাজ ঘরে। অঙ্ক শেষ হল—ঐক্যতান বাদন সুরু হল। রঘুবর গোস্বামী গম্ভীর কণ্ঠে অধিকারী মশায়কে ডেকে বললেন—অধিকারী মশায়—এ কি হইলো ভাই ?

—আজ্ঞে ? অধিকারী প্রশ্ন বুঝতে না-পেরে প্রশ্নই করলে।—খুলে বলুন ?

—অভিমন্যু এমন ক'রে কাঁদল কেনো ভাই ? অর্জুনের ছাওয়াল—কিষণজীর ভাগনা—সে মরণকে ডরে এমন ক'রে কাঁদবে কেনো ভাই ? কাঁদবে তো—লড়াইমে সে আইলো কেনো দাদা ? এমন ক'রে সাত সাত বীরের সাথে লড়াই দিলো কাহে ভাই ? সে তো ভাই—হাত দুটা বাড়ায়ে দিয়ে বন্ধন প'রে বাঁচতে পারতো ভাই ? ভাঙ্গা রথের চাকা নিয়ে লড়তে কেনো গেলো ? অভিমন্যু তো কাঁদবে না। বীর বংশের সন্তান—সে তো ভাই মরণকে ডরবে না !

অধিকারী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। এমন প্রশ্ন তো সাধারণত কেউ করে না ! মানুষ কেঁদে সারা হয়ে আসর জমিয়ে তোলে। ধন্য ধন্য পড়ে যায়। তিনি সবিনয়ে সেই কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন—বাবা মানুষ এতে কাঁদে—

কথা কেড়ে নিয়ে গোস্বামী বলেছিলেন—তাই বলে দুখ দিয়ে কাঁদাবে ভাই ; যাতনা দিয়ে কাঁদাবে ? কাঁদন খুব ভাল জিনিস, মনকে ময়লা ধুয়ে যায়—দিল সাফা হয়—ঠিক বাত। কিন্তু তার জন্যে মাথায় ডাণ্ডা মারকে কাঁদাবে দাদা ? প্রেমসে কাঁদাও ; আনন্দসে কাঁদাও। তবে তো ভাই। অর্জুন মহাবীর।— কিরাত বেশ ধরকে শিব আইলেন—তার সাথে লড়লেন ; তার ছাওয়াল-মরণকে ডর না করে বলুক আওরে তু—মরণ ! মরণ আসুক—হাত জোড় করকে আসুক। বলুক—হামারা পুরী ধন্য—হামি আজ ধন্য হইলো। মরণকে ডরসে পরিত্রাণকে পথ দেখে মানুষ আনন্দসে কাঁদুক ; তবে তো ভাই !

যাত্রার দলের অভিমন্যুর চেয়ে বহুগুণ দীনতার সঙ্গে কাতর কান্না কেঁদে মরেছিল বনবিহারী। অবশ্য আসল নকলে তফাৎ আছে কিন্তু যাত্রাদলের ওই মৃত্যুর অভিনয় সত্যও যদি হ'ত—তবুও তাঁর তুলনা ভুল নয়। বনবিহারী মারা গিয়েছে ম্যালেরিয়ায়। বনবিহারী রিপুর প্ররোচনায় দেহধাতাকে ক'রে

রেখেছিল রোগের বীজের পক্ষে অতি উর্বর ক্ষেত্রের মত অনুকূল। দাহ্য বস্তুতে সামান্য একবিন্দু আগুন যেমন সর্বধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হয় ঠিক তেমন ভাবেই ম্যালেরিয়া মৃত্যুরোগে পরিণত হল। আর জি কর স্কুল থেকে পাশ করেই সে এসেছিল। বিলাসী তরলচিত্ত উল্লাসচঞ্চল উচ্ছৃঙ্খল বনবিহারী। তখন তার ধারণা সে ধনীর সন্তান। জমিদারের সন্তান।

হায়রে সেই এক আনা অংশের জমিদারি! তাঁকেও একদিন অহংকৃত করেছিল। তার উপর বনবিহারী তখন এক অবস্থাপন্ন মোক্তারের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে তাঁর সম্পত্তিরও ভাবী উত্তরাধিকারের স্বপ্ন দেখছে। বিবাহ অবশ্য তিনিই দিয়াছিলেন। তবে পছন্দ আতর-বউয়ের। তিনিও অমত করেন নি। বনবিহারীর ভবিষ্যত সম্পর্কে সন্দিহান হয়েই পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে তিনি পছন্দ করেছিলেন। শ্বশুর দিয়েছিল দামী সাইকেল, জামাই সাইকেল চড়ে ডাকে যাবে; দিয়েছিল ভাল ঘড়ি, ঘড়ি দেখে নাড়ীর বিট গুনবে, হার্টের বিট গুনবে। নতুন চমৎকার বার্ণিশ করা আলমারী চেয়ার টেবিল, ডাক্তারখানার সরঞ্জাম। আরোগ্য-নিকেতনের ওই দিকে একখানা ছোট কুঠুরীতে বনবিহারী ডাক্তার বসতে সুরু করলে। নতুন সাইন বোর্ড টাঙ্গালে 'সঞ্জীবন ফার্মেসী'।

জীবন মশায় সহজ রোগী বনবিহারীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু আশ্চর্য, এই মশায় বংশের কুলগত চিকিৎসাবিদ্যার বা বুদ্ধির এতটুকুও বোধ বনুর মধ্যে স্ফুরিত হয় নি!

হবে কি ক'রে! যে-ধ্যানযোগে বিজ্ঞান ধারণায় ধরা পড়ে সে-ধ্যান সে কোন দিনই করে নি, করতে চায় নি। রোগীর চেয়ে ভিড় বেশী হ'ত বন্ধুর। নবগ্রামের ব্রাহ্মণ বাবুদের ছেলেরা আসত বনুর ডিসপেনসারীতে। কাপের পর কাপ চা আসত। হাস্যধ্বনিতে আতুরালয়ের মৌন বিষণ্ণতা যেন চাবুকের আঘাতে মুহুর্মুহু চকিত ত্রস্ত হয়ে উঠত। রোগীরা বসে থাকত। সংশয়াপন্ন রোগীর স্তিমিত জীবনদীপের শিখাকে সমুজ্জ্বল করবার জন্য শাস্ত্রোক্ত সঞ্জীবনী তৈলের মত ওষুধ যে ব্যাপ্তি সেই ব্যাপ্তি চলত উল্লাসের জন্য।

এখানে পড়বার সময় ব্যাভিচার থেকে তার ব্যাধি হয়েছিল। কলকাতায় পড়তে পড়তে আবারও ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিল। সে কথা সে তাঁকে জানায় নি।

কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, সালসা খাওয়া দেখে ধরেছিলেন। তখন সালভারশন ইনজেকশন উঠেছে বটে কিন্তু খুব প্রচলন হয় নি। রক্ত পরীক্ষার এত ব্যাপক প্রসার হয় নি, সহজ সুযোগও ছিল না। দুটি তিনটি ইনজেকশনে ক্ষত নিরাময় হলেই ইনজেকশন বন্ধ করত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তখন সালভারশনের দাম অনেক এবং ওষুধও দুষ্প্রাপ্য। ক্ষত নিরাময়ের পর লোকে সালসা খেত। উইলকিনসনস সারসা পেরিলা।

তখন দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার চক্রধারী ঘোষ; বনবিহারী থেকে কয়েক বছরের বড়, বনবিহারীর বন্ধু। বনবিহারীর মজলিসে চক্রধারী আসত, বিকেলবেলা এখানেই চা খেত; সন্ধ্যার পর বনবিহারী যেত চক্রধারীর বৈঠকে। সেখানে গানবাজনার আসর বসত—নিরুদ্বেগ নিরুপদ্রব উল্লাস চলত। গান-বাজনা পান-ভোজন। গভীর রাত্রে বনবিহারী ফিরত। যেদিন মশায় বাড়ীতে থাকতেন সেদিন বনবিহারীর জড়িত কণ্ঠস্বর তাঁর কানে আসত। বনবিহারীর সঞ্জীবন ফার্মেসীতেও মধ্যে মধ্যে নৈশ আড্ডা বসত—পান-ভোজন চলত। সকালবেলা উঠে জীবনমশায় দেখতে পেতেন উচ্ছিষ্ট পাতা, ভুক্তাবশেষ; দাওয়ার ধারে দুর্গন্ধ উঠত, দেখতে পেতেন বমি-করার চিহ্ন, অম্লগন্ধের সঙ্গে বিকৃত মদ্যগন্ধ পেতেন—ভনভন ক'রে মাছি উড়ত; দু একটা কুকুর তাই চাটত আর মশায়কে দেখে লেজ নাড়ত। কিন্তু বলবার উপায় থাকত না। এ সব ক্ষেত্রে প্রায়ই জড়িত থাকতেন—জামাতা। সুরমা সুষমার তখন বিবাহ হয়েছে।

দুটিই পয়সাওয়ালা বাপের সন্তান; উচ্চ কুলীন। কি করবেন? সে-কালের বিচারে তারাই ছিল সুপাত্র। তবু তিনি খুঁতখুত্ করেছিলেন। পেয়েছিলেন ভাল ছেলে। স্কুল মাস্টার। কিন্তু সে অন্য কারও পছন্দ হয় নি। চল্লিশ টাকা মাইনে কি উপার্জন? তা ছাড়া—ওই বিশ পঁচিশ বিঘে জমি-সম্বল পরিবার কি মশায় বংশের যোগ্য কুটুম্ব? দোষের সবটা অন্যের ঘাড়ে চাপানো অন্যায় হবে। লোকে বলেছিল, বেশী বলেছিল আতর বউ এবং বনবিহারী। কিন্তু তাঁর মনও সায় দিয়েছিল। তবে একটা বিষয়ে তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন; তার জন্য মানুষ দায়ী নয়, কাল তাঁকে প্রতারণা করেছিল। তিনি বুঝতে পারেন নি যে কালধর্মে পয়পুরুষ কুলধর্ম

ত্যাগ করেছে জীর্ণ কন্থার মত। এ অঞ্চলের বৈষ্ণব মন্ত্র উপাসক—কায়স্থ সমাজের ছেলেরা কালধর্মে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়েছে বা হবে এটা তিনি অনুমান করতে পারেন নি।

মহাসমারোহ করেই তিনি মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন। তারা আসত। তাদের আসার অজুহাতেই মশায় বংশের অন্দরের রান্নাশালে মাংস প্রবেশ করেছিল।

অতীত কথা মনে করতে করতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ জীবন মশায়।

ওই চক্রধারী ডাক্তারকে মশায় বলেছিলেন—চক্রধারী—বনবিহারী এত সারসা পেরিলা খায় কেনহে? ওর কি—? জিজ্ঞাসা করো তো?

চক্রধারী হেসে বলেছিল—বনবিহারী তো নিজেই ডাক্তার; ও সব ওর উপরে ছেড়ে দিন।

—হুঁ। কিন্তু—

—ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। সে সব সেরে গিয়েছে। সারসা পেরিলা খায় শরীর ভাল হবে বলে। আমিও খাই।

—ভাল।

কিন্তু প্রকৃতি অনাচার সয় কতদিন? অমিতাচারী অসতর্ক বনবিহারী পড়ল ম্যালেরিয়ায়। বিচিত্র ব্যাপার; ডাক্তার বনবিহারী কুইনিন খেত না; কুইনিনের বদলে প্রতিষেধক হিসাবে খেত ব্র্যাণ্ডি। মশায় নিজে খেতেন শিউলি পাতার রস, মধ্যে মধ্যে কুইনিনও খেতেন। বনবিহারী হাসত। দেশে তখন প্রবল ম্যালেরিয়া। বছরের পর বছর—পাহাড়িয়া নদীর বন্যার মত দেশকে বিধ্বস্ত ক'রে চলেছে। ওই দাঁতুর মত। জ্বর হলে বনবিহারী ম্যালেরিয়া মিকশ্চারের সঙ্গে আউন্স দুয়েক ভাইনাম গ্যালেসিয়া মিশিয়ে নিত। নিজেই প্রেসকৃপশন ক'রে নিজের ডাক্তারখানা থেকেই আনিয়ে নিত। নিজের ডাক্তারখানায় না থাকলে পাঠাত নবগ্রামে সীতারামের দোকানে। সীতারামও বনবিহারীর সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। সীতারামও মরেছে অকালে। অমিতাচারের নিমন্ত্রণে মৃত্যু তার জীবনে এসে প্রবেশ করেছিল কদর্যতম

মূর্তিতে। কুষ্ঠ হয়েছিল সীতারামের। কখন হয়েছিল উপদংশ—তাকে গোপন করেছিল। তারই বিষ জর্জরতায় সীতারামের দেহ-রক্ত কুষ্ঠ বীজ সংক্রমণের গুপ্তপথ খুলে দিয়েছিল। হতভাগ্য সীতারাম।

হতভাগ্য বনবিহারী। ক্রমে ক্রমে অমিতাচার অনিয়মের প্রশ্রয়ে রোগ হয়ে উঠল জটিল। আয়ুও ক্ষয় হল, দেহ জীর্ণ হল।

লিভার, প্লীহা, পুরানো ম্যালেরিয়া, রক্তহীনতা, পানভোজনের প্রতিক্রিয়া—সব জড়িয়ে সে এক জটিল ব্যাধি।

জীবন মশায় মনে মনে বনবিহারীর অকালমৃত্যুর কথা অনুমান করেছিলেন। মশায় বংশের আয়ু—মহৎ সাধনার পরমায়ু সে পাবে না, পাবার অধিকারীই নয়। কিন্তু এত শীঘ্র যাবে তা ভাবতে পারেন নি। অকস্মাৎ একদিন চোখে পড়ে গেল। সকালবেলা বাড়ীর ভিতরে দাওয়ায় বসে বনবিহারী চা খাচ্ছিল। আরোগ্য-নিকেতন থেকে কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে—বোধ করি—টাকা নেবার জন্য তিনি বাড়ী ঢুকছিলেন। পূর্বদ্বারী কোঠাঘরের বারান্দায় বনু ব'সেছিল, পরিপূর্ণ রৌদ্র উপভোগের জন্য।

বনবিহারীর রৌদ্রালোকিত মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। রক্তহীন বিবর্ণ মুখ বনবিহারীর, দৃষ্টি ক্লান্ত এবং ওই বিবর্ণ পাণ্ডুরতার উপরে যেন একটা পাংশু অর্থাৎ ছাই রঙের সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়ছে—নয়?

সেদিন তিনি বিধিলঙ্ঘন করে গোপনে ঘুমন্ত বনবিহারীর নাড়ী পরীক্ষা করেছিলেন; সন্তর্পণে হাতখানি নামিয়ে রেখে নেমে এসেছিলেন। তিনিই সেদিন নিজে চক্রধারীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বনবিহারীর রোগ কি কমেছে চক্রধারী? কি বুঝছ?

চক্রধারী একটু চিন্তিত হয়েই বলেছিল—আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অন্যরকম। আমি বলব বলব ভাবছিলাম। বনবিহারীকে আমি বলেছি। আমার মনে হচ্ছে কালাজ্বর।

—কালাজ্বর?

—হ্যাঁ। বনবিহারীকে একবার কলকাতায় পাঠান। একবার দেখিয়ে আসুক।

—যাক। তাই যাক। তুমি যখন বলছ। যাক।

—আপনি একদিন দেখুন ভাল করে।

—না। দেখা উচিত নয়। আর। যাক। যাক, কলকাতা গিয়ে দেখিয়েই আসুক।

বনবিহারী কলকাতা গেল, সঙ্গে আতর-বউ গেল। মশায় বলেছিলেন— বউমাকেও নিয়ে যাও সঙ্গে।

—বউমাকে? কেন? না। ওই সর্বনাশীকে বিয়ে করেই বনু আমার গলে গেল রোগে। না। ওর নিশ্বাস আমি লাগতে দেব না।

মশায় আবারও বলেছিলেন—ওসব বলতে হয় না আতর-বউ। ওতে ছেলে বউ দু'জনের মনেই কষ্ট হয়। বউমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, আমার কথা শোন, তোমারও সাহায্য হবে, তা ছাড়া বনুর মন ভাল থাকবে। এখন মন ভাল থাকাটা আগে দরকার।

এই শশাঙ্কর বধূটির কথা সেদিন মনে পড়েছিল। মনে মনে বলেছিলেন— তোমাকে মাছের মুড়ো খেতে দিয়েছিলাম। এবং তোমাকে দেওয়া কথা অনুযায়ী আমার পুত্রবধূকে স্বামীসঙ্গ ভোগের জন্যই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আসামের কালব্যাধি কালাজ্বর। এককালে মৃত্যু-আশ্রিত ম্যালেরিয়াই বলত লোকে। তারপর কালাজ্বরের স্বতন্ত্র স্বরূপ ধরা পড়েছে। জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঙালী ডাক্তার ইউ এন ব্রহ্মচারী তার ওষুধ আবিষ্কার ক'রেছেন।

তাঁর বাবা বলতেন—আসামে এক ধরণের বিষজ্বর আছে। সাক্ষাৎ মৃত্যু; মহামারীর মত গতি প্রকৃতি। সেই রোগে ধরল বনবিহারীকে?

না। চক্রধারী নূতন ডাক্তার, নূতন কালের রোগ এবং নূতন ওষুধের উপর একটা ঝোঁক আছে। তিনি নাড়ী দেখে বুঝেছিলেন জীর্ণ জ্বর— পুরানো ম্যালেরিয়া—জীবনকে ক্ষয় ক'রে শেষ সীমান্তে উপনীত ক'রেছে। অন্ধকার মৃত্যুলোকের ছায়ার আভাস ওই আস্তরণ।

তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। রক্ত পরীক্ষায় কালাজ্বরের বীজাণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। কলকাতায় বনবিহারীর শিক্ষকেরা যত্ন ক'রে দেখেই ব্যবস্থাপত্র ক'রে তাকে বায়ুপরিবর্তনে যেতে আদেশ ক'রেছিলেন।

কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এল জীর্ণতর হয়ে।

রোগ মৃত্যুরোগে পরিণত যখন হয়—তখন রিপুই জীবনের বুদ্ধিদাতা। অমৃত বলে বিষ খাওয়ার দুর্মতি দেয় সে। পোর্টওয়াইন খেতে দিয়েছিলেন ডাক্তার। বনবিহারী দুদিনে একবোতল পোর্ট খেত, তার সঙ্গে দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য মুরগী খেতে শুরু করেছিল।

মৃত্যুর তিনদিন আগে মশায় আতর-বউকে বলেছিলেন—বুক বাঁধতে হবে আতর-বউ। বনুর ডাক এসেছে।

আতর-বউ বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত থেকে বজ্রবহ্নিতে জ্বলে উঠেছিলেন—বলেছিলেন—বলতে তোমার মুখে বাধল না? তুমি বাপ!

—আমার যে মশায় বংশে জন্ম আতর-বউ। আমার যে একটা কর্তব্য আছে। বনুকে প্রায়শ্চিত্ত করানো আমার কর্তব্য।

—না-না-না!

বনবিহারী সে কথা শুনতে পেয়েছিল। হাউ হাউ ক'রে কেঁদেছিল সে।—বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করিয়ো না। তা হ'লে আমি আরও বাঁচব না।

—বেশ, তা হ'লে কিছু খেতে যদি সাধ থাকে—খেতে দিয়ো।

আতর-বউ তাও পারেন নি।

সেদিনের জ্বরটা ছেড়ে গেলে বনবিহারী নিজেই আচার চেয়ে খেয়েছিল। আতর-বউ দেন নি, দিয়েছিল বনবিহারীর স্ত্রী। পরের দিন বনবিহারী ভাল রইল। চক্রধারী কুইনিন ইনজেকশন দিয়ে গেল।

জীবন মশায় জানতেন—এরপর একটা প্রবল জ্বর আসবে। আগামী কালের মধ্যেই।—।

কখন আসবে জ্বর?

বিনিদ্র হয়েই শুয়েছিলেন। ভাবছিলেন।

গভীর রাত্রে সেদিন আবার ডাক এসেছিল।

—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

—কে?

—আজ্ঞা—পশ্চিম পাড়ার হাজি সাহেবের বাড়ির লোক।

—কি? ছেলে কেমন আছে। ডাক্তার উঠে বসেছিলেন। হাজির ছেলের সান্নিপাতিক চিকিৎসা তিনিই করেছেন।

—আসতে হবে একবার। বড় বাড়াবাড়ি।

—যাচ্ছি। চল।

পথ সামান্য। মাইল দেড়েক। কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে পথ। মশায় ভারী পায়ে শব্দ তুলে ভাবতে ভাবতে চলেছিলেন। লোকটা চলছিল আলো হাতে কাঠের কলবাক্স মাথায় নিয়ে আগে আগে। যমে মানুষে লড়াই। রোগে ভেষজে দ্বন্দ্ব। মনে আছে—সব ভুলে শুধু চিন্তা করেছিলেন—স্টিকনিন, ডিজিটেলিস, এড্রেনেলিন। হার্ট, নাড়ী, রেস্‌পিরেশন। গভীর চিন্তায় মগ্ন মশায় যেন ঘুমের ঘোরে পথ চলেছিলেন সে দিন, রাত্রির অন্ধকার দুপাশের ধানক্ষেত এসব যেন কিছু ছিল না। মধ্যে মধ্যে নক্ষত্র-ঝলমল আকাশের দিকে চোখ পড়েছিল। ক্ষণিকের জন্য, আবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন।

সেখানে গিয়ে রোগীর বিছানার পাশে বসে নাড়ী পরীক্ষা ক'রে আলো তুলে ধরে রোগীর উপসর্গ লক্ষ্য করে চেহারা দেখে গন্ধ বিশ্লেষণ করে অনেক চিন্তা করে ওষুধ দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ বসে ওষুধের ক্রিয়া লক্ষ্য ক'রে বাড়ি ফিরেছিলেন। হাজির নাতির ক্রাইসিস কাটবে। প্রশান্ত অথচ অবসন্ন মনেই আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানের কাছে বনবিহারীর মঙ্গল কামনা করেছিলেন। সবই জানেন—তবু কামনা করেছিলেন।

আকাশে চাঁদ অস্ত যাচ্ছিল—পশ্চিম দিগন্তে।

পূর্বদিগন্ত থেকে পাণ্ডুর জ্যোৎস্নাকে গ্রাস করে অন্ধকার সম্প্রসারিত হচ্ছে, দূরের গ্রামান্তর অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে হয়ে অন্ধকারে ঢাকা পড়ছে।

ঠিক রোগীর দেহে মৃত্যুলক্ষণ সঞ্চারের মত; নখের কোণ নীল হয়ে উঠছে, হাতপায়ের তালুর পাণ্ডুরতা ক্রমশ সর্বদেহে ব্যাপ্ত হচ্ছে।

বাড়ি ফিরে একবার থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

নাঃ। তখনও জ্বর আসে নি। ভালই আছে বনু। সকলে গাঢ় ঘুমে ঘুমুচ্ছে।

তিনিও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল—তাঁর ঘরের দরজায় কে তাঁকে ডাকছে।—বাবা!

বনু!

কি হ'ল? তাড়াতাড়ি দরজা খুলেছিলেন; সামনে উঠানে অন্ধকার থমথম করছে, গাঢ় নির্জনতার মধ্যে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কই বনু? কে ডাকলে? সম্ভবত তাঁর মনের বনু ডেকেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বনুর কোঠা ঘরের দরজায় গিয়ে ডেকেছিলেন—আতর-বউ!

—এঁ্যা। সাড়া পেয়ে চমকে উঠেছিলেন জীবন মশায়। আতর-বউ জেগেছে। তবে আসছে!

—বনু কেমন আছে?

—শীত শীত করছে বলছে, হয় তো জর আসবে।

আসবে নয়, তখন এসেছে! উঃ সে কি ভীষণ কম্প!

* * *

অন্ধকারের মধ্যে স্থবির হস্তীর মত পদক্ষেপে চলতে চলতে কখন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন জীবন মশায় নিজেও বুঝতে পারেন নি। সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে উঠেছে।

বিপিনের স্ত্রীর ওই দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে মর্মান্তিক অতীত স্মৃতি জেগে উঠেছে মনের মধ্যে। এরপর বিপিনের স্ত্রীকে রতনবাবুকে তিনি কি ক'রে বলবেন? না—তিনি তা পারবেন না। ভয়লেশহীন জীবন মশায় ভীত হয়ে পড়েছেন যেন। প্রেতযোনির ভয় নয়, হঠাৎ বনবিহারীকে দেখতে পাবেন এ আশঙ্কায় নয়; তবু কেমন একটা ভয়। যদি বিপিন বনবিহারীর মত ব্যাকুল হয়ে বলে—আমায় বাঁচাও! যদি বিপিনের স্ত্রী প্রশ্ন করে?

মনে হল সেতাবের বাড়ি ফিরে গেলে হয়। তামাক খেয়ে দুটো গল্প করে, অথবা দু'বাজী দাবা খেলে ভারাক্রান্ত মনকে একটু হাল্কা করে নিলে সুস্থ হ'তে পারবেন।

পরক্ষণেই মনে হ'ল—নাঃ থাক। সেতাবকে এই রাত্রে ডেকে তার এই নিশীথ শান্তি ভঙ্গ করা ঠিক হবে না। সেতাবের স্ত্রী যতই লোভী হোক

সেতাবকে সে ভালবাসে। সেতাবও ভালবাসে। নিঃসন্তান দম্পতিটি একেবারে অরণ্য বনস্পতি এবং বন্যলতার মত প্রায় অচ্ছেদ্য জটিল বন্ধনে পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। সেতাবের বাড়িতে দাবার আসর বসলে আজও শুনতে পান ওদের জীবনের সেই এক পুরানো কথা। কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা হলেই খাওয়ার পর সেতাব উঠে ভিতরে গিয়ে গাড়ুটা নেড়েই বলে—কি গো—জল রাখতে ভুলেছ?

সেতাবের বউ বলে—ওঃই যা। ভুলে গিয়েছি। যাই, দিই গিয়ে।

সেতাব বলে—ঠিক আছে। তুমি ভুলেছ তাই বলছি। আসতে হবে না—আমিই নিচ্ছি।

—না—না। আমি যাই।

—না। দরকার নেই। এই তো টবে জল রয়েছে।

—তা হোক। আমি যাই।

—না—না—না। একে তোমার বেতো পা। আসতে কষ্ট হবে। আমি নিচ্ছি।

—না—না—না। আমার দিব্যি!

—এই দেখ। না, আসতে হবে না। আমি বলছি। দিব্যি-টিব্যি ফিরিয়ে নাও। এই আমি কপালে ঢেঁড়া কেটে দিব্যি কেটে দি-লা-ম।

—ভাল হবে না।

—তুমি এলেও ভাল হবে না। বেতো পা নিয়ে উঠো না—আমার দিব্যি।

সেতাবই জল নিয়ে আসে। বলে—বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছ রে। পায়ের গাঁঠটা যা ফুলেছে।

এই নিত্যকার কথা। এ ওদের জীবনে পুরনো হ'ল না।

এখন ওরা হয় তো দুজনে একসঙ্গে খেতে বসেছে! সেতাব তুলে তুলে দিচ্ছে; গৃহিণী দন্তহীন মুখে সলজ্জ হেসে একটু ঘোমটা টেনে খেয়ে চলেছে।

সেতাবের জোলা বউয়ের গল্পটা নেহাতই গল্প! বউয়ের দিকটা যদিবা সত্য হয়—জোলার দিকটা অসত্য; সেতাবের সঙ্গে তার কোন যোগসূত্রও নাই মিলও নাই।

অন্ধকার রাস্তায় বালি কাঁকরের উপর মশায়ের পায়ের জুতোর শব্দ উঠছে। পথে লোকজন কম হয়ে পড়েছে। অনেকটা পিছনে নবগ্রামের বাজার পটির আলোর ছটা শূন্যলোকে ভাসছে। বাজারের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে, তবে একেবারে থামে নাই। অনাবৃষ্টির বর্ষায় মাঠে লোকজন নাই, রাত্রি প্রথম প্রহর পার না হতেই কৃষাণেরা বাড়ি ফিরেছে।

বড় পুকুরটার পাশ দিয়ে এসে রাস্তার মোড় ফিরতেই আলো পেলেন মশায়। হাসপাতালের কোয়ার্টারের জানালায় বারান্দায় আলোর ছটা পড়েছে; হাসপাতালের বারান্দায় আলো জ্বলছে। উঃ—ডাক্তারের বারান্দায় এখনও সেই মজলিস চলছে? পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে?

—এতক্ষণে ফিরছেন ডাক্তার বাবু?

—কে? বিনয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি এখনও দাঁড়িয়ে? ব্যাপার কি বলতো?

—ডাক্তারদের মিটিং হচ্ছে।

—কিসের? হাসপাতাল সম্বন্ধে—

—না—গো। আমাকে বয়কটের ব্যবস্থা হচ্ছে।

—তোমাকে বয়কটের?

—হ্যাঁ। কাল যাব আমি আপনার কাছে। মিটিং শুধু আমাকে নিয়েই নয়, আপনিও আছেন। বলব, কাল সকালে সব বলব, যাব আমি।

(পঁচিশ)

বিনয়কে বয়কটের জন্য ঠিক নয়; তবে বিনয়কে মুস্কিলে পড়তে হবে।

প্রদ্যোত ডাক্তার এখানকার ডাক্তারদের ডেকেছেন—এখানে প্র্যাকটিসের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে আলোচনা করবেন। সদর থেকে বিপিনবাবুর ইউরিন ও ব্লাড রিপোর্ট নিয়ে সেখানকার ক্লিনিকের ডাক্তার নিজেই এসেছেন। এ রিপোর্ট রোগীর পক্ষে আশাপ্রদ বটে কিন্তু পরীক্ষক ডাক্তারের একটি সন্দেহ হয়েছে। তিনি আবার একবার ইউরিন ব্লাড নিজে নিয়ে যাবেন। আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। এখানে মোটামুটি ব্যবস্থা দেখে একটা ক্লিনিক খোলা যায় কি না—তাও বুঝতে এসেছেন। প্রদ্যোত ডাক্তার এই ডাক্তারটির সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। একালে ক্লিনিকের সাহায্য ছাড়া চিকিৎসা করা অন্যায়, যে বিজ্ঞান নিয়ে সাধনা সেই বিজ্ঞানকে লঙ্ঘন করা হয়। সাধারণ ম্যালেরিয়া বা সামান্য অসুখ বিসুখে উপসর্গ দেখে, থার্মোমিটার স্টেথেসকোপের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়তো যায় কিন্তু অসুখ যেখানে একটু জটিল বলে মনে হয়, যেখানে এতটুকু সংশয় জাগে, সেখানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রক্ত মল মূত্র এ সব পরীক্ষা না করে চিকিৎসা করার পক্ষপাতী প্রদ্যোত নন। নাড়ী পরীক্ষার উপর বিশ্বাস তাঁর নাই। বায়ু পিত্ত কফও বুঝতে পারে না। এবং চোখে উপসর্গ দেখে, রোগীর গায়ের গন্ধ বিচার ক'রে রোগ নির্ণয় দু চারজন প্রতিভাবানের পক্ষে সম্ভবপর বটে কিন্তু সাধারণ চিকিৎসকদের সে শক্তি নাই বলেই তার ধারণা যাঁরা করেন তাঁরা পাঁচটাতে ঠিক ধরেন,—পাঁচটাতে ভুল ক'রে পরে শুধরে নেন—পাঁচটাতে ভুল শেষ পর্যন্ত ধরাই পড়ে না। রোগী যখন মারা যায় তখন মনে হয়—চিকিৎসা আগাগোড়াই ভুল হয়েছে। রোগটা বোধ হয় ম্যালেরিয়া ছিল না—কালাজ্বর ছিল; অথবা কালাজ্বর ছিল না—ছিল ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়াকে টি বি ভুল করতেও দেখা গিয়েছে।

প্রদ্যোত শুধু নিজের প্রতিষ্ঠাই চায় না। তার জীবনে একটা আদর্শবাদও আছে। দরিদ্র দেশ হতভাগ্য দেশ—তাই এ দেশের হতভাগাগুলোর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যায়; বৈজ্ঞানিকেরাও বিজ্ঞানকে লঙ্ঘন ক'রে

তাই খেলছে। মানুষের জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্বে ওষুধ হল অমৃত, সঞ্জীবনী, তাতেও এদেশের একদল মহাপাষণ্ড প্রতারণা শুরু করেছে। ইনজেকশনের এ্যাম্পুলের মধ্যে ওষুধের বদলে জল ভরে লেবেল এঁটে চালাচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় পার হলে যে ওষুধ বাতিল বলে গণ্য হয়, লেবেল পাল্টে তাই চলছে বিনা প্রতিবাদে। এর উপর নকল আছে, মেকী আছে।

তারপর পল্লীঅঞ্চলে যেসব দোকানে প্রেসক্রপশন সরবরাহ হয় সেখানকার অসাধুতার অন্ত নাই। কোন ওষুধ না থাকলে নিজেরাই বুদ্ধিমত একটা বিকল্প দিয়ে চালিয়ে দেয়। তাও না থাকলে সেটা বাদ দিয়েই চালিয়ে দেয়। কোন ওষুধটা যথানিয়মে ক্রম রক্ষা ক'রে তৈরী করবে না। ওষুধের শিশি রেখে দিলে বিভিন্ন ভেষজ স্তরে স্তরে স্বতন্ত্র হয়ে ভাসবে অথবা তলায় জমে থাকবে। একদফা ওষুধ এনে তাতেই চলবে ছ মাস, এক বছর। নিস্তেজ নির্গুণ ওষুধের ক্রিয়া নাই। সব থেকে বিপদ হয়েছে এখনকার বিশেষ ওষুধগুলি নিয়ে। পেনিসিলিন যে বিশেষ তাপমানে রাখার কথা তা রাখা হয় না। যেসব ওষুধ আলোক-রশ্মিতে বিকৃত হয়— সেগুলিও নিয়ম মত রাখে না এরা। মানুষের জীবন মরণ নিয়ে যেখানে প্রশ্ন সেখানে অবহেলা—অজ্ঞতা এবং কুটীল ব্যবসায় বুদ্ধির স্বেচ্ছাচারে ব্যভিচারে মানুষের জীবন হচ্ছে বিপন্ন।

তার উপর দাম। দরিদ্র মানুষ সরল গ্রামবাসী অসহায় ভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে এই লোলুপতার খড়্গের নিচে ঘাড় পেতে দিতে বাধ্য হচ্ছে। শুধু দামই নয়, বাকীর খাতায় বাকী বেড়েই চলে। এদের পীতপাণ্ডুর চোখের দৃষ্টি দেখলে প্রদ্যোতের করুণাও হয় রাগও ধরে। এক এক সময় মনে হয়—মরুক, এরা মরুক, মরে যাক। শেষ হয়ে যাক। নির্বোধ মূর্খেরা— নিজেদের অজ্ঞতা মূর্খতা নির্বুদ্ধিতা কিছুতেই স্বীকার করবে না। বললে শুনবে না। বুঝিয়ে দিলে বুঝবে না, বিশ্বাস করবে না। আজও কবচ মাদুলী জড়ি বুটি ঝাড় ফুঁক ছাড়লে না এরা। এদের বিজ্ঞানবোধ জীবন মশায়ের নাড়ীজ্ঞান পর্যন্ত এসে থেমে গেছে।

তাই অনেক চিন্তা ক'রে সে তার এই বন্ধুটিকে নিয়ে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায়। একটি ছোটখাটো ক্লিনিক—তার সঙ্গে বড় একটি ওষুধের দোকান।

আজ ছ মাস আটমাস সে এখানকার অবস্থা দেখে যা বুঝেছে তাতে বড় একটি কারবার বেশ সমৃদ্ধির সঙ্গেই চলবে। নবগ্রামে একটি মাঝারি ওষুধের দোকান আজ তিরিশ বৎসরেরও বেশী কাল ধরে ভাল ভাবেই চলে আসছে। তার আগে হরিশ ডাক্তারের বাড়িতে এক আলমারী ওষুধ নিয়ে তাঁর নিজস্ব কারবার চলত। জীবন মশায়ের আরোগ্য-নিকেতন তাকি সমারোহের সঙ্গে চলেছে দীর্ঘকাল। আজ উনিশ শো পঞ্চাশ সালে কি এখানে ক্লিনিক ডাক্তারখানা চলবে না ?

উনিশ শো সালে এখানে ডাক্তার বলতে একা জীবন মশায়। তারপর এসেছিল—দুর্গাদাস কুণ্ডু এ্যালোপ্যাথ। মাস কয়েক থেকেই সে চলে গিয়েছিল। তারপর এসেছিল কে এম বাড়ুরী হোমিওপ্যাথ। তারও চলে নি। জীবন মশায়ের একচ্ছত্র রাজত্ব তখন। তারপর ব্রজলাল বাবুর চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর চল্লিশ টাকা মাইনের কল্যাণে হরিশ ডাক্তার প্রথম টিঁকতে পেরেছিলেন। হরিশবাবুর পর বিদেশী ডাক্তার। মিস্টার মিত্র। মিত্র যাবার পর এসেছিলেন চন্দ্রবাবু ডাক্তার। তারপর চক্রধারী। চক্রধারীর পর এখানে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর সঙ্গে চার বেডের হাসপাতাল যুক্ত হল এবং সেখানে আশীটাকা মাইনের উপর নির্ভর করে এলেন চারুবাবু—এখানকার প্রথম এম-বি। তারপর চারুবাবু চাকরী ছেড়ে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস শুরু করলে এসেছিলেন অহীভূষণবাবু, তিনিও এম-বি। তারপর এসেছেন তিনি।

আজ নবগ্রামেই দু জন এম-বি, দু জন এল-এম-এফ রয়েছে। আশে পাশে চারিদিকে দশ বারো মাইলের মধ্যে আরও চারজন এল-এম-এফ আছে। তাদের সকলেরই কোন রকমে চলে যাচ্ছে। তাঁদের সকলকেই আজ নিমন্ত্রণ করেছেন প্রদ্যোত ডাক্তার। সকলে মিলে অংশীদার হয়ে এই কারবার গড়ে তুলতে চান। তাতে সকলেরই লাভ। তাঁরা ব্যবসায়ীর মত লাভ করবেন না, তবুও যেটুকু লাভ হবে তাঁরাই পাবেন। প্রেসকৃপশনে কমিশনও যে যেমন পান পাবেন। এখানকার লোকেও অপেক্ষাকৃত কম দামেই ভাল ওষুধ পাবে।

* * *

নিজের কোয়ার্টারের বারান্দায় চেয়ার টেবিল বিছিয়ে আসরটি বেশ মনোরম করেই পেতেছিলেন প্রদ্যোতবাবু। সন্ধ্যার সময়ে চা-পর্ব থেকে শুরু হয়েছে। মাঝখানে একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলছে। রাত্রে খাওয়া দাওয়া আছে। কিছু পাখী শীকার করা হয়েছে—তার সঙ্গে কয়েকটি মুরগীও আছে। রান্না করছে হাসপাতালের কুক্। ডাক্তারের আধুনিকা স্ত্রী মঞ্জু মধ্যে মধ্যে উঠে গিয়ে রান্নাবান্নার তদ্বির করছে। আবার ফিরে এসে মজলিসের মধ্যে নিজের আসনে বসছে। তার সামনে একটি অর্গ্যান। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রদ্যোত বা তার নবাগত বন্ধু বলছেন—এইবার একখানা গান হোক।

ডাক্তারের আধুনিকা তরুণী স্ত্রী মঞ্জুর সঙ্কোচ নেই, সে বেশ সপ্রতিভ মেয়ে। সে সঙ্গে সঙ্গে গান ধরছে, অর্গানে ডবল রিডে খাদে ও উচ্চগ্রামের সম্মিলিত সুরধ্বনি বেজে উঠছে। ডাক্তারের ব্যাটারী সেট রেডিয়ো আছে, সেটা আজ বন্ধই রয়েছে। চঞ্চলা বিলাসিনী আধুনিকা মঞ্জু রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং আধুনিক সঙ্গীতেরই পক্ষপাতিনী। সন্ধ্যা থেকে খান চারেক রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছে সে, তাই এবার ধরলে একখানি আধুনিক।

সমাগত ডাক্তারদের মধ্যে চারুবাবু সর্বাপেক্ষা প্রবীণ; পঞ্চাশের উধে বয়স। চারুবাবুই এখানকার প্রথম এম-বি। সদ্য ডাক্তারী পাশ করেই এখানকার হাসপাতালে চাকরী নিয়েছিলেন। তারপর চাকরী ছেড়ে স্বাধীন ভাবে প্র্যাকটিস করেছেন। আজ বছর চারেক থেকে প্র্যাকটিস তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। এখন তিনি এখানে ইউনিয়ন বোর্ড, ইস্কুল বোর্ড প্রভৃতি নিয়ে মেতেছেন বেশী। লোকে অবশ্য বলে চারু ডাক্তারের প্র্যাকটিস পড়ে এসেছিল স্বাভাবিক নিয়মে, ডাক্তার তাই ওই দিকে ঝুঁকেছেন। ডাক্তারের ছেলেরাও বড় হয়েছে। বড়টি বেশ উঁচুদরের সরকারী চাকুরে। ছোটটি ডাক্তারী পড়ছে। চারু ডাক্তার লোকটি সাচ্চা। দিল-খোলা মানুষ হ'লেও অত্যন্ত হিসেবী লোক। যে লোক মেজার গেলাসে মেপে দুটি আউন্স ব্র্যাণ্ডি সান্ধ্যবেলা নিয়মিত পান ক'রে তার হিসেবের কথা বিস্তারিত ক'রে বলার প্রয়োজন নাই।

এ অঞ্চলে অনেক ডাক্তারেরই কিছু-না কিছু ব্যাড-ডেট্ অর্থাৎ অনাদায়ী বাকী থেকে গেছে কিন্তু চারু ডাক্তারের খাতায় হিসেবে যেমন একচুল গলদ থাকে না—তেমনি পাওনাও এক পয়সা আনাদায় থাকে না। তাঁর কম্পাউণ্ডার প্রতিমাসেই দুচার নম্বর বাকীর জন্য তামাদীর মুখে ইউনিয়ন কোর্টে গিয়ে নালিশ দায়ের ক'রে আসে। এ বিষয়ে কেউ কেউ অনুযোগ করে—কঠোর বলতেও দ্বিধা করে না, কিন্তু চারুবাবু বলেন—লুক এ্যাট জীবন মশায়। ওই বৃদ্ধকে দেখে কথা বলো বাবা। পঞ্চাশ হাজার টাকার বাকী খাতায় লেখা রইল—উইয়ে খেলে। দেখেই শিক্ষা হয়েছে। ঠেকে শিখতে বলো না বাবা। এখনও চারু ডাক্তার যে অল্প-স্বল্প প্র্যাকটিস করেন তা তাঁর নিজের ব্যক্তিগত খরচটা তুলবার জন্য। তাঁর প্র্যাকটিস কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ডিসপেনসারিটিও ছোট হয়ে এসেছে। চারটে আলমারীর মধ্যে এখন ওষুধ মাত্র আছে একটাতে, আর একটার পাঁচটা থাকের মধ্যে তিনটে খালি।

চারুবাবু এই নতুন ডাক্তারখানার প্রস্তাবে খুব উৎসাহী। তিনি আজকের এই ঘরোয়া সভায় সভাপতি। একখানা ইজিচেয়ারে আরাম ক'রে বসেছেন। পাশে একটি পেগ-টেবিল ধরণের চৌকিতে সেই দু আউন্স ব্রাণ্ডি সোডা মিশিয়ে চুমুকে চুমুকে পান করছেন। এবং সকলের মধ্যে তিনিই বেশ স্বচ্ছন্দ। গান শুনে তারিফ করছেন—দুটি একটি মিহি রসিকতাও করছেন ভেবেচিন্তে। অন্য সকলে কিন্তু আড়ষ্ট। সেটা ওই মঞ্জুর জন্যই। এরা সকলেই স্থানীয় লোক, একেবারে পাড়াগাঁয়ের ছেলে। নবগ্রামের ইস্কুলে পাশ করে কেউ বর্ধমানে, কেউ বাঁকুড়ায়, জন তিনেক কলকাতায় ক্যাম্বেলে ও ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলে পড়ে শহুরে হাওয়া গায়ে লাগিয়ে এলেও ঠিক প্রদ্যোতদের আধুনিকতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছিল না। বিশেষ ক'রে মঞ্জু দমকা হাওয়ার মত এসে আবির্ভূত হলেই ওরা ধানখেতের ধান ঝাড়ের মত নুয়ে পড়ছে।

চারু ডাক্তার গানের ব্যাকরণ মোটেই বুঝতে পারেন না। কিন্তু ব্র্যাণ্ডির ঝোঁকে এবং এই নূতন ব্যবসায় উৎসাহে উল্লাসে—মঞ্জুর গানের সঙ্গে চেয়ারের হাতলে বেখাপ্পা তাল মারছিলেন।

প্রদ্যোত আলোর কাছাকাছি বসে কাগজে কলমে হিসেব করছে। প্রদ্যোতের বন্ধু সিগারেটের ধোঁয়ায় রিঙ বানিয়ে চলেছে। তিনশো ক্যাণ্ডেল পাওয়ার পেট্রোম্যাক্সের সাদা গ্যাসের আলোর মধ্যে রিঙগুলি নীলাভ রঙের বাহার তুলে—সামনের লোকগুলিকে বেড় দিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে।

মঞ্জু গাইছিল—

তারার আলোয় তীরের ঠিকানা, যায় হারিয়ে, যায় হারিয়ে।

গান শেষ করে মঞ্জু এক সঙ্গে এক থাক রিড টিপে বেলোর বাতাসের সঙ্গে বহু সুরের মিলিত বেসুরো আওয়াজ তুলে ডালাটা নামিয়ে দিতে তবে চারুবাবুর চমক ভাঙল। বললে—বাঃ চমৎকার!

মঞ্জু না হেসে পারলে না।

চারু ডাক্তার লজ্জা পেলেন না। বললেন—গান আমি বুঝি না মিসেস বোস, এ জীবনটা লাপ্ ডাল, লাপ্ ডাল—করেই গেল। তাল-বেতাল ও তিনতাল এক ফাঁক বুঝবার সময় হল না। তবে বুড়ো বয়সে একখানা বেহালা কিনে শিখবার শখ আমার আছে। এ্যাণ্ড একখানি মাত্র গান বাজাতে শিখব—"হেসে নাও দুদিন বই তো নয়, কে জানে কখন কার সন্ধ্যা হয়।" মারভেলাস গান। আর একখানি গান—সে আমাদের ছেলেবেলার গান মিসেস বোস! সে গান আজকের গানের কাছে হারবে না। বুঝেছেন—"সম্মুখে রাঙা মেঘ ক'রে খেলা, তরণী বেয়ে চলো না—হি বেলা। আধো আধো দেখা যায় কণকভূমি—সেথা কি তরী বেয়ে যা-বে তুমি?"

হঠাৎ হাসপাতালের ফটকে চারপাঁচজন লোক এসে ঢুকল। একটি মেয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছে।—ওরে সোনারে, ও মানিকরে! ওরে বাবারে!

প্রদ্যোত ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন।—এত রাত্রে এমন বুকচাপড়ে কাঁদছে—হাসপাতালে ছুটে এসেছে—নিশ্চয় এ্যাকসিডেণ্ট। ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের কেস। কিন্তু এখানে ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড মানে দুটি বেড এখন। একটি বেডই ছিল—প্রদ্যোত এসে অনেক চেষ্টা ক'রে—কিশোর বাবুকে দিয়ে চেষ্টা করিয়ে আর একটা বাড়িয়েছেন। থানা হেলথ সেণ্টার হলে পাঁচটা বেড হবে। কিছু নূতন ব্যবস্থাও করেছেন। কিন্তু ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের সব থেকে বড় প্রয়োজন—রক্তের। রক্ত কলকাতার ব্লাড ব্যাঙ্কে—দেড় শো মাইল দূরে।

—আমি আসছি। দেখি কি হ'ল! প্রদ্যোত চলে গেল।

চারুবাবু বললেন—এমন কর্তব্যপরায়ণ লোক আমি দেখি নি। আমিও একসময় এখানে ছিলাম তো। আমারও খুব কড়াকড়ি ছিল। বুঝলেন মিসেস বোস—আমিও খুব কড়া লোক ছিলাম। তবে করব কি? সে কালই ছিল আলাদা। তখন হাসপাতাল ছিল বাবুদের, ডি-বি গ্রাণ্ট ছিল এই পর্যন্ত। বাবুরাই হর্তাকর্তা বিধাতা। ডিসপেনসারিতে কাজ করছি, বাবুদের কল এল, আসুন আরজেণ্ট। কি করব, যেতে হল। গিয়ে দেখি ছোট ছেলে খুব চীৎকার করছে। তারস্বরে। বাবুর মেয়ের প্রথম ছেলে, বারো বছরের মেয়ের ছেলে—বুঝছেন ব্যাপার?

—বারো বছরের মেয়ের ছেলে? মঞ্জুর বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

—তার আর আশ্চর্য কি? সে আমলে এ তো হামেসাই হ'ত। এগার বছরের মেয়ের ছেলে আমি দেখেছি। চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে না হলে সেকালে হায় হায় পড়ত সংসারে। আর ছেলে হল না। দেবতাস্থানে মানত করত।

মঞ্জু বললে—আমার মায়ের মায়ের মা, great-grandma—তার ছেলে হয়েছিল তের বছরে; আমার মায়ের মা। তাই শুনি যখন তখন আশ্চর্য হয়ে যাই। সে বুড়ী—আজও বেঁচে আছে। ওঃ, যা কালা হয়েছে বুড়ী।

ভিতর থেকে ঠাকুরটা চীৎকার ক'রে উঠল—ভয় পেয়েছে লোকটা। বু-বু করে চেঁচাচ্ছে।

মঞ্জু দাঁড়িয়ে উঠে ছুটল। সঙ্গে সঙ্গে প্রদ্যোতের বন্ধুও ছুটল।

চারু ডাক্তার বললেন—কি হ'ল, চোর টোর না কি?

হরেন বললে—কি জানি?

—না, কড়াই কড়াই উল্টে ফেললে পারে?

সকলেই সচকিত হয়ে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

ডাকলেন চারুবাবু শেষ ব্রাণ্ডিটুকু পান করে—ও মশায়! ও মিসেস বোস!

ওদিকে ভিতরে হাউ হাউ করে কি বলছে ঠাকুরটা। কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না। প্রদ্যোতের বন্ধু ধমকাচ্ছে। ডাক্তারের বউ খিল খিল করে হাসছে।

চারু ডাক্তার বললেন—বলি হরেন।

—আজ্ঞে।

—এ মেয়েটা কি হে? কি হাসছে দেখ তো? আবার বন্দুক নিয়ে কি শীকার করে!

হরেন বললে—হ্যাঁ, সাইকেলও চড়েন।

চারু ডাক্তার এবার বললেন—এ একটা গেছো মেয়ে! ডাক্তারটি লো ভালো কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই গেছো মেয়ের পাল্লায় পড়ে গাছে উঠে না বসা হয়; লেজ না গজায়!

সব ডাক্তারেরাই হেসে উঠল।

চারু বাবু মাথার টাকে হাত বুলিয়ে সরস হেসে বললেন—কিন্তু ওরা আছে বেশ। কপোত কপোতী সম। বেশ! হাসছে খেলছে গাইছে। বেশ আছে! মাঝে মাঝে মনে আপশোষ হয় হে। বলি এ কালে জন্মালাম না কেন? ডাক্তার এবার নিজেই হেসে উঠলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খিল খিল ক'রে হেসে যেন বর্ষার ঝরণার মত ঝরে পড়তে পড়তে ওদিক থেকে বেরিয়ে এল প্রদ্যোত ডাক্তারের গেছো বধূটি। ডাক্তারের বন্ধুও হাসছিল, সে বললে—ইডিয়ট কোথাকার! কাণ্ড দেখুন তো!

চারু ডাক্তার বললেন—হল কি?

মঞ্জু বললে—ভূত। চারু বাবু—ভূত এসেছিল। আবার সে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে লাগল।

—ভূত! শশী ডাক্তারের আমেজ ছুটে গেল।

—হ্যাঁ। চাকরটা ঘরে খাবার জায়গা করছে ওদিকে রান্নাঘরে ঠাকুর গরমমশলা বেটে মাংসের সঙ্গে গুলে দিচ্ছে; সারি সারি থালা বাটি সাজানো। হঠাৎ টুপ্ টাপ্ শব্দে ঢিল পড়তে শুরু করে। ঠাকুর তাইতে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, আপাদমস্তক সাদা কাপড় পড়ে কে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই বলেছে—এঁকটু মাংস দেঁ! এঁকটু—দেঁ! বাস্—ঠাকুর অমনি বু-বু ক'রে উঠেছে।

প্রদ্যোতের বন্ধু বললে—আমার ইচ্ছে হল ব্যাটার গালে ঠাস ক'রে চড় কষিয়ে দিই গোটা কয়েক।

চারু ডাক্তার বললেন—উঁহু। এতটা উড়িয়ে দিলে চলবে না। জায়গাটা ভাল নয়। বহু লোকে বহুবার ভয় পেয়েছে এখানে। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বড় গাছ ছিল। সেখানে নানা প্রবাদ ছিল। আর হাসপাতাল যেখানে—ওখানটা তো ছিল মুসলমানদের কবরস্থান। ওই ভয়ে হাসপাতালে সেকালে রোগী হ'ত না। গোটা সাত বছরে সাতটা রোগী হয় নি। যা গোটা চারেক হয়েছিল—তাও মরণদশায় ভিখিরী আর নাকারি—গোটা দুয়েক এ্যাকসিডেণ্ট কেস—প্রায় আনক্লেমড্ প্রপার্টির মত। সে সব ওই কিশোরবাবুর সোসাল সার্ভিসের দল কুড়িয়ে বাড়িয়ে ভরে দিত। একটা ছাড়া মরেছেও সব কটা। এবং সব রোগীতেই ভয় পেত।

মঞ্জু আবার খিল খিল ক'রে হেসে উঠল, বললে—আপনি ভূত বিশ্বাস করেন নাকি ডাক্তারবাবু ?

চারুবাবু বললেন—হ্যাঁ। মানে, করি আবার করিও না। করি না আবার করি দুইই বটে। মানে, কি যে আছে কি যে নাই—এ ভারী মুস্কিল।

প্রদ্যোত ফিরে এলেন। গম্ভীর মুখ। আস্তিন পর্যন্ত জামা গুটানো। ডিস-ইনফেকট্যাণ্টের মৃদু গন্ধ উঠছে। চেয়ারের উপর বসে প'ড়ে বললে—ছোট ছেলে, ছ সাত মাস বয়স। গরম দুধে পড়ে একেবারে—।

চারু ডাক্তার আপনার অজ্ঞাতসারেই একটা জৈবিক যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে উঠলেন—আঃ !

অন্য সকলে শিউরে উঠল। উঃ !

প্রদ্যোতের বন্ধু প্রশ্ন করলে—টি কবে ?

—মরে গেছে। টেবিলের উপরে শোওয়াবার পর মিনিট কয়েক ছিল। ওই তারপর বার কয়েক স্প্যাজম—ব্যস। আমি আর করি নি কিছু। শুধু দেখলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

মঞ্জু স্থির হয়ে গিয়েছে। তার সকল চঞ্চলতা, হাসি, কৌতুক—সব যেন শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রদ্যোতের বন্ধু বললে—এখানে আবার আর এক হাঙ্গাম !

—হাঙ্গাম? মানে?

—তোমার ঠাকুর ভূত দেখেছিল। বু-বু শব্দে চীৎকার করে—সে এক কাণ্ড!

—ননসেন্স! বদমাইসী করছে বেটা! বোধ হয় মাংসটাংস সরিয়েছে। পরে বলবে ভূতে খেয়ে গেছে।

চারু ডাক্তার বললেন—উঁহু। সব ওরকম ক'রে উড়িয়ে দেবেন না! উঁহু।

প্রদ্যোত হেসে উঠল।—আপনি ভূত মানেন নাকি?

চারু ডাক্তার বললেন—মানি মানে? এই গোরস্থানে—ওদিকে একটা মানুষের বাচ্ছা ম'ল অপঘাতে, এদিকে মাংসের গন্ধে ঘরে ঢেলা পড়ল; খোনাসুরে কথা কইলে। ব্র্যাণ্ডির আমেজ কেটে গেল। দিন, এখন আমাকে আর এক আউন্স ব্র্যাণ্ডি দিন। সব মাটি। এক আউন্সের বেশী না। ব্যস্ ব্যস্।

প্রদ্যোত গ্লাসটি বাড়িয়ে দিয়ে বললে—সে যা হোক—ভূত থাক বা না থাক মারামারি নাই। এদিকের কথা বলুন। তা' হ'লে আমাদের এদিকের সব ঠিক তো!

—হ্যাঁ। ঠিক বই কি। না কিহে সব?

—তা হ'লে কাগজখানা দেখুন—সই করে দিন!

—আপনি পড়ুন ডাক্তার। ইউ সি—ব্র্যাণ্ডি খেয়ে চালশের চশমা চোখে দিলে বড্ড বেশী উঁচু নিচু লাগে আমার। আরে, ওই জন্যে রাত্রে কল এলে আমি যাই না। নে-ভার। রাত্রে রোগী মরলে চারু ডাক্তার ইজ নট রেসপন্‌সিবল। পড়ুন—আপনি পড়ুন।

প্রদ্যোত বলে গেল। কোম্পানীর নাম হবে নবগ্রাম কো-অপারেটিভ মেডিকেল স্টোর এ্যাণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবোরেটরী।

চারু ডাক্তার বললেন—গুড।

ক্যাপিটাল পাঁচ হাজার টাকা। শেয়ার দশ টাকা হিসেব। চারুবাবু একশো শেয়ার নিচ্ছেন। মঞ্জু বোস—এক শো। আমার বন্ধু নির্মল সেন—একশো। হরেনবাবু পঞ্চাশ।

—না মিঃ বোস। আমার পঁচিশ করুন।

—কেন হে হরেন? তোমার তো চলতি ভাল হে। জীবন মশায় তোমায় ডেকে ইনজেকশন দেওয়াচ্ছেন, ওদিকে রতনবাবুর ছেলে বিপিন-বাবুর এ্যাটেণ্ডিং ফিজিশিয়ান তুমি, এই দুটো কেসেই তো তোমার পঞ্চাশের দাম উঠে যাবে হে!

হরেনের মুখখানা লাল হয়ে উঠল। কুরনাহারের ডাক্তার হরিহর পাল—এতক্ষণে বললে—তা, রামহরিকে জীবন মশায় আর হরেনবাবু বাঁচিয়েছেন খুব। আমাকেই প্রথম ডেকেছিল পাগলা শশী। একেবারে সরাসরি কথা বলেছিল। উইল একখানা করে রেখেছে রামহরি—তাতে সাক্ষী হতে হবে তোমাকে। টিপ সই আমরা দিয়ে নোব। তুমি সাক্ষী হয়ে যাও। হাঙ্গামা হুজ্জুত কিছু হবে না, ভয় কিছু নাই। যদি হয় বলবে—সজ্ঞানেই টিপ সই করেছে রামহরি; টনটনে জ্ঞান ছিল। পঞ্চাশ টাকা—শেষে বলে একশো টাকা। কিন্তু আমি বললাম—ওতে আমি নাই শশীবাবু। মাফ করবেন আমাকে। টাকায় আমার কাজ নাই। আমি যা দেখেছিলাম—তাতে তো প্রায় শেষ অবস্থা।

চারুবাবু বললেন—ওইটেই জীবন মশায়ের ভেল্কী। আমি ভেল্কী বলি বাপু। বুঝেছ না। রোগটা ঠাওর করতে পারে। তা পারে। নাড়ীজ্ঞানই বল—আর—বহুদর্শিতাই বল—যাই বল—লোকটা এগুলো প্রায় ঠিক ঠিক বলে দেয়। আর লোকটির গুণ হচ্ছে ধার্মিক। মিষ্টভাষীও বটে।

প্রদ্যোত ডাক্তার বললেন—আমি কিন্তু কথার মধ্যে একটু ইণ্টারাপ্ট করছি। আমরা আসল কথা থেকে সরে যাচ্ছি। আমাদের কাজটা পাকা ক'রে নিতে হবে।

হরেন বললে—আমার তা হ'লে চল্লিশখানা শেয়ার লিখুন।

চারুবাবু বললেন—তোমার দশখানার দাম আমি এখন দিয়ে দেব হে। তুমি আমাকে মাসে মাসে দিয়ো। যাও যাও আপত্তি কর না। বাস্ খতম। ওয়ান টু—থ্রি।

টেবিলের উপর চড় মেরে হাসতে লাগলেন। তারপর আবার বললেন—এই তো সাড়ে তিন হাজার উঠে গেল। বাকী দেড় হাজার

রইল—এরা দিক—এরা রয়েছে পাঁচজনে, ওরা দুশো করে—মানে কুড়িখান ক'রে দেবে। আর বাকী পাঁচশো—আমি বলি ওপেন থাক। দু চারজন কোয়াক আছে—তারা যদি—

প্রদ্যোত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—আমি কিন্তু এর বিরোধী ডাক্তারবাবু।

টাকে হাতে বুলিয়ে চারুবাবু বললেন—আপনার এখন নতুন রক্ত প্রদ্যোতবাবু। অনেক কোয়াক ভাল চিকিৎসা করে, তাদের ভাল প্র্যাকটিস, তাদের টানুন। এই ধরুন জীবন মশায়—

বাধা দিলেন প্রদ্যোতবাবু। বললেন—এ নিয়ে তর্ক আমি করব না। কিন্তু এ ইনস্টিটিউশন খাঁটি পাশ করা ডাক্তারদের। এখানে খাঁটি সায়ান্স ছাড়া ভেল্কীকে আমরা প্রশ্রয় দেবার কোন দরজা খোলা রাখব না। ডাক্তারবাবু, আপনি অস্বীকার করবেন না যে, এখানে এখনও দৈব ওষুধ অনেক চলে। কবচ মাদুলী চলে। এই তো আপনাদের এখানকার ধর্মঠাকুরের বাতের তেল ওষুধের খুব খ্যাতি। কলকাতা থেকে লোক আসে। কিন্তু আপনি ডাক্তার হয়ে—প্রেসকৃপশনে অবশ্যই লিখবেন না—ধর্মঠাকুরের তেল—এক আউন্স। এবং সে তেলও আপনি এই ডাক্তারখানায় রাখতে বলবেন না। কবচ মাদুলীও আমাদের মেডিকেল স্টোর থেকে অবশ্যই বিক্রী হবে না।

—আপনি আমাকে দমিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। চারু ডাক্তার ঘাড় নাড়তে লাগলেন।—যুক্তি আপনার কাটবার উপায় নেই। উকীল হলে—আপনি ভাল উকীলও হ'তে পারতেন। কিন্তু—

—বলুন কিন্তু কি? খুব গম্ভীর মুখেই প্রদ্যোত প্রশ্ন করলেন। এবং টেবিলের উপর হাত রেখে চারুবাবুর দিকে একটু ঝুঁকেও পড়লেন—আগ্রহ প্রকাশ করে।

হেসে ফেলেলেন চারুবাবু, বললেন—কিন্তু এটা এমন কিছু নয়, মানে ভাবছিলাম—আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া অবশ্যই হয়—তাতে জেতে কে?

সমস্ত মজলিসটাই হো-হো ক'রে হেসে উঠল। মিসেস বোস হেসে উঠল সর্বাগ্রে।

হাসি একটু কমে আসতেই চারুবাবু বললেন—তবে ওই পঞ্চাশটি শেয়ার পাব্লিকের জন্যে খোলা রাখ। কেউ একটার বেশী শেয়ার পাবে না। যারা কিনবে তারা ওষুধ পাবে একটা কনসেশন-রেটে।

—তাতে আমি রাজী। এবং ওটাকে বাড়িয়ে পঞ্চাশের জায়গায় একশো করার পক্ষপাতী আমি।

—বাস-বাস। দিন সই ক'রে দি। নাও, সব সই কর।

সই ক'রে চারু ডাক্তার কাগজখানা প্রদ্যোত ডাক্তারকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—খাবার দেরী কত মিসেস বোস? অন্নপূর্ণার দরবারে শিব ভিখারী—তাকে চুপ ক'রেই হাত পেতে থাকতে হয়। কিন্তু শিবের চ্যালারা হ'ল ভূত। তারা ক্ষিদে লাগলে মানবে কেন।

—হয়ে গেছে। জায়গা করতে বলে এসেছি। হয়ে যেত এতক্ষণ। ঠাকুরটা যে ভয় পেয়ে মাটি করলে। চাকরটা তাকে আগলাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে সব এ ঘরে এনে তবে জায়গা করবে।

—ওই দেখুন। ভূতের চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে।

—দেখছি আমি।

—দাঁড়ান।

—কি?

—আমি বলি কি, মাংসটা—। ওটা না খাওয়াই ভাল।

—মাংস বাদ দেব? আপনি কি পাগল হলেন ডাক্তারবাবু?

—উঁহু। মুসলমানের কবরখানা—তার উপর মুর্গীর মাংস—। উঁহু। মানে ভূত মানি চাই নাই মানি, আমরা ডাক্তার—ভূত মানা আমাদের উচিত নয়—মানবই বা কেন? তবে যখন একটা খুঁত হয়ে গেল, মানে বু-বু করবার সময় ঠাকুরটার থুথু টুতু পড়ল কিনা কে জানে—কিম্বা—আরও কিছু হ'ল কিনা—কে বলতে পারে—তখন—কাজ কি? মানে—আমি, মানে আমার ঠিক রুচি হচ্ছে না।

খাওয়ার সময় দেখা গেল মাংসে রুচি সমাগত স্থানীয় ডাক্তারদের কারুরই প্রায় হ'ল না।

প্রদ্যোত ডাক্তার রেগে আগুন হয়ে উঠলেন—ঠাকুরটার উপর।—এ ওর বদমাইসী! আপনারা এটা বুঝতে পারছেন না? একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেছে এইবার। এই রকম একটা ব্যাপার করলে—আপনারা কেউ মাংস খাবেন না। লোকাল লোক—এখানকার বিশ্বাস অবিশ্বাস জানে। ঠিক হিট করেছে। এইবার ব্যাটারা গোগ্রাসে গিলবে!

চারুবাবু বললেন—তাই থাক। ব্যাটারা খেয়েই মরুক। বুঝেছ না, হেভি ডোজে ক্যাস্টর অয়েল ঠুকবে। তবে—বুঝেছ না—আমাদের রুচি মানে বললাম তো। থাক না। যা আসল কাজ তা তো হয়ে গেল।—নবগ্রাম কো-অপারেটিভ মেডিকেল স্টোর এ্যাণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবোরেটরী। এ একটা মস্ত কাজ আপনি করলেন। ক্লিনিক্যাল টেস্ট ছাড়া এ যুগে এক পা এগুনো যায় না। উচিত না। এ্যাণ্ড—আপনি ওই কথাটা যা বললেন সেটা আমি মানি। ঠিক বলেছেন। কবচ মাদুলী দৈব ওষুধে ফল যদি হয়—আমরা প্রতিবাদ করব না কিন্তু ওকে প্রশ্রয় আমরা দেব না।

তাঁরা চলে গেলেন একে একে।

প্রদ্যোত চাকর এবং ঠাকুরকে ডেকে বললেন—কালই দুজনে মাইনে মিটিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

মঞ্জু বললে—এটা তোমার অন্যায় হল।

—না, হয় নি।

—তুমি সে সময়ে ঠাকুরের চেহারা দেখ নি। লোকটা ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। কি, বলুন না মিস্টার সেন?

সেন বললেন—ভয় লোকটা পেয়েছিল প্রদ্যোত, সেটা মিসেস বোস ঠিক বলেছেন। হি ওয়াজ ট্রেম্‌ব্লিং লাইক এ লীফ। পাতার মত কাঁপছিল।

প্রদ্যোত বললেন—তোমাদের কথা মানতে হলে—আমি বুঝব—লোকটা অত্যন্ত ভূতবিশ্বাসী; এটা কবরস্থান—রাঁধছে মুর্গীর মাংস; সুতরাং কবর থেকে ভূত উঠে আসবে এই সব মনে মনে কল্পনা করছিল সন্ধ্যে থেকে; এবং তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সে ভিশন্ দেখেছে। এ লোককে আমি হাসপাতালে রাখতে পারব না। আমার রোগীরা ভয় পাবে। কাল ভোরেই ওদের চলে যেতে হবে।

(ছাব্বিশ)

সমস্ত রাত্রি জীবন মশায় ঘুমান নি। মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়েছে। শশাঙ্ক, শশাঙ্কের স্ত্রী, বনবিহারী, বনবিহারীর স্ত্রী, আতর-বউ, বিপিন, বিপিনের স্ত্রী, রতনবাবু—যেন তার শয্যা ঘিরে বসেছিল।

তাঁর বাবা বলেছিলেন—নিদান দেবার সময় সর্বাগ্রে অন্তরে অনুভব করতে হয় পরমানন্দ মাধবকে। তাঁর প্রসাদে জন্ম মৃত্যু জীবন মরণ হয়ে ওঠে দিবা এবং রাত্রির মত কালো এবং আলোর খেলা, পরমানন্দময়ের লীলা। তখন সেই মন নিয়ে বুঝতেও পারবে নাড়ীর তত্ত্ব এবং বলতেও পারবে অসঙ্কোচে। জিজ্ঞাসিত না-হয়ে এ কথা বলার বিধি নয়। তবে ক্ষেত্র আছে, যে-ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসিত না হয়েও নিজে থেকেই তোমাকে বলতে হবে। পরমার্থ সন্ধানী বৃদ্ধকে বলতে হবে, বলতে হবে—বিশ্বাস বশে মুক্তির অভিপ্রায়ে বা আপনার বৈরাগ্যকে পরিপূর্ণ করে তুলবার জন্য যদি কোন কাম্যতীর্থে যাবার বাসনা থাকে—তবে চলে যান। কোন গুপ্ত কথা গোপন দুশ্চিন্তার মত অন্তরে আবদ্ধ থাকে—তাকে ব্যক্ত করে নিশ্চিন্ত হোন। কোন ভোগ বাসনা বা মমতা সংক্রান্ত বাসনা যদি মনে অতৃপ্তির আকারে নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের ছলনায় আপনাকে ছলিত করে—তবে তা পূর্ণ করে পূর্ণ তৃপ্তি সঞ্চয় করে নিন।

আর এক ক্ষেত্রে নিজে থেকে বলতে হবে রোগীর আত্মীয়কে—স্বজনকে।

রোগী বৃদ্ধ না-হয়, পরমার্থ সন্ধানী না-হয়, তবু বলতে হবে। কর্মী—সম্পদশালী—যে ব্যক্তি সংসারের সমাজের বহু কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জড়িত, যাঁর উপর বহুজন নির্ভর করে, তার ক্ষেত্রে বলতে হবে তোমাকে। আত্মীয় স্বজনকে বলবে, কারণ ওই মানুষটির তিরোধানে বহুকর্ম বহুজন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে জানতে পেরে তার যতটুকু প্রতিকার সম্ভব—ওই রোগীকে দিয়েই ব্যবস্থা করিয়ে নিতে পারবে। তার কাছে যা জানবার—জেনে নিতে পারবে।

আর এক ক্ষেত্রে বলতে হবে। যে ক্ষেত্রে রোগী প্রবৃত্তিকে রিপুতে পরিণত ক'রে মৃত্যুকে আহ্বান ক'রে নিয়ে আসছে—সেই ক্ষেত্রে তাকে সাবধান করবার জন্য জানিয়ে দেবে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই পরমানন্দ মাধবকে অনুভব করা প্রয়োজন। কিন্তু সে মাধবকে এ জীবনে তাঁর পাওয়া হল না। তিনি কি ক'রে রতনকে বলবেন—?

নাঃ, কালই তিনি হরেনকে বলে আসবেন। এ তিনি পারবেন না। রতনবাবুকে সে যেন বলে দেয়—জীবন মশায়ের মতিভ্রংশ হয়েছে, তিনি আর কিছু বুঝতে পারেন না। বড় ভুল হয়ে যায়। গতকালের নাড়ীর অবস্থা মনে থাকে না। অনেক বিবেচনা ক'রেই তিনি বলেছেন—তিনি আর আসবেন না।

ভোর বেলাতেই বিছানা থেকে উঠলেন তিনি।

আরোগ্য-নিকেতনও বন্ধ করে দেবেন। নাঃ আর না।

মতির-মা সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক। দাঁতু বেঁচে উঠুক।

জীবন মশায় নিচে নেমে এসে প্রাতঃকৃত্য সেরে—দাওয়ায় এসে বসলেন। কায়ক্লেশে চলে একরকম ক'রে যাবে। ঋণদায়ে সব গিয়েও যা আছে—তাতে আতর বউ এবং তাঁর অন্ন-বস্ত্রের অভাব হবে না। প্রাচুর্য নাই, তার প্রয়োজনই বা কি? সাদা ঘোড়া কিনে তার উপর সওয়ার হয়ে—আতর বউকে গয়না পরিয়ে সাজিয়ে—ষোল বেহারার পাল্কীতে চাপিয়ে কান্দী যাওয়ার শখ বা সাধ তো আর নাই। বনবিহারী নাই, তার একটি ছেলে অবশ্য আছে। কিন্তু সে তাঁর কেউ নয়। বনবিহারীর স্ত্রী, তাঁদের পুত্রবধূ বাপ-মায়ের একমাত্র কন্যা—সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী—সে বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। তার ধারণা জীবন মশায় তার স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছিলেন, ডেকে এনেছিলেন। আতর-বউও বাদ পড়ে নি। বধূর সৌভাগ্যের ঈর্ষায় তার দীর্ঘ নিশ্বাসে বধূর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। সুতরাং কারও জন্য কিছু রেখে যেতেও হবে না। সুতরাং কিসের জন্য?

উপার্জন অনেক করেছেন। জীবনে লক্ষ টাকার বেশী উপার্জন করেছেন—সব খরচ করে দিয়েছেন। ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকার মত ওষুধের দাম বাকী পড়ে আদায় হয় নি। মেয়েদের বিয়েতে দেনা করেছেন,—যাদের বাড়িতে দেনা করেছেন—তাদের বাড়ি চিকিৎসা করেছেন—ফিজ নেন নি। আশা করেছিলেন—সুদটা ওতেই কাটান যাবে। কিন্তু তা যায় নি। তারা সুদে আসলে নালিশ ক'রে ডিগ্রী করে সম্পত্তি নীলেম ক'রে নিয়েছেন। আক্ষেপ

নাই তাতে। মশায় বংশই যখন শেষ হল তখন আর সম্পত্তি কি হবে? আর বংশ যখন ছিল—তখনও তো তিনি এই চেয়েছিলেন। যে সম্পদের বিলাস মোহে বনবিহারী এমন হল—মশায় বংশের মহাশয়ত্ব বিসর্জন দিলে—সে তো সর্বনাশ—। সে যাক। তবে হ্যাঁ—যতটুকু জীবনে প্রয়োজন—ততটুকু থাকলে ভাল হ'ত। রাখা তাঁর উচিত ছিল। সে তিনি রাখতে পারেন নি। তিনিও মদমত্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারপর বনবিহারীর মৃত্যুর পর—প্র্যাকটিস বছর পাঁচেকের মত ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাঁচ বছর পর টেনে বের করেছিল ওই কিশোর। আর বের করেছিল অভাব।

হঠাৎ বাইসিক্লের ঘণ্টায় মশায় ফিরে তাকালেন। বাইসিক্ল আজ আর বিরল নয়, অতি সাধারণ জিনিস; যে কোন গ্রামেই পাওয়া যায়। সেকালে এ গাঁয়ে প্রথম বাইসিক্ল এনেছিল বনবিহারী। তিনি এনেছিলেন ঘোড়া! জীবন মশায় তবুও তাকালেন। তাকিয়ে বিস্ময় মানলেন।

পাশাপাশি দুখানি বাইসিক্ল চলেছে। নতুন ডাক্তার এবং ডাক্তারের স্ত্রী! ডাক্তারের সাইকেলের ডাণ্ডায় বন্দুক বাঁধা রয়েছে। ডাক্তারের স্ত্রীর কাঁধ থেকে পৈতের বেড়ের মত কার্টিজ-বেল্ট। শীকারে চলেছে দুজনে। পাগলা শশী সেদিন বলেছিল বটে ডাক্তারের স্ত্রী বন্দুক ছুঁড়তে পারে, শীকার করে। ডাক্তার হাসলেন। ডাক্তার এবং ডাক্তারের স্ত্রীও তাঁর দিকে তাকাচ্ছে—কিছু যেন বলছে।

প্রদ্যোত ডাক্তার নেমে পড়লেন সাইকেল থেকে। ডাক্তারের স্ত্রী খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নামল। ডাক্তার বোধ হয় হঠাৎ নেমেছে।

—নমস্কার। এই বুঝি আপনার বাড়ি?

জীবন মশায় দাঁড়িয়ে উঠলেন; প্রতিনমস্কার ক'রে বললেন—নমস্কার! বাড়ি ছিল এককালে, এখন ধ্বংসস্তূপের কাছে এসে পৌঁচেছে! আমার মতই আর কি! হাসলেন তিনি।

প্রায়-মুছে-যাওয়া সাইন বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন—আরোগ্য-নিকেতন। এইটিই এখানকার বহু বিখ্যাত আপনার ডাক্তারখানা? নাম তো খুব শুনি!

—হাঁ। তা শুনবেন। তবে এখন 'দেখে এলাম শ্যাম সাধের ব্রজধাম—শুধু নাম আছে।' সেই বৃত্তান্তে দাঁড়িয়েছে। আপনারা বুঝি শিকারে চলেছেন?

—হ্যাঁ।

একটু চুপ ক'রে থেকে ডাক্তার বললেন—কাল চারুবাবু ডাক্তার আপনার কথা বলছিলেন। প্রশংসা করছিলেন।

—আর প্রশংসা! হাসলেন জীবন মশায়।

—আচ্ছা চলি। রোদ্দুর উঠলে আর ঝাঁক মিলবে না।

প্রদ্যোত ডাক্তার বাইসিক্লখানা একটু ঠেলেও আবার দাঁড়ালেন। বললেন—যে কথাটা বলব বলে দাঁড়ালাম—

—বলুন। জীবন মশায় মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। এই তরুণ ডাক্তারটির আর একদিনের তীব্র তিরস্কার মনে পড়ে গেল। তেমনি ক্ষেত্র আর একটা এসেছে। দাঁতু ঘোষালের কেস পেয়েছে প্রদ্যোত ডাক্তার। দাঁতু হাসপাতালে আছে, ডাক্তার তাকে আগ্রহ ক'রে ভর্তি ক'রে নিয়েছে। প্রদ্যোত ডাক্তার কথা বলবার আগেই জীবন মশায় বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে সবিনয়েই বললেন—দাঁতুর কথা কি?

প্রদ্যোত চকিত হয়ে মশায়ের মুখের দিকে চাইলেন। একটু হেসেই বললেন—না। ওর কথা বলি নি। সে ব্রাহ্মণ ভালই আছে। হয়ও নি কিছু। ও এখন অনেক দিন বাঁচবে। আমার কথা অন্য।

জীবন মশায় বললেন—মতির মায়ের কেস সার্জারির কেস। পা ভাল হয়ে ফিরে সে হয় তো আসবে। সার্জারির কথা ভাবি নি। কিন্তু দাঁতু অনেকদিন বাঁচবে না ডাক্তারবাবু। হাসলেন তিনি।

প্রদ্যোত ডাক্তার তার মুখের দিকে চেয়ে আবার হাসলেন; প্রচ্ছন্ন কৌতুক ফুটে উঠল তাঁর হাসিতে। বললেন—ও নিয়ে বাদ প্রতিবাদ করব না। দাঁতু মরে গিয়ে আপনার কথা প্রমাণ করবে, না বেঁচে থেকে আমার কথা প্রমাণ করবে সেটা ভবিষ্যতে দেখা যাবে। তবে হঠাৎ অন্য রোগে মরলে কথাটা স্বতন্ত্রই হবে। এবং অনেক কাল পরে মরলেও সেটা অবশ্য আপনি ধরবেন না।

—দাঁতু মাস ছয়েকের বেশী বাঁচবে না।

—থাক ও কথা ডাক্তারবাবু। আপনি প্রবীণ লোক। এখানকার মানীলোক। লোকে আপনার নাড়ীজ্ঞানের সুখ্যাতি করে। দাঁতুর জীবনও মূল্যবান নয়। দাঁতু যেন আপনার কথাই সত্য প্রমাণ করে। আমি তাতে খুশিই হব। তবে এ প্রসঙ্গে সেদিন মতির মায়ের বেলা যা বলেছিলাম সেই কথাই আজও বলব। চিকিৎসা জগতে যুগান্তর হয়ে গেছে। সেকাল থেকে একালের চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে। পেনিসিলিন—স্ট্রেপ্টোমাইসিন—সালফাগ্রুপ সব ওলটপালোট করে দিয়েছে। এ কালে মান্ধাতা আমলের থিয়োরি চালাতে গেলে আপনি উপহাসাস্পদ হবেন জীবনবাবু। তা ছাড়া—

একটু থামলেন প্রদ্যোত। বললেন—মানুষকে মৃত্যুভয় দেখানোর মত নিষ্ঠুরতা আর হয় না। আপনি অতি নিষ্ঠুর। আরও একটু চুপ ক'রে থেকে প্রদ্যোত আবার বললেন—আমার বলবার কথা ছিল কিন্তু অন্য কিছু। কিন্তু সে থাক, এরপর সে আর ভাল লাগবে না।

বলেই সে বাইসিক্লে উঠে চলে গেল।

ডাক্তারের স্ত্রী অপেক্ষা করেই দূরে দাঁড়িয়েছিল—সেও তার অনুসরণ করলে। জীবন মশায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ঠোঁটের ডগায় একটি ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটেছিল, ডাক্তারের শেষ কটি কথায় যেন চমকে উঠে বিলুপ্ত হয়ে গেল সে হাসিটুকু।

দাঁতু বাঁচবে না তিনি জানেন। সে সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ। সে নিজে মৃত্যুকে ডাকছে, প্রদ্যোত তাকে বাঁচাতে পারবে না। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আবার মাসখানেকের মধ্যেই রোগ প্রবলতর আকার নিয়ে দেখা দেবে। পাকস্থলী অন্ত্রপাতি জীর্ণ হয়ে এসেছে। নাড়ী দেখেছেন, সেখানেও জীর্ণতাকে অনুভব করেছেন।

কিন্তু তিনি নিষ্ঠুর!

জীবন মশায় চোখ বন্ধ করলেন। যেন বাইরের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজের অন্তরলোককে সন্ধান করে দেখতে চাইলেন।

তাঁর বাবা বলেছিলেন—রিপুর অধীন মোহে উন্মত্ত রোগীকে সতর্ক ক'রে দেবে। ক্ষেত্র বিশেষে তার মৃত্যু ঘোষণা করে তাকে জানিয়ে দেবে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর এসেছে। পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, সালফাগ্রুপের যুগ!

শ্রাবণের দিগন্তজোড়া মেঘের আস্তরণের মত শ্বাসযন্ত্রের উপর বিস্তীর্ণ নিউমোনিয়ার আস্তরণ কয়েকটি ইনজেকশনের প্রভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বিলীন হয়ে যায়, শরতের প্রসন্ন রৌদ্রালোকিত আকাশের মত শ্বাসযন্ত্র সুস্থ হয়ে উঠে। ক্ষয়রোগ পশ্চাদপসরণ করে। মৃত্যুর রোগবাহিনী পরাভব মানতে বাধ্য হয়। কিন্তু রিপু, নিবৃত্তিহীন প্রবৃত্তি সে কোথায় যাবে? জীর্ণ দেহযন্ত্র? সে কি করে নূতন হবে? পরক্ষণেই হাসলেন জীবন মশায়। তাও হয়। জীর্ণ গ্রন্থির পরিবর্তন করে নূতন গ্রন্থির সংস্থানে তাও হবে। অবশ্য দাঁতুর ক্ষেত্রে দেশ কাল বিবেচনা ক'রে তিনি যা ঘোষণা ক'রেছেন তাই হবে—সে তিনি জানেন। এক্ষেত্রে প্রদ্যোত ডাক্তার ঠকবে।

আবার বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল।

মশায় ভ্রূ কুঞ্চিত করে চোখ মেলে তাকালেন। আবার ফিরে এল? না। ঘণ্টা বাজছে উল্টো দিকে। ডাক্তার যে দিকে গেল সে দিকে নয়, যে দিক থেকে এসেছে, নবগ্রামের দিক থেকে আর কেউ আসছে।

আসছে বিনয়। নবগ্রামের কেমিস্ট এ্যাণ্ড ড্রাগিস্ট—লোকে ঠাট্টা ক'রে বলে—বি-কে। তবে পাল নয় সিন্‌হা। বোধ করি কাল রাত্রে হাসপাতালের ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে তাঁকে যে বলছিল—কাল সকালে যাব, সেই কথা অনুযায়ী এসেছে। বিনয় সাইকেল থেকে নেমেই সভক্তি প্রণাম করে বললে—বুঝলেন, কাল আর সারারাতের মধ্যে ঘুমুইনি আমি। গরম হয়ে গেল মাথা।

বিনয় বিচিত্র ভাবে কথা কয়। বক্তৃতার সুরে, ঝোঁক দিয়ে বক্তব্যের গুরুত্বকে বাড়িয়ে তোলে।

মশায় বললেন—বোস্। তোকে বয়কট—কেন? ব্যাপারটা কি?

—বলছি। মাকে প্রণাম ক'রে আসি আগে।

মশায় এইবার না-হেসে পারলেন না। বললেন—তুই যে ঘনঘটা ক'রে তুললি বিনয়! মা কি তোকে বয়কট আন্দোলন থেকে বাঁচাবে? কেন সকাল বেলা তুই তার মেজাজ খারাপ ক'রে দিবি? সারাটা

দিন তোকে কটু কথা বলবে। সারা দিনের যত খুঁটিনাটির দায় তোর ঘাড়ে ফেলবে!

—উঁহু।

—উঁহু নয় বোস্। প্রণাম করবি পরে। এখন ব্যাপার কি বল।

—তা হ'লে ঘরে চলুন। আসতাম আরও সকালে। তা জানি আপনি দেরীতে ওঠেন। তারপর কিশোরবাবুর ওখানে গেলাম। কাল রাত্রে এসেছেন। তুললাম ডেকে। তাঁকে সব বললাম। তিনি বললেন, তুই চল্ আমি যাচ্ছি।

বিনয় সমস্ত কথা বিবৃত ক'রে বললে—আপনাকে আমার দোকানে বসতে হবে ডাক্তার বাবু। তারপরে আমি দেখব।

—আমি? তোর দোকানে বসব?

—হ্যাঁ। রোগী দেখবেন। প্রেসক্রৃপশন করবেন। যেমন শহরে বাজারে বসে ডাক্তারেরা। কমিশন দেব আমি। যদি বলেন ধরা বাঁধা চাই—তাই দেব আমি। কিশোরবাবু আসছেন, যা বলে দেবেন তাতেই রাজী।

জীবন মশায় বিনয়ের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে নীরবে বসে রইলেন। কি বলবেন তিনি? বিনয়ের অবস্থাটা তিনি বুঝতে পারছেন। এবং বিনয় যা বলছে সেও যে তাঁর পক্ষে আশাতীত কিছু তাও নয়। তবু তিনি বিস্মিত হয়েছেন।

আজই সকালে তিনি আরোগ্য-নিকেতন বন্ধ ক'রে দেব ভেবে উঠেছেন। সেই কথাই ভাবছিলেন। হঠাৎ এল প্রদ্যোত ডাক্তার। তারপর বিনয়। কি বলবেন তিনি ভেবে পেলেন না।

বিনয় কৃতী ব্যবসায়ী—ওষুধের ব্যবসায়ে উপার্জন সে যথেষ্ট করেছে—জীবনে দুঃখও তেমন কিছু পায় নি—বেশী কথা বলা তার স্বভাব। বিচিত্র ভঙ্গিতে অভিনয়ের ভঙ্গিতে নিজের কৃতকার্যতার কথা অনর্গল বলে যায়, বাজারে ব্যবসায়ী মহলে মাতব্বরী করে, আবার নিজের গরজে তোষামোদ করে মনোরঞ্জন করে চমৎকার চাতুর্যের সঙ্গে। সে বলেই চলেছিল—মশায়, আপনি হাতুড়ে আর আমি জোচ্চোর—লোকের

গলায় ছুরি দিয়ে লাভ করি! বলতে মুখে ওদের বাধল না। মশায় বংশের জীবন মশায় এখানকার ধন্বন্তরি—যিনি নাড়ী ধ'রে রোগ ব'লে দেন, রোগের ভোগ ব'লে দেন, নিদান দিতে পারেন, তিনি হাতুড়ে? হায়রে হায়! এখানে যখন ডাক্তার বলতে কেউ ছিল না—তখন কে ছিল এখানে? পাঁচ সালের কলেরা, এগার সালের ম্যালেরিয়া, ষোল সালের রণজ্বর-ইনফ্লুয়েঞ্জা—চব্বিশ সালের কলেরা—

—থাম বিনয়। থাক, ওসব কথা থাক। কথাটা আমি ভেবে দেখি।

—সে বললে, আমি ছাড়ব না মশায়। আমি হাঙ্গারস্ট্রাইক করব। রামহরিকে যমদ্বার থেকে টেনে এনে বাঁচালেন—আপনাকে বলে হাতুড়ে! মশায়, আপনার নাড়ীজ্ঞানের কাছে ওরা লজ্জায় মরে যায়। এতটুকু হয়ে যায়। ব্লাড ইউরিন স্টুল স্পিটাম এতসব ক'রে যা করবে ওরা—আপনি নাড়ী ধ'রে তাই করেন—এ ওদের সহ্য হয় না। বলে ম্যাজিক—ভেল্কী। আমাকে বলে জোচ্চোর; মশায়, আপনি বলুন—এ গরীবের দেশে আমি সামান্য লোক কত ওষুধ খয়রাত করি! কলেরার সময়—ওষুধ টাকা দিই নাই আমি? একত্রিশ সালে ম্যালেরিয়ার সময় কুইনিন নাই চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীতে, সিনকোনা নাই। আমি দিই নাই? বলুন?

তা অবশ্য বিনয় দিয়েছে। সে কথা জীবন মশায় মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবেন। বিনয় এখানকার মহামারীতে, কলেরায়, ম্যালেরিয়ায় গরীবদের বিনামূল্যে ওষুধ দিয়েছে। কিশোরের সে শিষ্য ছিল প্রথম যৌবনে। বনবিহারীর মৃত্যুর পর তিনি চিকিৎসা একরকম ছেড়ে দিয়েছিলেন। ডাকে তিনি বড় একটা যেতেন না। আরোগ্য-নিকেতনে যারা আসত তাদের দেখতেন শুধু। উনিশ শো বাইশ তেইশ গেল নিদারুণ অনাবৃষ্টি। চব্বিশ সালের বৈশাখে সারা অঞ্চলটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বৈশাখে বলে দ্বাদশ সূর্যের উদয় হয়—সে যেন শত সূর্যের উদয়। পুকুর শুকিয়ে গেল—ইন্দারা শুকাল; এখানকার নদী পাহাড়িয়া নদী—বৈশাখে জলস্রোত শীর্ণ হয়ে আসে—সে বৎসরের উত্তাপে নদী শুকিয়ে গেল,—মরুভূমির মত ধু ধু করতে লাগল—অনাবৃষ্টির বর্ষার ফাটা মাঠে মাটি বায়ুস্তরের সর্বাঙ্গে ধুলো হয়ে উড়তে লাগল,

মানুষ জল জল করে হাহাকার করে উঠল—তারই মধ্যে লাগল মহামারী, কলেরা। সে মহামারী যেন শুকনো পাতার জঙ্গলের আগুন। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল সারা অঞ্চলে।

হঠাৎ একদিন কিশোর এসে দাঁড়াল তাঁর দরজায়। তার সঙ্গে কটি ছেলে, তাব মধ্যে ছিল বিনয়। কিশোরকে তিনি তখন অনেকদিন দেখেন নি। কিশোর তখন সেই ছেলেবয়সের মুখরস্বভাব রুচিমুখ ছেলেটি নয় তখন মাজা-ঘষা ধারালো অস্ত্রের দীপ্তি তার সর্বাঙ্গে—তেমনি কঠিন এবং দৃঢ়। প্রথমবার আটক বন্দী থেকে মুক্তি পেয়ে সবে ফিরে এসেছে। এবং ছোট একটি দল নিয়ে এই অগ্নিকাণ্ডের মত মৃত্যু-মারীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিশোর এসে দাঁড়িয়েছিল—মশায়!

ঠিক তিনি চিনতে পারেন নি কিশোরকে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মিনিট খানেক পর বলেছিলেন—তুমি? তুমি কিশোর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়। তবে এখন আর ক্ষীর ছানা চুরি করে খাই না। খেলে পাপ হয় না—তাও বলি না।

একসঙ্গে মশায়ের মনে পড়েছিল বনবিহারীকে এবং কিশোরের বাবা কৃষ্ণদাস বাবুকে। চোখ জলে ভরে উঠেছিল। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করে, মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে তিনি হেসে বলেছিলেন—এখন বুঝি কিশোরীর সঙ্গে গোপসখার মত ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণ রাখতে রণবেশে মথুরার পথে হাঁটছ? না, প্রভুর সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের পথে? কিশোর, বড় আনন্দ হল তোমাকে দেখে। কতকাল তোমাকে দেখিনি। তারপর বল—হঠাৎ আমার কাছে?

পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন—কিশোর! বাবা, বাড়ির সকলে ভালো ত?

—হ্যাঁ, বাড়ির সকলে ভাল। কিন্তু আমি এসেছি আপনার কাছে, এই কলেরা লেগেছে, এখানে ডাক্তার নেই। চক্রধারী ডাক্তার ফি দিলেও কলেরা কেসে যায় না তা—গরীবদের দেখবে কি! আমি একটি সেবক সমিতি করেছি এদের নিয়ে; আমাদের ডাক্তার নাই। আমি শুনেছি—আপনি কলেরা কেসে

ভয় করেন না। আমাদের ছেলেবেলায় যখন এখানে কলেরা হয়েছিল—তখন আপনি গরীব দুঃখীদের বিনা পয়সায় দিন রাত ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করেছিলেন। তাই আমি এসেছি আপনার কাছে মশায়।

তিনি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারেন নি। চুপ ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন—ঠিক আজকের মত। সেই পুরানো কালের—উনিশ শো পাঁচ সালের মহামারীর কথা মনে পড়েছিল। সেই অন্ধ বধির পিঙ্গলকেশিনী দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে; মহাকালের ডমরুতে বেজেছে তাণ্ডব বাদ্য—তারই তালে তালে উন্মত্ত নৃত্যে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলেছে—আর মৃত্যু-ভয়ভীত মানুষ, আগুনলাগা বনের পশুপক্ষীর মত আর্ত কলরব করে ছুটে পালাচ্ছে। ছুটে পালাচ্ছে—পিছনের লেলিহান শিখা বাতাসের ঝাপটায় মুহূর্তে নুইয়ে দীর্ঘায়িত হয়ে তাকে গ্রাস করছে—আকাশে পাখী উড়ে পালাচ্ছে—আগুনের শিখা লক লক জিহ্বা প্রসারিত ক'রে তাকে আকর্ষণ করছে—পাখীর পাখা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে—অসহায়ের মত পড়ছে আগুনের মধ্যে। মহামারীর স্মৃতি তাঁর ঠিক তেমনি।

কিশোর বলেছিল—মশায়!

—কিশোর।

—আপনি বলুন, চলুন আপনি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মশায় বলেছিলেন—বাবা, বনবিহারীর মৃত্যুর পর আজ পাঁচ বছর আমি বাইরে বের হই নি। বের হতে আমার—।

লজ্জা হয় এ কথাটা বলতেও তিনি পারেন নি। অথচ লজ্জাই হত। কেন তা' জানেন না। কিন্তু হয়। শুধু তাঁর একার নয়, সকলেরই হয়। হয় তো লোকে দুর্ভাগা বলবে বলে। করুণার পাত্র বলে বিবেচিত হবেন বলে! হয় তো—। চকিতে বিদ্যুত চমকানোর মত একটা কথা মনে হয়েছিল। হয় তো—লোকে ভাববে—কোন গোপন পাপের জন্য তার এই শাস্তি, সেই কারণে ফেরারী আসামীর মত মানুষ মুখ লুকিয়ে বসে থাকে, ভাবে—এ মুখ আমি দেখাব কি ক'রে?

মানুষের পাপের তো অবধি নাই। প্রবৃত্তির তাড়নায় সে যে অবিশ্বাস্য মর্মান্তিক গোপন কাহিনী রচনা ক'রে যায়—পরে তা স্মরণ করে সে নিজেই

নিজেকে অভিসম্পাত দেয়—মনে মনে ভাবে—আকাশের সূর্য কালো হয়ে যাবে; বলে, কাজ নাই—আলোতে আর কাজ নাই। অন্ধকারে ঢাকা থাক।

তরুণ যুবক মৃত্যুশয্যায়—গভীর রাত্রি; তিনি জেগে বসে আছেন নিচের তলায়। নির্দিষ্ট সময়ে রোগীর অবস্থার কথা জানবার প্রতীক্ষা করছেন, সংবাদ না-পেয়ে উপরে উঠবার সময় লজ্জায় ঘৃণায় থমকে দাঁড়িয়েছেন। যুবকের প্রৌঢ় পিতা—যৌন লালসা চরিতার্থ করছেন।

সঙ্গিনী—কোথাও রোগীর বিমাতা। কোথাও বাড়ির পাচিকা বা পরিচারিকা। কোথাও দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়া। শুধু গর্ভধারিণী জননীর পুণ্য অক্ষয়। ভাই-ভাগ্নে—ভাইপো—এদের কথা তিনি ধরেন না। পুত্রকেও ক্ষমা করেন তিনি।

স্বামী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, স্ত্রীকেও ব্যাভিচার করতে দেখেছেন। অবশ্য ভ্রষ্টা স্ত্রী। যারা ভ্রষ্টা নয়—তাদের দেখেছেন মাছ খেতে। বহু ক্ষেত্রে বাড়ির লোকে খাইয়েছে—অনেক ক্ষেত্রে গোপনে চুরি করে খেয়েছে। রোগীর শিয়রের ফল-পথ্য চুরি ক'রে খাওয়া তো সাধারণ ব্যাপার।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত গৃহস্বামীর চাবী খুলে নিয়ে টাকা সরানোর কথা ধরেন না তিনি। ভাই ভাইকে ফাঁকি দেবার জন্যে সরায়, এমন কি মা—পুত্র পুত্রবধূকে বঞ্চিত করবার জন্যে সরায়।

তবু সূর্য ওঠে—তার কারণ বোধ করি এই কিশোরের মত মানুষদের পুণ্য। সে পুণ্যও তো কম নয় পৃথিবীর। ওরাও যে আছে। গুরু রঙলাল ডাক্তারকে মনে পড়ল। বাবাকে মনে পড়ল। তিনি সেদিন আর দ্বিধা করেন নি, উঠে দাঁড়িয়েছিলেন—বলেছিলেন—বেশ, যাব। তুমি ডাক দিলেই আমি যাব।

কিশোর বলেছিল—সকালে একবার গিয়ে বসবেন আমাদের সেবা-সমিতির আপিসে; পাড়া পাড়া ঘুরে দেখে আসবেন। আবার বিকেল বেলা একবার।

—বেশ তাই হবে। কিন্তু এরা কে কে বলতো? পাঁচ বছরে এরা সব বড় হয়ে উঠছে—চিনতে পারছি না।

তাদের মধ্যেই ছিল বিনয়। ওষুধের নতুন দোকান করেছেন শশধর ঘোষ, তাঁরই ছেলে।

নেপালের ভাই সীতারাম তখন মারা গেছে। তারই ওষুধের দোকান কিনেছেন শশধর ঘোষ। ঘরে বসেও সে কথা তিনি জানতেন। শশধর ঘোষের ওখান থেকেই তখন তিনি অল্পসল্প ওষুধ কিনে আনতেন। বিনয় তাঁকে প্রণাম করেছিল। মশায় বলেছিলেন—তবে তো আমার মহাজন।

বিনয় তার বাপের দোকান থেকে সেবা সমিতির প্রয়োজন মত ওষুধ জুগিয়েছিল—বিনামূল্যে। বিনয় মিথ্যা অহঙ্কার করে নি।

*　　　*　　　*

বিনয় বকেই যাচ্ছিল মনের আবেগে। আঘাত পেয়েছে সে, তার উপর এটা তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা। সে তো সহজে হার মানবে না।

বিনয় বলছিল—সে কবিরাজী ওষুধ রাখবে, হোমিওপ্যাথি রাখবে, মশায়ের ফর্দমত তাঁর টোটকার বক্কেল সংগ্রহ ক'রে রাখবে। ওরা ক্লিনিক করছে করুক, তার ক্লিনিক মশায়ের নাড়ীজ্ঞান। যত সব বাজে—পয়সা রোজকারের নতুন নতুন বিলিতি ফন্দী! ও এখানে চলবে না।

মশায় বললেন—না-না-না। ওসব বলিস নে বিনয়। ও বলতে নাই। ও একটা বড় জিনিস। আমাদের নাড়ীজ্ঞানের চেয়েও বড়। হ্যাঁ, বড় বলতে হবে বই কি।

ঘাড় নাড়তে লাগলেন মশায়। যেন বার বার ক'রে স্বীকার করলেন। —নাড়ীজ্ঞান তো সবারই সমান হয় না রে। ও হ'য় যার যেমন ধ্যান সিদ্ধি তার তেমন। কিন্তু ওই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সবারই সমান সুবিধে। ভুল ভ্রান্তির পথ থাকে না।

—ও আমি মানি না মশায়। বিনয় ঘাড় নেড়ে উঠল।

—জীবন!

বৃদ্ধ সেতাব এসে উঠলেন।

—সকালে সেতাব? শরীর ভাল তো? গিন্নী ভাল আছে তো?

গতকাল রাত্রে সেতাব এখান থেকে তালের বড়া ও ক্ষীর ছাঁদা নিয়ে গিয়েছিলেন—কথাটা মনে পড়ে গেল মশায়ের। ভাবনা সেতাবের জন্য নয়। ভাবনা তার স্ত্রীর জন্য—সেতাবের পত্নীপ্রেম এবং পত্নীর লোলুপ রসনার জন্য।

—নিশি ঠাকরুণের ভাইঝিটি মারা গেল। নিশির কান্না সে তো বুঝতে পারিস! চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় করেছে। দুনিয়ার লোককে গাল পাড়ছে, চোখে এক ফোঁটা জল নাই, সহ্য হ'ল না। একেবারে বাড়ির দরজায়। কি করব পালিয়ে এলাম।

জীবন মশায় বললেন—চিকিৎসা কে করছিল? শশী?

—শশী নয়, হরেন। হরেনের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছে। বলছে—জীবন মশায় জলবারণ খাওয়াতে বলেছিল, কেন খাওয়ালাম না রে!

—জলবারণেও বাঁচত বলে মনে হয় না। তবে সূচিকাভরণ আমাদের এ মতে শেষ ওষুধ, তাই দিতে চেয়েছিলাম। তবে এ কালে স্ট্রেপ্টোমাইসিন অদ্ভুত ওষুধ। হরেন দিয়েছিল কি না কে জানে।

পরক্ষণেই হেসে বললেন—রোগের মধ্যে মৃত্যু এসে আসন পাতলে তখন ওষুধে কিছু হয় না।

চাকর ইন্দির এসে দাঁড়াল।—চা এইখানে আনব? না—

—এইখানেই নিয়ে আয়। তিন কাপ।

—মা বকছে। চিনি নাই।

বিনয় বলে উঠল—গুড় দিয়ে আন। ও বেলা আমি পারমিটে হোক ব্ল্যাকে হোক আড়াই সের চিনি পাঠিয়ে দেব। যা—মাকে বল গিয়ে। চল আমিই যাই।

জীবন মশায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—বিনয়।

—আসছি। আমি এলাম বলে। দেখুন না, দু মিনিট মাকে আমি গলিয়ে মা গঙ্গা করে দিয়ে আসছি।

—ওরে! শোন্ শোন্ তালগাছের কথা বলিসনে যেন।

বিনয় ততক্ষণে বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকেছে। সাড়া পাওয়া গেল না। মশায় বললেন—কি বিপদ!

সেতাব বললেন—তালগাছ? অ, লাইকারের পাড়ের তালগাছ কিনতে এসেছে বুঝি।

—না, আজ এসেছে অন্য কথা নিয়ে কিন্তু তালগাছ একটা আগে চেয়েছিল। আমি গিন্নীর কথা বলে বলেছিলাম দেবেন না তিনি। ও যেতে

চেয়েছিল গিন্নীর কাছে সেবার, তাও দিই নি। ওকে তো জানিস। যা হড়বড়ে ; হয় তো বলবে। গিন্নী ভাববে আমি পাঠিয়েছি।

জীবন মশায়ের লাইকার পুকুরে পঁচিশটি তালগাছ আছে। সোজা এবং সুদীর্ঘ আর বহুপুরানো। এ অঞ্চলে গাছ কটির খ্যাতি বহুবিস্তৃত এবং সর্বজন স্বীকৃত। এমন পাকা সোজা তালগাছ একালে সুদুর্লভ। ওই গাছ ক'টি আতর-বউয়ের সম্পত্তি, তাঁর বক্ষপঞ্জর বললেও অত্যুক্তি হয় না। যুদ্ধের আগেই এ সব গাছের দাম ছিল তিরিশ টাকা। এখন আশী নব্বই টাকা লোকে হাসিমুখে দিতে চায়। কিন্তু আতর বউ তা দেবেন না। ছন্নমতি লক্ষ্মীছাড়া ভাগ্যহীন স্বামীর উপর তাঁর আস্থা নাই। পঁচিশটির দশটি নিজের এবং দশটি স্বামীর পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য রেখেছেন। পাঁচটি রেখেছেন আপৎকালের জন্য।

জীবন মশায় হেসে বলেন—কুড়িটি হল ভবসাগর পারের ভেলা। আর পাঁচটি হল শেষ বয়সে খানা খন্দ পার হওয়ার নড়ি। ও আতর-বউ দেবে না।

—বিনয়ের বিনয় আছে—কথাগুলি সবিনয়েই নিবেদন করে কিন্তু মতলবে ও দুর্নিবার এবং ছদ্মরূপে দুর্বিনীত। ও যা হয় করবে। ওকে আটকাতে যখন পারি নি তখন আর দুশ্চিন্তা করে লাভ নাই। কিন্তু তোকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি সেতাব। বিনয় বলছে—।

সমস্ত শুনে সেতাব বললে—বিনয় ভালই বলছে জীবন। এতে তুই না করিস না।

—আমার আর ইচ্ছা নাই সেতাব।

—কিন্তু লোকে তো তোকে ছাড়বে না। আজও তো তোর দোরে লোক আসছে।

—ওই তো এতবড় হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে—ওটা হলেই লোকে আর আসবে না। তার থেকে আগেই ছাড়া ভাল নয় ?

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সেতাবের পক্ষে সহজ নয়। সেতাব শুধু বললে—তাইত।

ঠিক এই মুহূর্তে এল কিশোর।

তার দেরী হয়ে গিয়েছে। হাঙ্গামার কথা আর কত বলবে? নিশি ঠাকুরুণের ভাইঝি মরেছে—তার সৎকারের ব্যবস্থা করে আসতে হয়েছে। তারপর পথে হাসপাতালের ফটকে আর এক হাঙ্গামা। দাঁতু বলছে—এখানে ভূতের উপদ্রব হয়েছে। এখানে থাকলে মরতে হবে। সে কিছুতেই থাকবে না। অন্য রোগীরা কিছু বলতে পারছে না কিন্তু সবারই মনের কথা তাই। ডাক্তারের চাকর পালিয়েছে। ঠাকুরটাই খুব ভয় পেয়েছিল—তার তো জ্বর হয়েছে। সে কাঁদছে। তার ধারণা সে মরে যাবে।

—তারপর দেরী আপনার জন্যে।

—আমার জন্যে?

—তা বই কি। আপনার ক্লায়েন্ট রামহরি এসেছে—উইল তৈরী করাচ্ছে। চাৎকার করছে। আসছে সে আপনার কাছে। বাজারে হরেনের ডাক্তারখানায় বসে সে প্রায় চারণ কবির মত আপনার জয়গান করছে। ওদিকে শশী প্রচুর মদ্যপান ক'রে তার সঙ্গে তর্কার লড়াই লাগিয়েছে।

জীবন মশায় বললেন—উইল কি করছে শুনেছ? সেই মেয়েটাকে—নতুন পরিবারটাকে—কিছু দিচ্ছে তো?

কিশোর বললে—সে আপনাকে দেখিয়ে সাক্ষী করিয়ে নিয়ে যাবে।

(সাতাশ)

কিশোরই মশায়ের সকল আপত্তি ভাসিয়ে দিলে, সকল দ্বিধা ঘুচিয়ে দিলে, বললে—ও হবে না মশায়। এখন আপনাকে ছাড়তে পারব না। সমর্থ রয়েছেন, নাড়ীজ্ঞান রয়েছে টনটনে—আপনাকে ছাড়লে এখন চলবে না। বিনয়ের জন্যও আপনাকে বসতে হবে। ডাক্তাররা ডাক্তারখানা ক্লিনিক করছেন করুন, একটার জায়গায় দুটো হল—ভাল হ'ল। কিন্তু একটার জন্যে আর একটা উঠে যাবে এ হতে পারে না।

কিশোর বিচিত্র মানুষ। এক ধাতের পাগল। পাগল না হলেও উদ্ভট মানুষ। সমস্ত জীবন জেল খাটলে—আজীবন কুমার রয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মন্ত্রী হল না, আইন সভার সভ্য হল না, সেই পরের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। ওর জীবনের মত কথাবার্তাও বিচিত্র। সে বলে দেশের কথা। বলে—এ ডাক্তারদের আমি শ্রদ্ধা কম করি না মশায়। বিশেষ করে প্রদ্যোত ডাক্তারের মত মানুষকে। একালের চিকিৎসা বিজ্ঞানকে তো অস্বীকারের উপায় নেই। কিন্তু এরা দেশকে ঠিক চেনে না, আর মানুষকে এরা দয়া করে, ভালবাসে না। এদের কথা এদেশের মানুষ ঠিক বুঝতে পারে না। আপনার কথা পারে।

হঠাৎ হাসলে কিশোর—বললে—কখনও কখনও আদা ও লবণ সংযুক্ত ক'রে পুরাতন চালের মুড়ি বললে একটু আধটু গোল লাগে—তা অবিশ্যি সহজেই মেটে।

হেসে উঠলেন ডাক্তার। ওই পথ্যটা তিনি প্রায়ই দিতেন। হরেনকেও দিয়েছেন—কিশোরকেও দিয়েছেন। কিন্তু কিশোর বিভ্রাট বাধিয়েছিল, আদা নুন এবং মুড়ি পেয়েও সে গোলমাল শুরু করেছিল—সংযুক্ত কই হ'ল? সকালবেলা আর মুড়ি খায়ই নি কিশোর। এমন রোগী ডাক্তারে কদাচিৎ পায়। শেষে বিকেলবেলা ডাক্তার গিয়ে সংযুক্ত করার অর্থ বুঝিয়ে নিজের হাতে সংযুক্ত করে দিলে তবে সে খেয়েছিল।

ডাক্তার হেসে বললেন—তোমার মত রোগী পেলে বাক্যের ব্যাখ্যান করেও সুখ। বুঝেছ।

কিশোর বললে—আপনার মত চিকিৎসকও যে মেলে না ডাক্তারবাবু। ডাক্তার তো শুধু বিচক্ষণ হলেই হয় না। হৃদয় চাই।

বিনয় এবং ইন্দির চা নিয়ে এসে ঢুকল। বিনয় বকতে বকতেই আসছে—বুঝলি ইন্দির, তুই মায়ের কাছে শুনে নিবি—আমার কাছে সটান চলে যাবি। বাস। আচ্ছা মশায়, মা ঠাকরুণ আজ পাঁচদিন গুড় দিয়ে জল খাচ্ছেন—এ আপনি দেখেন না।

—গুড় তো ভাল জিনিস রে। জীবন মশায় হাসলেন। পরক্ষণেই শঙ্কিত হয়ে বললেন—কই, আমি তো কিছু জানি না। চায়ে তো চিনিই পাই। বলে নি তো কিছু।

—হ্যাঁ মশায়, সংসারে কত লাগে আপনি জানেন না? এও বলতে হবে? কত কাপ চা হয়? বলুন!

—জানি তো। কিন্তু পারমিটের চিনি। বিনা প্যরমিটে পাব কোথায়?

—বেশ মশায়, আপনাকে আর পেতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করব। ইন্দির আমার কাছে যাবে। আচ্ছা মানুষ আপনি। এবার মায়ের অনন্ত চতুর্দশী ব্রত প্রতিষ্ঠা তার খবর করেছেন? রাখেন?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ, বটে বটে। তাও তো বলে নি।

—সেও আর জানতে হবে না আপনাকে। সে ব্যবস্থা আমি করব। আপনারা এখন চা খান। চিনির চা। ইন্দিরকে পাঠিয়ে চিনি আনিয়ে চা ক'রে আনলাম। ব্রত প্রতিষ্ঠার ফর্দ ক'রে নিলাম। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। এখন চা খেয়ে রুগী দেখুন। দশ বারো জন এসে ব'সে আছে। আর কাল দিন ভাল, কাল দশটায় এখানে সাইকেল রিক্সা পাঠাব, রোজই আসবে, এখানকার রোগী দেখে চলে যাবেন। আবার সন্ধ্যে সাতটায়। মুখুজ্জে মশায়ও ওইখানেই যাবেন, দাবার ছক পেতে দেব। বাস্। না কি কিশোরবাবু?

—তোকে আমি সন্ধ্যেবেলা খবর দেব বিনয়। আমাকে ভাবতে দে। মশায় অকস্মাৎ যেন চঞ্চল হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—এই দেখুন—

—আর বকিসনে বিনয়, আমায় ভাবতে দে।

মশায়ের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠেছে। মুখে চোখে একটা যেন কি ফুটে উঠেছে। বিনয় থমকে গেল। মশায় কিশোরকেও বললেন—আমি ভেবে দেখি!

—বেশ ভাবুন। কিশোর তাঁর কথা উপেক্ষা করবার চেষ্টা করলে না। সে বুঝেছে, কিছু একটা সংশয় হোক ভাবনা হোক এই বৃদ্ধটির জীবনের গভীরে একটা নাড়া দিয়েছে। সাড়া তুলেছে। পরের যুক্তিতে তার খণ্ডন হবে না।

কিশোর বিনয়কে নিয়ে চলে গেল।

সেতাব বসে রইল। সেও কিছু বললে না। জীবনের স্বভাব সে জানে।

বাইরে রোগী এসেছে। প্রায় দশজন। এক বুড়ী কাতরাচ্ছে।—আমারে আগে দেখেন বাবা! রোদ চড়লে মরব বাবা মশায়!

বুড়ীর সূর্যিকোড় হয়েছে। বিচিত্র ব্যাধি। মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে—বেলা বাড়ে, যন্ত্রণায় অধীর ওঠে মানুষ। আবার বেলা পড়ে, ধীরে ধীরে কমে। সূর্যাস্তের পর উপশম হয়। কিছুটা রাত্রি হলেই একেবারে ছেড়ে যায়। বুড়ী হাসপাতালে গিয়েছিল কিন্তু সেখানকার ওষুধে কিছু হয় নি। কে বলেছে জীবন মশায়ের অব্যর্থ মুষ্টিযোগ আছে—তাই এসেছে সে। বুড়ী পূর্ববঙ্গের মেয়ে, এখানে থাকে সরকারী ক্যাম্পে। আগে সে জানত না—তা হলে আগেই আসত। এ রোগ তাদের দেশে কখনও দেখে নাই। এ দেশ যেমন শুকনো কঠিন—এদেশের রোগও তেমনি অদ্ভুত। বুড়ী বকে গেল অনর্গল।

মশায় বিপদে পড়লেন। মুষ্টিযোগের বক্কেল এ বিদেশী বুড়ীর পক্ষে সংগ্রহ করা সহজ হবে না। ইন্দিরকে ডাকলেন তিনি।—দে বাবা যোগাড় করে দে বুড়ীকে। আর ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিবি। বঙ্গদেশের লোক। পুরাতন চালের মুড়ি আদা ও লবণ সংযুক্ত বললে গোলমালে পড়বে। বলে নিজেই হাসলেন।

বাকী অধিকাংশই ম্যালেরিয়া। একজনের আমাশয়। এক জনের বুকে সর্দি বসেছে। অবশ্য ভাসা সর্দি। নিউমোনিয়া নয়। তবু ভাল

ক'রে দেখলেন স্টেথেসকোপ দিয়ে। পেনিসিলিন হলে ভাল হয়—দু দিনেই সেরে ওঠে। কিন্তু পেনিসিলিনের দাম কি পারবে যোগাড় করতে? গরীব মানুষ! মশায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন—এই এদের জন্যেই আরোগ্য-নিকেতন তিনি বন্ধ করতে পারেন নি। তাঁর পিতামহ তাঁর বাবা বলতেন—এরাই মশায় বংশের দেবতা। এদের সেবা করেই দত্ত বংশ মশায় বংশ হয়েছে। আশয়-বিষয় সবই ওই ওদের প্রসাদ। দীনবন্ধু মশায় যখন প্রথম চিকিৎসা শুরু করেন তখন ওরাই প্রথম বিশ্বাস করেছিল—ডেকেছিল। জগত মশায় চিকিৎসা আরম্ভ করলে দীনবন্ধু মশায় তাঁকে ওদের বাড়িই প্রথম পাঠিয়েছিলেন। মশায়ের ছেলে ছোট মশায়কে ওরা অবজ্ঞা করে নি। তাঁর নিজের বেলাতেও তাই। ওরা তো সেই আশ্বাসেই আসে তাঁর কাছে। মশায়ের কাছে ধনে প্রাণে • কখনও মরবে না। মশায় একটা খাবার ওষুধ লিখে দিলেন—বিনয়ের দোকান থেকে নেবে। বুঝলে। খুব কম দামেই সে দেবে। আমি লিখে দিলাম। আর এই একটা মুষ্টিযোগ।

লোকটি কপাল, চোখের কোল, নাকের পাশ আঙুল দিয়ে টিপে দেখিয়ে বললে—সব দরদ, সব দরদ, মনে হ'চ্ছে কি বামড়াচ্ছে বাবা মশায়! আর সর্দি যেন হলুদ বরণ এক্কেরে কঠিন হয়ে গেলছে বাবা।

—নাস নিয়ো, কালো জিরা ছোট ন্যাকড়ায় বেঁধে নস্যি দেওয়ার মত টেনে গন্ধ শুঁকবে। বুঝেছ! আর মুষ্টিযোগ রইল—ওষুধ রইল—পাঁচ ছ দিনেই সেরে যাবে। তবে সাবধানে থাকবে। এর উপর আর ঠাণ্ডা লাগিয়ো না। খাওয়া দাওয়ার অত্যাচার করো না।

লোকটিকে বিদায় ক'রে জীবন মশায় সেতাবের দিকে তাকিয়ে বললেন—সেতাব!

সেতাব একখানা পুরানো হিসাবের খাতা ওল্টাচ্ছে। খাতার দিকে দৃষ্টি রেখেই সেতাব বললে—এতটাকা পড়ে গেল—একবার উদ্ধারের চেষ্টাও করলি না জীবন?

—ওটা বন্ধ কর সেতাব, রেখে দে তুলে। ও আর দেখতে নাই।

—দেখতে নাই?

—না। সংসারে পাওনা যদি খুশি মনে দেনদার না-দেয় তবে জোর ক'রে আদায় করতে গেলে সে পাওনা বিষ হয়ে ওঠে ভাই। তাই ওদিকে তাকাতে নাই। তাকাতে হয় দেনার দিকে। কেউ যদি পায়—সেই পাওনা দিয়ে এলে অমৃত পাওয়া হয়। বুঝলি। কিন্তু কি করি বল ত?

—কিসের? বিনয়ের কথার? আমি তো বলি ভাই ব'সে যা।

—কিন্তু—। কিন্তু আজ সকালে আমি ভেবেছিলাম—চিকিৎসা করা ছেড়ে দেব।

—কি হ'ল হঠাৎ?

—কাল রাত্রে—রতনবাবুর বাড়িতে গেলাম—ফিরবার সময় বিপিনের বউটি আমার সামনে দাঁড়াল। সিঁথির সিঁদুর ডগডগ করছে। কি বলব তাকে? আমার মনে পড়ে গেল—।

মশায় থেমে গেলেন। না, শশাঙ্কের স্ত্রীর কথা বলবেন না তিনি। বৃদ্ধ দাড়ীতে হাত বুলিয়ে গাঢ় স্বরে বললেন—মনে পড়ে গেল বনবিহারীর কথা।

—বিপিন তা হ'লে—

—হ্যাঁ।—একটু চুপ ক'রে থেকে মশায় বললেন—পিতৃপুরুষের উপদেশ অনুযায়ী আমাকে বলতে হয় সে কথা। আমার সুনাম দুর্নাম নয়। বিপিন বহুকর্মের কর্মী—বহুজনের নির্ভরস্থল; এক্ষেত্রে না বললে—বহুকর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বহুজন বিব্রত হবে। তা ছাড়া আমার বারবার মনে পড়ছে বনবিহারীর কথা।

সেতাবও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। কোন কথা বলতে পারলে না। কি বলবে?

—মশায়! মশায় রয়েছেন? মশায়! ভারী মোটা গলা, কিন্তু পরিশ্রান্ত ক্লান্ত।

রাণাপাঠক। রাণা আবার এসেছে। ঘরের ভিতরে ঢুকে পুরানো চেয়ারখানায় বসতে গিয়ে নেড়ে দেখলে—ভেঙে যাবে না তো? টি-বি হলেও তো রাণাপাঠক আমি। হাসলে সে।

—ওটাও শাল বৃক্ষের সার বাবা রাণা। অসার পুরাতন হলে জীর্ণ হয়, সারবস্তু হয় না। বস, ভাঙবে না। কিন্তু তুমি এমন করে হাঁটাহাঁটি করো

না রাণা। এটা তো তোমার পক্ষে ভাল নয়। তোমার এখন সব থেকে দরকার বিশ্রাম।

কপালে হাত দিয়ে রাণা বললে—অদৃষ্ট মশায়। কর্মফল। কি করব? রাণাপাঠক—দত্যি একটা। চেঁচিয়ে বলেছে—আশী বছরের পাকা তাল কাঠের মত সোজা থাকব, দশ ক্রোশ হাঁটব; তা—। হতাশ ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—তাল কাঠেও ঘুণ ধরল বাবা।

—চিকিৎসা করাও বাবা, ভাল হয়ে যাবে তুমি। ভয় কি?

—ভয়? হাসলে রাণা। ঘাড় নেড়ে বললে—ভয়-টয় খুব আমার নাই মশায়। মরতে তো হবেই। সে নয়। তবে যাবার বয়স না হতেই যাব? বহুরঙ্গের বহুরসের সংসারে এলাম—রঙ্গরস ভোগ করতে পেলাম না! আর যাব যাব—একটা পাপ ক'রে তারই ফলে পাপীর মত যাব? এই আর কি! এখুনি পথে মতে কামারের দরজায় মতের মা-বুড়ীকে তাই বললাম।

—মতির মা ফিরে এল? মশায় ঈষৎ চকিত হয়ে উঠলেন।

—হ্যাঁ এল। একটা পা এখনো সাদা মত কি দিয়ে ব্যাণ্ডেজের কাপড় জড়িয়ে বেঁধে রেখেছে। গরুর গাড়ি থেকে মতে আর তার বেটা ধরাধরি ক'রে নামাচ্ছে। আমি মশায় দেখে থমকে দাঁড়ালাম। বললাম—তা তুই একটা রঙ্গ দেখালি মতির মা! তা ভাল। বুড়ী বললে—তা রঙ্গ বটে ঠাকুর। সে কি কাণ্ডকারখানা। কি ঘর, কি দুয়োর, কি আলো, কি ব্যবস্থা, কি চিকিচ্ছে। কাটলে কুটলে—তা জানতে নারলাম। তা পরেতে দিন কতক কষ্ট বটে। শুয়ে শুয়ে মল মূত্র ত্যাগ। তবে যত্ন বটে, কুটকুটে টুকটুকে ভদ্রঘরের মেয়ে ধবধবে পোষাক পরে, মাথায় টুপি দিয়ে—ওষুধ খাইয়ে দেওয়া, পথ্যি দেওয়া, মুখ মুছিয়ে দেওয়া—বাবা বলব কি—ময়লা মাটির পাত্তর সরানো—সব করছে! আর ডাক্তার কি সব! মশায় তো আমার নিদেন হেঁকে দিয়েছিল—তা দেখ বাবা ফিরে এসেছি। বলেছে মাস তিনেক পরে এই সব খুলে দেবে—তার পরে একমাস মালিস—তার পরে পা ফিরে পাব। আমি বললাম—আর কি পেলি মতির মা? অমর বর পেলি না? তা মতে কামার রেগে উঠল, বললে—যাও ঠাকুর যাও। নিজে তো বাঁচবার লেগে পথে পথে এর কাছে ওর কাছে ঘুরছ—এ দেবতা ও দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ছ!

বললাম—মতে, তোর মায়ের বয়স হলে কি রাণা বাঁচতে চাইত রে? আমা ছেলে দুটো নেহাৎ নাবালক, একটা কন্যে আছে,—আমার দাদা রাঘব বোয়াল আমি না থাকলে গিলে খেয়ে দেবে। বুঝলি, নইলে রাণা ঘুরত না!

রাণা একসঙ্গে এতগুলি কথা বলে হাঁপাতে লাগল।

জীবন মশায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, কথাগুলি শুনেছেন বলেও মনে হল না। মাটির মূর্তির মত নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেছেন।

বাঁকা হাসি হেসে প্রদ্যোত ডাক্তার তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

"চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর হয়ে গেছে জীবন বাবু। পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন, সালফাগ্রুফ সব ওলোট পালোট করে দিয়েছে। এ কালে সেই পুরনো—বায়ুপিত্তকফের নাড়ী পরীক্ষা নিয়ে নিদান দেওয়া চলে না!"

আজই প্রদ্যোত বলে গেল।

রঙলাল ডাক্তারের শিষ্য না হলে তিনি হয় তো অস্বীকার করতেন। তিনি জানেন—তিনি স্বীকার করেন।

কিশোরের ডাকে—বনবিহারীর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পর যখন তিনি আবার বের হয়েছিলেন তখনই তিনি প্রথম দেখেছিলেন, বিস্মিত হয়েছিলেন। কিশোরের কাছে বিনয়ের কাছে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন। ইণ্টারভেনাস স্যালাইন ইন্‌জেকশন, রেকটাল গ্লুকোজ, কলেরার টিকে—ইন-অকুলেশন ব্লিচিং পাউডারও সেই প্রথম দেখেছিলেন তিনি।

ওঃ সে কি অবস্থা দেশের। মৃত্যুভয় ভীত অসহায় মানুষের মুখের সে ছবি তিনি ভুলতে পারবেন না। শুধু তাই নয়। পাঁচ বৎসর পর নির্জন বাস থেকে বের হয়ে চোখে পড়ল মানুষের ধ্যানে ধারণায় এক বিচিত্র পরিবর্তন। এর আগে বনবিহারী বেঁচে থাকতে এ পরিবর্তনের সূত্রপাত তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—কিন্তু তখন নিত্য তাঁর চোখের উপর তিলে তিলে এই পরিবর্তন, শিশু থেকে বালক, বালক থেকে যুবা যুবা থেকে প্রৌঢ় হওয়ার মত ঘটে যাচ্ছিল, তাই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে নি, মনকে অভিভূত করে নি; কিন্তু পাঁচ বৎসর পর অকস্মাৎ যেন শিশুকে দেখলেন বালকরূপে। বনবিহারীর কথাই মনে পড়েছিল। সে

কেঁদেছিল—মৃত্যুকে তার সে কি ভয়! মনে প্রশ্নও জেগেছিল। আজ পাঁচ বছর পর দেখলেন—সেই ভয়টা বেড়ে উঠেছে—গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভয়ে মানুষেরা দেশ দেশান্তরে পালিয়েছে। নবগ্রামের মত বর্ধিষ্ণু বাজার, যেখানে লাভের কারবার, লোভী মানুষেরা যেখানে গুড়ের চারিপাশে চাপ-বাঁধা পিঁপড়ের মত জমে থাকে—সে বাজারও খাঁ খাঁ করছে। কারবার লেনদেন বন্ধ। মাঠ ধূ ধূ করছে, পুকুর জল শূন্য। হরিজন পল্লীতে মহামারী চলছে; যেন বৈশাখী দ্বিপ্রহরে খড়ের চাল জ্বলছে। কান্নার রোল উঠছে এখানে ওখানে—আরও খানিকটা দূরে, এ-পাশে ও-পাশে, কোনটা সদ্য বিয়োগ বেদনার বুক ফাটানো আর্তনাদ, কোনটা একটু ক্লান্ত, কোনটা অতি অবসন্ন পরিশ্রান্ত—মধ্যে মধ্যে থামছে, আবার অকস্মাৎ বুক ফাটিয়ে বেরিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। কোন বাড়িতে রোগী ফেলে আপন-জনেরা পালিয়েছে, রোগী জলের জন্য কাতরাচ্ছে—হাঁ করছে; কখনও কখনও ক্ষীণ জীবনীশক্তি একত্রিত করে চীৎকার করে উঠছে আতঙ্কে—শব মাংস লোভে শেয়াল এসে উঁকি মারছে অথবা দীর্ঘ কর্কশ-পাখা মেলে কুৎসিৎদর্শন লম্বা গলা বাড়িয়ে শকুন বা গৃধ্র এসে বসেছে উঠানে।

জীবন মশায়—সেদিন একান্ত অসহায়ের মত বলেছিলেন—কিশোর, এই আগুনের মত মহামারীর মুখে একটি ভাঁড়ের মত পাত্রে কয়েক গণ্ডূষ জল নিয়ে কি করব?

কিশোর, বিচিত্র ছেলে। মধ্যে মধ্যে মশায়ের মনে হত—বনবিহারী যদি কিশোর হ'ত! গোটা নূতন কালটার প্রতি বনবিহারীর আচরণে—তার মৃত্যু ভয়ে—শ্রদ্ধা হারাতেন জীবন মশায় যদি কিশোর এসে তাঁর সামনে ঠিক পরমুহূর্তেই না-দাঁড়াত। কিশোর সেদিন তাঁকে বলেছিল—তবু তো দাঁড়াতে হবে মশায়। আপনি দাঁড়ালে আমরা আপনার পাশে দাঁড়াব। দেখতে দেখতে লোক আসবে।

মিথ্যে বলে নি কিশোর। লোক এল। এল ক'লকাতা থেকে। মেডিকেল কলেজ ক্যাম্বেল কলেজ থেকে ছেলেরা এল। একদল এল

স্যানিটারী ইন্‌স্‌পেক্টার। একদল এল কি নাম যেন তাদের? কোদালি: পর কি? কোদালি ব্রিগেড!

শুকনো পুকুরের তলায় কুয়ো কেটে তারা জল বের করলে তাই ত! কথাটা তো কারুর মনে হয় নি! স্যানিটারী ইন্‌স্‌পেক্টারের পুকুরে পুকুরে ব্লিচিং পাউডার গুলে দিয়ে জলকে শোধন করলে। এ্যান্টি-কলেরা ভ্যাকসিন ইনজেকশন দিলে। কলেরার টিকে! বিশ্বাস তাঁরও প্রথমটা ঠিক হয় নি। কিন্তু পরে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সব থেকে বিস্মিত হয়েছিলেন—স্যালাইন ইনজেকশন দেখে।

অবিনাশ বাউড়ীর-বউ—সত্যকারের সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, সকালে সে এসে ভদ্রপাড়ায় বাসন মেজে ঘর দোর পরিষ্কার ক'রে ঝিয়ের কাজ ক'রে গেল তাঁর চোখের সামনে। দুপুরে শুনলেন তার কলেরা হয়েছে। বিকেলে গিয়ে দেখলেন—সেই স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়েটার সর্বাঙ্গে কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে, একগাছা কাঁটার মত কঙ্কালসার—দেহের সকল রস কে যেন নিঙড়ে বের ক'রে দিয়েছে। দেখে শিউরে উঠলেন তিনি। মৃত্যুর ছায়া পড়েছে সর্বাঙ্গে। নাড়ী নাই, হাতের তালু পায়ের তলা বিবর্ণ পাণ্ডুর, হাত পা কনুই পর্যন্ত হিমশীতল।

তরুণ দুটি ডাক্তার তখন তাঁদের দলে এসে যোগ দিয়েছে। চোখে তাদের স্বপ্ন, বুকে তাদের অসম্ভব প্রত্যাশা, ওই কিশোরের জাতের ছেলে। তারা বললে—স্যালাইন দেব একে। বের করলে স্যালাইনের বাক্স।

এ রোগী বাঁচে না একথা মশায় জানতেন কিন্তু বাধা দেন নি। দাঁড়িয়ে দেখলেন, লক্ষ্য করে গেলেন। নিপুণ ক্ষিপ্র হাতে সাবধানতার সঙ্গে ওরা কাজ করে গেল। শিরা কাটলে, একমুখ বন্ধ করলে—অন্য মুখে স্যালাইনের নলের মুখটা ঢুকিয়ে দিলে। একজন কাচের নলটুকর দিকে চেয়ে রইল। বুদ্বুদের মধ্য দিয়ে বায়ু না যায়। সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে।

বায়ু বুদ্বুদ গেলেই নাকি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। চারিদিকে দূরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়াভিভূত জনতা। জীবন মশায়ের দৃষ্টিতে কৌতূহল—আনন্দ।

অদ্ভুত। অদ্ভুত! মেয়েটার দেহ থেকে মৃত্যু ছায়া অপসারিত হয়ে যাচ্ছে, কালো মুছে গিয়ে তার গৌর বর্ণ ফুটে উঠছে। রস শুষে নেওয়া শুষ্ক দেহ রসসঞ্চারে আবার নিটোল পরিপুষ্ট কোমল হয়ে উঠছে, জীবনের লাবণ্য ফিরে আসছে। অদ্ভুত, এ অদ্ভুত। যুগান্তর, সত্যই এ যুগান্তর! মৃত্যু ফিরে গেল?

সে বড় কঠিন। যায় না। বৃদ্ধ জীবন মশায় হাসলেন আজ।

মনে পড়ছে যে!

ইনজেকশন শেষ হল—মেয়েটি হাসিমুখে সলজ্জভাবে মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে নিজেই পাশ ফিরে শুলে। ডাক্তারেরা যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে ব্লিচিং পাউডার মেশানো জলে হাত ধুচ্ছে, এই সময় হঠাৎ জল-ভরা মাটির পাত্র ভেঙে যেমন জল ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবেই মুহূর্তের মধ্যেই একরাশি জল ছড়িয়ে পড়ল, নির্গত হয়ে গেল। এবং মুহূর্তে মেয়েটা আবার হয়ে গেল সেই মৃত্যুছায়াচ্ছন্না, কালোবর্ণ, কঙ্কালের মত শুষ্ক। অবিনাশ বাউড়ার স্ত্রী মারাই গেল। কিন্তু জীবন মশায় সেদিন মনে মনে মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের সাধনাকেও প্রণাম জানিয়েছিলেন। মৃত্যুকে জয় করা যাবে না কিন্তু মানুষ অকাল মৃত্যুকে জয় করবে। নিশ্চয় করবে! ধন্য আবিষ্কার! ইউরোপের মহাপণ্ডিতদেরও প্রণাম করেছিলেন। হ্যাঁ—আজ বেদজ্ঞ তোমরাই। এই কথাই বলেছিলেন। সেদিনও মনে মনে এমনি ভয় পেয়েছিলেন। কিশোরের টানে বেরিয়ে এলেন—এসে তিনি ভুল করলেন। এইসব নূতন আবিষ্কার নূতন তত্ত্ব নূতন বিদ্যা না জেনে তিনি কি ক'রে চিকিৎসা করবেন?

এই পাঁচ ছ বছরের মধ্যে এত এগিয়ে গেল? তিনি এত পিছনে পড়ে গেলেন?

এ তত্ত্বের কথা অবশ্য আগেই তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু দেশে চলন দেখেন নি। ওদের বিচিত্র দেশে যা ঘটে যা হয় তা এ হতভাগ্য দেশে আসতে দেরী হয়। অনেক পরে ঘটে। ওদের দেশে তরুণ যুবা হচ্ছে। হৃদপিণ্ডে অস্ত্রোপচার হচ্ছে। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার হচ্ছে। মুমূর্ষু লোকের চোখ সংরক্ষণ ক'রে আয়ুষ্মান অন্ধের অন্ধচোখের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে

অন্ধকে চক্ষুষ্মান ক'রে দিচ্ছে। কুৎসিতকে অস্ত্রোপচারে রূপবান করে তুলছে। এ দেশে তা এখনও হয় না। আসবে—একে একে আসবে। প্রচলন হবে। সে সময় এসেছিল—ওই চিকিৎসাগুলি, কলকাতা হয়ে পাড়াগাঁয়ে নবগ্রামে এল স্যালাইন চিকিৎসা।

তবুও তো সেকালে তিনি একালের মত স্থবির হন নি। একালের প্রদ্যোতদের মত সেকালের তরুণ ডাক্তারেরা পুরাতনের প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা হারায় নি। এমন অবজ্ঞা দেখাবার মত উদ্ধত হয়ে ওঠে নি। সেদিন দ্বিধার মধ্যেও এই তরুণ স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তারদের নতুন চিকিৎসার কাজে লেগে পড়েছিলেন—তা ঠিক খেয়াল করতে পারেন নি তিনি। ডাক্তারদের সঙ্গে কলেরা সংক্রামিত পাড়া ঘুরে রোগী দেখে ফিরে এসে কিশোরদের বাড়িতে বসতেন, হাত পা ধুতেন—ব্লিচিং পাউডারে মাড়িয়ে জুতোর তলা বিশুদ্ধ করে নিতেন—ততক্ষণে দুজন চারজন এসে জুটে যেত; জ্বরে আমাশয়ে পুরানো অজীর্ণ ব্যাধিতে ভুগছে এমনি রোগী সব।

—একবার হাতটা দেখুন।

জীবন মশায় প্রথম প্রথম বলতেন—এই এ দের দেখাও।

—না। আপনি দেখুন।

ডাক্তার দুটি বড় ভাল ছেলে ছিল—তারা বলত—দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনাকেই দেখাতে চায় ওরা।

মশায় দেখতেন। কিন্তু ওষুধ দিতেন না। শুধু বলতেন—এই ন দিন না-হয় এগার দিনে জ্বর ছাড়বে।

এমনি ভাবেই শুরু।

তারপর একদিন ঈশানপুরের পাগ্‌লা বাউড়ী তাঁকে টেনে নামালে।

সংসারে কত বিচিত্র ঘটনাই ঘটে!

এই ডাক্তারদের সঙ্গে কিশোরের টানে গিয়েছিলেন—শ্যামপুর। সেখানেও কলেরা চলছে। একদল ডাক্তার—পাঁচ ছ জন সেখানে এসে রয়েছেন। রয়েছেন ঠিক নয়, একদল যান—একদল আসেন। মেডিকেল কলেজের সিক্সথ ইয়ারের ছাত্র সব। সেখানে একটা গণ্ডগোল বেধেছে। তারা স্যালাইন চিকিৎসা চালিয়েছে প্রায় একদিক থেকে। তাতে

মরেছে কম—বেঁচেছেই বেশী কিন্তু যারা বেঁচেছে তাদের কয়েক জনেরই হাতের শিরা-কাটার ক্ষতমুখ দূষিত হয়ে পেকে উঠেছে। ওখানকার লোকেরা তাতে ক্ষেপেছে। ছাত্রদল ভয় পেয়েছে। কিশোরের কাছে লোক পাঠিয়েছে। যাওয়া সেই কারণে।

পথে—এক ক্রোশব্যাপী একটা মাঠ। এবং এমনই মাঠ যে গাছ পর্যন্ত নাই। বৈশাখের বিকেলবেলা সেই মাঠ অতিক্রম ক'রে যাওয়ার পথে পশ্চিম দিগন্তে দেখা দিল এক টুকরা কাল মেঘ। মাঠের প্রায় শেষাশেষি যখন—তখন অন্ধকার হয়ে গেল, আকাশ আর শূন্যমণ্ডল হয়ে উঠল ধূলি-ধূসর। দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রচণ্ড প্রখর রৌদ্রদাহের পর সেই প্রথম মেঘ—প্রথম ঝড়। সেবার বৈশাখে সেই প্রথম কালবৈশাখী। ছেলেদের দল নিয়ে নিয়ে তিনি যেমন বিব্রত হয়েছিলেন, ছেলেরাও তেমনি বিব্রত হয়েছিল তাঁকে নিয়ে। তাঁর স্থূল স্থবির দেহ নিয়ে ছুটবার শক্তি ছিল না, ছেলেরা চেয়েছিল ছুটতে। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দেবার একটা উল্লাস তাদের মনে। কিন্তু তিনি ভাবছিলেন; যা ভাবছিলেন তা এল; ঝড়ের মুখে যেন তীক্ষ্মমুখ তীর ছুটে আসছে। মুখে হাতে ঘাড়ে বিঁধছে; ক্ষত হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার ছেলে দুটি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল—এ কি?

মশায় হেসে বলেছিলেন—শিল নয় শিলা, পাথরের কুচি কাঁকর—তীর নয় বাঁটুল।

তরুণ ডাক্তারদের একজন রীতিমত বিব্রত হয়ে উঠেছে তখন, সে বলেছিল—আর তো পারা যায় না। এ যে অসহ্য। এবং কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠেছিল—এ কি? কিশোরের কপালটা যে পাঁচ সাতটা জায়গায় ফুটে গেছে। আপনারও মশায়।

মশায় তখন ভেবে ঠিক ক'রে নিয়েছেন কি করবেন। রাঢ়-অঞ্চলের চাষের মাঠ সিঁড়ির মত উঁচু টিলা থেকে সমতলে নেমে যায়। এমনকি সমতলে পর্যন্ত উঁচু-নিচু কিছু থাকে। একখানা উঁচু জমির আলের নিচে নিজে ঘাড় হেঁট করে উপু হয়ে বসে পড়ে বলেছিলেন—বসে যাও কিশোর, এমনি করে বসে যাও। আলের আড়াল দাও। অবিশ্যি পিঠে

কিছু বাজবে—তা বাজুক। কালাপাহাড়ের হাত থেকে নাক বাঁচাতে বিশ্বনাথ কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ওতে লজ্জা নাই—বসে পড় বাবা।

বসেই পড়েছিল সকলে। কিন্তু তার পরই এল বৃষ্টি। আকাশের দিকে তাকিয়ে মশায় শিউরে উঠলেন। আকাশের মেঘ যেন ছানা কাটা দুধের মত কেটে ছেতরে যাবার মত একটা বিচিত্র চেহারা নিচ্ছে। বহুদর্শী তিনি, বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি যে শিলবর্ষণ হবে। বুঝতে পারলেন এই বৃষ্টির ঝাপটা অকস্মাৎ থেমে যাবে, তারপর ওই ছানা কাটার মত মেঘ কুণ্ডলী পাকাতে শুরু করবে—তারপরই দুটো একটা জোরালো বিদ্যুত এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে শিলবর্ষণ। প্রথমে ছোট কুচির মত—তারপর ক্রমশ বড়। এতবড় দুরন্ত অনাবৃষ্টির বৎসরের প্রখর গ্রীষ্মের প্রথম কালবৈশাখীতে শিলবর্ষণ হলে সে শিলের ওজন একপোয়া পর্যন্ত হতে পারে। তার একটার আঘাতই মানুষের মৃত্যু ঘটাতে যথেষ্ট। মুহূর্তে উঠে পড়ে তিনি বললেন—কিশোর উঠে পড়। উঠে পড়। ছুটতে শুরু কর। ওঠ। ওঠ। ডাক্তার বাবারা, ওঠ।

—কেন? কি হল? এই ঝড় বৃষ্টি কাঁকর পাথর ছুটছে—

—ওঠ। ওঠ। হোক ঝড় বৃষ্টি। কাঁকর পাথর আর ছুটছে না। জলে ভিজে মাটির সঙ্গে আটকে গেছে। এবার বোধ হয় শিল ঝরবে। পাশ থেকে নয়। উপর থেকে নামবে। আলের আড়ালে আটকাবে না। পিঠে পড়বে। মেরুদণ্ড ভেঙে দেবে। ওঠ। ছুটতে শুরু কর। ওই গ্রাম। খুব বেশীদূর নয়।

কিশোর বলেছিল—আপনি মশায়? আপনি ছুটতে পারবেন?

—পারতেই হবে। না-প্যারি, আমার জন্যে তোমরা থেমো না বাবা। পরমানন্দ মাধবকে মনে ধ্যান করে বসে পড়ব। যেতে তো হবেই। সময়ও অসময় নয়।

—না সে হবে না। তা হলে আমরাও তাই করব। ডাক্তারবাবু? আপনারা ছুটুন। ওই গাছ দেখা যাচ্ছে। ওই গ্রাম। কিছু না পান গাছতলায় আশ্রয় নেবেন।

ডাক্তারেরাও বলেছিল, না।

জীবন মশায় অগত্যা নিজেই ছুটতে শুরু করে বলেছিলেন—এস।

তিনি জানতেন একবার ছুটিয়ে দিলে ওরা ছুটবে তখন তিনি পিছনে পড়লে খুব সম্ভব সেটা খেয়াল করবে না।

পরমানন্দ মাধব সেদিন প্রসন্ন ছিলেন। তাঁরা সকলেই গিয়ে পৌঁছুতে পেরেছিলেন একটা আশ্রয়ে। এক দফা কুচি কুচি শিল মিনিট দুই তিন সহ্য করতে হয়েছিল। গ্রাম প্রান্তে অতি দরিদ্র একজন বাউড়ীর ঘর। একখানা মাত্র ঘর—কোলে একটা পিঁড়ে, মানে—ঢাকা রোয়াক—ছোট রোয়াক। পাশে আর একখানা ছিটে বেড়ার হাত তিনেক মাত্র উঁচু ঘর। রোয়াকেও স্থান ছিল না। সেখানটা ঘিরে তখন আঁতুড়ে ঘর হয়েছে। ঘরের ভিতরে থেকে রুগ্ণ কণ্ঠে কেউ বলেছিল—কোথায় দাঁড়াবা বাবা? বাইরের পিঁড়িতে ঘিরে—আমার পরিবারের সন্তান হয়েছে। ভিতরে আমি রোগা মানুষ শুয়ে আছি। তিনটে শুয়োর আছে, পাঁচ-ছটা হাঁস আছে। আপনারা বরং ওই গরুর ঘরটায় গিয়ে দাঁড়াও।

সেই ঘরেই তাঁরা ঢুকেছিলেন। ঘরে একটি গরু ছিল, তারই পাশে গুঁড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিশোর এবং ডাক্তার ছেলে দুটি তারুণ্যের কৌতুকে হাসছিল। মনে রয়েছে কিশোরই বলেছিল—ভাগ্যে মশায় ছিলেন তাই কপালটা বেঁচেছে শিলের আঘাত থেকে। আর কপালটা বেঁচেছে বলেই ওই লেখার জোরে আমরা বেঁচেছি। তাই না, মশায়?

—তা বটে। কপালের শিলালিপি বা বিধিলিপি ভাঙলে বাঁচা অসম্ভব। ডাক্তারী শাস্ত্রেও ওর সঙ্গে বিরোধ নাই। ফাটলে অবশ্য জোড়াতালি দিয়ে বাঁচে—কিন্তু এ যা শিল এতে বিধিলিপির ফলকখানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত।

বাইরে তখন শিল পড়ছে বড় বড়। ক্রমশই বড় হয়ে উঠছে।

মশায় ভাবছিলেন অন্য কথা। মৃত্যু যখন আঘাতের মধ্য দিয়ে আসে তখন সে যেন চামুণ্ডার রূপ ধারণ করে আসে। জিহ্বায় রক্ত-তৃষ্ণা, বিচিত্র খট্টাঙ্গধারিণী, উন্মাদিনী!

কিশোর ভেবেছিল মশায় বোধ হয় ছুটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। (কাছে এসে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠেই তাঁকে ডেকে বলেছিল—হাঁপিয়ে পড়েছেন কষ্ট হচ্ছে না মশায় ?

—তা একটু হচ্ছে বই কি। তবে সে কিছু নয়। পরক্ষণেই হে বলেছিলেন—খট্টাঙ্গ কাকে বলে জান ? খাটের পায়া নয়। অস্ত্র ?

ডাক্তাররা জানত না। কিশোর জানত। সে ঠিকই বলেছিল। মানুষে মুণ্ডু লাগানো খাটের পায়ার গড়নের মুগুর। ঠিক সেই মুহূর্তেই গরুটা চঞ্চ হয়ে দড়ি ছিঁড়ে ছুটে বেরিয়ে পালিয়েছিল। কি হল ?—সঙ্গে সঙ্গে কিশো চীৎকার করে উঠেছিল—সাপ ! গোখরো সাপ !

সত্যই একটা গোখরো সাপ ওদিকের এক কোণে এসে ঢুকেছে। মশা বুঝেছিলেন—সেটাও তাঁদের মতই শিলের তাড়নায় আশ্রয়প্রার্থী হয়ে ঘরে এ ঢুকেছে। ক্লান্ত, হয় তো বা আহত। ভীত। এদিকে কিশোর এবং ডাক্তা দুটি ভয় পায় নি। কিন্তু বের হবার পথের দিকেই সাপটা রয়েছে। কিশো এদিকে বাঁশের বেড়াটা ভাঙবার চেষ্টা করছে।

মশায়ই ওদের অভয় দিয়ে সাপটাকে আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— তোমরা এত ভয় করো না। আমি সাপ ধরতেও এক সময় শিখেছিলা কিশোর, আমি দাঁড়াচ্ছি, তোমরা আস্তে আস্তে বের হয়ে যাও। বাবা, ওই গরুটার মত যদি মৃত্যুভয়ে অধীর হয়ে ওঠ—তবে মানুষ কেন তোমরা! সাপটাও আমাদের মত আশ্রয়প্রার্থী ; ও এখন নিজের নিয়েই ব্যস্ত। তোমরা ভয় পেয়ে চঞ্চল হলে—ওটাও নিজের প্রাণের ভয়ে অধীর হবে। আক্রমণ করবে !

নির্বিঘ্নেই বেরিয়ে এসেছিলেন সকলে। এবং এবার দাঁড়িয়েছিলেন ঘরখানার দেওয়াল ঘেঁষে, ছাঁচের তলায়। উঠানটা শাদা হয়ে গিয়েছিল শিলের স্তূপে। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, দেখছিলেন।

হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে—বিস্মিত শ্রদ্ধান্বিত কণ্ঠের কথা ভেসে এসেছিল— মাশায় ! আপুনি !

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল—এক কঙ্কালসার মানুষ ! যুবা কি প্রৌঢ় কি বৃদ্ধ বুঝতে পারা যায় না। শুধু কালো চুল দেখে মনে সন্দেহ জাগে, হয় তো বা মানুষটার বয়স অল্প।

—হ্যাঁ বাবা আমরাই বটে।

—উঠে আসেন মাশায়—পিঁড়েতেই উঠে দাঁড়ান।

—না। আমরা বেশ আছি। ব্যস্ত হয়ো না তুমি।

লোকটা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠে বলেছিল—আমার যে নড়বার ক্ষ্যামতা নাই মাশায়। আমার হাতটা দেখেন বাবা! আমাকে বাঁচান! আমাকে চিনতে লারছেন বাবা?

—কে? ঠিক চিনতে তো পারছি না বাবা। কি হয়েছে তোমার?

—আমি হাটকুড়ো কাহারের বেটা পরাণ। আপনার গেরামের—আপনকার পেজা হাটকুড়ো!

হাটকুড়োর ছেলে পরাণ!

তাঁরই গ্রামের—তাঁরই পুকুর পাড়ের প্রজাই বটে হাটকুড়ো। পরাণ, শূরবীর পরাণ। বছর কয়েক আগে—প্রেমে পড়ে পরাণ বাপ মা জাতি জ্ঞাতি সব ছেড়ে প্রেমাস্পদা একটি ভিন্ন জাতীয়া মেয়েকে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করেছিল।

সেই পরাণের এই কঙ্কালসার মূর্তি দেখে শিউরে উঠেছিলেন মাশায়।—কি হয়েছে?

—রক্ত উঠছে মুখ দিয়ে। বমি হয়।

—রক্ত উঠছে। টি বি? নতুন ডাক্তারেরা শিউরে উঠেছিলেন।

—আজ্ঞে—লবগেরামের ডাক্তারখানার ডাক্তার বলছে—রাজব্যাধি যক্ষা। বলেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আপুনি একবার দেখ বাবা। আমি আর বাঁচব না? ফুরির আর কেউ নাই মাশায়!

'ফুরি' পরাণের প্রণয়াস্পদা; তার প্রিয়তমা। যার জন্য সে সব ছেড়েছে। তাকে ও ছেড়ে গেলে তার আর কেউ থাকবে না বলেই পরাণের ধারণা। কিন্তু ফুরি আবার বিয়ে করবে। ফুরিও তাঁর গ্রামের মেয়ে, তার কথাও তিনি জানেন, ফুরি লাস্যময়ী স্বৈরিণী। তার জন্য বহু জনেই মোহগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু পরাণের মত তাকে গলায় বেঁধে ঝাঁপ কেউ দেয় নি! সকরুণ হাসিই এসেছিল তাঁর ঠোঁটের রেখায়। কিন্তু সে হাসি স্তব্ধ হয়ে মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

—মাশায়! বাবা! আমার আর কেউ নাই বাবা!

ফুরি এসে দাঁড়িয়েছিল তার আঁতুড় ঘরের দরজায়। তাকে দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই সেই ফুরি? সে স্বৈরিণীর কোন চিহ্ন অবশেষ নাই মেয়েটার মধ্যে! সদ্য সন্তানপ্রসবের পর সে ঈষৎ শীর্ণ ঈষৎ পাণ্ডুর কিন্তু রূপের অভাব হয় নি। লাবণ্য রয়েছে স্বাস্থ্য রয়েছে চিক্কণতা রয়েছে চোখের দৃষ্টিতে গঠনে ফুরির একটি মাধুর্য ছিল—সে মাধুর্যও রয়েছে, নাই শুধু লাস্য-চাপল্য, যার ফলে—ওকে আর চেনাই যায় না ফুরি বলে। ঠোঁটের পাশে—গালে ওটা কি? তিল? ওটা তো মশায় কখনও দেখেন নি। তিনি অবশ্য ফুরিকে পথে চলে যেতেই দেখেছেন, দূর থেকেই দেখেছেন, তাঁর মত মানুষের সামনে ফুরির মত মেয়েরা বড় একটা আসত না। তাঁকে দেখলে—সসম্ভ্রমে পাশে স'রে দাঁড়াত। তিলটা ঠিক—বনবিহারীর স্ত্রী—তাঁর বউমার ঠোঁটের পাশের তিলের মত। অবিকল।

ওঃ, বনবিহারীর স্ত্রী তাঁর পুত্রবধূর ধনী বাপ আছে মা আছে। এ মেয়েটার সত্যিই আর কেউ নাই। বাপ-মা মরেছে। এবং ওর মনের ভিতর যে স্বৈরিণী লীলাভরে এক প্রিয়তমকে ছেড়ে তাকে ভুলে গিয়ে আর একজনকে প্রিয়তম বলে গ্রহণ করতে পারত—সে স্বৈরিণীও ম'রে গেছে। পরাণ মরে গেলে ওর আর কেউ থাকবে না—এ বিষয়ে আর তাঁর সন্দেহ রইল না।

তিনি দাওয়ায় উঠে পরাণের হাত ধ'রে নাড়ী পরীক্ষা করতে বসেছিলেন।

সেই হল তাঁর নূতন ক'রে নাড়ী-ধরা, চিকিৎসা করতে বসা।

পরাণকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন।

যক্ষ্মা—বা টি বি পরাণের হয় নি। পুরানো ম্যালেরিয়া এবং রক্তপিত্ত দুইয়ে জড়িয়ে জট পাকিয়েছিল। চক্রধারী রক্তবমি এবং জ্বর দুটো উপসর্গ দেখেই সাংঘাতিক ধরনের—গ্যালপিং থাইসিস বলে ধরেছিল। এ কালে দেশে যক্ষ্মার ব্যাপক প্রসার হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু সাধারণ ডাক্তারেরা রক্ত এবং জ্বর এ দুটোকে একসঙ্গে দেখলেই টি বি বলেই ধরে নেন। সেই কারণেই সেদিন ওই এক পরাণের চিকিৎসা ক'রেই জীবন মশায় আবার হয়ে

উঠলেন ধন্বন্তরী। মাস কয়েক পর পরাণ সুস্থ হয়ে দেহে বল পেয়ে কোদাল ঘাড়ে মজুর খাটতে বের হলে লোকের আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

মনে আছে—পরাণের এখানকার গ্রাম ঘাট রামপুরের মিয়াদের বাড়ি থেকে—ডুলি এসে নেমেছিল আরোগ্য-নিকেতনের সামনে।

বৃদ্ধ সৈয়দ আবুতাহের সাহেব পুরাণো আমলের কাশ্মিরী কাজ-করা শালের টুপি শাদা পায়জামা শেরোয়ানী পরে ডুলির বেহারাদের কাঁধে ভর দিয়ে এসে ওই রাণা আজ যে চেয়ারখানায় বসেছে ওইখানাতেই বসে বলেছিলেন—আপনার কাছে এলাম মশায়, আপনি পরাণ কাহারের এত বড় ব্যামোটা সারিয়ে দিলেন। আমারে আরাম ক'রে দ্যান আপনি। আপনারে ঘরে ডাক না দিয়া—নিজে আপনার ঘরে এসেছি। আপনারে ধরবার জন্য এসেছি। আমারে আরাম করে দ্যান কবিরাজ!

বাঁ হাত দিয়ে মশায়ের হাতখানি চেপে ধরেছিলেন। কথা শুনেই বুঝেছিলেন মশায় মিয়া সাহেবের ব্যাধি কি! কথাগুলি জড়িয়ে যাচ্ছিল। মিয়া সাহেবের পক্ষাঘাতের সূত্রপাত হয়েছে, ডান চোখের কোলটা ঝুলে পড়েছে, ডান দিকের ঠোঁট বেঁকে গিয়েছে,—ডান হাতখানি কোলের উপর পড়ে আছে। ডান পা-খানাও তাই।

মশায় ম্লান হেসে বলেছিলেন—এ বয়সে এ ব্যাধির মালিক পরমেশ্বর মিয়া সাহেব। ওই চোখ ওই হাত ওই অঙ্গটা তাঁর সেবাতেই নিযুক্ত আছে ভাবুন। আমার কাছে এর ইলাজ নাই। সে কিম্মতও নাই।

একটু চুপ ক'রে থেকে মিয়া সাহেব বলেছিলেন—বলেছেন তো ভাল মশায়! মশায় ঘরের ছাওয়ালের মতই বাত বলেছেন। কিন্তু কি জানেন—শেষ বয়সে নিজেই বাধিয়েছি ফ্যাসাদ, মামলাতে পড়েছি। তাঁর সেবাতে ডান অঙ্গটা দিয়া নিশ্চিন্তি হতে পারছি কই! কিছু করতি পারেন না আপনি?

মশায় বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—আপনার সঙ্গে মামলা কে করছে? সে কি?

রামপুরের মিয়ারা এ অঞ্চলের মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু। তাঁদের সম্পত্তি সমস্তই নাবকার অর্থাৎ নিষ্কর। এবং নিব্বাট। তাঁর সুদীর্ঘ

জীবনে তিনি কখনও রামপুরের মিয়াদের আদালতের সীমানায় যাতায়াতের কথা শোনেন নি। তাঁরা কাউকে খাজনা দেন না, খাজনা পান বহু-জনের কাছে; কিন্তু তাঁদের বংশের প্রথা হ'ল সুদও নাই তামাদিও নাই। সে প্রথা তাঁদের প্রজারাও মানে। পঞ্চাশ বছর পরও লোকে খাজনা দিয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে মামলা করলে কে?

মিয়া বলেছিলেন—কে করবে মশায়! করছে নিজের ব্যাটা-জামাই। ঘরের ঢেঁকি কুমীর হল মশায়—তাইতো বাঁচবার লাগি এসেছি আপনার কাছে; ডান অঙ্গটা না থাকলে লড়ি কি ক'রে, ঠেকাই কি করে?

—কাজটা যে আপনি ভাল করেন নি মিয়া সাহেব; উচিৎ হয় নি আপনার। মশায় সম্ভ্রমের সঙ্গে বলেছিলেন কথাটা।

মিয়া সাহেব বছর পাঁচেক আগে নতুন বিবাহ করেছেন। উপযুক্ত ছেলে তিনটি—মেয়ে জামাই নাতি নাতনি, বৃদ্ধা দুই পত্নী থাকতে হঠাৎ বিবাহ করে বসেছেন এক তরুণীকে। এবং সে তরুণীটি মিয়া বংশের ঘরের যোগ্য বংশের কন্যা নয়। স্ত্রী পুত্রদের পৃথক ক'রে দিয়ে—সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিয়ে—পৃথক সংসার পেতেছেন। একটি সন্তানও হয়েছে বোধ হয়। এখন ছেলেরা শরীক হয়ে মামলা বাধিয়েছে। এদিকে মিয়া সাহেবের দক্ষিণ অঙ্গ পঙ্গু হয়ে পড়ছে।

মিয়া সাহেব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—হঁা, ইকালে কাজটা নিন্দার বটে, তবে মশায় আপনিও সিকালের লোক আমিও তাই। আমাদের কালের মানুষের কাছে কি পঞ্চান্ন ষাট বয়সটা একটা বয়স? এই ভাই ছেলেবেলা দেখেছি নবগ্রামে কাঙালীবাবু পঞ্চান্ন বছর বয়সে দোসরাবার সাদী করলে—ছাওয়ালের জন্যে। ছাওয়াল হ'ল, এক ব্যাটা দুই বেটী; তারপরে সে পরিবার মারা গেল; আবার সাদী করলে কাঙালীবাবু। সে পরিবার গেল। তারপরেও কাঙালীবাবু বেঁচে রইল। সাতাশী বছর বয়স মারা গেল কাশীতে। আমাদের তো তিন সাদী শাস্ত্রের নিয়ম। আমার বাপ করেছেন—দাদা করেছেন। সবাই করে ভাই! তা-ছাড়া—মশায়—।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—কারেই বা বলি ই কথা? আপন বয়সী ইয়ার-বন্ধু ছাড়া বলিই বা কি ক'রে। মশায়, প্রথম কাঁচা উমর যখন আমার—ষোল সতের বছর উমর। তখন—সেই কাঁচা নজরে মহব্বত হয়েছিল এক চাষার কন্যের সঙ্গে। বুঝলেন না? সে আমার দিল দেওয়ানা হয়ে গেল। ধরলাম—উয়াকে সাদী করব। বাপ রেগে আগুন হলেন। আপনি তো জানেন—আমাদের বংশে বাঁদী কি রক্ষিতা রাখা নিষেধ আছে। নইলে না-হয়-তাই রেখে দিতেন। আমি গোঁ ধরলাম। বাবা শেষমেশ—আমাকে লুকায়ে সেই কন্যের সাদী দিয়া পাঠায়ে দিলেন—এক্কেরে দুটা জেলার পারে। আমাদের এক মহালে, পত্তনীদারের এলাকায়। মশায়, এতকাল পর হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল—এক কন্যে, ঠিক তেমুনি চেহারা—যেন সেই কন্যে ফিরে এসেছে। লোকে অবিশ্যি তা দেখে না। তা দেখবে কি ক'রে বলেন? আমার আঁখ দিয়া তো দেখে না। তাই ওই মেয়েটারে নিকা না ক'রে পারলাম না।

মশায় একটু হেসেছিলেন।

মিয়া সাহেব বলেছিলেন—আপনিও হাসছেন যে মশায়? তবে আপনারে বলি আমি শুনেন। ই সাদা করে আমি সুখী হয়েছি। হাঁ। মনে হয়েছে কি দুনিয়াতে যা পাবার সব আমি পেয়েছি। হাঁ। দুঃখ শুধু আয়ু ফুরায়ে আসছে; দেহখানা পঙ্গু হয়ে গেল; মেয়েটারে দুনিয়ার মার থেকে বাঁচাতে পারছি না।

তাঁর চোখমুখের সে দীপ্তি দেখে মশায় বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধের চোখ দুটো জলজল ক'রে জ্বলে উঠেছিল। মনে হয়েছিল তাঁর সমস্ত অন্তরটা যেন প্রবল আবেগে ওই দুটো চোখের জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে দেখ, সত্য না মিথ্যা—দেখ!

সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠেছিলেন মনে মনে। উঃ—অতৃপ্ত কামনার মত ব্যাধি বোধ করি পৃথিবীতে আর নাই। অনির্বাণ আগুন। নেভে না; আবার যদি জ্বলে তবে সর্বগ্রাসী শিখা মেলে দাউ দাউ করে জ্বলে। একেবারে ছাইয়ের গাদায় পরিণত ক'রে শান্ত হয়।

মিয়া সাহেব বলেছিলেন—মশায়, আমি বলি কি, আপনি দেখেন—তারপরে আমার নসীব। বুঝলেন না?

কম্পিত ডান হাতখানাই তুলবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হ'য়ে বাঁ হাতের আঙুল কপালে ঠেকিয়ে বলেছিলেন—ইটাকে লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা কারুর নাই। সে যা হয় হবে। ইয়ার লেগে এত ভাবছেন কেন আপনি মশায়? যিনি যক্ষ্মার মতুন ব্যামো ভাল করতি পারেন—তিনি যদি এই একটা সামান্য ব্যাধি সারাবারে না পারেন—তবে দোষটা আপনারে কেউ দিবে না, দিবে আমার নসীবের লিখনকে।

মশায় সেকথা শুনেও যেন বুঝতে পারেন নি।

তিনি চলে গিয়েছিলেন দূর অতীতকালে। অন্তরের মধ্যে কোথায় লুকানো গোপন আগুনের আঁচ অনুভব করছিলেন; অতি ক্ষীণ ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছিলেন যেন; চোখ যেন জ্বালা করছিল। সত্যসত্যই তাঁর চোখে জল এসেছিল।

মিয়ার চোখ এড়ায় নি। তিনি বলেছিলেন—ইয়ারই তরে আপনার বংশেকে বলে মশায়ের বংশ, ইয়ারই তরে লোকে আপনারে চায়। রোগীর দুঃখ দরদে যে হকিমের চোখে জল আসে—সেই ধন্বন্তরী গো!

মশায় মুহূর্তে সম্বিত ফিরে পেয়েছিলেন; চোখ মুছে মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করেছিলেন—বলেছিলেন—তুমি রক্ষা কর আমাকে। মিয়া সাহেবের চিকিৎসার ভারও নিয়েছিলেন তাঁকেই স্মরণ করে। বলেছিলেন—তাই হবে মিয়া সাহেব। চিকিৎসা আমি করব। আপনার ভাগ্য আর ভগবানের দয়া। আমার যতটুকু সাধ্য। কই, দেখি আগে আপনার হাতখানি।

নিজেই তুলে নিয়েছিলেন তাঁর হাতখানি।

সেই হয়েছিল আবার শুরু।

* * *

রানা পাঠক আজ ঠিক সেই চেয়ারখানায় বসে আছে। ঠিক সেই ভাবেই এসে আত্মসমর্পণ করেছে। রানার অল্প বয়স। রানা প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী। নিজেকে বলে কলির ভীম। বাঁচবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তিনি কি পারবেন!

—দেখি বাবা রাণা হাতখানি দেখি।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে আছে রাণা, এইবার নাড়ী সহজ অবস্থায় এসেছে।—দেখি!

দীর্ঘক্ষণ নাড়ী ধরে বসে রইলেন। ভুজঙ্গগতি। হ্যাঁ! সাপের মত গতিতেই চলছে নাড়ী। কুটীল সর্পিল ভঙ্গি। এ সাপ রাজগোক্ষুরই বটে, দেহ-বিবরের মধ্যে বাসা বেঁধেছে; তার বিষনিশ্বাসে সারাটা দেহ আরও জরজর্জর; প্রবীণ বহুদর্শী বিষবৈদ্য যেমন গর্তের বাইরে বসে অনুমান করতে পারে গর্তের ভিতরের সাপের জাতি-প্রকৃতি, মশায়ের কাছেও ঠিক তেমনি ভাবেই অনুমিত হল ব্যাপারটা। এতক্ষণে চোখ খুলে চাইলেন। রাণার মুখের দিকে তাকালেন। চোখের চারিপাশে কালো ছায়া পড়েছে; চোখ দুটি ক্লান্তিতে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের মত বিষণ্ণ। রাণার হাতখানি ছেড়ে দিয়ে বিষণ্ণ হেসে বললেন—তাই তো রাণা!

রাণা হেসেই বললে—সে তো আমি জানি গো! নিজে তো গোড়া থেকেই বলছি। তা আপনি আমাকে বাঁচান। ভাল ক'রে দেন।

মশায় চুপ করে রইলেন। ভাবছিলেন—নূতন ওষুধ উঠেছে 'স্ট্রেপ্টো-মাইসিন' তার—কথা। সে নাকি অব্যর্থ।

রাণা বললে—আমি আজ একবার চারুবাবু ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। বুঝেছেন। তা উনি বললেন—বাপু শুনে-টুনে লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে টি বি কিন্তু এক্সরে না হলে ঠিক বলতে তো পারব না। স্ট্রেপ্টোমাইসিনের খরচও অনেক আর একেবারে নিশ্চয় না হয়ে দেবই বা কি ক'রে? তুমি বরং গোটা কতক ক্যালসিয়াম ইনজেকশন নাও—আর কি বলে—দুধ ঘি মাছ ডিম মাংস খাও—খেয়ে দেখ। তাতে ভাল হয় তো ভালই, না হয় তো—। চারুবাবুকে তো জানেন। কি রকম ছাড়া-ছাড়া কথা। হল-তো-হ'ল, না-হল-তো-না-হল, চারুবাবুর কি? তাই বলি—যাই তা-হলে আবার গিয়ে মাশায়কেই ধরি গিয়ে। উনি অন্তত বলে দিতে পারবেন বাঁচব কি বাঁচব না; যদি না বাঁচি তা হলে সময় থেকে জানতে পারব; মনকে বেঁধে কালো কালো বলে তৈরী হয়ে থাকব। মরণকে বলতে পারব "আমি রই আটাশে ছেলে—ভয় করব না রাঙা চোখ দেখালে!"

বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

মশায় বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন—তাই হ'ল বাবা রাণা। তুমি কাল বিকেলে আসবে—এখানে নয়, বিনয়ের দোকানে। ওখানেই আমাকে পাবে। কিন্তু হেঁটে এমন ক'রে এস না, বুঝেছ, গরুর গাড়ি ক'রে আসবে। হাঁটাহাঁটি পরিশ্রম এসব এখন স্থগিত রাখ। আর সেই মেয়েটির সংশ্রব একবারে পরিত্যাগ করতে হবে। বুঝেছ?

রাণা খুশি হয়ে উঠল। বললে—আজ্ঞে হাঁ। যা বলবেন আমি তাই করব। কাল আমি গাড়ি ক'রে বিনয়ের দোকানেই আসব। তা—।

—কি বল? হাসলেন মশায়।

—সে মেয়েটার অবিশ্যি ব্যামো বেশী। বাঁচবে না। তবে রোগ তো একই। তাকেও আমার সঙ্গে দেখুন না কেন? আপনি বিশ্বাস করুন আমি তাকে ছোঁব না। কিন্তু তাকে যখন আশ্রয় দিয়েছি—তার ধকল—। অবিশ্যি সর্বনাশ তার যা হবার সে কলকাতার দাঙ্গার মধ্যে হয়েছে, এখানে তাকে লুঠে নিয়ে এসেছিল মুসলমানে। বোরখা পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। তবু আমার দায় তো আছে। তাকে আজ তাড়িয়ে দেওয়াটা কি আমার পাপ হবে না? সে হতভাগী আবার কোথায় কার ঘরে যাবে বিষ ছড়াবে!

—এনো। তাকেও এনো। দেখব।

রাণা চলে গেল।

মশায় বিষণ্ণ হেসে বললেন—রাণাকে এই গুণেই আমি ভালবাসি।

সেতাব বললে—আমি কিন্তু খুশি হয়েছি তুই বিনয়ের ওখানে বসবি ঠিক করেছিস শুনে। বুঝেছিস!

হেসে মশায় বললেন—কিছু ঠিক করা কি মানুষের নিজের হাত সেতাব? সংসারচক্র মানুষকে ঘাড়ে ধরে ঠিক করায়।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন—বললেন—চল, রতনবাবুর বাড়ি যাব। সকালে উঠে বিপিনকে দেখতে যাই নি। কালরাত্রে ভেবেছিলাম কি জানিস? ভেবেছিলাম ছেড়ে দেব চিকিৎসা।

সেতাবও উঠল। বললে—না—না—না। অন্তত আমাদের মত বুড়ো কটা যদিন আছে—ততদিন ছাড়িস নে ভাই।

—মরতে ভয় লাগে না কি রে?

—ভয় করলে তো ছাড়বে না। সেকথা নয়। একালের চিকিৎসা দেখে আমার ভয় লাগে। বুঝেছিস! ওই সূচের বি ধুনি! বাবা!

—না রে! সে নিন্দে করিস নে। চিকিৎসার উন্নতি অদ্ভুত হয়েছে। সে বললে চলবে না। মৃত্যু নিবারণ করা যায় না কিন্তু রোগের ভোগ আর যন্ত্রণা অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

ইন্দির এসে দাঁড়াল। একখানা ফর্দ হাতে দিলে। বললে—একবারে মাসকাবারি হিসেব ক'রে জিনিস নিয়ে এলাম। এই ফর্দ।

মশায় হাসলেন—বললেন—উত্তম। গিন্নীকে দাও গো, রেখে দেবে। না হয় ফেলে দেবে। কমিশনে কুলোয় ভাল, না হলে বিনয়কে তালগাছ দিলেই হবে।

সেতাবের দিকে তাকিয়ে বললেন—বলছিলাম না সংসারচক্র। এই দেখ। বিনয়চন্দ্র মাসকাবারির জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছে। চল্!

(সাতাশ)

—এ লজ্জা রাখবার আমার আর জায়গা নাই। মৃত্যু হবার আগেই আমি মরে গেলাম লজ্জায়। আমি আপনাকে দুঃখ দিয়ে গেলাম।

কিশোর বলছিল।

বিপিনের কথা বলছিল। এই কথাগুলিই না কি বিপিনের একরকম শেষ কথা। কথাগুলি বলেছে তার বৃদ্ধ পিতা রতনবাবুকে।

অসাধারণ মানুষ রতনবাবু। বিষন্ন হেসে তিনি ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—তুমি আমার বীরপুত্র। জীবন-সংগ্রামে ভয় পাও নি, পিছু হট নি, বিশ্রাম নাও নি—যুদ্ধ করতে করতেই পড়লে ; তার জন্য লজ্জা কি ?

—লজ্জা ? বৃদ্ধ বয়সে আবার আপনাকে বর্ম পড়তে অস্ত্র ধরতে হবে। এ থেকে আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না। এই লজ্জা। এই তো আমার চরম দুঃখ।

এরপর আর কিশোর ঘরে থাকতে পারে নি। বেরিয়ে চলে এসেছিল। এর আগের দিন থেকেই বিপিনের প্রস্রাব বন্ধ হয়েছিল। তারই পরিণতিতে ক্রমশ মোহাচ্ছন্ন হয়ে বিকেল বেলা পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। রাত্রি এগারটায় সময় তার মৃত্যু হয়েছিল।

সাত দিন পর বিনয়ের দোকানে বসে কিশোর কথাগুলি বলছিল। জীবন মশায়কেই বলছিল।

জীবন মশায় এখন সন্ধ্যাবেলায় বিনয়ের দোকানেই বসছেন। সন্ধ্যের আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ; পথে সেতাবের ওখানে একবার হাঁক দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে বিনয়ের দোকানে এসে বসেন। বিনয় সঙ্গে সঙ্গে হাঁকলে, 'বি-কে রেস্টুরেণ্টের' লোকদের।

—ওরে 'খোকা' চা দু কাপ। চাকরকে বলে—ভজ—কাপ ধুয়ে ঠিক কর, কল্কেতে আগুন দে।

শেষ কয়েক দিন—পাঁচ দিন—জীবন মশায় বিপিনকে দেখতে যান নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে তাঁর আগেই পারা উচিত ছিল ; বুঝেও ছিলেন হয় তো কিন্তু বন্ধু রতনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা যেন

নিজেই বুঝতে চান নি। শুধু রতনবাবুই নয়। বিপিনের স্ত্রী তার পুত্র। তাদের দিকে চেয়েও বলতে পারেন নি।

মনে পড়েছিল—শশাঙ্কের স্ত্রীর কথা। মনে পড়েছিল বনবিহারীর স্ত্রী এবং তার ছেলের কথা। বনবিহারীর ছেলে সমর। দেড় বছরের সমরকে নিয়ে পুত্রবধূ সেই চলে গেছে পিত্রালয়। আর ফেরে নি। দু একবার এসেছে, মাসখানেক কি পনের দিন থেকে গেছে। তাও প্রথম দিকে। তারপর আর আসে নি। সমরকে তার মা সযত্নে তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে লুকিয়ে রেখেছে।

কঠোরভাষিণী শাশুড়ীর কঠোর বাক্যবাণ সে সইতে পারবে না। নিষ্ঠুর শাশুড়ী তার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে পর করে দেবে। আর শ্বশুরকে তার প্রচণ্ড ভয়। সমরের অসুখ করলে কখনও সে-সংবাদ তাঁদের জানানো হয় না। মশায় শুনেছেন—তাঁর বধূ বলেছেন পিত্রালয়ে—বাপ রে! নিজের ছেলে—শেষরাতে কম্প দিয়ে জ্বর এল। যেন হাত শুণতে জানে, নিজে এসে ডাকলে - অমুক কেমন আছে? শাশুড়ী বললে—শীত করছে বলছে, বোধ হয় জ্বর আসবে। বলব কি—বললে—আসছে? আসবার কথা। আমি জানতাম। বলে ঘরে ঢুকে হাত দেখে আপনার মনে পরমানন্দ মাধব বলে নেমে চলে গেল। আর এল না, দেখলে না, বসে রইল কবরেজখানায়। শাশুড়ী নিজে গেল—বলে—ওষুধে আর কাজ হবে না। দুধ গঙ্গাজল দাও গিয়ে, নয় তো যদি কিছু খেতে সাধ থাকে তাই দাও গিয়ে। এ মানুষ দেবতা হয় তো দেবতার পায়ে প্রণাম। দেবতার সঙ্গে মানুষের বাস অসম্ভব।

মশায় বংশে ছেদ পড়ে গেল। সমর এখন শুধুই সমর দত্ত। মাতামহ মোক্তার গোবিন্দ মিত্তিরের উত্তরাধিকারী। সমরকে তিনি ওকালতি পড়াবেন। সে এখন সদর শহরে কলেজে বি-এ পড়ছে। দুঃখ তাঁর এইখানেই। সমর যদি এম-বি পাশ ক'রে ডাক্তার হ'ত! এই প্রদ্যোত ডাক্তারের মত একালের ডাক্তার! তিনি জানেন—বিশ্বাস করেন—সমর প্রদ্যোতের থেকে ভাল ডাক্তার হত। এ তার বংশগত সাধনা যে। এখানে আরোগ্য-নিকেতনে না-আসত, না-বসত তাতে তিনি কিছু মনে করতেন না। শুধু বলে যেতেন—ভাই, মশায়ত্বটা বজায় রেখো।

আর কিছু উত্তরাধিকার দিয়ে যেতেন। মাতামহের কল্যাণে তার বিষয় সম্পত্তি তো বেশই আছে—তার অভাবও তার নাই এবং সেদিক দিয়ে দেবারও তাঁর কিছু নাই। সবই প্রায় গিয়েছে। মেয়ের বিয়েতে ঋণ করেছিলেন নবগ্রামের জমিদার বহুকীর্তিতে কীর্তিমান ব্রজলাল বাবুর কাছে। তাঁদের বাড়িতে তিনি নিয়মিত গৃহচিকিৎসকের কাজ করেছেন বহুকাল, কখনও ফিজ নেন নি। মনে তাঁর সংকল্প ছিল—আসল টাকাটা নিয়ে গিয়ে বলবেন—সুদ আমি দেব না। আমি অনেক সেবা আপনাদের করেছি। কিন্তু ব্রজলাল বাবুর আমলে সে সংকল্প কাজে পরিণত করতে পারেন নি। বনবিহারীর মৃত্যুর পর তিনি যে পাঁচ সাত বৎসর ঘরের কোণে বসে পরমানন্দকে অনুভব করতে চেষ্টা করেছিলেন—সমস্ত বাস্তব সংসারকে ভুলতে চেষ্টা করেছিলেন—সেই সময়ের মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন ব্রজলাল বাবু। তাঁর ছেলেরা বাপের মৃত্যুর পর নালিশ করেছিল। তিনি তখন তাঁদের কাছে দাবীটাও জানিয়েছিলেন। সবিনয়েই অবশ্য। তারা অস্বীকার ঠিক করে নি; বলেছিল—মাসিক দু টাকা হিসেবে বেতন ধরে সেই টাকাটা সুদে বাদ দিতে প্রস্তুত আছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার তাঁদের গৃহচিকিৎসক হিসেবে পাঁচ টাকা বেতন পান মাসে। সে ক্ষেত্রে তাঁকে—দু টাকা হিসেবে দিতে রাজী আছেন। তিনি আর কোন উত্তর দেন নি! হেসেছিলেন ঘরে বসে। নিজেকেই তিরস্কার করেছিলেন। কেন? আবার কেন? সব ভুলতে বসেছ তখন আর কেন? তবু মনে সাধ হ'ত—সমর বড় ডাক্তার যদি হয় তবে তিনি সুখী হন। উত্তরাধিকার হিসেবে তাকে তিনি তাঁদের মুষ্টিযোগের খাতা দিয়ে যাবেন আর নাড়ী দেখতে শিখিয়ে যাবেন। আর সম্ভব হলে খুঁজে পেতে মঞ্জরীর যদি কেউ থাকে—ভাল মেয়ে—তার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে যাবেন।

—কি গো? আপন মনেই ঘাড় নাড়ছেন যে? নিন, তামাক খান! বিনয় হুকোটা এগিয়ে দিলে।—বিপিনবাবুর কথা ভাবছেন বুঝি? তা—ঘাড় নাড়ার কথাই বটে। হায় হায় করে মনটা সারা হয়ে গেল। ইন্দ্রপাত! যাকে বলে ইন্দ্রপাত ঠিক তাই। বাপরে বাপরে—বিপিনবাবুর দেশে খাতির কি? রোজগার কি? পসার কি?

কিশোর বললে—ডাক্তার চ্যাটার্জী যা করতে বললেন—তা ডাক্তাররা করতে সাহস করলে না কেউ। করা উচিত ছিল।

দুদিন আগে কলকাতা থেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার চ্যাটার্জী এসেছিলেন বিপিন বাবুকে দেখতে। হরেন ডাক্তার গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছিল।

পাঁচ দিন আগে মশায় গিয়ে বিপিনকে দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন নি। মনে করতে চেষ্টা করেছিলেন—এটা রাত্রের সেই উত্তেজনার ফল। হয় তো সাময়িক—এটা কেটে যাবে। তবু তিনি হরেনকে বলেছিলেন। হরেন প্রদ্যোতকে বলেছিল। প্রদ্যোত অসন্তুষ্ট হয়েছিল। বলেছিল—হরেনবাবু, রোগী সম্পর্কে আপনিও জানেন আমিও জানি যে কোনদিন যে কোন মুহূর্তে সামান্য কারণে রোগী Expire করতে পারে। এটা তো কোন নতুন তথ্য নয়। কিন্তু ওই হাত দেখে এই ধরনের একটা ভবিষ্যদ্বাণী—ওতে মশায় আমার বিশ্বাস নেই। অন্তত আমার কাছে এটা বলবেন না। তবে ওঁদের বিশ্বাস হয় ওঁরা যা করতে চান করতে পারেন।

ঠিক পরের দিন কিন্তু রোগ সত্যই কঠিন বলে ডাক্তারদের মনে হল। হরেন ডাক্তার প্রদ্যোত ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালেন। চারুবাবুকেও ডাকা হ'ল।

মনে হল—ইউরিমিয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, বা দেবে।

সেই দিনই হরেন কলকাতা গিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জীকে নিয়ে এসে পৌঁছুল পরের দিন। ডাক্তার চ্যাটার্জীরই হাতের রোগী বিপিনবাবু।

ডাক্তার চ্যাটার্জী এসে দেখে একটা ইনজেকশন দিতে বলেছিলেন। যার ক্রিয়ায় রোগের সদ্য সদ্য উপশম হবে অথবা হয় তো সঙ্গে সঙ্গেই জীবনান্ত ঘটতে পারে।

ডাক্তারেরা পরস্পরের দিকে চেয়ে দৃষ্টি বিনিময় করেছিলেন, হাঁ না কোন কথাই বলতে পারেন নি।

বড় ডাক্তার ডাক্তার চ্যাটার্জী যে দিন আসেন সেদিন সকালে জীবন মশায় একখানা চিঠি পেয়েছিলেন রতনবাবুর কাছ থেকে; বাকী কয়েকটা ফিজের টাকাও তিনি পাঠিয়েছিলেন। লিখেছিলেন—"আজ কলকাতা হইতে

ডাক্তার আসিতেছেন। চিকিৎসার ভার একেবারে সম্পূর্ণরূপে একালের পদ্ধতিতে পরিচালনা করাই সকলের মত। তোমার মত আমি অনেক দিন বুঝিয়াছি। জানিয়াছি। বিপিন যদি বুঝিতে পারিত তবে আমার কোন দুঃখই থাকিত না।" এই কারণেই জীবন মশায় শেষ কয়েকদিন বিপিনকে দেখতে যান নি।

ডাক্তারেরা সে ইনজেকশন দেয় নি, দিতে সাহস করে নি। প্রদ্যোতের ইচ্ছা ছিল কিন্তু চারুবাবু তাকে নিরস্ত করেছিলেন।

—ও কাজও করবেন না ভায়া। যদি কিছু হয় তখন কি হবে? ক্ষেপেছেন আপনি! যদি দেন, তবে দেন আপনি—আমি মশাই এর মধ্যে নেই। বড় ডাক্তার ওঁরা, ওঁদের কি? ভাল ফল হলে সুনাম হবে ওঁদের কিন্তু মন্দ হলে সে দায় আপনার আমার। বলবে—ইনজেকশন দিতে ভুল করেছে। কিম্বা বলবে—তোমরাও তো ঘোড়ার ঘাস কাট না—ডাক্তারী কর, বোঝ; তোমরা জেনে শুনে দিলে কেন?

বিপিনবাবু কিন্তু এই থেকেই বুঝে নিয়েছিলেন ভবিষ্যত।

স্তব্ধ হয়ে স্থির দৃষ্টিতে খোলা জানালা দিয়ে আকাশের নীলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সারা দিনটা। সন্ধ্যার পর বাপকে ডেকে ওই কথা বলেছিলেন।

—এ লজ্জা রাখবার আর ঠাঁই নাই। মৃত্যু হবার আগেই আমি লজ্জায় ম'রে যাচ্ছি। আপনাকে আমি দুঃখ দিয়ে গেলাম।

জীবন মশায় সমস্ত শুনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বললেন—যে জীবনে শান্তি নেই কিশোর সেই জীবনই অসুস্থ। অশান্তি আর অতৃপ্তি ও দুটোই এক। ওই আসল ব্যাধি। আগন্তুক ব্যাধি যে সব—ইনজেকশন ডিজিজ—তার প্রতিকার ওষুধ একে একে আবিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু এই দুটোর প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। তবে—

—হ্যাঁ, তবে বিপিন যে শেষটা নিজে সমস্ত বুঝে নিজে তৈরী হয়েছিল এতেই আমি শান্তি পেয়েছি। বুঝেছ—

—হুজুর।

এসে দাঁড়াল কদ্রু। বুড়ো জুতো সেলাইওয়ালা।

বিনয়ের ডাক্তারখানায় কদ্‌রু তাঁর প্রথম রোগী। বুড়ো আমাশয়ের রোগী। পুরানো রোগ। কদ্‌রু কিন্তু আশ্চর্য রোগী। এমন সাবধান রোগী আর দেখা যায় না। রোগ তার দুরারোগ্য অসাধ্য। আজও সারল না। কিন্তু কদ্‌রুকে পাড়ুও কখনও করতে পারে নি। রোগ বাড়লেই কদ্‌রু খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দেবে। চিকিৎসক যদি বলেন—এক পোয়া খাবে তবে সে আধ পোয়ার বেশী খাবে না।

বাতিক তার ওষুধের। ওষুধ তার একটা না একটা খাওয়া চাই-ই। সে ডাক্তারী কবিরাজী যা হোক। পালা আছে। কিছুদিন ডাক্তারী তারপর কিছুদিন কবিরাজী।

কদ্‌রু তাঁর পুরানো রোগী। কদ্‌রু এ দেশের লোক নয়। বোধ করি বিলাসপুর অঞ্চলের চর্ম-ব্যবসায়ী। এ দেশে সেকালে যে প্রথম দল এসেছিল তাদের মধ্যে ছিল কদ্‌রু।

কদ্‌রু এখানকার সকলেরই প্রিয় পাত্র। বিশেষ করে মশায়ের এবং কিশোরের।

মশায় সেকালে ওর মরণাপন্ন ছেলেটাকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই কারণে কদ্‌রু সেকালে মশায়কে দেখলেই এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াত।—জুতাটা বুরুশ করে দিব মহাশা।

জুতো পরিষ্কার না-করিয়ে উপায় ছিল না তাঁর। দাঁড়াতেই হত। সে যেখানেই হোক। বাজারে-হাটে-ইস্কুলের সামনে সবরেজেস্ট্রি আপিসের অশথ তলায় কদ্‌রু এক একদিন এক এক জায়গায় পালা ক'রে বসত। সেদিক দিয়ে যেতে হলেই কদ্‌রুকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নিতে হত।

পয়সা অবশ্যই দিতেন মশায়। কদ্‌রুর আগ্রহের দাম দেওয়া যায় না। বনবিহারীর মৃত্যুর পরও মধ্যে মধ্যে কদ্‌রু বাড়ি গিয়ে জুতো পালিশ ক'রে দিয়ে এসেছে। তখন কোনদিন পয়সা পেয়েছে কোনদিন পায় নি। আজ বছর কয়েক কদ্‌রু বুড়ো হয়ে অক্ষম হয়েছে। সবরেজেস্ট্রি আপিসের অশথ তলাটি ছাড়া অন্য কোথাও আর যায় না, যেতে পারে না। বিনয়ের দোকান সবরেজেস্ট্রি আপিসের কাছেই। এবার কদ্‌রু ঠিক এসে হাজির হয়েছে। জুতোও সাফ করে দিয়েছে। এবার অসুখটা বেশী।

কদ্‌রুর মৃত্যুকাল নিরূপণ করা কঠিন। কদ্‌রু রোগকে প্রশ্রয় দেয় না সাবধানী লোক। কিন্তু রোগটা যেন ক্রমশ গ্রহণীতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে মনে হচ্ছে

কদ্‌রু নিজেই বলেছে—সুই দাও বাবা মহাশা। বেশ ভাল তেজ টাটকা আমদানী দাওয়াই দিয়ে সুই দাও।

—সুই? ইনজেকশন? ডাক্তার হাসলেন।—জলদি আরাম চাই কদ্‌রু

—হাঁ বাবা। বিনা কামসে খাই কি ক'রে?

কদ্‌রুর ছেলেরা বড় হয়ে বাপকে ফেলে অন্যত্র চলে গেছে। স্ত্রী মরেছে কদ্‌রু এখন একা। কাজেই খাটতে হবে বই কি।

ডাক্তার সেদিন বলেছিলেন—তার থেকে তুই হাসপাতালে যা না কদ্‌রু তোর সাহেবকে ধরলেই তো হয়ে যাবে।

কদ্‌রুর সাহেব হল কিশোর। কিশোরকে কেন কি জানি ছেলেবেল থেকে বলে—সাহেব।

কিশোরের সঙ্গে কদ্‌রুর আলাপ ফুটবল মেরামতের সূত্র ধরে। তখন কিশোর হ্যাফপ্যান্ট জারসি পরে ফুটবল খেলত। ছেলেদের দলের ক্যাপ্টেন ছিল, বোধ করি সেই কারণেই বলত সাহেববাবু। পরে খদ্দরধারী কিশোর কত আপত্তি করেছে, কখনও কখনও ধমকও দিয়েছে কদ্‌রুকে—তবু কদ্‌রু সাহেববাবু নাম ছাড়ে নি।

কদ্‌রু হাসপাতালে যেতে রাজী হয় নি।—নেহি মা বাপ। উখানে হামি যাবে না। উ সব বাবু লোক—মেম সাহেব লোক ওষুদ পিলায়—আর তা ছাড়া বাবা—দিনরাত বিস্তারায় শুয়ে থাকা, ওই সব লোকের সেবা নেওয়া কি আমার মত চামারের কাজ?

—আরে! ওই জন্যেই তো ওরা আছে। হাসপাতাল তো সবারই জন্যে। রোগী তো হ'ল হাসপাতালের দেবতারে। তার জন্যে তুই সরম করিস না।

—না বাবা। না।

—কেন রে? আমি বলছি ভাল হবে। তুই যে রকম নিয়ম করিস তাতে চট করে সেরে যাবি। আর রোগ হলে শুয়ে থাকাই তো নিয়ম।

—তাই তো থাকি বাবা। গাছতলায় চ্যাটাই পেড়ে বসে থাকি, বসে বসেই কাম করি। ঘুম পেলে ঘুমুই।

—সেই হাসপাতালে ঘুমোবি।

—আমি দাওয়াইয়ের দাম দেব বাবা।

—তার জন্যে আমি বলি নি কদ্রু। হাসপাতালে গেলে তোর ভাল হবে।

—নেহি বাবা। হাসপাতালে যে যাবে সে বাঁচবে না। আমি বলে দিলাম।

—কেন ?

—হাসপাতালে দেও আছে বাবা। রাতসে ঘুমে ঘুমে বেড়ায়। কবর-স্থানের উপর হাসপাতাল ; সেই কবর থেকে ভূত উঠেছে।

মশায়ের মনে পড়ে গেল কথাটা। সে দিন রাত্রে প্রদ্যোত ডাক্তারের রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ভূতে নাকি মাংস চেয়েছিল। ডাক্তারেরা কেউ মাংস খান নি। পরের দিন দাঁতু ঘোষাল হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে।

মশায় ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। একটা কথা তাঁর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে— ; কিন্তু থাক সে কথা। ভূত একবার তিনি দেখেছিলেন। সে মাছ খাচ্ছিল। রাত্রি তখন একটা। তিনি ডাক থেকে রোগী দেখে ফিরছিলেন। পথে নবগ্রাম ঢুকবার মুখে—বাগানওয়ালা পুকুরটার ঘাটে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল একটা আপাদমস্তক শাদা কাপড় ঢাকা মূর্তি। কিছু যেন খাচ্ছিল। জ্যোৎস্নার মধ্যে হাত মুখের কাছে তোলা বুঝতে পারা যাচ্ছিল।

গাড়োয়ানটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভয় পান নি। গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়েছিলেন। দেখেছিলেন প্রেতই বটে। মাছ খাচ্ছে। সে ছবিটা যেন চোখের উপর ভেসে উঠেছে। দেখছেন তিনি।

এবার তাঁর মুখে এক বিচিত্র ধরণের হাসি দেখা দিল। এ সংসারে সবই আছে। ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য সবই আছে। নাই কে বলে ? যদি সত্যকারের সেই দৃষ্টি থাকে তবে নিশ্চয় দেখতে পাবে।

—বাবা !

—হ্যাঁ। মশায় বললেন—ওরে বিনয়, দে বাবা একটা এমিটিন দে। ভয় যখন পাচ্ছে কদ্রু তখন হাসপাতালে পাঠানো ঠিক হবে না।

কিন্তু—। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন, বললেন—থাক। আন বিনয়, ইনজেকশন আন।

কদ্রুকে ইনজেকশন দিয়েই চিকিৎসা তিনি শুরু করেছিলেন। বিনয়ের দোকানে নতুন আটনে কদ্রু তাঁর প্রথম রোগী। আজ আবার কদ্রুর ইনজেকশনের দিন। ঠিক সে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছিস?

—না—না। ঘাড় নাড়লে কদ্রু। ভালো না বাবা মহাশা। ভালো না। থোড়াথুড়ি বুখার ভি হয়।

—দেখি হাত দেখি। হাত ধরে মশায় বললেন—বড় যে দুর্বল হয়ে পড়েছিস কদ্রু। অসুখ বেড়েছে? বেশী ঝাড়া খাচ্ছিস?

—না বাবা। কম হোয়েসে। সো তো কম হোয়েসে।

—তবে? খাচ্ছিস কি?

—কি আর খাব বাবা? থোড়াসে বার্লিকে পানি। বাস্। আর কুছু না। কুছু না।

—কিন্তু খেতে যে হবে রে। না খেয়েই এমন হয়েছে।

—ডর কে মারে খেতে পারি না বাবা মহাশা।

—ডর করলে হবে না। খেতে হবে। না খেয়েই তুই মরে যাবি।

—মরণকে তো ডর নেহি বাবু। বেমারির দুঃখকে ডর করি বাবা। খানা-পিনা করব, যদি বেমারি বাড়ে! পেটকে দরদ বাড়ে! শেষে কি ময়লা মিট্টি খেয়েই মরব বাবা?

মশায় একটু ভেবে বললেন—তুই হাসপাতালে যা। তোর সাহেববাবু রয়েছেন—বলে দিলেই হয়ে যাবে। আর তুই যেরকম রোগী, হয় তে অল্পেই ভাল হয়ে যাবি।

—নেহি বাবা। হুঁয়া ভূত আছে বাবা। বিলকুল রোগী পালিয়েছে তুমি খবর নাও।

মশায় একটু চুপ ক'রে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—না, ভূত নয় আমার কথা শোন। ভূত নয়। মিছে কথা। সব মিছে কথা।

—নেহি বাবা। ডাগডর সাহেবের বাবুর্চি নিজু আঁখসে দেখিয়েসে। গোস্ মাগছিলো!

—সে ভূত নয়। মানুষ। আমি বলছি। আমি জানি। এ ভূত ওই দাঁতু ঘোষাল। আমি বলছি।

বিনয় কিশোর চমকে উঠল। দুজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল—সে কি কথা! আপনি কি করে জানলেন?

—জানি। মশায় বললেন—কিশোর, লোভ পাপ—মানুষের জীবনের কলঙ্ক, সেই কারণেই আমি বলি নি। দাঁতুর লজ্জা নেই—মান নেই অপমান নেই তবু বলি নি। কিন্তু হাসপাতালের অপবাদ যে ভয়ানক ব্যাপার। সে ক্ষেত্রে না বললে তো চলবে না! তাই আমাকে বলতে হচ্ছে। এ ওই দাঁতু। প্রবৃত্তি ওর লোভের তাড়নায় রিপু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ নয়, অনেক কাল থেকে। এমনি ভূত সেজে খাওয়ার অভ্যাস ওর আছে—আমি নিজের চোখে দেখেছি। নবগ্রামের প্রান্তে একদিন দুপুর রাত্রে আসছি—ঝাঁ ঝাঁ করছে রাত; শুক্লপক্ষ—দ্বাদশী ত্রয়োদশী হবে, আকাশ জ্যোৎস্নায় যেন দুধে ধোয়া; চারিদিক ধবধব্ করছে। গাড়োয়ানটা ভয় পেয়ে ডেকে উঠল—মশায় গো! আমি আকাশের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম, মনটা সেদিন ভাল ছিল না, যে রোগী দেখতে গিয়েছিলাম—সে রোগী মরেছে। ভাবছিলাম—আকাশের দিকে তাকিয়ে ওই মৃত্যুর কথাই ভাবছিলাম। মরবার আগে বিকারের ঘোরে রোগীটি বড় ভয় পেয়েছিল। গাড়োয়ানের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে জিজ্ঞাসা করলাম—কি? সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ভূত। ওই। দেখলাম—বাগানওয়ালা পুকুরটার ঘাটের পাশে একটা গাছের তলায় একটা শাদা মূর্তি। আপাদমস্তক শাদা কাপড়ে ঢাকা। কিছু যেন খাচ্ছে। বুকটা চমকে উঠল প্রথমে। তারপর আমি নামলাম। এগিয়ে গেলাম। খানিকটা গেছি—খোনা গলায় মূর্তিটা বলে উঠল—কেঁ রেঁ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কে? মূর্তিটা এবার হেসে উঠল—বললে—আমি ভূঁত। আমি এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম—কে? হাতখানা চেপে ধরলাম। ভূত গামছার আঁচলে এক আঁচল ভাজা মাছ নিয়ে খাচ্ছিল।

বললে—ছাড় ছাড়, মাছ পড়ে যাবে। লোকটা দাঁতু ঘোষাল। নবগ্রামে অমর মুখুজ্জের মেয়ের বিয়েতে রান্নার কাজে সাহায্য করছিল; সেখান থেকে গামছায় এক আঁচল ভাজামাছ চুরি করে গ্রামের প্রান্তে পুকুরে ওই গাছতলায় দাঁড়িয়ে প্রেতের মত আনন্দে গিলে খাচ্ছে। বললে, ভারী মিষ্টি লাগছে মশায়। বললাম, এ কি প্রবৃত্তি তোর দাঁতু! ছি! সামাজিক ভোজনের অগ্রভাগ চুরি করে খাচ্ছিস—আর খাচ্ছিস ময়লার দুর্গন্ধে ভরা এই পুকুরের গাছতলায় দাঁড়িয়ে, তোর কি ঘৃণাও নাই রে? বললে, না। ঘেন্না-টেন্না আমার নাই বাপু। মাছ-টাছ খেতে আমি বড় ভালবাসি। আমি সেই দিন ওকে বলেছিলাম, দাঁতু, তুই শেষ পর্যন্ত এই লোভেই যাবি। এই জন্যেই বলছি—এ ওই দাঁতু ঘোষাল। এ কথা আজও কাউকে বলতে পারি নি। দাঁতু আমার পায়ে ধরতে এসেছিল। বলেছিল—সামাজিক ভোজনের রান্নাশালা থেকে চুরি করে খাই এ যদি প্রকাশ হয় মশায় তবে আমাকে আর কেউ ডাকবে না। আমার অন্ন মেরো না। কিন্তু আজ তো না বললে নয়।

সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিনয় সর্বপ্রথম হেসে উঠল। কিশোর বললে—কিন্তু দাঁতুই তো প্রথম পালিয়েছে মশায়!

—তাই পালাবার কথা কিশোর। হাসপাতালের যত্নে একটু সেরে উঠেছে। এখন আর নিয়মকানুন ও সহ্য করতে পারছে না। মাংস খেতে গিয়েছিল, গোলমালে খেতে পায় নি, পালিয়ে গিয়েছে; তারপর ওই অজুহাত তুলে ওই সর্বাগ্রে পালিয়েছে। এই জন্যেই আমি নিশ্চিত হয়ে বলেছি ওকে যেতে হবে ছ মাসের মধ্যেই। ওর নাড়ী আমি দেখেছি, ওর অম্বলের ব্যাধি গ্রহণীতে দাঁড়িয়েছে। কদরু তুই হাসপাতালে যা। নির্ভয়ে যা। ভূত নাই—ভূত নয় আমি বলছি তোকে। তোর যত্ন হবে পথ্য পাবি। সেই দুটোই তোর আগে দরকার। কিশোর, ওকে তুমি নিয়ে যাও। হাসপাতালে ভর্তি করে দাও।

একখানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়াল।

—মাশায়! রাণা পাঠক এসে নামল গাড়ি থেকে।

—এস রাণা।

—এসেছি। মেয়েটিকে নিয়ে এসেছি মশায়। ওকেও দেখুন। ওকে তো তাড়িয়ে দিতে পারব না। রোগের সেবাও করতে হবে। হয় দুজনকেই ভাল করুন নয় যেতে দু জনকেই হবে।

মেয়েটি রোগে জীর্ণ হয়ে এসেছে। চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি। ঠোঁটের দু পাশের বক্ররেখায় জীবনের উপর পৃথিবীর উপর তিক্ততার আভাস ফুটে উঠেছে; কাপড়ের আঁচলে রক্তের চিহ্ন রয়েছে; আসবার পথে কাশির সঙ্গে রক্ত উঠেছে বোধ হয়।

মশায় রাণার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

*　　　　*　　　　*

রাত্রি দশটায় বিনয়ের দোকান থেকে উঠলেন। সাড়ে আটটাতেই রোগী দেখার পালা শেষ হয়েছে। তারপর ঘণ্টা দেড়েক সেতাবের সঙ্গে দাবা খেলেছেন। আজ দাবায় তিনি দু বাজীর খেলাতেই হেরেছেন। নবগ্রামের বাজারের আলো নিভে আসছে। পথ জনবিরল। বিনয় যাবার সময়ের জন্য সাইকেল রিক্সার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল, কিন্তু মশায় বলেছেন—না। তাঁর মত ওজনের মানুষকে চাপিয়ে নিয়ে যেতে সাইকেল রিক্সা-চালকদের কষ্ট তিনি অনুমান করতে পারেন। তিনি বরং চারজন বেহারার কাঁধে পাল্কীতে যেতেও রাজী আছেন কিন্তু রিকসায় চাপতে চান না।

পথ জনবিরল। সেতাব দাবার কথা তুললে—বললে—আজ কি ভাবছিস বল তো? দাবায় যে ভুলগুলো করলি! রাণার কথা? পরক্ষণেই বললে—না—দাঁতুর কথা? হাসতে লাগল সেতাব।

—উঁহু। ভাবছিলাম বিপিনের কথা।

—ভুল চিকিৎসা হয়েছে?

—নাঃ। শেষকালে আর ভুল ঠিক বলে কিছু নাই। ও বানের তুফানে কুটো ধরা। মিছে জেনেও ধরে। ধরেও কিছু হয় না। যেখানে হয় সেখানে কিসে যে হয় কেন যে হয় তাও ঠিক কেউ বলতে পারে না। ও ভাবি নি। ভাবছি—

—কি?

—পুণ্যবানের সন্তান, নির্মলচরিত্র মানুষ, শুধু প্রতিষ্ঠার মোহ ছিল ত্রুটি। আমি ভেবেছিলাম বিপিন হয় তো মরতে আতঙ্কিত হবে ভয় পাবে। তা পায় নি। সেই জন্যে মনে সান্ত্বনা পেয়েছি। একালে মানুষ মরতে ভয় পাচ্ছে। ওটা বড় দুর্লক্ষণ সেতাব। তাই কিশোরের কথা শুনে অবধি ভাবছি—নাঃ, তা নয়। আছে। থাকবে। মানুষের ওইটেই কষ্টিপাথর সেতাব। কে কতবড় মানুষ সে ধরা পড়ে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে।

সেতাব সেকালের মানুষ, সৎ মানুষ কিন্তু এত গভীর তত্ত্বতে সে হাঁপিয়ে ওঠে। সে চুপ ক'রে গেল।

মশায় বললেন—নতুন যুগ—কত কি হল। যা কেউ কখনও ভাবে নি ভাবতে পারে নি তাই। কত ওষুধ কত ব্যবস্থা; বলেছি তো রোগের যন্ত্রণা কমেছে, অকাল মৃত্যু কমেছে। কিন্তু মৃত্যুভয় বাড়ছে কেন? আর ভুলে যাচ্ছে কেন—মৃত্যু আসবেই। সে ভাবনাটাই যেন নাই। বিপিনের মধ্যে—

সেতাব তার কথায় বাধা দিয়ে বললে—চারুবাবুর আড্ডাটি কানা হয়ে গেল।

চারুবাবু ডাক্তারের বাড়ির সামনে দিয়ে চলছিলেন তাঁরা। চারুবাবু এই সময়টিতে নিত্য বারান্দায় বসে থাকতেন, সামনে পেগ-টেবিলে থাকত দু আউন্স ব্রাণ্ডির গ্লাস আর থাকত গড়গড়া। কয়েকজন অনুগত লোক নিয়ে গল্প করতেন, মধ্যে মধ্যে উচ্চ হাস্য করতেন। রাত্রি আরও একটু গাঢ় হলে রাস্তায় যে কেউ আসুক জিজ্ঞাসা করতেন—Halt, who comes there—হুকুমদার? তারপর বিশুদ্ধ বাংলায় বলতেন—কে যায়?

মশায় চারু ডাক্তারের বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। সত্যি বারান্দাটা অন্ধকার হয়ে রয়েছে। চারু ডাক্তার আজকাল ডাক্তারদের Co-operative medical Store & Clinicএ বসছেন। ওঁদের ডাক্তারখানা খোলা হয়েছে। ঠিক তার পাশ দিয়ে দক্ষিণমুখে ঘুরবে সেতাব, উত্তরমুখে ঘুরবেন মশায়। উজ্জ্বল স্টোভলাইট জ্বলে। ডাক্তারেরা আড্ডা দেন। চারুবাবু, হরেন প্রদ্যোতের বন্ধু; প্রদ্যোতও থাকে, কোন কোন দিন প্রদ্যোতের বাচুরী বউটিও থাকে। লোকে ওকে বাচুরী বউ বলে।

চারুবাবু বলেন—গেছো মেয়ে। মশায়ের কিন্তু ভাল লাগে। বেশ লাগে। শুধু জানতে ইচ্ছে হয় প্রদ্যোত ওতে সুখী কি না।

মানুষ বিচিত্র। লোকে আতর বউয়ের সুখ্যাতি করত। বলত—এমন গুণের বউ আর হয় না। কি শীলতা কি সভ্যতা! কেউ হাসি শুনলে না। কিন্তু —!

চারুবাবু প্রশ্ন করলেন—ফিরলেন নাকি মশায়? নতুন ডাক্তারখানার দাওয়ায় বসে চারুবাবু প্রশ্ন করলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মশায় ফিরে তাকালেন কিন্তু দাঁড়ালেন না! দাঁড়ালেই বসতে হবে। প্রদ্যোত ডাক্তার আজ নাই। না থাক। তবুও এখানে গিয়ে বসতে তাঁর ইচ্ছে করে না। ডাক্তারখানা খোলার দিন ওরা তাঁকে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করে নাই। চারুবাবু প্রশ্নের জন্যই প্রশ্ন করলেন—তারপর, বাড়ি?

—হ্যাঁ। বসে আছেন?

—হ্যাঁ বসে আছি। কিচ্ছু না। একেবারে ডাল্ সিক্তন। হ্যাঁ হ্যাঁ—তারপর দাঁতুর কথা শুনলাম। ডেঞ্জারাস তো! আরে মশায় সেদিন এমন সুস্বাদ পক্ষী-মাংস আমরা কেউ খেলাম না! বলেই চারু ডাক্তার হা-হা করে হেসে উঠলেন। ভূঁত—আমি ভূঁত! my God! Rascal কোথাকার! ব্যাটা আমার রসিক!

সুখী মানুষ চারু ডাক্তার। মশায় মোড় ফিরলেন।

গাছের ছায়ায় অন্ধকার দুটো পুকুরের মাঝখান দিয়ে খানিকটা পথ পার হয়েই আলো পেলেন। হাসপাতালের আলো। দূরে মাঠে আলো জ্বলছে, খুব উজ্জ্বল আলো। আলো জ্বেলে ক্যানেলের একটা বাঁধ তৈরী হচ্ছে। পাকা বাঁধ।

—মশায়!

—কে? ও—তুমি।

হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার হাসপাতালের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রদ্যোত ডাক্তারের ঘরে আলো জ্বলছে। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে ঘরের মধ্যে ঘুরছে। বলছে—আজ্ঞে হ্যাঁ আমি। ফিরলেন?

—হ্যাঁ।

—ডাক্তারবাবু আজ কিন্তু আপনার সম্বন্ধে বেশ ভাল কথা বলছিলেন।

—কে? হাসপাতালের ডাক্তারবাবু? কেন? কি হ'ল?

—কিশোরবাবু কদ্রুকে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন কিনা! দাঁতুর কথা বলে গেলেন।

—অঃ। হাসলেন ডাক্তার। তা বেশ।

—বলছিলেন—

বাধা দিয়ে মশায় বললেন—যা জানি তাই বলেছি। ওতে খুশির কথা তো কিছু নাই।

ডাক্তার হন হন করে এগিয়ে গেলেন। এইটে তাঁর ভাল লাগল না। কিন্তু কম্পাউণ্ডার তা বুঝবে না। হাসপাতালের ডাক্তারের খুশি হওয়াটা তার কাছে একটি বড় কথা। কিন্তু—। হাসলেন মশায়।

—আরে বাবা একটু পথ দে। শুনছিস!

সামনেই একখানা গরুর গাড়ি চলেছে। সঙ্কীর্ণ পথে পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নাই।

—আজ্ঞে?

—একটু পথ দে বাবা। আমি পার হয়ে যাই। ধূলো খেয়ে মারা যাব বাবা।

গাড়ির ভিতর ফিসফাস শব্দ শুনতে পেলেন।—মশায়! তাঁরই নাম করছে। কণ্ঠস্বরে তাঁকে চিনেছে। গাড়িটা পাশ ক'রেই দাঁড়াল। মশায় পার হয়ে গেলেন। গাড়ির গাড়োয়ানকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।—কে? মতি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মতি কর্মকার মৃদুস্বরে জবাব দিলে।

—কোথা থেকে এতরাত্রে গাড়ি নিয়ে?

—আজ্ঞে! একটু চুপ ক'রে থেকেই মতি উত্তর দিলে—ইস্টিশান থেকে!

চকিতে মশায়ের মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন—মা ফিরল বর্ধমান থেকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ! বেশ!

ডাক্তার হন হন ক'রে হাঁটতে লাগলেন।

আতর-বউ বসে ঢুলছে। সামনে আলোটা জ্বলছে। ওপাশের বারান্দায় বসে রয়েছে ইন্দির। ওটা কে? নন্দা? নন্দা এখনও রয়েছে? ও—মাইনে। নন্দা মাইনে চেয়েছে। বলেছিলেন—ফিরে এসে দেব।

পকেট থেকে টাকা বের করলেন। সে আমলের বোম্বাই পকেট নয়। পাঁচটা টাকা!

(আটাশ)

হার আর জিত এই দুটো নিয়েই সংসার। জীবনে কেউ একটানা হেরে যায় না, একটানা জিতও কোন মানুষের ভাগ্যের কাহিনীতে নাই। তবে যার জিত বেশী সেই জয়ী, যার হার বেশী সেই এ সংসারে পরাজিত।

তাঁর ভাগ্যে হারই বেশী। চিকিৎসা-বিদ্যায় হার তাঁর বেশী নয়—সেখানে তিনি জিতেই এসেছেন বেশী কিন্তু অন্য সব দিকে—সবখানে তিনি হেরেই এলেন। মঞ্জরীকে নিয়ে সে হারের সূত্রপাত। সেই তার ভূমিকা রচনা করে দিয়েছে। তারপর আতর-বউ সারা জীবন লড়াই চালিয়েছে। আজ শেষ জীবনে—যাবার আগে—চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও জিতের পালা শেষ হবে হারের পালাতেই দাঁড়িয়ে যায়—তো তাই যাক। কি করবেন?

পরমানন্দ মাধব হে! হে পরমানন্দ মাধব!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মশায় বিষণ্ন হাসি হাসলেন। নাম করলেই, ডাকলেই পাওয়া যায় না পরমানন্দ মাধবকে। তাই যদি পাওয়াই যায় তবে যে হেরেও পালাটা হয় জিতের পালা। হার মেনে যে আনন্দ পায় দুঃখ যাকে স্পর্শ করতে পারে না তার হার তো হার নয়। সে হার জিতের চেয়েও বড় জিত। প্রদ্যোত জিতবে সে তিনি জানেন। এ এক বিস্ময়কর কাল, জ্ঞানবিজ্ঞানে বোধ হয় এমন সমৃদ্ধির কাল মানুষের কালে কখনও আসে নি। ভাগ্যবান প্রদ্যোত সেই কালে জন্মেছে—তার কাছে হার তাঁকে মানতে হবে তাতে তাঁর লজ্জা নাই। দুঃখ একটু হয়। এ যদি প্রদ্যোত না হয়ে সমর হ'ত! বনবিহারীর ছেলে যদি এই ডাক্তারটি হ'ত। তা হ'লে তাকে তিনি আরও বড় ক'রে দিয়ে যেতেন। এ-কালের অহঙ্কার যতই হোক, সম্পদ যতই হোক—সেকালের অন্তর্দৃষ্টি নাই। এরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝেই ক্ষান্ত, অনুভব করতে চায় না। সেটা মাত্র একটা জায়গায় আছে এদের। সম্প্রতি তার পরিচয় পেলেন।

মাস দেড়েক পরের কথা।

পরাণ খাঁয়ের বাড়িতে প্রদ্যোত ডাক্তারের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে গেল আমার। পরাণের বিবির হঠাৎ অসুখ বেড়েছিল। পরাণের স্ত্রী সন্তান-

সম্ভবা। এই সম্ভাবনা থেকেই তার অসুখ কমে গিয়েছিল। ইদানীং বেশ ভালই ছিল। বেশ উঠে বসছিল। হাসিও দেখা দিয়েছিল মুখে। এটা ওটা খাবার ইচ্ছাও প্রকাশ করছিল। হঠাৎ অসুখটা বেড়ে গেল। লুকিয়ে কয়েত বেল খেয়ে অসুখটা বেড়েছে। পরাণ বলে যে ঘরে পাকা কপিথের গন্ধে তার সন্দেহ হয়। বিবিকে জিজ্ঞাসা করেছিল কিন্তু বিবি স্বীকার করে নাই। তারপর সে গোপনে লক্ষ্য রেখে তাকে হাতেনাতে ধ'রে ফেলে।

পরাণ বিবিকে নিয়ে অনেক ভুগেছে। তার উপর মেজাজ তার বাইরে ভাল হলেও বাড়িতে খুব কড়া। বিবিকে কর্তা বকুনী দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এর জন্যে বাড়ির বুড়ি ঝিটাকে জবাব দিয়েছে, বাড়ির কিষাণটাকেও খেদিয়ে দিয়েছে। কিষাণটা আবার ওই বুড়িরই ছেলে। বুড়ির ছেলে কিষাণটা কয়েত বেল এনে দিত, আর ওই বুড়িটা তার হাত থেকে নিয়ে ঘরে এনে তরিবৎ করে গুড় লঙ্কা দিয়ে মাখিয়ে চাটনী তৈরী করে বিবিকে খাওয়াত। কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছিল; চাটনী ক দিন থেকে খাচ্ছিল কে বলবে?

—তিলের পরে তিল জমেই তো তাল হয় মশায়। তাই এখুন হয়ে গেলছে।

বিবির অম্বল সঞ্চিত হয়ে তখন পাথার হয়ে উঠেছে। শুরু হয় বমি। প্রথমটা অম্বলের দাওয়াই কিছু খাইয়েছিল কিন্তু কোন ফলই হয় নি। তারপর ওরই সঙ্গে হঠাৎ দেখা দিল মূর্চ্ছা। আর সে কি শ্বাসকষ্ট।

—যেনু পরাণ বেরিয়ে যাবে বলে লাগছে মশায়! ইয়ার সাথে আবার য়াব দেখা দিয়েছে। মনে লাগে সন্তানটা বুঝি থাকে না! আপুনি একবার চলেন। আর—।

মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—দোষ নিবেন না হুজুর; লোকে বলছে মশায়ের সাথে ডাক্তার একটা ডাক। তা আপুনি যদি বলেন—

—বেশ তো ডাক। হরেনকে ডাক।

হাত জোড় করেই পরাণ বলেছিল—ডাকতে হলে পর হাসপাতালের উঁয়ারেই ডাকতে কয় সকলে। পরাণের মুখ দেখে জীবন মশায় আর না

বলতে পারেন নি। মনে কাঁটা তাঁর বিঁধেই আছে, তবু সে সহ্য করেই বলেছিলেন—তাই ডাক। তবে আমাকে আর কেন ডাকছ?

—জী, না। সে হবে না। রোগী আপনার। তাকে ডাকা শুধু যদি কোন ইনজেকশন দিয়ে সন্তানটারে রাখতে পারে। তাতে আপনার মত না থাকলে আমি ডাকব না।

হেসে মশায় বলছিলেন—তবে তাই ডাক।

প্রদ্যোত এসে ইনজেকশন একটা দিয়েছিল। বলেছিল—ইনজেকশন দিলাম কিন্তু বমিটা থামা দরকার। সেবার দরকার। আমি বলি কি ওই বুড়ি ঝিটাকে ডেকে আবার রাখুন। সে রোগীকে জানে-শোনে। বুঝেছেন।

পথে মশায়কে বলেছিল—ব্যাপারটা মানসিক। বুঝেছেন! আসল ব্যাপারটা জটিল। অম্বল-টম্বল ওসব কিছু নয়। আপনি তো নাড়ী দেখে বুঝতে পারেন এ সব। অম্বল কতটা পেয়েছেন? যা পেয়েছেন—বা যদি পেয়েছেন তবে তাতে কি এমন বমি হতে পারে? আমি আগে একবার তো বলেছিলাম। মনে আছে?

—আছে।

—ওই ঝিটাকে আর ওই কিষাণটাকে আবার বাহাল করতে বলুন খাঁকে। বিবি সেরে যাবে।

—বুঝেছি। অবিশ্যি রোগ মেয়েটির আমিও তেমন দেখি না। আমার মনে হয় পরাণের আদরেই ওর রোগ বেড়েছে।

—না। ঠিক তার উল্টো। অবশ্য আমাদের মতে। বুড়ো খাঁয়ের উপর বিরাগ থেকেই রোগটার সৃষ্টি। খাঁ যদি আজ মরে কি মেয়েটাকে তালাক দেয় তো কাল মেয়েটার সব ভাল হয়ে যাবে। মনের খেলা বড় অদ্ভুত মশায়।

প্রদ্যোতের কথাই সত্য হয়েছে।

ঠিক দু দিন পর পরাণ খাঁয়ের একটা মামলা ছিল সদরে। খাঁ ভাবছিল মামলায় দিন নেবে, এই অবস্থায় বিবিকে ফেলে যাবে না। কিন্তু আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই বিবি সুস্থ হয়ে উঠছিল। পরাণকে বলেছিল—তুমি যাও, আমি ভাল হয়েছি।

পরাণ সদরে গিয়েছিল। ব্যবস্থা করে গিয়েছিল পরের দিন বিবি কেমন থাকে সে সংবাদ নিয়ে তার কাছে লোক যাবে। তার ফিরবার কথা দু দিন পর। একটা ভাল সম্পত্তি নিয়ে স্বত্বের মামলা। সংবাদ নিয়ে লোকও গিয়েছিল। কিন্তু সংবাদটা বিবির অসুখের সংবাদ নয়, বিবির গৃহত্যাগের সংবাদ। সকালে উঠে বিবিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। সেই সঙ্গে বুড়ি ঝি এবং কিষাণটাও গ্রামে নাই, নিখোঁজ হয়েছে বলে জানা গেছে।

পরাণ প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছে। তার চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। মাথায় হাত দিয়ে আরোগ্য-নিকেতনের বেঞ্চের উপর বসে আছে। অসহ্য যন্ত্রণা তার মাথার মধ্যে। ঘুম হয় না। সে এসেছে—ঘুমের দাওয়াই দেন মশায়, মাথার দরদ কমিয়ে দেন। নইলে বলেন আমি বিষ খেয়ে মরি।

মশায় মুষ্টিযোগ এবং এ্যালোপথিক ওষুধ দুইই লিখে দিলেন। মনের যন্ত্রণা ক্ষোভ থেকেই এর উৎপত্তি, তবু দ্রব্যগুণের প্রভাবে তার যতটা উপশম হয় হবে। পরাণের লোক বিনয়ের দোকানে চলে গেল ওষুধ আনতে, পরাণ বসে রইল।

পরাণ হঠাৎ বললে—জিন্দিগীতে আজও পরাণ খাঁ কখুনও মাথা হেঁট করে নাই মশায়, হারে নাই। এই মামলাতেও জিত হলছে আমার। কিন্তু মনে হচ্ছে সব মিছা। হেরেই গেলছি আমি। হাসপাতালের ডাক্তার সেই পেরথম কালে বলেছিল রোগীটার রোগ আসল নয়, আসল হ'ল মনের অসুখ। আমার মেজাজ তখুন গরম হলছিল। কিন্তু ডাক্তার ঠিক বলেছিল। কিন্তু—

—কি বল পরাণ?

—আপুনি নাড়ীতে কি পেয়েছিলেন? এতদিন চিকিচ্ছা করলেন!

—এ দিকের চিকিৎসাটা আমি বাহ্যিক চিকিৎসা করেছিলাম। সে তোমার জন্যে। আমি যে চিকিৎসা করেছি, তাতেই তার মা হওয়া সম্ভবপর হয়েছে পরাণ। আমিই তোমাকে কলকাতা নিয়ে যেতে বলেছিলাম। তা তুমি গেলে না। তখন ওই চিকিৎসা করেছিলাম, ভেবেছিলাম মা হলেই সব সেরে যাবে।

পরাণ মশায়ের দিকে একবার তাকিয়ে হঠাৎ উঠে বেরিয়ে গেল।

মশায় ডাকলেন—পরাণ পরাণ।

পরাণ হন হন ক'রে চলছে। মশায় ডাকলেন—ইন্দির। পরাণের সঙ্গে যা। ছাতাটা, এই ছাতাটা নিয়ে যা।

মশায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

হার আর জিত। এই দুটো নিয়েই সংসার!

প্রদ্যোতের কাছে তাঁকে হারতে হবে। এইটেই বোধ করি শেষ হার। কারণ ওইটুকু জিতই তো তাঁর ছিল ঐ কাল পর্যন্ত! কিন্তু এরা মনের দিকে শুধু এই প্রবৃত্তির খেলাটুকুকেই দেখে কেন? দাঁতুর মনের খেলা স্বীকার করে না কেন? প্রদ্যোত যদি সময় হ'ত তবে এইটুকু তাকে শিখিয়ে দিয়ে যেতেন।

—মশায়!

ভারী গলায় ডাক দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল—রাণা পাঠক।

—আমি একটু ভাল আছি মশায়। দু তিন দিন থেকে জ্বর কম হয়ে গিয়েছে। কাল বোধ হয় হয়ই নাই। সে এসে বেঞ্চে বসল। মেঝের উপর নামিয়ে দিলে সের পাঁচেক একটা মাছ।—কই, ইন্দির কই?

মশায় রাণার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ওকে দেখতে লাগলেন। রাণার মুখে কোন পরিবর্তনের ছাপ দেখা যায় কি না। রাণা বললে—হাসপাতালের ডাক্তার, হরেন ডাক্তার, চারুবাবু ওদের আজ দুটো কথা বলে এলাম গো! ওদের নতুন ডাক্তারখানার সামনে দিয়ে আসছি, দেখি ওদের ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে সুরেশ্বর চাটুজ্জে, নবগ্রামের গো! লোকটা ঠকঠক করে কাঁপছে, দুইচোখে জলের ধারা বেয়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখে হঠাৎ আমার কাছে এসে বললে—তুমি কেমন আছ রাণা? বললাম—একটু ভাল চাটুজ্জে মশায়। মনে হচ্ছে সেরে যাব। চাটুজ্জে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে বললে—আমারও টি বি হয়েছে রাণা। ডাক্তারেরা বললে। তা আমি বললাম—তার আর কি গাঙ্গুলী মশায়। আপনি মশায়কে দেখান। আমি ভাল আছি। এদের পাল্লায় যাবেন না, এক্স-রে রাম-রে তাম-রে ক'রে দেবে আপনাকে ধসিয়ে। এই বুঝেছেন কিনা, হাসপাতালের ডাক্তার বেরিয়ে এসে বলে কি জানেন? বলে—কে হে তুমি? এ সব আবোল তাবোল খ্যাপার মতো বলছ কি? অসভ্য কোথাকার? তা—

এবার রাণা বেশ বিনয়ের সঙ্গে একটু হেসে বললে—তা জানেন তো আপনি—রাণা পাঠক ভয় তো কাউকে করে না। যমকেও না। আপনাকে সত্যি বলছি মশায়—মরতে ভয় আমার নাই। তবে যদি ভাল হই, বাঁচি আরও কিছুকাল, তো কেন বাঁচব না? নোটিশ পেলাম, এখন দশদিন যদি জামিনে খালাস পাই—তবে সাধআহ্লাদটা মিটিয়ে নি। আর মশায়—ভগবানের নাম করা হয় নাই এতদিন। সেটা সেরে নি। নইলে তো জানেন—মেয়েটাকে তার জীবন থাকতে আমি ছাড়তে চাই নি।

মশায় বললেন—ওঁদের তুমি কটু কথা বলেছ না কি?

—তা দু চারটে শক্ত কথা বলেছি। কটু নয় এমন কিছু। বলেছি দুচারটে। কত বড় শক্ত রোগ আরাম ক'রেছেন তার কথা। সেই কাহারের রক্ত বমি করা যক্ষ্মা ভাল করার কথা বলেছি। নিদান হাকার কথা বলেছি। আর বলেছি—আমি না হয় মুখ্যু। কিন্তু তুমি কি রকম পণ্ডিত হে যে আমাকে মুখ্যু বলছ? বলি, ইংরিজী না-জানলেই বুঝি মুখ্যু হয়? কোট পেন্টুল না পরলেই বুঝি অসভ্য হয়? তুমি ইংরিজী জান—ডাক্তারী শিখেছ—বেশ কথা। আমি খানিকটা সংস্কৃত জানি—সাওতালী ভাষা খুব ভাল জানি। আমি লাঠি খেলা জানি। কুস্তী জানি—নৌকা খেয়াতে জানি—সাঁতার জানি—পৃথিবীতে অনেক কাজ অনেক বিদ্যে জানি। আমি মিথ্যে কথা বলি না, আমি মদ্য খেতাম, আমার চরিত্র দোষ ছিল তা আমি স্বীকার করেছি—কখনও কারু কাছে লুকোই নি। কখনও কারও অনিষ্ট করি নি। কাউকে আগে মারি নি। মারতে এলেও রুখেছি। মারলে মেরেছি। দুনিয়াতে ভয় কাউকে করিনি। হঠাৎ তুমি আমাকে মুখ্যু বল অসভ্য বল—তুমি কি রকমের পণ্ডিত, কি রকমের সভ্য হে বাপু? এই তো তোমরা বলেছিলে এই করতে হবে ওই করতে হবে। আমি মশায়ের কাছে যাব বলাতে হেসেছিলে। তা এই তো আমি ভাল আছি। তা আমাকে কি বললে জানেন—? বললে—জীবন মশায়ই শুধু একা নিদান হাঁকতে পারে না হে, আমরাও পারি। আমি বললাম—তার মানে বলছ আমি মরব এই রোগে এই তো! তা বললে—ও চিকিৎসায় তুমি বাঁচবে না। বললাম—তুচ্ছ পরোয়া নাই। মরতে হবেই। দুদিন আগে আর পরে। তা দেখাই যাক।

হাসতে লাগল রাণা।—আমাকে বাঁচতেই হবে মাশায়। তা বাঁচব। ভাল আছি আমি।

মশায় কি বলবেন খুঁজে পেলেন না। রাণা, অদ্ভুত রাণা। কিন্তু এ কি করেছে সে? লজ্জিত হলেন তিনি! অন্যায় করেছে, বড় অন্যায় করেছে রাণা। তার অপরাধ যেন তাঁর ঘাড়ে এসে চাপছে।

রাণাই হাসতে হাসতে বললে—আমি অন্যায় বলেছি মাশায়?

—বলেছ বাবা। অন্যায় হয়েছে তোমার। ডাক্তারি শাস্ত্রের অনেক উন্নতি হয়েছে।

—ছাই হয়েছে। টাকার শ্রাদ্ধ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। আন টাকা, আন টাকা! আমি বলি—আমার যক্ষ্মাই বটে, আপনি চিকিৎসা করুন। তা বলে—তা হ'লেও এক্স-রে করতে হবে। এ করতে হবে। তা করতে হবে। এই তো আপনি চিকিৎসা করছেন—ফল তো হয়েছে। পরমায়ু থাকে ভাল হয়ে যাবে। না-থাকে মরব।

—না রাণা! ওসব বলো না, বলতে নাই। অন্তত আমার চিকিৎসায় যতদিন আছ ততদিন এ সব বলো না রাণা। দেখ, আর একটা কথা। তোমার যদি সাধ্য থাকত তা হ'লে তোমাকে এক্স-রে করতে বলতাম। যদি ভগবানের দয়ায় তুমি সেরে ওঠ তবে ভাল হওয়ার পর একবার এক্স-রে করাতে বলব। বাবা, আমার নাড়ী দেখতেও যদি ভুল হয় তবু এক্স-রেতে তো ভুল হবে না। রোগ যেখানে একবিন্দু লুকিয়ে থাক, সে দেখিয়ে দেবেই।

—যাক গে, মরুক গে, আপনি বারণ করছেন আর বলব না! তবে মাশায় আমাকে মুখ্যুটুখ্যু বললে আমি শুনব না। নেন, হাত দেখুন।

—এখন একটু জিরোও বাবা। যে বক্‌বক্ করলে এতক্ষণ। আর যে মাথা গরম করেছ। নাড়ী তো এখন তরতর করছে।

—মাছটা পাঠিয়ে দেন বাড়িতে।

—মাছ আনলে কেন রাণা? আমার বাড়িতে খাবে কে?

—পেলাম পথে, নিয়ে এলাম। জেলেরা নদীতে জাল ফেলেছে। নদী তো আমার এলাকা। ঘাটে দেখলাম জাল তুলেছে। মাছটা চমৎকার। তুলে নিয়ে এলাম। ঘরে খান—পাড়ায় দিয়ে দেন। ব্যস।

রানা পাঠক বাঁচবে বলে নিজে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। এত বড় দৈহিক শক্তিশালী মানুষ—পৃথিবীর ভোগের বস্তুকে—বড় বড় গ্রাসে ভোগ করেছে এতদিন; তার আস্বাদ জানে—কাজেই এটা তার পক্ষে স্বাভাবিক। জীব তো মরতে চায় না, সে আশা করে বাঁচব! মানুষ শুধু বুঝেছে মরতে একদিন হবে। কিন্তু তবু আশা করে।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং—

তবু জেনে শুনেও আশা করে। রানা দুর্দান্ত শক্তিশালী মানুষ, যে সব প্রচণ্ড শক্তির আঘাতে সাধারণ মানুষ লুটিয়ে পড়ে মরে, রানা অবলীলাক্রমে সেই শক্তির সঙ্গে লড়াই করেছে, যেন সকৌতুকে একালের দড়ি-টানা খেলা খেলেছে; দুকূল ভাসানো বন্যা কূল ভেঙে গ্রাম ভাসিয়ে মানুষকে আপন টানে টেনে নিয়ে চলে—দিকে দিকে হাহাকার ওঠে, অসহায় মানুষকে ভেসে যেতে দেখে তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ হায় হায় করে; রানা সেই বন্যায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মানুষকে পিঠে তুলে নিয়ে আসে। সেবার মুসলমানদের গ্রামে আগুন লেগেছিল; বৈশাখের দুপুরে। এক ক্রোশ দূর নিজের গ্রাম থেকে রানা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আগুনের সঙ্গে লড়াইয়ে। বড় বড় চালা, যেগুলোতে তখনও আগুন লাগে নি—সেগুলোকে কয়েকটা ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে ফেলে—আগুনের অগ্রগমনের পথে যেন খাল কেটে তাকে রুখেছিল। শুধু তাই নয়—হাফিজুদ্দির বুড়ি মাকে জ্বলন্ত ঘর থেকে বের ক'রে এনেছিল। এ মানুষের আশার ভঙ্গি সাধারণ থেকে পৃথকই হয়। এ যেন উৎসাহ।

কিন্তু—। মশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তিনি উৎসাহিত হন নি।

তবে ভরসা একটু পেয়েছেন। তিনি ভাগ্য অদৃষ্ট ঠিক মানেন না। গুরু রঙলাল ডাক্তারের সাহচর্যে ওদিকে বিশ্বাস তাঁর ঘুচে গেছে। কিন্তু যোগাযোগ—শুভ-অশুভ ঘটনা-বিন্যাস দেখে তাই থেকে একটা ইঙ্গিত উপলব্ধি করেন। সেই মেয়েটি মরেছে শুভযোগ সেইখানে।

সেদিন বিনয়ের দোকানে তাদের দুজনকে পনের দিনের ওষুধ দিয়েছিলেন। রানা যেখানে বেঁচে থাকতে তার সান্নিধ্য ত্যাগই করবে না এবং সে মেয়েটির যক্ষ্ম হৃদপিণ্ডের সর্বত্র—স্তরে স্তরে এই সর্বনাশা

অভিশপ্ত ব্যাধির ব্যাপ্তি, তখন ওষুধে তার কি হবে? ভরসা করেছিলেন—যদি মেয়েটি ম'রে রাণাকে মুক্তি দেয়। গাঁটছড়া বেঁধে মেয়েটা চলেছিল মৃত্যুর দিকে, টানে টানে রাণাকেও যেতে হচ্ছিল। এখন সে গাঁটছড়া কেটেছে। এর মধ্যে রাণার রোগ বৃদ্ধি অন্তত পায় নি। ভরসার ইঙ্গিত এইখানে। তবে ক্ষীণ—অত্যন্ত ক্ষীণ। আজ দিন বিশেক রাণার নিয়মিত চিকিৎসা চলছে।

ইন্দির এসে দাঁড়াল।

মশায় প্রশ্ন করলেন—পরাণকে পেঁৗছে দিয়ে এলি?

ইন্দির চুপ ক'রে রইল।

—কি? কথার জবাব দিস না যে?

—থাঁ বোধ হয় ক্ষেপে গিয়েছে।

—ক্ষেপে গিয়েছে?

—হ্যাঁ। এখান থেকে বেরিয়ে নিজের গাঁয়ের দিকে যেতে যেতে আবার ঘুরল। বললাম—কোথা যাবেন গো? বললে—তুর কি? বাড়ি যা। নইলে ঢেলা মারব। বলে সোজা উঠল গিয়ে হাসপাতালে। একেবারে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললে—আপুনিই ঠিক বলেছিলেন ডাক্তারবাবু। আমার বিবির ব্যামোর কথা গো? মশায় কিছু বুঝে নাই। এখন আমারে বাঁচাতে পার? মাথার ভিতরটা দপ্ দপ্ করছে। দেখে শুনে ডাক্তার তাকে হাসপাতালে শুইয়ে রাখলে, মাথায় বরফ চাপা দিয়েছে!

মশায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

মেয়েটির গোপন অভিপ্রায় তিনি বুঝতে পারেন নি এমন নয়। তাই জন্য তিনি তার সন্তানধারণের পক্ষে বাধাস্বরূপ যে ক'টি ব্যাধি দেখেছিলেন তারই চিকিৎসা করেছিলেন। মেয়েটির ওই বাসনাটিই যে সর্বস্ব তা ভাবতে পারেন নি।

শশাঙ্কের স্ত্রীর কথা মনে পড়ল।

মেয়েটি মাছের মুড়ো, মাংসের বাটীর ইঙ্গিতে বুঝতে পেরেছিল সব! ঠেলে উঠে গিয়েছিল আসন ছেড়ে। সে মেয়ে আজও বেঁচে আছে। তপস্বিনীর মত শশাঙ্কের ধ্যান করে বেঁচে আছে। জীবনে বোধ করি ওই একদিন—তাঁকেই সে অভিশাপ দিয়েছিল। নইলে মেয়েটি প্রসন্নময়ী।

মনে পড়ল—একদিন দুপুরে ডাক থেকে ফিরবার পথে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তার পিত্রালয়ের গ্রামে। তিনি বিব্রত বোধ করেছিলেন। সে কিন্তু হাসি মুখে এগিয়ে এসে বলেছিল—জ্যাঠামশায়!

—হ্যাঁ মা!

—ডাক থেকে ফিরছেন? একটা ছাতাও নেন নি!

—এই বিনা ছাতাতেই জীবন কেটে গেল মা।

—বড্ড যে ঘেমেছেন। একটু বিশ্রাম ক'রে যান। এক গ্লাস সরবত করে দি। তখন বনবিহারী মারা গেছে। বনবিহারীর স্ত্রী-পুত্রের সংবাদ সে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।

হঠাৎ—মশায় যেন চমকে উঠলেন।

যদি প্রদ্যোত বলে—বনবিহারীর মৃত্যুতেই তার আপনার উপর আক্রোশ মিটেছিল মশায়। তাই সে এমন সমাদর ক'রে আপনাকে সরবত খাইয়েছিল।

বলুক। মানুষের মূল প্রকৃতি হয় তো তাই বটে। কিন্তু মূল প্রকৃতি মানুষের সাধনায় বদলায়। মূল থাকে অন্ধকারে—পচন রসে তার তৃপ্তি, কিন্তু কাণ্ড ওঠে উপরের দিকে। সে ফুল ফোটায়। ফুলও মিথ্যা নয়। মানুষের জীবনে হিংসা ক্রোধ আক্রোশ লোভ কাম এই সব নয়—ক্ষমা প্রেম দয়া মমতার ফুলে সংসারে সে অহরহ বসন্ত ঋতুর সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। তিনি জানেন—বনবিহারীর যখন রোগ কঠিন হয়ে উঠেছিল—তখন শশাঙ্কের স্ত্রী দেবতার কাছে তার আরোগ্য-কামনা করেছিল।

একদিন পূজার পুষ্প নিয়ে আতর-বউকে দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—জ্যাঠাইমা কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি—আমার বাপের বাড়ির মা কালী যেন বলছেন—আমার পুষ্প তোর বনবিহারী ঠাকুরপোকে দিস।

মেয়েটি কেঁদেছিল।

শুদ্ধচারিণী নম্র এই মেয়েটি অনেক কাল তাঁর চোখের সামনে মূর্তিমতী বৈরাগ্যের মত মত দু বেলা ওই দেবস্থানে প্রণাম ক'রে গিয়েছে।

পরাণের বিবির বাসনা সন্তান হলে এমনি ভাবেই প্রসন্নতায় পরিণত হবে ভেবেছিলেন তিনি। ঠকেছেন। রোগ যেখানে—যে রোগ স্বভাবজ—সে

রোগের চিকিৎসায় মৌলিক প্রকৃতিই বলবতী। প্রবৃত্তিকে রিপু করে সেই। ভুল তাঁর হয়েছে। কিন্তু পরাণকে কি বলতেন তিনি ?

ইন্দির তাঁর চিন্তাসূত্রকে ছিন্ন করে দিলে।—মাছ ? মাছ কোথা থেকে এল ?

—ও। হ্যাঁ ওটা রাণা পাঠক দিয়ে গেল।

—রাণা পাঠক নবগেরামে কি সব বলে গিয়েছে হাসপাতালের ডাক্তারকে— ; খুব রমরম করছে বাজারময়। হাসতে লাগল ইন্দির।

মশায় বললেন—হাসিস নে ইন্দির, হাসির কথা নয়। যা, মাছটা নিয়ে যা।

—জীবন !

সেতাবের কণ্ঠস্বর। মশায় একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন—সেতাব ? আয়।

—এলাম। চাটুজ্জেকে নিয়ে এলাম—ওকে একবার দেখ ভাই।

—চাটুজ্জে ?

সেতাবের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় গলায় কম্ফার্টার জড়িয়ে—গায়ে র‍্যাপার দিয়ে এসে দাঁড়াল। কথা সে বললে, কিন্তু গলার তার স্বর বের হল না। মুখে আবর্জনা জমা একটা হাপরের মুখ দিয়ে বাতাস নির্গমনের মত কয়েকটা ফসফস আওয়াজ বের হ'ল।

বোধ হয় বললেন—মশায় !

সুরেশ্বর চাটুজ্জে। ওঃ এ কি চেহারা হয়েছে চাটুজ্জের। ডাক্তারেরা বলেছে যক্ষ্মা। মশায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন—মৃদুস্বরে বললেন—বসুন ! বসুন। রাণা পাঠক আপনার কথা বলছিল।

চাটুজ্জে—বহুকষ্টে তেমনি ভাবেই বললেন—আমায় বাঁচান। সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল।

—কি হয়েছে ? এ কি কাঁদছেন কেন ?

চাটুজ্জে কথা বলতে পারলেন না—অনর্গল ধারায় জল চোখ থেকে পড়তে লাগল।

সেতাব ব্যস্ত হয়ে বললে—বসুন। বসুন। হাত ধরেই সে বসালে। বললে—উনি আমার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। বলেন—আমাকে নিয়ে চলুন

মশায়ের কাছে। রাণা বললে রাণার উপকার হয়েছে। বললাম—ও বেলা বিনয়ের ওখানে নিয়ে যাব। তা বললেন—না, ওঁর বাড়িতে যাব আমি।

স্বরবদ্ধ কণ্ঠে চাটুজ্জে কিছু বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। ঠোঁট দুটি থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল।

ধীর শান্ত স্বরে জীবন ডাক্তার বললেন—দেখি, আপনার হাতখানা দেখি। ডাক্তারেরা যা বলেছে আমি শুনেছি।

—কিন্তু—। নাড়ী ধ'রে জীবন মশায় বললেন—কিন্তু তাতো মনে হচ্ছে না আমার।

চোখ বন্ধ করলেন তিনি।—কই? সে স্পর্শ কই? মুদিত চোখেই বাঁ হাতখানি বাড়িয়ে বললেন—দেখি ও হাতখানি। দুই হাতের মধ্যে রোগীর দুই হাত ধরে নাড়ী পরীক্ষায় মগ্ন হয়ে গেলেন বৃদ্ধ।—কই? সে হলে এত দীর্ঘকালের অনুভূতি স্পর্শ মাত্রেই চকিত হয়ে উঠত। কই সে কুটীল সর্পিল গতি? কই সে জর্জরতা? না তো!

চোখ বন্ধ করেই তিনি ঘাড় নাড়লেন।—উঁহু!

তারপর বললেন—নাড়ীর মধ্যে তো কোন কঠিন কিছু পাচ্ছি না। জ্বর একটু রয়েছে অবশ্য। মনে হচ্ছে কোষ্ঠবদ্ধ হয়ে রয়েছে অনেক দিন থেকে। লিভারটাও খারাপ হয়েছে, তা থেকেই কাশি হয়েছে। সর্দিও খানিকটা রয়েছে। তা বোধ হয় ব্রংকাইটিস্। ও তো বুড়ো বয়সের রোগই। খানিকটা রক্তহীনতাও আছে। তা' ডাক্তার কি দেখে এ সব বলছেন?

চাটুজ্জে এবার বললেন—উনি বলছেন—যখন পেনিসিলিনে গেল না, তখন এক্স-রে না করলে কিছু বলতে পারবেন না।

—এক্স-রে করতে হবে?

—হ্যাঁ। পেনিসিলিন দিলেন অনেক। অন্য দোষের জ্বর হলে নিশ্চয় যেত। কাশি অল্প অল্প, জ্বর যখন গেল না, তখন—

—তখন কি? টি-বি?

চাটুজ্জে কথা বলতে পারলেন না, ছোট ছেলের মত চোখে জল নিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালেন—হ্যাঁ।

মশায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রসন্ন হেসে বললেন—চাটুজ্জে মশায়, আমি বুড়ো হয়েছি, আজকালকার চিকিৎসার সঙ্গে খুব একটা যোগ আমার নাই! এক্স-রে একটা অদ্ভুত আবিষ্কার। ও হ'ল দিব্যদৃষ্টি। সেটা আমি অস্বীকার করি না। তবে নাড়ীজ্ঞান দিয়ে আমরা কিছুটা ধরতে পারি। ক্ষয় রোগ আপনার নয়। এক তো টি-বিটা সাধারণত যৌবন-কালের ব্যাধি। বৃদ্ধ বয়সে একেবারে হয় না, তা বলব না, তবে রোগেরও একটা বয়স বিচার আছে, জাত বিচার আছে, কাল-বিচার আছে। সে যাক। আমার মনে হচ্ছে দোষটা পেনিসিলিনের নয়। প্রয়োগের দোষ। ভাল ডাক্তারকে দেখান।

চাটুজ্জে অকস্মাৎ তাঁর হাত দুটি ধ'রে বললেন—না ডাক্তারবাবু, আপনি—আপনি রামহরিকে মরা বাঁচিয়েছেন—আপনি কোন কাহারকে যক্ষ্মা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। রাণার উপকার হয়েছে। আপনি আমাকে বাঁচান। নইলে—।

আবার চাটুজ্জের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

যাবারই কথা। চাটুজ্জে নিজে প্রায় বৃদ্ধ—কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের সংসার, ছেলেগুলি আজও ছোট, মেয়ে বিবাহযোগ্য। ঘাড়ে প্রথমপক্ষের কন্যাদায়ের দেনা—ক্রুদ্ধ বিস্ফোর মত ক্রমশ স্ফীতকলেবর হয়ে চলেছে। চাটুজ্জে জানে নিষ্কৃতি একমাত্র মৃত্যুতে, কিন্তু সে নিষ্কৃতি নেওয়াও তার পক্ষে শান্তির কথা নয়।

মশায় বললেন—কাহার ছোঁড়ার যক্ষ্মা নয় চাটুজ্জে মশায়, ওটা ছিল রক্ত-পিত্ত। রাণার উপকারের কথা এখনও বলতে পারি না। টি-বির চিকিৎসা একালে যা বেরিয়েছে তাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু আপনার তো টি-বি নয়। ওরা বুঝতে পারে নি। করব, আপনার চিকিৎসা আমি করব। আমি নিজে পয়সা খরচ ক'রে কলকাতা বা বর্ধমান পাঠিয়ে আপনার এক্স-রেও করিয়ে আনব। আপনি ওদের দেখাবেন।

অকস্মাৎ যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন জীবন মশায়।—মতির মায়ের পা সারাবার জন্যে বর্ধমান পাঠাতে হয়। অপারেশন করতে হয়। না করলে কিন্তু মতির মা যেত। আপনাকে আমি মুষ্টিযোগে পাঁচনে—আর সামান্য

দু একটা ইনজেকশনে সারিয়ে দেব। আপনার বাঁচার দরকার আছে। ভয় করবেন না আপনি।

সেতাব অবাক হয়েছিল একটু।

জীবনের এমন উৎসাহ অনেকদিন দেখে নি সে।

সে ভুরু কুঁচাক সবিস্ময়ে চুপি চুপি তাকে প্রশ্ন করলে—কি ব্যাপার বল তো?

জীবন মশায় চমকে উঠলেন। তারপর হাসলেন। বললেন—কি আর—মন না মতিভ্রম। বলতে বলতেই—উৎকর্ণ হয়ে কিছু শুনবার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, আতর বউ বকছে। কি হ'ল?

আতর-বউয়ের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এমন ধরা পড়ে। কখনও তাঁর ভ্রম হয় না। এবং আতর-বউয়ের উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর তাঁর অপরিসীম সহিষ্ণুতাকে স্পর্শ মাত্র চঞ্চল করে তোলে। মধ্যে মধ্যে প্রসন্নচিত্তে মৃদুহাস্য সহকারে নিজেকেই নিজে বলেন—যদি কোন দিন তিনি অজ্ঞান হন তবে এ্যামোনিয়ার দরকার হবে না, আতর-বউ একটু উচ্চগ্রামে চীৎকার ক'রে ডাকলেই তিনি জ্ঞান ফিরে পাবেন, উঠে বসবেন।

কখনও কখনও এই ভেবে একলা ঘরের মধ্যে অট্টহাসি হেসে উঠেছেন তিনি।

আতর-বউও এর জবাব দিয়ে থাকেন। বলেন—সে কি আর আতর-বউ জানে না? আতর-বউ সে জানে। কিন্তু একটা কথা শুধু আতর-বউ বুঝতে পারে না। বলতে পার—আতর-বউয়ের চড়া গলা ছাড়া আর কি তুমি কিছু শুনতে পাও না? কান পেতে শোন তো—গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে কত চীৎকার উঠছে! মানুষ গরু ছাগল কুকুর কাক চিল কত চীৎকার করছে অহরহ! ওই—ওই তো দেখ! চোখ আছে দেখ, কান আছে শোন।

এক ঝাঁক শালিক পাখী কলরব করে ঝগড়া করছে। ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি করে জড়িয়ে ধরে দুটোতে লড়াই করছে।

ওই শোন—চরখাই পুকুরের অর্জুন গাছের মাথায় বসে বীর হনুমানটা ক্রমাগত খ্যাঁকাচ্ছে। দাঁত কট কট করছে! শুনছ?

কানে যায় শুধু তোমার আতর-বউয়ের গলা! ওতেই তোমার চিন্তার ব্যাঘাত হয়। নয়?

বলতে ইচ্ছা করে—তাই সত্যি আতর-বউ, তাই সত্যি। জীবনে একবার তুমি প্রসন্ন হেসে বল—তুমি সুখী! মঞ্জরীর কথা নিয়ে তুমি আজও খোঁটা দাও আতর-বউ। কিন্তু একবার ভাব তো—তার কথা? ভূপী বোসকে নিয়ে কত দুঃখের মধ্যেও কত সুখী হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আজ আতর-বউয়ের হল কি? মশায় বেরিয়ে এলেন। ওই মাছটা বোধ হয়!

বাড়ির দোরে ইন্দির দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাচ্ছে আর হাসছে। বললে—মা মাছ দেখে ক্ষেপে গিয়েছে।

হ্যাঁ—তাই বটে। আতর-বউ বলছে শুনতে পেলেন—এত বড় মাছ? এ মাছ খাবে কে? কার শ্রাদ্ধ হবে?

জীবন মশায় রাগ করলেন না আজ। হাসতে হাসতে বাড়িতে ঢুকে বললেন—শ্রাদ্ধ নয়, আমার জীবন মহোৎসব হবে। রাণা মাছটা দিয়ে গেল। কেটে কুটে পাড়ায় যদি দেবে তো তাই দাও। তবে আমার ইচ্ছে—সেতাব বিনয় কিশোর এদের নেমন্তন্ন করি। বিনয়ের দোকানে বসছি—মধ্যে মধ্যে ওরা বলে। কি বল?

—আমি বাপু রান্না করতে পারব না।

—সে লোক পাঠিয়ে দেব। বিনয়কে বলব।

—তা হ'লে শশীকেও বলো যেন। বামুনের ছেলেকে বড় খাটো করে দিয়েছ তুমি।

—বলব।

(ঊনত্রিশ)

শশী কিন্তু এল না।

বিনয় নিজে গিয়েছিল তার কাছে নিমন্ত্রণ করতে। শশীর বিবরণ অদ্ভুত।

মশায় বিষণ্ণ হেসে বললেন—অদ্ভুত নয় বিনয়—ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। সূত্রপাত অনেক দিন থেকেই হয়েছে। আমি ওকে বারণ করেছিলাম; এত নেশা তুই করিস নে শশী। শুধু তো মদ নয়, গাঁজা ক্যানাবিসিণ্ডিকা দুটোই খায়। তার ওপর প্র্যাকটিস পড়ে গিয়ে শশীর মাথা আরও খারাপ হয়ে গেল। চণ্ডীতলার সন্ন্যাসী যেদিন দেহ রাখলেন তার আগের দিন রাত্রে ওখানেই ওর সঙ্গে দেখা হল। মহান্তকে ক্যানাবিসিণ্ডিকা খাইয়ে দিয়েছে। বললাম এ সব করিস নে। হি হি ক'রে হাসলে। তারপর বললে—ওর মরা মা না কি রাত্রে পথে ঘাটে ওকে আগলে আগলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। ভেতরে মাথা খারাপ ওর বেশ কিছুদিন থেকেই হয়েছে।

বিনয় বললে—তাই তো বলছে গো। বলছে মা আমার ওষুধ বলে দিচ্ছে। যেটা ওর ডাক্তারখানা ছিল—বাইরের ঘর, সেই ঘরে—একটা আসন পেতে—সামনে শিবের ছবি রেখে ধূপ ধুনো দিচ্ছে—একটা ছোট চৌকীতে ওর মায়ের রুদ্রাক্ষের মালাটা রেখেছে। আসনে বসে থাকে রাত্রে; আর পুরানো কালের বটতলার ছাপা—সচিত্র মুষ্টিযোগ, সরল চিকিৎসা-বিদ্যা, কবিরাজী শিক্ষা, অদ্ভুত চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে ওল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে। বলছে মা বলেছে—ওরই মধ্যে আছে অব্যর্থ ওষুধ। এমন ওষুধ আছে যার কাছে—পেনিসিলিন-মিলিন নস্যি। বুঝলি,—বেশ ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে—পারাভস্ম যদি করতে পারি,—পারব ঠিক পারব, দেখবি তখন, এই সূচের ডগায় যতখানি ওঠে তাই—মরা মানুষের মুখে ফেলে দেব,—গুণব—এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ—তারপর বলব—চোখ মেল; রোগী চোখ মেলবে। তোদের মশায়কে প্রদ্যোত ডাক্তারকে ডেকে দেখিয়ে দোব।—হি-হি ক'রে হাসতে লাগল। একটা ওষুধ এর মধ্যে তৈরী করে ফেলেছে। বললে—খরচ করে তুই তৈরী কর—কৌটো বন্দী ক'রে লেবেল দিয়ে বিক্রী কর, পেটেন্ট নিয়ে নে, রাজা হয়ে যাবি। সে ওষুধে না কি বয়েস কমে, যৌবনের কান্তি

ফিরে আসে, কাল রক্ত ফরসা হয়, গলায় সুর আসে। বললে—কাককে খাইয়ে পরীক্ষা কর, কুহু কুহু করবে না, কা—কা করেই ডাকবে, কিন্তু কোকিলের মত মিষ্টি গলায়।

সেতাব চুপ করে বসে দাবার ছকে ঘুঁটি সাজাচ্ছিল—সে বললে—তা হ'লে তো এর প্রতিকার করা দরকার! কোন দিন কাকে চিকিৎসার নামে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। লোকদের জানিয়ে দেওয়া উচিৎ—শশী পাগল হয়েছে।

মশায় হেসে বললেন—শশী পাগল হ'লেও লোকে পাগল হয় নি সেতাব। লোকে ওর ওষুধ খাবে কেন?

—খাবে মশায়, খাচ্ছে। শশীর কাছে রোগী বসে আছে দেখে এলাম। দাঁতু ঘোষাল।

—দাঁতু? সে তো ভাল হয়েছে এখন।

—আবার রোগ দেখা দিয়েছে। সাত আট দিন থেকে আবার কাশি হাঁপানি হচ্ছে।

মশায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—হতভাগা! মানুষ সংসারে ভাগ্য নিয়ে জন্মায় না; নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে। কতকগুলো মানুষ নিজের ভাগ্যকে গলা টিপে মারে। পশু যে পশু, গরু কুকুর এদের অসুখ করলে এরা আহার পরিত্যাগ করে। না-খাওয়া দেখেই ওদের রোগ আমরা ধরতে পারি। আর মানুষের দেখ দেখি আচরণ!

কিশোর এসে ঘরে ঢুকল। কিশোরের হাজার কাজ। বড় থেকে ছোট কাজের অন্ত নাই। তাই সকল জায়গাতেই আসে দেরীতে।

মশায় হেসে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন—এস। সময় হ'ল?

—হ'ল। পথে হাসপাতালে আটকেছিলাম।

—কি? আবার ভূত না কি?

—না। হাসলে কিশোর।—মাসখানেক হ'ল নতুন একটি নার্স এসেছে। তার নামে প্রদ্যোত ডাক্তার রিপোর্ট করেছে! সেটা আবার কর্তারা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। তাই ব্যাপারটা একটু জানবার জন্যে গিয়েছিলাম।

—কি ব্যাপার? প্রদ্যোত ডাক্তার তো এদিকে খারাপ লোক না!

কিশোর হাসলে, বললে—খারাপ আর ভাল। বিয়ে করি নি আছি ভাল। বুঝলেন না! সূত্রপাত হ'ল প্রদ্যোত ডাক্তারের স্ত্রীর সঙ্গে মেয়েটির কথান্তর।

বিনয় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল, বললে—কাণ্ডখানা কি বলুন তো? সেই বাইশ তেইশ বছর বয়স, রঙটা শ্যামলা, বেশ চটক আছে—সেই মেয়েটি বুঝি? ডাক্তার ছোকরা—

—তুই অতি ইতর বিনয়। কিশোর ধমক দিলে তাকে। তারপর হঠাৎ হেসে ফেললে নিজেই, বললে—ব্যাপার ডাক্তার জানবার কিছু নয়। ব্যাপার আমাদের বুড়ো মশায়কে নিয়ে। মেয়েটি ডাক্তারের বাড়ি বেড়াতে এসে বলেছিল—এখানে একজন আগেকার কালের বেশ ভাল ডাক্তার আছেন শুনেছি। তিনি নাকি নাড়ী দেখে সব বলে দিতে পারেন। ডাক্তারের স্ত্রী চটে গিয়ে বলেছে ও সব আগের কালের গল্প। গাঁজাখুরি। লোকটা হাতুড়ে। এই তো এখানকার কামারদের এক বুড়ীর পায়ের ভিতর হাড়ের কুচি ভেঙে ছিল—পা ফুলে বেদনা জ্বর হয়। বুড়ো তাকে নিদান হেঁকে দিয়েছিল। ইনি তাকে বর্ধমান হাসপাতালে পাঠিয়ে পা অপারেশন করিয়ে ভাল করে আনালেন। বুড়ী পা-খানা একটু টেনে চলে, কিন্তু ছ' মাসের মধ্যে মরবে না এটা নিশ্চয়। তারপর বলেছে দাঁতু ঘোষালের কেস। মেয়েটি বলেছে এটা একটু বাড়িয়ে বলছেন। দুটো কেসের জন্যেই তাঁর কোন জ্ঞান নেই প্রমাণ হয় না। এই নিয়ে সূত্রপাত। তারপর হঠাৎ মেয়েটি বলেছে আপনি ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, আমি নার্স। আমার তো আপনার উপর কথা কওয়া সাজে না। চটে যাবেন! কিন্তু ওই তো কম্পাউণ্ডার রয়েছে হাসপাতালে সে তো মশায়ের গুণগানে পঞ্চমুখ। ডাক্তারবাবুর সঙ্গেও না কি কি খিটিমিটি হয়েছে শুনেছি। এরপর ডাক্তার বুঝি মেয়েটিকে ডেকে বলেন—এই সব আলোচনা আপনি কদাচ করবেন না। আরও একটা কথা মনে রাখবেন, আমরা যে মতে চিকিৎসা করি—যেখানে চাকরী নিয়েছি সেখানে এই মতের উপরেই বিশ্বাস রাখতে হবে। হোমিওপ্যাথিতে মিরাকেল দেখা যায়। কিন্তু আমরা যতক্ষণ এ্যালোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করছি চাকরী করছি ততক্ষণ ওতে বিশ্বাস করতে তো পারব না। তারপর খিটিমিটি—এটা সেটা। এই আর কি!

মশায় অবাক হয়ে গেলেন। কে? মেয়েটি কে? তাঁর উপর এমন শ্রদ্ধা! তাঁকে এত ভালবাসে! বিচিত্র সংসার!

বিনয় বললে—তারপর হ'ল কি বলুন। মেয়েটিকে দিলেন তো সরিয়ে এখান থেকে!

—না। মিটমাট করে দিলাম। মেয়েটিকে বলে দিলাম! কাজ কি তোমার এসব নিয়ে আলোচনা করে? সত্যি তুমি বিশ্বাস কর তিনি ভাল চিকিৎসক—মনে মনে রাখ। তর্ক তুলে কাজ কি? আপনার কাজ ক'রে যাও। সে বললে—বেশ তাই করব। ডাক্তারকেও বললে—দেখুন আমি এ কোনদিন বলতে চাইনি যে তিনি আপনার থেকে ভাল ডাক্তার। যদিই অন্যায় কিছু বলে থাকি আপনি আমাকে মাফ করবেন। ডাক্তারকেও বলে দিলাম—এ সব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে আপনারও সুনাম হবে না প্রদ্যোতবাবু। বুঝে দেখুন। ডাক্তার আজ অবিশ্যি খারাপ মেজাজ নিয়েই ছিল। আজ আবার রাণা পাঠক বাজারে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে কি সব বলে এসেছে। আমি বললাম রাণা যা বলেছে সে রাণার কথা। তার কথাই আলাদা। এর জন্যে মশায়ের মত লোকের উপর আপনি চটছেন বা চটবেন এটা কি ঠিক প্রদ্যোতবাবু? তখন বুঝলে! আমি বললাম—লোকটির সঙ্গে আপনি আলাপ ক'রে দেখুন। বড় ভাল লোক। বললাম—চলুন আজই চলুন। বললে—না, আজ না—পরে কিশোরবাবু। বুঝলাম, ধাক্কাটা সামলাতে পারেন নি।

ইন্দির এসে দাঁড়াল।

সেতাব বললে—দূত এসেছে জীবন।

ইন্দির দূতই বটে। চিরটাকালই এই ভাবে জমাট আসরের মধ্যে আতর-বউয়ের দৌত্য নিয়ে এসে দাঁড়ায়। গলা ঝেড়ে সাড়া দেয়। সাড়া না পেলে অস্বস্তিতে মাথা চুলকায়, অকারণে পা চুলকায়। আবার গলা ঝাড়ে। অবশেষে অন্য কাউকে ডেকে বলে—ডেকে দ্যান কর্তাকে। ও দিকে গিন্নী মা রেগে আগুন হয়ে গেল।

ইন্দির আজ সংবাদ এনেছে—আহার প্রস্তুত।

বিনয় ব্যস্ত হয়ে বললে—উঠুন তা হ'লে উঠুন!

খাবার আয়োজন অনেক। বিনয়ই ব্যবস্থা করছে। সব জিনিস সে-ই পাঠিয়েছে। রান্নার ঠাকুর পর্যন্ত। একটা পেট্রোম্যাক্সের লণ্ঠনও জ্বলছে।

কিশোর প্রশ্ন করলে—কিন্তু আজ খাওয়ানোর ব্যাপারটা কি?

—রাণা মাছটা দিয়ে গেল। কি জানি হঠাৎ মনে হল—তোমাদের খাওয়াই। একটু আনন্দ করি।

—মেয়েটিকে নেমন্তন্ন করলে হত কিন্তু। বিনয় বললে, কথাটা শুনে পর্যন্ত আমার ভারী ভাল লাগছে।

মশায় স্তব্ধ হয়ে বোধ করি মেয়েটির কথাই ভাবছিলেন। ঘরের ভিতর থেকে আতর-বউ বেরিয়ে এলেন। বললেন—ইন্দির এ টোটা নিলি?

—এই নিই মা। উ একপাশে আছে।

—আমি জানি তোর রীতকরণ। কেন? একপাশে বলেই বা এঁটো থাকবে কেন? শনিগ্রহের মত বামুন, দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। নে এঁটো নে।

সবিস্ময়ে মশায় প্রশ্ন করলেন—কে? কার কথা বলছ?

—দাঁতু ঘোষাল।

—দাঁতু ঘোষাল?

—হ্যাঁ গো। শশীর বাড়িতে শুনেছে এখানে ভদ্রলোকেরা খাবে। একেবারে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে বলে—মা, বামুনকে একপাতা খেতে দিতে হবে। না বললে আমি যাব না। হাসপাতালে বালি খেয়ে আমার জিভে চটা ধরে গিয়েছে মা। তারপর হাসপাতালের ডাক্তারের নিন্দে। ক্রীশ্চান, বউটা গেছো মেয়ে, লজ্জা নাই। মুর্গী খায়। লুকিয়ে আরও অখাদ্যি খায়! একবার ভাবলাম বলি, দাঁতু কোন মুখে তুই এলি? কিন্তু পারলাম না। ঠাকুরকে বললাম—একপাতা ওকে আগেই দাও। নইলে খেয়ে কারুর হজম হবে না।

মশায় হাসলেন। তারপর ইন্দিরের দিকে তাকিয়ে বললেন—কাল একবার দাঁতুর খোঁজ নিয়ে আসবি ইন্দির। আমার ঘরে খেয়েই মানুষটা মরবে? জীব হত্যার পাপের নিমিত্ত হতে হবে? এই মশলা ঘি দেওয়া এত বড় মাছের খানা আর এই ময়ান দেওয়া লুচি খেয়েছে দাঁতু!

—আঠারখানা লুচি খেয়েছে। চারখানা মাছ। চারটে পানতোয়া। ইন্দির বললে।

—মশায়! মশায়! বাইরে থেকে কে ডাকলে।

—কে? আমি দেখছি মশায়। বিনয় বেরিয়ে গেল।

রাত্রে কে ডাকবে তাঁকে এ কালে? সে কালের সে পসার তো তাঁর নেই। তবে হয় তো—। চকিতে আর একটা কথা মনে হল। পরাণ খাঁ?

অথবা হয় তো আশেপাশে কারুর আকস্মিক বিপদ ঘটেছে। ছেলের তড়কা হয়েছে। অথবা হয় তো অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। এ কালে এই রোগটাই বেশী। এতেই লোক যাচ্ছে। একালে অতি কর্মব্যস্ত মানুষ এমনি অকস্মাৎ মারাই যায়; বুঝতে পারে না। হয় তো বা বুঝতে চায় না। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে ও-কথা ভুলেই থেকে যায়।

বিনয় ফিরে এল, সঙ্গে একটি কিশোর ছেলে। সুরেশ্বর চাটুজ্জের ছেলে। আজ বিনয়ের ওখানে মশায় যান নি। হরেনকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ওখানে বসবার জন্যে। হরেন তাঁর কথা রাখে। চাটুজ্জে মশায়ের কথা মত বিনয়ের ওখানে গিয়েছিল। হরেনকে সে দেখায় নি। উৎকণ্ঠিত চাটুজ্জে ছেলেকে পাঠিয়েছেন—চিঠি দিয়ে। "তবে কি আমাকে সান্ত্বনা দিতেই সকালে সেকথা বলিয়াছিলেন? আমাকে কি কাল রোগেই ধরিয়াছে?"

মশায় অনুতপ্ত হলেন। ছেলেটিকে বললেন—তোমার বাবাকে বলো কাল সকালে আমি নিজে গিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করে দিয়ে আসব। কোন ভয় নাই। বুঝেছ! বলো—মশায় মিথ্যে কথা বলেন না। আমার বিদ্যে মত আমি যা বুঝেছি তাই বলেছি। সত্যি বলেছি। আমার মতে কোন ভয় নাই।

ছেলেটিকে বিদায় ক'রে মশায় কিশোরকে বললেন—চাটুজ্জের এক্স-রের ব্যবস্থাটা তোমাকে ক'রে দিতে হবে কিশোর। আমার অনুরোধ। বুঝলে!

সকলকে বিদায় করে মশায় তামাক খেতে বসলেন।

অনেক কাল পর আনন্দ ক'রে খাওয়া-দাওয়া হ'ল। চাটুজ্জের কোন ভয় নেই। না-হলে যা শিখেছেন তিনি সব মিথ্যা। রাণা? রাণার কথা জানেন না।

রাণাকে সারাতে পারে প্রদ্যোতরা। হ্যাঁ পারে! তাঁদের চিকিৎসাও ছিল—কিন্তু সে চিকিৎসার উন্নতি হয় নি।

এ-চিকিৎসা-শাস্ত্র বিপুল গতিবেগে এগিয়ে চলেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দৃষ্টি দিয়েছে দিব্যদৃষ্টি। বীজাণুর পর বীজাণু আবিষ্কৃত হচ্ছে। রোগোৎপত্তির ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আজ সবই প্রায় আগন্তুক ব্যাধির পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল। সবের মূলেই বীজাণু। বীজাণু, জীবাণু, কৃমিজাতীয় সূক্ষ্ম কীট—তারপরে আছে ভাইরাস। খাদ্যে জলে বাতাসে তাদের সঞ্চরণ। মানুষের দেহে তাদের প্রবল বিস্তার। বিচিত্র উপসর্গ প্রকাশ। তার নতুন প্রতিকার, সিরাম, ভ্যাকসিন, ব্যাকটিরিও-ফাজ্।

কালাজ্বরের ওষুধ ব্রহ্মচারী সাহেবের ইনজেকশন। মেনিঞ্জাইটিসের ওষুধ প্রন্টসিল, তারপর দ্রুত আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে ওষুধের পর ওষুধ। পেনিসিলিন। ওদিকে—স্ট্রেপ্টোমাইসিন। ক্লোরোমাইসেটিন। অরোমাইসিনের নামও শুনছিলেন সেদিন হরেনের কাছে। পেনিসিলিন চোখে দেখেছেন। বাকিগুলি দেখেন নি। আরও কত ওষুধ বেরিয়েছে—তিনি হয়তো শোনেন নি। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি দিয়ে চিকিৎসা।

রক্ত—পুয-থুথু, মল-মূত্র, চামড়া-পরীক্ষা।

ব্লাডপ্রেশার পরীক্ষা।

এক্স-রে পরীক্ষা। যক্ষ্মায় আক্রান্ত শ্বাসযন্ত্র চোখে দেখা যায়। তেমনি ওষুধ। টি-বিতে স্টেপ্টোমাইসিন শক্তিশালী ওষুধ। স্ট্রেপ্টোমাইসিন ছাড়াও—পি, এ, এস্ বলে একটা ওষুধ বেরিয়েছে বলে শুনেছেন। দুটোর একসঙ্গে ব্যবহারে না কি আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। এ ছাড়া—অস্ত্র-চিকিৎসার কথা শুনেছেন। ওসব ওষুধ ব্যবহারের অধিকারও নেই তাঁর। তিনি জানেন না, বোঝেন না। এ কথাগুলি সেদিনও তিনি ভেবেছিলেন। বিনয়ের দোকানে বসবার সংকল্প স্থির করার আগের দিন। এখনও মধ্যে মধ্যে মনে হয়।

রাণা—যদি যাদবপুরে চিকিৎসা করাতে পারত। আশ্চর্য চিকিৎসা। আশ্চর্য সেবা পরিচর্যা। সেবাকারিণী মেয়েগুলির আশ্চর্য নৈপুণ্য। আশ্চর্য ধীরতা! কিন্তু ওই মেয়েটি কে? কে সে—তাঁকে এত শ্রদ্ধা করে? এ যুগের

তরুণী মেয়ে—। হঠাৎ মনে পড়ে গেল এখানকার নার্স টির কথা। মঞ্জরী কি মরেছে? মরে জন্মান্তর নিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে ফিরে এসেছে?

ভাবতে তাই ভাল লাগে। মশায় ঘরের সন্তান যে! নইলে রঙলাল ডাক্তারের শিষ্য জন্মান্তর মানে না। কিন্তু কে মেয়েটি?

* * *

শান্ত দৃষ্টি বড় বড় দুটি চোখ, প্রসন্ন মুখশ্রী, ফরসা রঙ, বাইশ তেইশ বছরের একটি মেয়ে। সাদা ব্লাউস—ফিতে পাড় সাদা শাড়ি—গলায় একছড়া সরু বিছে হার চিক্ চিক্ করছে, হাত দুখানি নিরভরণ, বাঁ হাতে একটি কালো স্ট্র্যাপে বাঁধা ছোট হাত ঘড়ি। প্রসন্নতা মেয়েটির সর্বাঙ্গে।

দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

না-না। মঞ্জরীর সঙ্গে এর কোন মিল নেই। কিন্তু মেয়েটির মুখের দিকে হঠাৎ চেয়ে মনে হয় এ মুখ চেনা! চোখ নামালে মনে হয় না। কিন্তু চোখ চেয়ে থাকলে মনে হয়। হাসলেও যেন মনে হয়। কার সঙ্গে আদল ঠিক করতে পারেন না।

মেয়েটি বাজারে এসেছিল জিনিস কিনতে। বিনয় তাঁকে দেখালে, ওই দেখুন সেই মেয়েটি। ডাকব?

—না। মশায় সবিস্ময়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। যাওয়ারই কথা, মনের প্রসন্নতা চোখের দৃষ্টিতে মাধুর্যের কাজল মাখিয়েই দেয়। তার উপর চেনা চেনা ভাবটুকু। ওইটেই যেন বেশী ভাল লাগায়।

কে মেয়েটি!

কিশোর এসে হাজির হ'ল এই মুহূর্তে। সেই তাকে ডেকে আনলে। বললে—ইনিই জীবন মশায়। যাঁর এত প্রশংসা করতে গিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছেন।

মেয়েটি চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বললে—জানি। আমি তো ওঁকে রোজ দেখি হাসপাতালের সামনে দিয়ে যান-আসেন।

—তুমি বস মা। বস। বুড়ো মানুষকে সংকোচ কি? বস। আমি শুনেছি। কিন্তু আমার প্রশংসা কেন করেছ তুমি জানি না। ডাক্তারের

বউ ঠিকই বলেছেন। আমি তো পাশ করা ডাক্তার নই। যারা পাশ করা নয় তারা তো হাতুড়েই বটে। আর জুয়ো যারা খেলে তাদের যখন বলে জুয়াড়ী, দাবা যারা খেলে তাদের যখন বলে দাবাড়ে, তখন আমি হাত দেখে রোগ দেখি—আমাকে হাতুড়ে বললেই বা ক্ষতি কি?

মেয়েটি হাসলে। তারপর বললে—না। ওঁরা যাকে হাতুড়ে বলেন—সে হাতুড়ে আপনি নন। আপনাদের বংশের নাম মশায় বংশ, মহাশয়ের বংশ!

—এত জেনেছ তুমি? কি ক'রে জানলে গো?

—আমি শুনেছি। কম্পাউণ্ডারবাবু বলেন, আরও লোকে বলে। কদ্রু বলে। আমি জানি।

মশায়ের বংশ! শেষ হয়ে গেল তার মহাশয়ত্ব। মশায় তাকিয়ে রইলেন বাইরে অপরাহ্নের পশ্চিমাকাশের দিকে। সূর্য ডুবছে।

—তোমার নামটি কি দিদি? হঠাৎ মশায় প্রশ্ন করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—দিদি বলব তোমাকে। ছেলের ছেলে তোমার বয়সী।

—আমার নাম সীতা।

মেয়েটি তাঁকে প্রণাম করলে।

মশায় ব্যস্ত হয়ে বললেন—প্রণাম করছ। কিন্তু তোমরা? ব্রাহ্মণ বৈদ্য নও তো?

—না। আমরা কায়স্থ।

পরমানন্দ মাধব হে! পরমানন্দ মাধব! মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠল আজ ইষ্টমন্ত্র! পরমানন্দ মাধব!

তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মঙ্গল হোক। কল্যাণ হোক।

(তিরিশ)

মাস কয়েক পর—মাস তখন চৈত্র। বেশ গরম পড়েছে। অপরাহ্ণ বেলায় আরোগ্য-নিকেতনের বারান্দায় সেতাবের সঙ্গে মশায় দাবায় বসেছিলেন।

মশায় ক্রমাগত হারছিলেন।

সেতাব বললে—তোর হল কি বল দেখি?

মশায় হাসলেন।

—খেলায় মন নেই একেবারে? কি হয়েছে আজকাল?

বাড়ি থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে এল ওই সীতা মেয়েটি। চায়ের বাটী হাতে এসে বাটী দুটি নামিয়ে দিয়ে বললে—চললাম দাদু। আজ সন্ধ্যে থেকেই ডিউটি।

—এস। সস্নেহে পিঠে হাত দিয়ে মশায় বললেন—কাল কখন আসবে?

—সকালে স্নান ক'রে ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর আসব।

—আচ্ছা।

লঘু পদক্ষেপে মেয়েটি পথে নামল। মশায় বললেন—ইন্দিরকে সঙ্গে নিয়ে যাও তো? না—একলাই যাও?

—একলাই যাই। চলে গেল সে।

সেতাব বললে—তুই বড় বাড়াবাড়ি করছিস জীবন!

মশায় হাসলেন—বাড়াবাড়ির উপরে কি মানুষের হাত আছেরে? আতুকে দোষ দিতাম। লোভ—লোভ—লোভ। এও দেখছি—মায়া মায়া মায়া ছাড়াবার উপায় নাই। ছাড়ব ভাবতে গেলে অন্তর ছটফট করে আরও নিবিড় পাকে জড়িয়ে পড়ে।

মশায় উদাস দৃষ্টি তুলে আকাশের নীলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সেতাব স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এতটা মাখামাখি সেতাবেরও একটু কটু ঠেকে। সেই সূত্র থেকে এ যেন শত সহস্র লক্ষ পাকে জড়িয়ে পড়ল জীবন। জীবন যদি যুবা হ'ত, এমন কি প্রৌঢ়ও হত এবং জীবন যদি জীবন মশায় না হ'ত তবে লোকে তাঁর দুর্নাম রটাত।

তবুও লোকে প্রশ্ন করে—এত কিসের মাখামাখি বলতে পার? সেতাবকেই প্রশ্ন করে। সেতাব বলে—জীবনকে রক্ষা করেই বলে—এটাও বোঝ না বাপু? ছেলেপুলে নাতি নাতনী সব যখন ছাড়লে তখন ওটা এসে পড়ল, ওরাও জড়িয়ে ধরলে আর কি! লোকে তবুও ছাড়ে না। বলে—নার্স টার্সদের জাতফাত তো সব গোলমেলে ব্যাপার। সেতাব বলে—সে বাপু আগেকার কালে ছিল—একালে নয়! জীবনের স্ত্রীও মেয়েটিকে ভালবেসেছে। আতর বউ ভালবেসেছে সেটা তো কম কথা নয়। নিত্যই মেয়েটি একবার ক'রে আসে। আতর-বউকে বই পড়ে শোনায়। আতর-বউয়ের দুঃখের কাহিনী শোনে। এ সব বলেও কিন্তু সেতাব সন্দেহ করে যে, মেয়েটি অত্যন্ত সুচতুরা। সে এই বৃদ্ধ দম্পতির জীবনের শূন্যতার সুযোগ নিয়ে তাদের দোহন করছে। টাকা পয়সাও নেয়, এঁরাও—অন্তত জীবন ডাক্তার দেন বলেই সেতাবের সন্দেহ হয়।

জীবনের এই শেষ জীবনে পড়তা ভালই হয়েছে। বিশেষ ক'রে রামহরি লেট এবং সুরেশ্বর চাটুজ্জের কেসে নতুন করে সুনাম ছড়িয়েছে। সুরেশ্বর চাটুজ্জের নাড়ী দেখে তিনি যা বলেছিলেন তাই ঠিক হয়েছে।

সেতাবের সেদিনের কথা মনে রয়েছে—জ্বল জ্বল করছে। তিনিই আগে এ সংবাদ পেয়েছিলেন। কিশোরের তদ্বিরে চাটুজ্জেকে সরকারী খরচে কলকাতা পাঠানো হয়েছিল। সেদিন সকালবেলা—সেতাব দাওয়ায় বসে আউশ ধানের হিসেব করছিলেন। সুরেশ্বর চাটুজ্জের ছেলে পথ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল—হঠাৎ ঘুরে এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল—বাবার কিছু হয় নি। এক্স-রেতে কিসু্য পাওয়া যায় নি!

সেতাব প্রথমটা ঠাওর করতে পারেন নি। মনটা ছিল ধানের হিসেবে। এবার ধান ভাল হয় নি। কাজেই হিসেব করতে গিয়ে ভাবতে বসেছিলেন—আসছে বছর হবে কি? মনে ভাসছিল—ক্যানেল কাটার ছবি। কবে যে ক্যানেলগুলি শেষ হবে! বাঁচে তা' হলে দেশের লোক। তিনি ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কি বলছ? কার কথা?

সে বলেছিল—আমি সুরেশ্বর চাটুজ্জের ছেলে। বাবা চিঠি দিয়েছেন। এক্স-রে হয়ে গিয়েছে। কোন দোষ নাই। মশায় যা বলেছেন—তাই।

সেতাব খুশি হয়েছিলেন। আহা—ছা-পোষা মানুষ! আহা। সঙ্গে সঙ্গে মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। জীবনের নাড়ীজ্ঞানের জয় হয়েছে। জীবনের মান রক্ষা হয়েছে! বড় ভাল হয়েছে। তিনি ধানের হিসেব শেষ করেই জীবনের বাড়ি এসে খবরটা দিয়েছিলেন। পথে হাসপাতালের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন—যে কেউ হোক—কাউকে বলে যাবেন এ খবরটা। তা' হলেই ডাক্তার পাবে। নিশ্চয় কানে উঠবে।

পেয়েছিলেন এই মেয়েটিকেই—সীতাকে। মাথায় সাদা টুপি পরে জুতো খুটখুট করে যাচ্ছিল—সংক্রামক ব্যাধির ঘরটার দিকে। সে সেতাবকে ওই ভাবে উঁকি মারতে দেখে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করেছিল—আমাকে কিছু বলছেন? মশায় কিছু বলছেন?

সেতাব বলেছিলেন—না। বলছিলাম, সুরেশ্বরের কেসটা জান তো? ডাক্তারেরা বলেছিল টি-বি। মশায় বলেছিল টি-বি নয়।—তাই মশায়ের কথাই ঠিক, টি-বি নয়। সেই—কি রে বলে তাতে কিছু পাওয়া যায় নি।

মশায় প্রায় নিশ্চিত হয়েই চাটুজ্জেকে বলেছিলেন, টি-বি নয়, এবং কোন সংক্রামকতা হেতু থেকে উৎপন্ন জ্বর নয়। তাই নয় বলেই পেনিসিলিন কোন কাজ করে নি। লিভারের দোষ, রক্তশূন্যতাই ছিল মূল কারণ। সর্দি কাশিটা ওই লিভারের জটিলতাকে আশ্রয় করেই রথের ধ্বজার মত সমস্ত কিছুর উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ধ্বজা দেখে রথ চেনা যায় অবশ্য। কিন্তু ধ্বজাটা নকল হলে করবে কি? মশায় শুনে হেসেছিলেন—বলেছিলেন—আমি জানতাম সেতাব। আমি জানতাম।

সেতাব বলেছিল—আজ খাওয়া।

হেসে মশায় বলেছিলেন—আবার। দাঁতুকে বধ ক'রে সাধ মিটল না।

দাঁতু মরেছে। শেষ চিকিৎসা তার জীবন মশায়ই করেছিলেন। হাসপাতালে ভূত সাজার কথাও সে স্বীকার করে গেছে। হেসেই বলেছিল দাঁতু,—দেখ জীবন মশায়, সবার কাছে ফাঁকি আছে কয়েতের কাছে ফাঁকি নাই। আবার কায়েতের মধ্যে তুমি। তা ভাই—অন্যায় আমি

করেছি। লোভ আমি সামলাতে পারি নাই। আর হবে না। আর লোভ করব না। আমাকে সারিয়ে দাও।

মশায় বলেছিলেন—চেষ্টা আমি করব দাঁতু। কিন্তু জীবন মৃত্যুর কথা তো কেউ বলতে পারে না, সে তো জানিস তুই!

দাঁতু প্রথম দিন রসিকতা করতে চেষ্টা করেছিল—ওরে বাবা! অন্ধকারে অজানা পথে একলা যাব কি ক'রে।

কিন্তু এ রসিকতা থাকে নি তার শেষ পর্যন্ত। সে কাঁদত। বলত—বাঁচব না? মশায় বাঁচাতে পারবেনা আমাকে! ওঃ, বড় কষ্ট পেয়ে মরেছে দাঁতু।

সেই থেকেই মশায়ের পড়তা পড়েছে ভাল। রোজগার এখন তাঁর বেশ ভাল। বিনয় বলছে—মশায় যদি নতুন ওষুধগুলো রপ্ত করে নেন—তবে তো মোটর চড়বে গো। কিন্তু মশায় তা' করেন না। বলেন—আগুন নিয়ে খেলাও ভাল—তাতে নিজে পুড়ে মরতে হয়, জীবন নিয়ে খেলব না। বাবা, ওসব হল পাশুপত অস্ত্রের মত। যে সে ধরবার অধিকারী নয়। তবুও দিন আট দশটাকা উপার্জন করছেন। সেতাবের ধারণা, মেয়েটা সেই লোভে এমন ক'রে আঁকড়ে ধরেছে মশায়কে, আলোকলতার মত আকাশপথে এসে বুড়ো শালের মাথায় পড়ে তাকে ছেয়ে ফেলেছে, তার রস শোষণ করছে। এই কারণেই সেতাব সন্তুষ্ট নয়। সে বলে—আজও বললে—তবুও বলব জীবন, বাড়াবাড়ি লোকের চোখে ঠেকছে। কোথাকার কোন বংশের কি ধরণের মেয়ে, তার ঠিক নাই! আর তোর হল মশায়ের বংশ!

হেসে মশায় বললেন—মশায়ের বংশের অবস্থাও ওই মেয়েটির মতই সেতাব। কি তফাৎ আছে বল?—আর—। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন—কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন।

কথা বন্ধ ক'রে মশায় যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।—কে কাঁদছে নয়? সেতাব?

—কাঁদছে? হ্যাঁ। কার অসুখ ছিল? হাঁ, কাঁদছেই তো!

মশায় উঠলেন। বললেন—ছক তোল সেতাব, আমি একবার দেখি।

বৃদ্ধ সেতাব এসব বিষয়ে নিরাসক্তির কোঠায় পোঁছেছেন। তিনি আর একবার বললেন—কার কি হল? বলেই হুকোটা তুলে নিলেন।

—বোধ হয় মতি কর্মকারের বাড়িতে কারও কিছু হয়েছে। ওর মায়ের সেই ব্যাপার থেকে ওরাই শুধু আমাকে ডাকে না। কথায় কথায় হাসপাতালে ছোটে দেখি। অন্য কারও বাড়িতে অসুখ থাকলে অবশ্যই তিনি জানতেন।

মশায়ের তার জন্যে ক্ষোভ নেই। মতির উপর রাগ করেন না। তিনি জানেন—তাঁর চেয়ে কেউ ভাল জানে না যে, তারা যে তাঁকে ডাকে না, আসে না—সেটা অবিশ্বাসের জন্য নয়। ডাকে না লজ্জায়। মতির মা তাঁর নিদান ব্যর্থ করে বেঁচেছে সেই লজ্জায় তাঁকে ডাকতে পারে না। মতি পর্যন্ত তাঁর সামনে আসে না। আড়াল দিয়ে হাঁটে। কিন্তু হল কি? আবার কারও কিছু হঠাৎ হতেও পারে।

মশায় তাড়াতাড়ি জুতো পরে বেরিয়ে পড়লেন।

মতির বাড়িতেই বটে। কান্নার রোল উঠছে। সকলের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে উঠছে মতির মায়ের কণ্ঠস্বর।—ওরে বাবারে! আমার একি সর্বনাশ হ'ল রে! তোমাকে আমি ছাড়ব নারে! তুমি আমার নাতিকে বাঁচিয়ে দিয়ে যাও। নইলে কেন তুমি আমাকে বাঁচালে রে?

এই মুহূর্তেই হাসপাতালের ডাক্তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। মশায়ের সঙ্গে তাঁর চোখোচোখি হয়ে গেল। হাসপাতালের ডাক্তার—তাঁকে লক্ষ্য না করেই এগিয়ে গেলেন—তাঁর সাইকেলটার জন্য। কিন্তু বাড়ি থেকে পাগলিনীর মত বেরিয়ে এল মতির মা। খুঁড়িয়ে চলেও ছুটে এসে সে হাসপাতালের ডাক্তারের সামনে আছড়ে পড়ল।—না-না-না। তুমি আমার নাতিকে বাঁচিয়ে দিয়ে যাও। নইলে ব'লে যাও। হাসপাতালের ডাক্তার দাঁড়াতে বাধ্য হলেন।

জীবন মশায় গম্ভীর স্বরে বললেন—মতির মা।

মতির মা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে নতুন ক'রে বিলাপ শুরু করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু জীবন মশায় সেই গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন—ওঠ, চুপ কর। সবেরই একটা সীমা আছে। কিন্তু হল কি? কার অসুখ করেছিল?

চীৎকার ক'রেই মতির মা কি বলতে গেল। মশায় বললেন—এমন ক'রে নয় মতির মা—এমন করে নয়। ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধরে বল।

এবার হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—মতির বড় ছেলেটি মারা গেল।

—আঃ ছি! ছি! ছি! মশায় বলে উঠলেন। বার-তের বছরের যে—পাথরে গড়া ছেলের মত শক্ত ছিল।—কি হয়েছিল?

—ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। মাত্র দু'দিন জ্বর। হঠাৎ হার্টফেল করলে। ডাক্তার বললেন। কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে আবার মতির মা চীৎকার ক'রে আর্তনাদ ক'রে উঠল—ওরে আমার সদল-বদল ছেলে রে, অসুরের কাঁড়ি সেই ছেলে আমার—।

বুক চাপড়াতে লাগল—মাথা ঠুকতে লাগল। ওরে তুমি আমাকে কেন বাঁচালে রে? কেন বাঁচালে রে?

হাসপাতালের ডাক্তার বিব্রত হয়ে উঠলেন। ওদিকে তাঁর সাইকেলের পিছনের চাকাটা পাংচার হয়ে গেছে। চারপাশে লোক জমেছে। মৃদু গুঞ্জনে তারা বলেছে—কি রকম? রোগ তাকতেই পারে নাই না কি?

জীবন মশায় ডাকলেন—মতি।

মতি দুই হাতে মাথা ধ'রে বসে ছিল। এবার সে হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল—ডাক্তার জেঠা আপনাকে দেখালে হয় তো আমার—

বৃদ্ধ বয়সে বহু সংসার হয়, মৃত্যুর বিরাম নাই সংসারে। মৃত্যুর কাছে বালক-বৃদ্ধ-যুবা বিচারও নাই; কে কখন যাবে তার কি স্থিরতা আছে? মুক্তি তখন নিতে হয়। তাতে ভয় করলে এই ঘটে!

কে একজন বলে উঠল—এতো চিরকালের নিয়ম গো। সংসারে প্রবীণ মানুষ মৃত্যুশয্যা পেতে যদি উঠে বসে, তবে সে শয্যেতে আর কাউকে শুতে হবে। মাশুল দিতে হবে।

নীরবে জীবন মশায় অগ্রসর হলেন, তাঁর সঙ্গে হাসপাতালের ডাক্তার। হঠাৎ তিনি বললেন—এখানে ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া তো এখন নাই। আমি সন্দেহ করি নি। আমাকে বলেও নি। আজ বললে—কয়েকদিন আগে মামার বাড়ি গিয়েছিল। সেখান থেকেই এনেছে।

জীবন ডাক্তার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—রোগীর রোগ-বর্ণনায় ভুল, চিকিৎসকের ভ্রান্তি, ওষুধ অপ্রাপ্তি, এসব মৃত্যু-রোগের উপসর্গ না হোক—হেতু! নইলে চিকিৎসা বিজ্ঞান—আমাদের বলে আয়ুর্বেদ পঞ্চমবেদ।

বিজ্ঞান বেদ এতো মিথ্যা নয়। মিথ্যা এমনি করেই হয়। মৃত্যু আসে। অবশ্য একালের রোগ পরীক্ষার উন্নতি আরও হবে। তখনকার কথা বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি—ভ্রান্তি মানুষের হবেই। আপনি চণ্ডী পড়েছেন কি না জানি না। চণ্ডীতে মহাশক্তিই হলেন বিদ্যা বিজ্ঞান, আবার তিনিই ভ্রান্তি।

—নাড়ী দেখে আপনি বুঝতে পারতেন ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া ?

—এ ক্ষেত্রে হয় তো পারতাম না। পারলেও বাঁচাতে পারতাম না।

—ওটা ঠিক কথা নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ অচিকিৎসায় অকালে মরছে।

—হ্যাঁ তা মরছে।

এরপর দুজনেই নীরবে পথ হাঁটতে লাগলেন। মশায় ভাবছিলেন ডাক্তারের কথাই ঠিক। মরে—অকালে অচিকিৎসায় অনেক লোক মরে। এ স্বীকার আজ করতেই হবে।

হঠাৎ হাসপাতালের ডাক্তার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, কিন্তু মতির মা'কে আজ আপনি যে কথাগুলি বললেন—সে আমার বড় ভাল লাগল। ঠিক কথা মশায়, জীবনে সময় আসে তখন মুক্তি নিতে হয়। আমার শাশুড়ীর দিদিমা আছেন। তিন কুলের সব গিয়েছে—তিনি আছেন। আমি গেলেই বলেন—তুমি তো ডাক্তার! আমার কান আর চোখ দুটো সারিয়ে দাও তো! এই মতির মা! আপনি ওকে যা বলেছিলেন—অপারেশন না হ'লে তাই হত। মরত বুড়ী। কিন্তু আপনি ওকে গঙ্গাতীর যেতে বলায় ওর সে কি কান্না তখন! আমার পায়ে ধরে বলে আমাকে বাঁচান ' এ রোগে আমি মরতে পারব না। এ যে অপঘাতে মৃত্যু। এতে মরে আমি শান্তি পাব না। আমার গতি হবে না।

—ওটা ছলনা ডাক্তারবাবু। মানুষ যেখানে অতি মায়ায় অতি মোহে বদ্ধ হয়, মৃত্যুভয়ে কাতর হয়, তখন নানা ছুতোয় বলে—আমি এই জন্যে বাঁচতে চাই, বাঁচাও আমাকে। মৃত্যু ভয় যে মানুষের একটা বড় লজ্জা! তাই ঢাকে।

—তাও বলেছিল। বলেছিল—আর সাধ আমার একটি আছে। বড় নাতির বউ দেখতে সাধ আছে। যদি বাঁচার আকাঙ্ক্ষাটা তার নিতান্তই জীবধর্মের বাসনার প্রেরণা হয় তবে সান্ত্বনা পেতে তার দেরী হবে না। কিন্তু

ছেলেটার যাওয়া বড় মর্মান্তিক। বড় সবল স্বাস্থ্য ছিল ছেলেটার! একজন বলশালী লোক হ'ত। ইস্কুলে পড়ত; বাপের কামারশালে বাপকে সাহায্য করত; হাতুড়ী পিটত। ওকে দেখলেই মনে পড়ত মঙ্গলকাব্যের বালক কালকেতুকে। একালের ছেলেদের পড়ার বইয়ের একটা পদ্য শুনে শুনে তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। সেই পদ্যটি মনে হ'ত। চাষার ছেলে বলছে

"শৈশব না যেতে পিতা লন সঙ্গে করে
আপন কাজের সাথী করেন আমারে।
পরের সঞ্চিত ধনে হয়ে ধনবান
আমি কি থাকিতে পারি পশুর সমান।"

ওই ছেলেটাকে দেখেই যেন পদ্যকর্তা পদটি রচনা করেছিলেন। কিশোর বলত, ছেলেটা ভাল ছেলে। ভাল মেকানিক হতে পারবে।

অকালমৃত্যুর চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু নাই। একে বোধ করাই এ সংসারে সব চেয়ে বড় কল্যাণ। সব চেয়ে সুখের। মৃত্যু এইখানেই মৃত্যু, বৃদ্ধ বয়সে সে অমৃত।

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—আজকের কথা চিরদিন মনে থাকবে আমার।

ওঃ। হাসপাতালের সামনে এসে পড়েছেন তাঁরা। কথার মধ্যে খেয়াল করেন নি।

সারি সারি ছোট বড় কোয়ার্টার, লাল সুরকীর রাস্তা। দূরে সামনেই পুরানো হাসপাতালটা দেখা যাচ্ছে। পাশে প্রকাণ্ড বড় নতুন হাসপাতাল তৈরী হ'চ্ছে। মশায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

মনে পড়ল গুরু রঙলালের কথা।

পদ্মবীজ বিভূষণা, কৌষেয়বাসধারিণী, পিঙ্গলাক্ষী, পিঙ্গলকেশী, পাণ্ডুর দেহবর্ণা, মৃত্যুর তাড়নায় জীব ছুটেছে জন্তু ছুটেছে, আগুন লাগা বনের পশুর মত দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছে; কিন্তু মানুষ তার সঙ্গে লড়াই করছে। পিছু হটেই আসছে চিরকাল কিন্তু লড়াই সে করছে। নূতন নূতন অস্ত্র উদ্ভাবন করছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আবিষ্কারের পর আবিষ্কার চলেছে তার। সে একদিন রোগকে পরাজিত করবে। সে চেষ্টায় তাঁর

অন্ত নাই। পরিণত বয়সে যোগীর মত কামনা করে সে জীবন থেকে মুক্তি নেবে। তার আয়োজন এখানে হচ্ছে। হোক। হোক।

প্রদ্যোত ডাক্তার বললেন—আসুন না। এখানে তো আসেন না! এ তো আপনাদেরই। আমরা তো আগন্তুক। কাজ করতে এসেছি।

মশায় হেসে বললেন—জীবনে আমার দুঃখ অনেক। তবু জীবন যায় নি। যায় নি বলে একালে দেখলাম অনেক ডাক্তারবাবু। অদ্ভুত কাল। অদ্ভুত মানুষ! আপনারা দেখালেন অনেক! অনেক!

ডাক্তারের চাকর ভিতর থেকে ছুটে এসে ফটকটি খুলে দিলে। ডাক্তারের স্ত্রী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বোধ করি সবিস্ময়ে দেখছে। দূরে হাসপাতালের কাছাকাছি ছোট কোয়ার্টারটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সীতা। সেও দেখছে। জীবন মশায় এবং প্রদ্যোত ডাক্তার অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছে—এটা একটা বিস্ময়কর সংবাদ বই কি!

ডাক্তার আবার আহ্বান জানালে—আসুন।

মশায় হাত জোড় ক'রে বললেন—আজ নয় ডাক্তারবাবু। আসব অন্যদিন।

প্রদ্যোত বুঝলে, মশায়ের কোথায় একটা অনিচ্ছা রয়েছে। সে বললে—আচ্ছা! বলে ভিতরে ঢুকেও কিন্তু আবার ফিরল। দূরে সীতা নার্সটিকে সে দেখেছে। বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মশায়?

—আমাকে?

—হ্যাঁ। আমি শুনেছি আপনি মিথ্যে কথা বলেন না।

—এতবড় কথা কি বলতে পারি ডাক্তারবাবু! সত্য তো সোজা কথা নয়, ও হল সূর্যের আলো। সমস্ত জীবন সূর্যের আলোর মধ্যে বাস করা কি যায়? গ্রীষ্মকালের দুপুরে আমরা ঘরে ঢুকে দরজা জানালা বন্ধ ক'রে বসে থাকি। অন্ধকার খুঁজি। নিদ্রা বিশ্রাম সব পরিত্যাগ করার মত শক্তি চাই।

প্রদ্যোত এত সব কথার হেঁয়ালী গ্রাহ্য করলে না। বললে—তবুও লোকে বলে আপনি মিথ্যে বলেন না। আপনাদের বংশ মশায়ের বংশ। ওই সীতা মেয়েটি আপনার ওখানে এত যাওয়া আসা করে—কিন্তু কেন?

মশায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—মেয়েটির মমতায় আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনেই জড়িয়ে পড়েছি ডাক্তারবাবু। স্বজাতির মেয়ে—আর---

—স্বজাতির মেয়ে? ওরা কি কায়স্থ না কি? ও অবশ্য সীতা দেবী লেখে।

—হ্যাঁ, কায়স্থই ওরা।

—জানাশোনা? কিছু মনে করবেন না। হয় তো কৌতূহলটা অন্যায় হচ্ছে। কিন্তু এখানে আমার হাসপাতাল এলাকায় গুজব—ও আপনার কাছে যায় এখানকার দোষ ত্রুটি জানাতে। আপনার কাছে গেলেই বিনয়ের কানে যায়। কিশোরবাবু জানতে পারেন। আপনি নমস্য লোক, আপনার কাছে গেলে দুর্নামের আশঙ্কা নাই। আজ আপনার সঙ্গে একটা জানাশোনা হল। এবং জানাশোনার এই বোধ হয় প্রথম। আপনাকে কথাটা তাই না জানিয়ে পারলাম না।

মশায় হেসে বললেন—কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তো শোনা হয় নি ডাক্তারবাবু। অবশ্য আপনি বলতে পারেন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের কিছু নাই। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয় ডাক্তারবাবু। আসল কথা আপনাকে খুলে বলতে পারলাম না ডাক্তারবাবু। বললে বুঝতে পারতেন। সে যাক। শুধু এইটুকু জানবেন—মেয়েটি সে ধরনের হলে ওকে স্নেহ করতাম না।

তারপর হঠাৎ হেসে বললেন—আপনারা ভাগ্য মানেন না। নইলে বলতাম ও আমার ভাগ্য। দুর্লভ ভাগ্য। আর তিনি দাঁড়ালেন না, আপনার মনেই মাথা নেড়ে কথাটাকে যেন নিজেই যাচাই করে স্বীকার করতে করতে পথ চলতে লাগলেন জীবন মশায়।

(একত্রিশ)

অপ্রত্যাশিত না হলেও সংবাদ এল যেন হঠাৎ। আরও মাস খানেক পর। বৈশাখের শেষ সপ্তাহে।

রাণা পাঠক মরেছে।

সংবাদটা নিয়ে এল কিশোর। কিশোর গিয়েছিল সেখানে। রাণাই তাকে সংবাদ পাঠিয়েছিল। রাণা শেষটা মশায়ের চিকিৎসাও ছেড়ে দিয়েছিল। মশায়ের চিকিৎসায় প্রথমটা ফল হয়েছে বলে উৎসাহিত হয়েছিল বটে কিন্তু মশায় উৎসাহিত হন নি। কিছুদিন যেতে রাণাও সেটা বুঝতে পেরেছিল। একদিন মশায়কে সে নিজেই বলেছিল—প্রথমটা উপকার যেমন বুঝেছিলাম মশায়, আর তেমন বুঝতে পারছি না।

মশায় বলেছিলেন—রোগ কঠিন বাবা রাণা। সময় সাপেক্ষ তো বটেই—তা ছাড়া—। বলবার কথা খুঁজে পান নি তিনি। খানিকটা চুপ ক'রে থাকতে হয়েছিল তাঁকে ; কথা খুঁজতে হয়েছিল। খুঁজে নিয়েই বলেছিলেন—দেখ, কিছুদিন দেখ। আর যদি পার তো ডাক্তারী মতে চিকিৎসা—সেও অবিশ্যি যাদবপুর ভিন্ন বাইরে সুবিধে হবে না। বল তো কিশোরকে বলে দেখি। সে যদি সরকারী স্যাংশন নিয়ে সেখানে ভর্তি করে দিতে পারে!

রাণা বলেছিল—ভেবে দেখি মশায়।

সেই রাণা গিয়েছিল আর আসে নাই। কয়েকদিন পর সংবাদ পেয়েছিলেন—রাণা দৈবকৃপার শরণার্থী হয়েছে। এখানে সিজা গ্রামের ধর্মরাজ ঠাকুরের হাঁপানী এবং কাশ ব্যাধির স্বপ্নাদ্য ওষুধ আছে। বুকের রোগের ওষুধ এদের অনেককাল থেকে চলে আসছে। হাঁপানী এদের ওষুধে কম পড়ে। সে মশায় স্বীকার করেন। অনেকের ভাল হয়েছে বলে শুনেছেন। দু চার জনের ভাল হওয়ার কথা নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে জানেন। কিন্তু কাশ অর্থাৎ যক্ষ্মার কথা জানেন না। যক্ষ্মা তো দেশে খুব ছিল না। কদাচিৎ দু একটা বাড়িতে দেখেছেন। ভাবতেও শিউরে ওঠেন—সে বাড়ির প্রায়সব শেষ হয়ে গিয়েছে। সত্য রায়ের যক্ষ্মা হয়েছিল। বাইরে চাকরী করতে গিয়ে ফিরে এল যক্ষ্মা নিয়ে। যক্ষ্মায় সত্য গেল, সত্যর স্ত্রী

গেল, সত্যরায়ের তিন ছেলে—তারা গেল, বড় ছেলে বিয়ে করেছিল—তার বউ গেল, এখন থাকবার মধ্যে আছে বড় ছেলের একটি ছেলে। আত্মীয়স্বজনে ভয়ে ছেলেটিকে কেউ স্থান দেয় নি। স্থান দিয়েছে এক বৈরাগী! সে তাকে মানুষ করছে। তার ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে? আর যক্ষ্মা এ কয়েকখানা গ্রামে তিনি সে-আমলে দেখেন নি। এ আমলে দেখছেন। শহর বাজার থেকে নিয়ে আসছে মানুষ এ বিষ। ছড়াচ্ছে। তার উপর মানুষ হয়েছে জীবনীশক্তিতে দুর্বল। বাড়ছে। সে আমল থেকে এখন পর্যন্ত সিজাগ্রামের দৈব ওষুধে কাশ রোগ ভাল হওয়ার কথা তিনি শুনেছেন কিন্তু বিশ্বাস করেন না। কিন্তু রাণার গোঁড়ামী, রাণার বিশ্বাস অদ্ভুত। ওকে টলানো যায় না। মৃত্যুশয্যাতেও স্বীকার করে না। বলে এই আমার অদৃষ্ট তার দেবতা কি করবে? বদ্যি কবরেজের কথা ছেড়েই দিলাম। অটুট বিশ্বাসে হাসে।

রাণা ঠিক তাই বলেছে এবং এই ভাবেই হেসেছে মৃত্যুকালে।

শেষের দিকে রাণা প্রায় সন্ন্যাসী হয়েছিল। গেরুয়া কাপড় পরত, দাড়ী গোঁফ রেখেছিল, স্তব-স্তোত্র পাঠ করত, বাড়ির বাইরে একখানা চালা ঘর তুলে সেইখানেই বাস করত, আর মোটা গলায় গান করত, শ্যামাসঙ্গীত। গতকাল সন্ধ্যায় সে কিশোরের কাছে লোক পাঠিয়েছিল। নবগ্রামের জেলেরা গিয়েছিল নদীতে মাছ ধরতে, তাদেরই একজনকে বলেছিল—কিশোরবাবুকে একবার আসবার জন্যে বলিস। আমি বোধ হয় আর দু একদিন আছি। বুঝলি!

তারা রাত্রে আর সংবাদটা দেয় নি, জেলেরা সারাটা দিন জলে কাজ করে সন্ধ্যাকালে মদ না খেয়ে পারে না, ওটা ওদের নেশা নয়—ওটা ওদের ওষুধ; মদ খেয়ে বলতে ভুলে গিয়েছিল। খবর দিয়েছিল আজ সকালে। কিশোর খবর পেয়েই গিয়েছিল। ওই ভাবে হেসে ওই কথা বলে রাণা কিশোরকে বলেছে—গ্রামের লোকে তো আমার দেহটা ভয়ে ছুঁতে চাইবে না, তাই তোমাকে কষ্ট দিলাম। আর ছেলেমেয়ে তিনটে রইল, বিপদে আপদে দেখো। হ্যাঁ, মশায়ের কাছে ওষুধের দাম কিছু বাকী আছে, দিই দিই করে আর হয়ে ওঠে নি। ওটা মশায়কে মাফ দিতে বোলো।

বিনয়ের দোকানে বসে শুনলেন মশায়। শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। দু ফোঁটা জল তাঁর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে; দীর্ঘ দাড়ীর মধ্যে পড়ে হারিয়ে গেল শিবের জটার গঙ্গার মত। অনেকক্ষণ পর তিনি ডেকে উঠলেন—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

সেতাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বিকার থাকেন, তিনিও আজ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। দাবার কথা আজ পাততে ভুলে গেলেন। হঠাৎ এক সময় হাতখানা বাড়িয়ে বললেন—আমার হাতটা দেখ্ তো!

—কেন? হাতে কি হল?

—হবে কি? যাব কবে জানতে চাচ্ছি। নিদান হাঁক। কাশী যাই।

—কাল দেখব। আজ নয়। তা ছাড়া নিদান আর হাঁকব না সেতাব। উচিত নয়। এ কালের ওষুধ সব গোলমাল করে দিয়েছে। আচ্ছা চলি।

পরমানন্দ মাধব! পরমানন্দ মাধব! পরমানন্দ মাধব হে!

উঠলেন মশায়। কিশোর তখন চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকলেন—কিশোর।

কিশোর জেগে উঠে বললে—উঠছেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার কথা ছিল কিছু।

—বলুন।

—চল, পথে বলব।

নীরবেই পথ চলে নবগ্রামের চৌরাস্তার মোড়ে ডাক্তারদের কো-অপারেটিভ স্টোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এইখানেই মশায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে। কিশোর বললে—কই, বললেন না তো মশায়!

কো-অপারেটিভ স্টোরের বারান্দায় চারুবাবু বসে আছেন। সামনে খালি গেলাসটা রয়েছে। গড়গড়া টানছেন। তিনি বললেন—মশায় না কি?

মশায় হেসে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ।

—গুডনাইট বিগ্ ব্রাদার!

—গুডনাইট।

এটি এখন নিত্য বলেন চারুবাবু। মশায়কে বলেন বিগ ব্রাদার অর্থাৎ বড় ভাই। মশায়ও ওই উত্তর দেন। বলতে বলতেই চলে যান। চারুবাবুও

আবার গড়গড়ায় মন দেন। আজ চারুবাবু নলটা নামিয়ে দিয়ে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন, বললেন—ও মশায়, সীতার যে বনবাসের হুকুম এসেছে। শুনেছেন ?

মশায় উত্তর দিলেন না। কিশোরের হাত ধরে নিজের সঙ্গে আকর্ষণ ক'রে বললেন—কিশোর, সীতার ট্রান্স্ফারের অর্ডার এসেছে।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে অসহায় কাতরতা যেন কান্নার সুরে বেরিয়ে এল।

—সীতার ট্রান্স্ফার হয়েছে ?

—হ্যাঁ। তোমাকে এটা রদ করাতে হবে কিশোর।

কিশোর একটু হেসে বললে—তা না হয় করলাম। [illegible] এত জড়িয়ে পড়লেন কেন ? কি ব্যাপার [illegible] মেয়েটি কি আপনার আত্মীয়টাত্মীয় কেউ ? [illegible] সংকোচ যেন আপনি যেন লুকোতে চান।

—তা চেয়েছি কিশোর।

—মেয়েটি আপনার কে ?

—কে হবে কিশোর ? আমার আপনজন তো সবই গিয়েছে। যারা আছে—তারা ছেড়েছে, কেউ আসে না। আমার জীবনে থাকবার মধ্যে থেকেছে শুধু রোগী। জীবনে আপনজন, যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক—তাদের কাছে হারিয়ে গিয়েছি। জীবনটা শুধু চিকিৎসার নেশায় ওই কর্মেই ডুবে রইল! আমার আর রোগী ছাড়া কে থাকবে বল ; তাই শেষ বয়সে সব হারানো অবস্থায় এসেছে ওই মেয়েটা। ও আমার রোগী। কোনকালে ওকে ছেলে বয়সে আমি নাকি ওকে বাঁচিয়েছিলাম ; ওর তখন শৈশবকাল। কত রোগীই দেখলাম, কত জনই না কঠিন অসুখ থেকে বাঁচল ; কিন্তু অনেক জায়গায়ই তো নিই নি। কিন্তু সে কে মনে রেখেছে বল ? এ মেয়েটার শৈশবকালের কথা—আমাকে ও মনে রেখেছে। সেই কৃতজ্ঞতায় ও ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া করেছে! আমাকে প্রণাম করে বলেছে—আপনি বাঁচিয়েছিলেন তাই আজ এত বড় হয়েছি। এ মেয়ে কত বড় আপনার বল তো!

কিশোর অবাক হয়ে গেল। প্রশ্ন করলে, আপনি ওকে বাঁচিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ওই বললে। ও কে জান? না, তুমি ঠিক চিনবে না। উনিশ শো তিরিশ সালের আন্দোলনে তুমি তখন জেলে। এখানকার সবরে'জস্ট্রি আপিসে এসেছিল এক হেডক্লার্ক। নাম ছিল রামলোচন ঘোষাল। বিধবা মেয়ে, স্ত্রী আর মেয়ের ওই মেয়ে নিয়ে আমাদের গ্রামে বাসা করেছিল। এখানে ছিল মাত্র মাস আষ্টেক। বিধবা মেয়েটির খুব অসুখ নিয়েই এসেছিল। আমিই তার চিকিৎসা ক'রে বাঁচিয়েছিলাম। এবং নাকি বলেছিলাম এবার বাঁচালাম আপনার মেয়েকে কিন্তু খুব নিয়মে যত্নে রাখবেন; বারবার এ রোগ হলে আর বাঁচবে না। মেয়েটি সেরে উঠে আমার ছোট মেয়ের সঙ্গে সই পাতিয়েছিল। এ মেয়েটি তখন কঙ্কালসার শিশু। ওকেও নাকি সারিয়েছিলাম আমি। তারপর একত্রিশ সালের আশ্বিনে যে মারাত্মক ম্যালেরিয়ায় শিশু মড়ক হয়েছিল সেই ম্যালেরিয়ায় এ মেয়েটিও তড়কা হয়ে যায় যায় হয়, তাতেও আমিই নাকি বাঁচাই। ও সেদিন আমার বাড়িতে এসে পরিচয় দিয়ে যখন বললে—আপনি যা বলেছিলেন, ঠিক তাই। ঠিক সেই ভাবেই আমার মা মারা গেছেন। আমি চিনলাম না। কিন্তু আমার স্ত্রী চিনলেন। বললেন—সেই হাড় জিরজিরে মেয়েটা তুই? এমন হয়েছিস? আমি যে তোকে কত কোলে ক'রে তেল মাখিয়ে রোদে ভেজেছি। তখন আমারও মনে পড়ল। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করবার পথ নাই কিশোর। ওর মা বিধবা ছিল না। কুমারী অবস্থায় মেয়েটির জন্ম। রামলোচনবাবু মেয়েকে শেষ পর্যন্ত বিধবার মতই রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু মেয়েটি তাও থাকে নি। ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সীতার বাপ ছিল কায়স্থ। সীতার যাতে মাথা হেঁট হবে তাই কি আমি প্রকাশ করতে পারি? তাই আমি তোমার কাছেও বলিনি। জীবনে এমন সৌভাগ্য হয় না কিশোর; ও আমার পরম সৌভাগ্য। এ পৃথিবীতে আমি যা দিয়েছি—যার কাছে যা পাওনা, ওকে পাঠিয়েই ভগবান সে শোধ করেছেন।

স্তব্ধ হয়ে কিশোর দাঁড়িয়ে রইল। সে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর সে বললে—তাই হবে মশায়। তাই হবে। সীতা এখানেই থাকবে।

পরমানন্দ মাধব! পরমানন্দ মাধব! পরমানন্দ মাধব হে!

হঠাৎ দাঁড়িয়ে নিজের হাতটা দেখলেন। পরমুহূর্তেই ছেড়ে দিলেন। কি করছেন তিনি? সঙ্গে সঙ্গে হাসলেন। একেই বলে ক্ষণ-বৈরাগ্য। তাঁর নিজের যেতে দেরী আছে। আর যাবার ভাবনাই বা ভাবছেন কি করে? মাধবকে পাওয়া হল কই? পান নি তো। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেই তো মাধব আসেন—গায়ে যেন ছোঁয়া দিয়েই সরে যান, আর তিনি ক্ষতি বাস্ত মানুষের মত সেখানে হাত বুলিয়ে তখন বুঝতে পারেন এ তাঁর স্পর্শ, তিনি হাত বাড়াবার আগেই সরে গেছেন। আবার খোঁজেন কাজ কাজ। কাজ নইলে আকাশ বুকে চেপে বসে। সে অসীম শূন্যতার মধ্যে কোথাও তাঁর স্পর্শ নাই, গন্ধ নাই, রূপচ্ছটার চমক নাই, সাড়া নাই। যাবেন--কি নিয়ে যাবেন? যাওয়ার কথা তিনি ভাবছেন কি করে?

—ডাক্তারবাবু।

—কে?

পথের মধ্যেই কে ডাকলে। তিনি মুখ তুলে তাকালেন। সঙ্গে একটা লোক আলো নিয়ে আসছিল—সে তাঁর পিছনে ছিল, আলোর ছটাটা তাঁর মোটা পা দুখানার ছায়া ফেলে সামনের রাস্তার খানিকটা জায়গার উপর শুধু ছড়িয়ে পড়েছে। বাকী আশপাশ উর্দ্ধলোক অন্ধকার। মুখ তুলেও তিনি বক্তাকে দেখতে পেলেন না। চোখে শুধু পড়ল—বাঁ দিকে কতকগুলি আলো, জানলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। বুঝলেন—হাসপাতাল-এলাকা।

—আমি।

—ও। হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার। কি?

—আমাদের ডাক্তারবাবু একবার ডাকছেন। বললেন—তাঁর তো বাড়ি ফেরার এই পথ। যখন ফিরবেন—একবার ডেকো। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর জ্বর। একবার আসুন।

প্রদ্যোত ডাক্তারের স্ত্রীর জ্বর তাঁকে দেখতে হবে? মশায় অকস্মাৎ যেন একটা অপ্রত্যাশিত অতি বিস্ময়কর সংবাদে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি এ বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি অনেকটা অভিভূতের মতই ওই কথাটাই প্রশ্ন করে বসলেন—আমাকে দেখতে হবে?

—হ্যাঁ, জ্বরটা উনি কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছেন। মাঝখানে কলকাতা গিয়েছিলেন তো! দিন চার হল এসেছেন কলকাতা থেকে। আজ সন্ধ্যে বেলা স্বামী-স্ত্রীতে বকাবকিও করেছেন। আটটার সময় আমাকে ডেকে ডাক্তার বললেন—মশায়কে একবার আমার নাম করে ডাকবে। জ্বরটা সন্ধ্যে থেকে বেড়েছে।

ইষ্ট নাম স্মরণ করলেন মশায়। একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তিনি। পরমানন্দ মাধব! চল। এ কি পরীক্ষা?

কম্পাউণ্ডার বললে—একজ্বরী জ্বর আজ দিন পাঁচেক। সন্দেহ করছেন টাইফয়েড। কিন্তু নিঃসন্দেহ তো হতে পারছেন না। রক্তপরীক্ষা সে আরও একদিন দুদিন পর। আজ সকালেও তাই বলেছেন।

ডাক্তার মাটীর দিকে চেয়ে পথ চলেছেন! লাল কাঁকড় বিছানো রাস্তার উপর তাঁর ভারী পায়ের শব্দ উঠছে, কাঁকড়গুলো সশব্দে সরে যাচ্ছে। পিছনের আলোর আলোক-মণ্ডলের মধ্যে তাঁর মোটা পায়ের ছায়া দুলে দুলে এগিয়ে চলছে।

* * * *

লাবণ্যবতী দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি। প্রাণময়ী চঞ্চলা ঝরণার মত কলহাস্যময়ী মেয়েটি নেতিয়ে পড়েছে! শ্যামবর্ণ মুখখানি জ্বরোত্তাপে ঈষৎ রক্তাভ এবং ভারী হয়ে উঠেছে। ভ্রমরের মত কোঁকড়ানো রুক্ষ চুল বালিশের নীচে খোলা রয়েছে, কপালের উপর কতকগুলি উড়ছে। কপালে জলের পটি রয়েছে। চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। ঘরে একটি বিচিত্র গন্ধ উঠছে। ধূপকাঠি, অডিকোলন, ফিনাইল, ওষুধ এই সবের একটা মিশ্রিত গন্ধ। মাথার শিয়রে বসে রয়েছে নার্স। সীতা! হ্যাঁ, সীতাই বসে রয়েছে!

বাবা তাঁর নাড়ী পরীক্ষা বিদ্যার গুরু। তাঁকে স্মরণ করে তিনি মেয়েটির হাতখানি তুলে নিলেন। সেখানি রেখে আর একখানি। সেখানিও পরীক্ষা করে রেখে দিলেন। জ্বর অনেকটা—১০৪½এর বেশী মনে হচ্ছে।

সীতা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতীক্ষা করছে কি বলবেন।

হাসপাতালের ডাক্তার স্ত্রীর মাথার কাছে ঝুঁকে মৃদুস্বরে সস্নেহে ডাকলেন—মঞ্জু!

ভুরু দুটি ঈষৎ উপরের দিকে তুলে চোখ বুঁজেই মেয়েটি সাড়া দিলে—উঁ।

—এখানকার ডাক্তারবাবু জীবন মশায় এসেছেন তোমাকে দেখতে।

মেয়েটি চোখ খুললে, বড় বড় দুটি চোখ, এদিক থেকে ওদিক চোখ বুলিয়ে জীবনবাবুকে দেখে ঈষৎ হেসে আবার চোখ বন্ধ করলে।

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—তোমার জিভটা দেখাও তো।

মেয়েটি জিভ দেখালে।

হাসপাতালের ডাক্তার সীতাকে বললেন—থার্মোমিটার দাও।

জীবন মশায় বললেন—থাক। এর আগে কত ছিল?

ডাক্তার একখানা খাতা এনে চোখের সামনে ধরলেন। একশো চার।

মশায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন—আর কিছু বেড়েছে। আধ ডিগ্রী।

বারান্দায় এসে হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—আপনার নাড়ীজ্ঞান—নাড়ী ধরে ডায়গনেসিসের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা আমি শুনেছি। বলুন তো? টাইফয়েড?

জীবন মশায় একটু দ্বিধা করলেন। বললেন—কাল সকালে দেখে বলব। আজ মন বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। কাল আর একবার দেখে বলব।

—কিন্তু আমি যে ক্লোরোমাইসেটিন দেবো ভাবছি। প্রথম সপ্তাহে জ্বর। বলেই ঘরের দিকে ফিরে বললেন—সীতা, কত দেখলে জ্বর নিয়ে এসো।

সীতা থার্মোমিটার হাতে বেরিয়ে এল—প্রদ্যোত ডাক্তারের হাতে দিয়ে নীরবেই চলে গেল। কিন্তু একটি স্মিতহাস্যে মুখখানি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কারণ থার্মোমিটারে কালো দাগটি একশো সাড়ে চারের দাগের এক সূতো পিছনে এসে থেমে রয়েছে। ডাক্তার বললেন—সাড়ে চারই বটে।

জীবন মশায় বললেন—আর আজ বাড়বে না। আমি কাল সকালেই আসব।

—আমি ক্লোরোমাইসেটিন আনিয়েছি! আজ দিতে পারলে—

—কাল। কাল সকালে। এ রোগে আট ঘণ্টায় কিছু যাবে আসবে না। আর—হাসলেন জীবন মশায়।—রাগ করবেন না তো?

—না। বলুন।

—আপনি উতলা হয়েছেন। আপনার চিকিৎসা করা তো উচিত হবে না।

—নাঃ। আমি ঠিক আছি। তবে কাল ডাকব রেলের ডাক্তারকে।

* * *

পরদিন সকালে জীবন মশায় নাড়ী ধরে দীর্ঘ সময় প্রায় ধ্যানস্থের মত বসে রইলেন।

সকালবেলা। প্রসন্ন সূর্যালোকে ঘর ভরে উঠেছে। দরজা জানালা খোলা, ঘরখানিকে ইতিমধ্যেই বীজাণুনাশক ওষুধ মেশানো জল দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। এক কোণে ধূপকাঠি জ্বলছে। বিছানা চাদর পরিচ্ছন্ন। খাটের পাশে টি-পয়ের ওপর ওষুধের শিশি, ফিডিং কাপ, কয়েকটা কমলালেবু, টেম্পারেচার চার্ট। রোগিণী রাত্রির চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুস্থ। জ্বর এখন কম। ঠোঁট দুটি শুকিয়ে রয়েছে। আচ্ছন্ন ভাবটা কম। তবু চোখ বুঁজেই রয়েছে। মধ্যে মধ্যে মেলছে—কিন্তু আবার নেমে পড়ছে চোখের পাতা। কপালে এখন জলের পটি নাই, কপাল মুখ রক্তাভ শুষ্ক। পরিপূর্ণ আলোর প্রসন্নতা এবং বৈশাখের প্রভাতের স্নিগ্ধতার মধ্যেও রোগিণীর যেন স্বস্তি নাই, মধ্যে মধ্যে নাক খুঁটছে।

নাড়ীর গতি তিনি অনুভব করলেন, ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল :

মন্দং মন্দং শিথিল শিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা—

অতি মন্থর ভারাক্রান্ত পদক্ষেপে স্খলদগতিতে চলছে—অসহায় আকুলতার প্রকাশ রয়েছে তার মধ্যে।—যেন—যেন ব্যাকুল জীবনস্পন্দন ত্রস্ত হয়ে কোন আশ্রয় খুঁজছে। সান্নিপাতিক জ্বরের সমস্ত লক্ষণ সুপরিস্ফুট। ত্রিদোষের প্রকোপ তীব্র। মনে হচ্ছে—। যাক সে-কথা। জীবন মশায় চোখ খুলে তাকালেন হাসপাতালের ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার তাঁরই মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন। সন্তর্পণে জীবন মশায় হাতখানি নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। চাকর দাঁড়িয়ে ছিল সাবান জল তোয়ালে নিয়ে। হাত ধুয়ে মশায় তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বললেন—রোগ টাইফয়েড। নিঃসন্দেহে টাইফয়েডের চিকিৎসা চলতে পারে।

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—সন্দেহ আমারও হয়েছিল। কিন্তু মঞ্জুই আমাকে ধোঁকা ধরিয়েছে। নিয়মিতভাবে আমি টাইফয়েডের টিকে নিয়ে

থাকি। দুমাস আগে ও কলকাতা গিয়েছিল। এই সময়েই আমাদের টিকের সময়টা পার হয়েছে। আমি এখানে টিকে নিয়ে ওকে লিখেছিলাম কলকাতায় রয়েছ, নিশ্চয় যেন টিকে নেবে। ও লিখেছিল—নিলাম। এখানে এল সেদিন—এই তো দিন কয়েক আগে—আমি জিজ্ঞাসা করলাম টিকে নিয়েছ? বললে—নিয়েছি। জ্বর হতে—তিনদিনের দিন থেকে জিজ্ঞাসা করছি। বলছে—নিয়েছি। আজ সকালে স্বীকার করলে।—আমি বললাম—মশায় আমাকে বলে গেছেন টাইফয়েড। তখন নিশ্চয় তুমি ভ্যাকসিন নাও নি। তবে বললে—না—নিই নি। যাক এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ক্লোরোমাইসেটিন দেব। চারুবাবু হরেনবাবু এদের ডেকেছি। একবার জিজ্ঞেস করে নি।

সীতা এসে ঘরে ঢুকল। সে স্নান করে সঞ্জীবিত হয়ে এসেছে যেন। সে বড় প্রসন্ন আজ। মশায় বুঝলেন তার মনের কথা। তাকে ডেকে বললেন—দেখো ভাই, সেবায় যেন এতটুকু অমনোযোগ প্রকাশ না পায়।

প্রদ্যোত ডাক্তার বেরিয়ে এল। বললে মশায়, সীতার ট্রেনিংয়ের ক্যানসেলের জন্যে আমি লিখেছি।

চারুবাবুরা এসে পৌঁছুলেন। মশায়কে দেখে বললেন—বেশ, প্রদ্যোত বাবু, উনি যদি বলেন তো, দিন ক্লোরোমাইসেটিন। [illegible]

ক্লোরোমাইসেটিন। নূতন যুগের আবিষ্কার [illegible] ঔষধ।

দুঃসাধ্য টাইফয়েড, সাক্ষাৎ মৃত্যু-সংহত সান্নিপাতিক, [illegible] বাঁধের গায়ে ভেঙে নদীর প্রচণ্ড বন্যার মত—[illegible] যায় না। প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে—বন্যার মতই [illegible] তবে ক্ষান্ত হয়। সেই শেষ [illegible] বাঁচে। তাও বাঁচে—বন্যাপ্লাবনে মাটি গলে যাওয়া [illegible] যাওয়া পুষ্পোদ্যানের মত। [illegible] হয়।

ব্রজলাল বাবুর দৌহিত্রের টাইফয়েড—[illegible] দেখেছিলেন। সে ক্ষেত্রে কাজ করে নাই। কিন্তু পরে কাজ করবার কথা শোনাছেন। ক্লোরোমাইসেটিন না কি অমোঘ। সান্নিপাতিকদশা মৃত্যুকে না কি তর্জনী-হেলনে অগ্রগমনে নিষেধ করবার মত শক্তিশালিনী। বৃদ্ধ জীবন মশায় বসে

রইবেন উদগ্রীব হয়ে, তিনি দেখবেন। শিশি তিনি দেখেছেন—বিনয়ের ওখানে আছে কয়েক শিশি। তিন শিশি বোধ হয়। একটা কেসে—ওই তিন শিশিই যথেষ্ট। কাল থেকেই না কি জ্বর কমবে। তৃতীয় দিনে জ্বর ছাড়বে : বিস্ময় বই কি!

প্রদ্যোত ডাক্তার ডাকলেন--মঞ্জু! মঞ্জু! হাঁ করো। ট্যাবলেট।

সীতা জল তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে মুখে জল ঢেলে দিলে। চারুবাবু ট্যাবলেটটা মুখে ফেলে দিলেন।

সন্ধ্যায় আবার গেলেন জীবন মশায়। নাড়ী ধরে দেখলেন—জ্বর বেড়েছে। আজ বোধ হয় একশো পাঁচ—মাথার শিয়রে বসে আছে আজ অন্য নার্স। সীতাকে বোধ হয় ছুটি দিয়েছে।

পরদিন সকালেও জ্বর কমল না। আগের দিনের থেকে বেশী।

রোগীর আচ্ছন্নতাও বেশী। পেটের ফাঁপ বেশী।

তৃতীয় দিন। আজ জ্বর উপশম হওয়ার কথা। ছাড়ার কথা। কিন্তু কোথায়? মশায় গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন—কই, ভেষজের ক্রিয়া কই?

হাসপাতালের ডাক্তার --রেলের ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন---তাই তো! তবে কি—?

জীবন মশায় দৃঢ়স্বরে বললেন—রোগ টাইফয়েড। নাড়ীতে রোগ অত্যন্ত প্রবল। এইটুকু আমি বলতে পারি।

প্রৌঢ় চারুবাবু অল্পেতেই ভড়কান—এবং অল্পেই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তিনি দমে গেছেন।—তাই তো। সংসারে মুনিরও মতিভ্রম হয় যে!

জীবন মশায় দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন --না। ভ্রম তাঁর হয় নি।

হাসপাতালের ডাক্তারের চোয়াল দু'টো শক্ত হয়ে উঠল। বললেন—আবার ক্লোরোমাইসেটিন দিন চারুবাবু! নিজের হাতে খুললেন শিশি। তুলে দিলেন রেলের ডাক্তারের হাতে।

সন্ধ্যায় জীবন মশায় দেখলেন হাসপাতালের ডাক্তার দু হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন। রোগিণীর মাথার শিয়রে বসে সীতা। সেই বললে—রক্ত দাস্ত হয়েছে। জ্বর সমান।

জীবন মশায় আজ নিজেই ঘরে ঢুকে রোগীর পাশে বসে হাত তুলে নিলেন। বেরিয়ে এসে প্রদ্যোতের কাঁধের উপর হাত রাখলেন।

ডাক্তার মুখ তুললেন—মশায়?

—হ্যাঁ। আপনি মুষড়ে পড়বেন না। রক্তদাস্ত হোক। হবেই [illegible]। রোগীর নাড়ী আমি ভাল দেখলাম। ত্রিদোষ-প্রকোপের মাত্রা কমেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমার ভুল হয়নি।

ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জীবন মশায় বললেন—আমি আপনাকে মিথ্যা প্রবোধ দিই নি।

দীর্ঘক্ষণ বসে রইলেন তিনি।

স্টেশন থেকে একখানা গরুর গাড়ি এসে ঢুকল। দুটি মহিলা নামলেন। দুজনেই বিধবা, একজন অতিবৃদ্ধা। ডাক্তার এগিয়ে গেলেন।—মা।

—মঞ্জু কেমন আছে বাবা?

—অসুখেই আছে। কিন্তু—ওঁকে আনলেন কেন? ডাক্তার বিরক্ত হয়েছেন।—বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করে কথাটা বললেন।

—কোথায় ফেলে দেব বাবা? ও তো আমায় ছাড়বে না।

—কিন্তু। কোথায় ওঁকে রাখি? কি করি?

—একপাশে থাকবে পড়ে। এখন আর উপদ্রব করে না। কেমন হয়ে গেছে কিছুদিন থেকে। চুপ করেই থাকে। নইলে আনতাম না।

—আসুন।

জীবন মশায়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন—বসুন ডাক্তারবাবু, যাবেন না। আমি আসছি। ইনিই আমার শাশুড়ীর দিদিমা। যিনি মরতে চান না—মরেনও না। চোখ চান কান চান। তিনি।

বসে রইলেন জীবন ডাক্তার।

বৈশাখের আকাশ। গতকাল দুপুরের দিকে সামান্য একটু ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে আজ ধূলিমলিনতা নাই। নক্ষত্রমালা আজ ঝলমল করছে। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন জীবন মশায়। এমন অবস্থায় মন যেন ফাঁকা হয়ে যায়। কোন কিছুতে দৃষ্টি আবদ্ধ করে না রাখলে মন ছুটতে শুরু করবে। কি করলে কি হবে? হাজার প্রশ্ন জাগবে?

কোথায় কি হল? কোন ত্রুটি? জীবন হাঁপিয়ে উঠবে। ছুটতে পারে না—তবু ছুটবে—ছুটতে হবে।

আকাশের ঝলমলানির মধ্যে মন হারিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে বেঁচেছে।

—মাঃ! মাঃ!

—এই যে মা। মঞ্জু। আমি এসেছি মা।

—মাঃ!

—কি বলছিস? কোথায় যন্ত্রণা? কি হচ্ছে? মঞ্জু?

—এ্যাঁ! মাঃ!

—কি বলছিস?

—বাবাঃ। আঁ!

জীবন মশায় হাসলেন।

মা! মা বলছেন—এই যে আমি। তবু রোগী ডাকছে—হয়তো বা পাশ ফিরে শুয়ে ডাকছে—মা! সুদীর্ঘ চিকিৎসকের জীবনে এ কত দেখে এলেন। হায়রে—মানুষ! অক্ষম মানুষ! সে মা কি তুমি? সে মা—আরোগ্যরূপিণী যিনি—তিনি। তাঁর সর্বাঙ্গে অমৃত—তাঁর স্পর্শে শান্ত স্নিগ্ধ হবে রোগীর দেহের রোগজর্জরতা, উত্তাপ কমে আসবে—জীবকোষে কোষে—জীবনবহ্নি স্নিগ্ধ হবে প্রদীপের মত। সকল যন্ত্রণাহরা—সর্বসন্তাপহরা আরোগ্যরূপিণী—তিনিই মা; কে তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি অমৃতরূপিণী, অভয়া, মৃত্যু তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নমস্কার ক'রে দূরে চলে যায়। মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হলেন মশায়। মনে হল মৃত্যু এসে যেন দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। কোন কোণে সে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে রয়েছে। রোগিণী তাই অনুভব করেই ডাকছে অমৃতরূপিণীকে। সতর্ক হয়ে তিনি রোগিণীর দিকে চেয়ে রইলেন। সীতা সযত্নে সুকৌশলে রোগিণীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। রোগিণী শান্ত হয়ে আসছে। বাঃ।

(বত্রিশ)

পরের দিন সকালে।

জীবন মশায় তাঁর দাওয়ার উপর দাঁড়িয়েছিলেন। হাসপাতালের ডাক্তার সাইকেল চড়ে এসে রোয়াকে পা দিয়েই সাইকেলটার গতিরোধ করলেন; নামলেন না। হাঁপাচ্ছেন।

—মশায়, আজ জ্বর নাইণ্টিনাইনে নেমেছে।

—নেমেছে ?

—হ্যাঁ। নাইণ্টিনাইন পয়েণ্ট দুই। ভোরবেলা থেকেই মন্ত্র কথা বলছে—সহজ কথা। বলছে ভাল আছি।

—ভগবানের দয়া আর আপনার অদ্ভুত সাহস—আর দৃঢ়তা।

তরুণ ডাক্তারটি কোন প্রতিবাদ করলেন না এ প্রশংসায়। নিঃসঙ্কোচে হাসিমুখে গ্রহণ করলেন, শুধু বললেন—আপনার জ্ঞানের সাহায্য না পেলে এতটা সাহস পেতাম না মশায়। আচ্ছা আমি যাই। মনের খুশিতে ছুটে এসেছি।

ঘুরল সাইকেল। ডাক্তার দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। সকালের বাতাসে তার রুখু চুলগুলি উড়ছে।

পরমানন্দ মাধব! পরমানন্দ মাধব হে! পরমানন্দ—কলিটা অসমাপ্ত রেখেই ডাক্তার একসঙ্গে হাসলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সুখীদের মধ্যে এই লোকটি একজন। ওই মেয়েটিকে সে জীবন ভরে পেয়েছে। ছেলেটি আর মেয়েটিতে মিলে মানস সরোবর।

কিশোর সেদিন বলেছিল—এই পাওয়াই শ্রেষ্ঠ পাওয়া। এ পাওয়া যে পায়—তার সব পাওয়া হয়ে যায় ডাক্তারবাবু। সৃষ্টি হয় মানস সরোবরের।

কিশোরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বিয়ে করছ শুনলাম, কিন্তু কি হ'ল ?

সে বলেছিল—ভয় হল মশায়!

—কেন ?

—বিয়ে করলে বউ পাওয়া যায় মশায়, কিন্তু যা পাওয়ার জন্যে বিয়ে করে মানুষ—তা পাওয়া যায় না। নারী আর প্রকৃতি ও দুই সত্যই এক। দুদিন পরেই বুকে পা দিয়ে দলে আপনার পথে চলে যায়। কখনও নিজের মুণ্ড কেটে নিজেই রক্তস্নান করে, কখন নিজে স্বামীকে গ্রাস ক'রে ধূমাবতী সাজে, কখনও আবার নিজের বাপের মুখে স্বামী নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করে। কদাচিৎ পুরুষের প্রেমে পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে শান্ত অচঞ্চল হয়ে ধরা দেয়। যাদের ভাগ্যে এই পাওয়া ঘটে—তাদের আর কিছু প্রয়োজন নাই। প্রতিষ্ঠা প্রশংসা সাম্রাজ্য—এমন কি মুক্তিও না।" এর চেয়ে বড় পাওয়া আর নাই। এ কেউ পায় না। ভয়ে পা বাড়িয়ে পিছিয়ে নিলাম। কে জানে—কি ফাঁকি আছে—আমাদের দুজনের মধ্যে। ফাঁক থাকলে তো রক্ষে নাই। নারী তখন নদীর মত ছুটবে আর আমি তীরের মত বাহু বাড়িয়ে সাগরের কূল পর্যন্ত ছুটেও তাকে পাব না। ও থাক। বাহুবন্ধনের মধ্যে ধরা পড়লেই মানস সরোবর।

ওরা মানস সরোবর।

কথাটা সত্য! ভুল নাই। মনে মনে বার বার বললেন জীবন মশায়। হাসপাতালের ডাক্তারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে—সন্ধ্যাবেলায়—আরও ভাল করে এই সত্যটি অনুভব করলেন। সন্ধ্যার দিকে রোগিণীর জ্বর ধীরে ধীরে মগ্ন হয়ে এসেছে এখন।

সীতা স্মিত মুখে ডাক্তার-গৃহিণীর মুখখানি মুছিয়ে দিয়ে বললে—যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

—তোমায় খুব খাটতে হয়েছে, না? শীর্ণ হাসি ফুটে উঠল ডাক্তারের বউয়ের মুখে।

ডাক্তার ছেলেমানুষের মত ছুটে গিয়ে কম্পাউণ্ডারকে বলে এলেন। নার্সদের ওদিকে গেলেন। হাসপাতালের রান্নাশালায় ঝাড়ুদার মাতিয়া জমাদারকে বলে এলেন—ওরে জ্বর ছেড়ে গেছে। জীবন মশায়ের উপস্থিতিও ভুলে গেছেন ডাক্তার।

রোগীর ঘরে ডাক্তারের শাশুড়ী প্রবেশ করলেন—

—যে ভয় তুই ধরিয়েছিলি মঞ্জু! সে কি বলব!

—কে জানে! তিন-চার দিনের কথা আমার কিছুই মনে নেই।

—থাকবে কি ? একেবারে বেহুঁস। মা—মা ব'লে চেঁচিয়েছিস [illegible] ডাকলাম—এই যে আমি। তা' একবার ফিরেও তাকালে না।

—তুমি কবে কখন এসেছ—আমি কিছুই জানি না।

—তোর এই অবস্থা, ওদিকে জামাইয়ের সে কি মুখ ! মুখ [illegible] কান্না উপে গেল। মনে হল মঞ্জুর যদি কিছু হয় তবে জামাই [illegible] হয়ে যাবে।

—পাগল হ'ত না। তবে সন্ন্যাসী হ'ত, হয়তো [illegible]

জীবন মশায় বারান্দায় দাঁড়িয়েই মনশ্চক্ষে [illegible] ক্লান্ত শুষ্ক অধরে স্মিত হাস্যরেখা ফুটে উঠছে, [illegible] এককলা চন্দ্রোদয়ের মত সে হাসির রূপ [illegible] লজ্জা অনুভব করছে না। [illegible] অকুণ্ঠ প্রকাশে হাসিমুখে বিকশিত [illegible]

পরমানন্দ মাধব হে !

ডাক্তার ফিরছেন। পদক্ষেপে উল্লাস ফুটে উঠছে।

— ধরা। ধরিত্রী ! শুনছিস ?

ডাক্তারের শাশুড়ীকে ডাকছেন তার সঙ্গে সেই মেয়েটি। [illegible] দিনই এই কণ্ঠস্বর তিনি শুনেছেন। ভিতরের দিকে বারান্দা থেকে ঐ ডাক ডাকেন। আবছা চোখেও পড়ছে—একটি দীর্ঘাঙ্গী প্রৌঢ়া বিধবা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চুপ করে বসে থাকেন। গালে একটি হাত, মাটির উপর একটি হাত, বসেই থাকেন। মধ্যে মধ্যে ডাকেন—ধরা, ধরিত্রী !

এদিক থেকে সাড়া দিত না কেউ। রোগীর শিয়রে বসে সাড়াই বা দেবে কি করে ? চুপ করে যেতেন ভদ্রমহিলা। মহিলাটিকে দেখে মনে হয় একদিন জীবনে তার জীবনমহিমা ছিল। কিছুক্ষণ পর আবার ডাকতেন—

—ধরা ! ধরিত্রী। অ-ধরিত্রী ! হ্যাঁ লা, মেয়ে তোর রয়েছে কেমন ? বল ? ঘরে ঢুকতে বারণ করেছিস—ঢুকি নে। তবু খবরটা বল !

সাড়া এতেই বা কে দেবে ? তিনি চুপ করতেন।

আজও সেই তিনিই ডাকছেন। সেই ডাক। আজ ধরিত্রী সাড়া দিলেন —বল ! কি চাই ?

—কি চাইব? হ্যাঁ লা, তুই নাতনী—মেয়ের মেয়ে, মঞ্জু তার মেয়ে, তার এখানে এসেছি—তাই লজ্জা—চাইব কি?

—তবে? কি বলছ?

—বলছি, মঞ্জু তো ভাল রয়েছে—একবার যাই না ওঘরে—ওকে দেখি! চোখে তো দেখব না, একবার মুখে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

—একটু অডিকলন মাখবে না? এ কণ্ঠস্বর মঞ্জুর। সে হেসে উঠল, দুর্বল কিন্তু সশব্দ হাসি।

—তা ভাই দিস যদি মাখব। ক'দিন এখানে এসেছি—মাথায় তেল দিই নি। নারকেল তেল দেয় নামিয়ে। ও তো ভাই মাখতে পারি নে, কি করব। রুক্ষু মাথাতেই চান করি। অডিকলন নয়, একটু গন্ধ তেল দিস।

—চুপ কর, জামাই আসছেন—দিদিমা চুপ কর।

ডাক্তার আসছেন—মঞ্জুর মা দেখতে পেয়েছেন। তিনি সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন ওই মহিলাটিকে। বৃদ্ধা ওঁর মায়ের মা। এবং পোষ্য।

একটু বেদনা অনুভব না ক'রে পারলেন না জীবন মশায়।

—কই তোর জামাই, কই? একবার ডেকে দে না আমার কাছে। আমি আজ না হয় পথের ধূলোর অধম হয়েছি, ঘরে গেলে ঘর নোংরা হয়, ছুঁলে হাত ময়লা হয়। কিন্তু চিরদিন তো এমন ছিলাম না! আমারও রূপ যৌবন ছিল। আদর সম্ভ্রম ছিল। তার উপর আমি মঞ্জুর মায়ের মায়ের মা। সেদিক থেকেও তো আমার সঙ্গে কথা বলতে হয়!

—কি? কি বলছেন? ডাক্তার শুনতে পেয়েছেন কথাগুলি। বারান্দায় উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। এ অবস্থায় মঞ্জুর মায়েরও দিদিমাকে সাবধান করার উপায় ছিল না। ডাক্তারের মন আজ পরম প্রসন্নতায় ভরা। তিনি হেসেই উত্তর দিলেন—নিশ্চয়; কথা বলব বৈ-কি। আপনি গুরুজন। তবে মঞ্জুর অসুখ নিয়ে—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ ভাই। তা বটে। যে লজ্জা, যে ভয় হয়েছিল আমার। ভেবেছি—কেন এলাম? আমি সর্বস্বখাগী। স্বামী খেয়েছি, তাকে খেয়ে গেলাম মেয়ের ঘরে, সেখানে মেয়েকে খেলাম। তোমার শাশুড়ীকে মানুষ করলাম—সেই জামাইয়ের ঘরে—তার অন্ন খেয়ে, মেয়ের সতীন এল—তার

কথা শুনে ; তারপর ধরার বিয়ে হ'ল—ধরার বাড়ি এলাম, ধরা বিধবা হল। আবার এখানে—এখানে কেন এলাম? তা' যার জন্যে এসেছি—সে জান তো? আমার চোখ দুটি ভাল করে দাও। বড় ডাক্তার তুমি!

—আচ্ছা, আচ্ছা। কালই আমি ওষুধ দোব।

—ওষুধ নয়—অপারেশন ক'রে দাও।

—অপারেশন কি হবে? ছানি তো নয়?—

উঁহু—অপারেশন না করলে ভাল হবে না। অপারেশন করলেই ভাল হবে। কতজনের ভাল হ'ল।

—আচ্ছা, দেখব কাল ভাল ক'রে! তা হলে আমি বাইরে যাই। আপনার কোন কষ্ট-টষ্ট হচ্ছে না তো?

—হচ্ছে ভাই। মাথায় একটু ভাল তেল চাই। আর কাপড়গুলি বড় পুরনো হয়েছে।

ঘরের ভিতর থেকে ডাক্তারের লজ্জিতা শাশুড়ী বললেন—করবে কি? উপায় কি বল? কাপড়ের কণ্ট্রোল—বিশ্বসুদ্ধ লোক কাপড়ের অভাবে ছেঁড়া পরে দিন কাটাচ্ছে।

—তা বটে, তা বটে ভাই। তবে মঞ্জুর দুখানা আধপুরনো শাড়ি দিস। তাই পরব।

মঞ্জু হেসে উঠল। —রঙীন ডুরে শাড়ি—

—তাই পরব। তবু ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত কাপড় পরতে পারি না।

ডাক্তার বারান্দায় জীবন মশায়কে দেখে একটু লজ্জা পেলেন। তাঁর মনেই ছিল না জীবন মশায়ের অস্তিত্বের কথা। মনের উল্লাসে ভুলেই গেছেন।

—আমার দেরি হয়ে গেল জীবনবাবু।

—তা হোক।

—ও ভাই—ও মঞ্জুর বর! শুনছ!

কি বিপদ! ডাক্তার এবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন। হয় তো বা ওই মহিলাটির কথা জীবন মশায় শুনেছেন বুঝে মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন। মহিলাটির উপর তো বটেই—হয়তো জীবন মশায়ের উপরেও বিরক্ত হয়েছেন। জীবনবাবুর শোনা উচিত হয় নি, চলে যাওয়া উচিত ছিল।

জীবন মশায় বললেন—আমি আজ যাই।

—বসবেন না একটু?

—না, আবার কাল আসব।

—আচ্ছা। মঞ্জু যেদিন পথ্য পাবে সেদিন একটা খাওয়া-দাওয়া করব।

—বেশ তো।

—পথ্যের দিন নির্ণয় কিন্তু আপনি করবেন। ক্লোরোমাইসেটিনে জ্বর ছাড়ে, কিন্তু আবার রিল্যাপ্স করার একটা ভয় আছে। আপনি যে দিন বলবেন নাড়ী নির্দোষ হয়েছে—এবার পথ্য দেওয়া যেতে পারে, তখন দেব। রক্ত দাস্ত যখন হয়েছে, তখন পারফোরেশন হয়েছে নিশ্চয়। পথ্য খুব হিসেব ক'রে দিতে হবে।

ওদিকে সর্বরিক্ত দীনাতিদীন মহিলাটি ডেকেই চলেছেন—অ-ভাই! শুনছ! একটু অপেক্ষা করে আবার ডাকছেন—মঞ্জুর বর! আবার ডাকছেন—অ ডাক্তার সায়েব।

মঞ্জুর মা একবার চাপা গলায় বললেন—থাম দিদিমা, কথা বলছেন জামাই—ডাক্তারের সঙ্গে।

—ডাক্তারের সঙ্গে? কোন্ ডাক্তার?

—উনি কবিরাজ। যিনি খুব ভাল নাড়ী দেখেন! চুপ করলেন মহিলাটি।

ডাক্তার সিঁড়ির কাছে এসে বললেন—এখনও পারফেক্‌শন হয়নি ওষুধটার। তবে হবে।

—নিশ্চয় হবে। মানুষের সাধনা—। ঈশ্বরকে দেখা দিতে হয় মানুষের সাধনায়।

আবার মহিলাটি ডাকলেন—ধরা, কথা শেষ হল? আমি একটা কথা বলছিলাম।

এবার প্রদ্যোত ডাক্তার বোধ হয় ক্ষেপে উঠলেন। মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—বলেছি তো কাল চোখ কেটে দেব। যা হয় হবে আপনার।

—না। তা বলিনি ভাই।

—তবে? কাপড়? তাও এনে দেব।

—না।

—তবে কি ?

—ওই যে ডাক্তার, যিনি নাড়ী দেখেন ভাল—

—হ্যাঁ—তিনি কি করবেন ? তিনি তো অপারেশন করেন না !

—না—না। তাঁকে একবার হাত দেখাব।

—হাতে কি হল আবার ? বেশ তো শক্ত রয়েছেন। এখন তো কোন অসুখ নেই।

—হাত দেখাব, শুনেছি নাকি হাত দেখে নিদান হাঁকতে পারেন। কবে মরব—সেইটে জানব। তুমি ওঁকে বল, মঞ্জরী—মঞ্জরীর হাত দেখতে হবে। ওঁর মাস্টারের মেয়ে মঞ্জরী আমি। কাঁদির অমুক বসুর স্ত্রী মঞ্জরী! উনি চিনবেন।

বৈশাখের বর্ষণধৌত নির্মেঘ নক্ষত্র-ঝলমল আকাশ অকস্মাৎ কোমল নীলাভ দীপ্তিতে ভরে গিয়ে একটা উল্কা খসে গেল বুঝি। জীবন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

মঞ্জরী !

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—চেনেন না কি ডাক্তারবাবু ?

—চিনি। খুব চিনি। আপনার আপত্তি না থাকলে ওঁকে আমি দেখব।

—বেশ তো। আজই দেখবেন ?

—ক্ষতি কি ?

ডাক্তার মিত্তির হাসলেন। বললেন—হ্যাঁ, তবে রোগের একখানি ডিপো। স্বামী ছিলেন খুব অমিতাচারী।

—জানি।

—তাঁর অমিতাচারের বিষ আছে রক্তে। নিজের রসনার লোভের ফলে—স্টমাক-ইন্টেস্টাইন হয়েছে ব্যাধিগ্রস্ত, পুষ্টির অভাবে দেহকোষ হয়েছে দুর্বল মনের অশান্তি—তাও ক্রিয়া করেছে। চোখ গেছে। কানেও একটু খাটো। কোলাইটিস লেগেই আছে, শীতে হাঁপানি হয়, শিরঃপীড়া আছে, মধ্যে মধ্যে জ্বর। তবে শক্ত দেহ ; সহ্য করেই বেঁচে রয়েছেন। চুরি ক'রে খান—।

থেমে গেলেন ডাক্তার। মনে হ'ল আর বলা অন্যায় হবে।

মঞ্জরী চুরি ক'রে খায়, চুরি ক'রে গন্ধদ্রব্য মাখে, হাতে অনুভব ক'রে যার হোক খরখরে দেখে—পরিচ্ছন্ন বুঝে কাপড় টেনে নিয়ে পরে।

সে-সব কথা নিজেই বললে মঞ্জরী।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বিয়ের সম্পর্কের কথা, সে সব ঘটনার কথা মনেই নেই মঞ্জরীর। হঠাৎ বললে—আচ্ছা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাও হয়েছিল—নয় ?

—হাঁ। জীবন দত্ত হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল এল। মঞ্জরী মানস সরোবরের মতই ভূপী বোসের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছিল।

মঞ্জরী আবার বললে—প্রথমটা আমার খটকা লেগেছিল। জীবন মশায় কে ? তারপর তোমার কথা শুনে—ঝোঁক দিয়ে দিয়ে কথা বল তুমি। গলার আওয়াজ পাল্টেছে—ভারী হয়েছে—তবু ওই ঝোঁক শুনে মনে হ'ল—নাম এক—নাড়ীজ্ঞান খুব ভাল! সেই নয় তো? তারপর মনে হ'ল নবগ্রাম! সেও নবগ্রাম—এও নবগ্রাম। মাথার গোলমাল তো; মাঝে মাঝে মনে পড়ে সব—আবার। হাত নেড়ে দিলে সে।

হাসলে সে একটু। তারপর বললে—এখন মনে পড়ছে কত। এখন—হাত দেখে বল দেখি—মুক্তি কত দিনে পাব ?

জীবন মশায় এতক্ষণে তার হাতখানি তুলে নিলেন। চোখ বন্ধ করলেন তিনি।

জ্বর লেগেই আছে নাড়ীতে। ব্যাধিজর্জর অভ্যন্তর। উদ্বেগকাতর চিত্ত। নাড়ীর স্পন্দনে স্পন্দনে—বলছে। দেহকোষে কোষে, আকাশের নক্ষত্রমালার মত যে জীবনশিখাগুলি জ্বলে প্রাণদেবতার আরতি করে—তাঁকে মধুময় উত্তাপে অভিষিক্ত করে, তার অনেকগুলি নিভে গিয়েছে। সে ছায়ার দৈত্যের স্পর্শ অনুভূত হচ্ছে—নাড়ীতে, রক্তসঞ্চালনের ক্ষীণ গতিতে। জীর্ণতার শেষ সীমারেখায় উপনীত হতে আর অল্প পথই বাকী।

—তোমার হাত আর পা দেখি মঞ্জরী!

—হাত দেখ। পা কি দেখে? তবে যা জানতে চাচ্ছ তা' বলি। [illegible] মধ্যে [illegible]। মধ্যে মধ্যে কমে, কখনও বা বাড়ে।

আবার হাত ধরলেন। এবার অন্য হাতখানি।

তারপর বললেন—মুক্তি তোমার আসছে মঞ্জরী। দেরী নাই। তিন মাসের মধ্যেই আসবে। তবে—।

—তবে ?

—নতুন কালের ওষুধ খেয়ো না। এ কালের ওষুধ বড় শক্তিশালী। মুক্তিকে পিছিয়ে দেবার শক্তি রাখে। তবে শিরঃপীড়ার একটা মুষ্টিযোগ আমি দেব। ভাল হবে না, যন্ত্রণা উপশম হবে। তিন মাস। তিন মাসের মধ্যে তোমার মুক্তি হবে।

মশায় উঠলেন।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবার পথে মনে পড়ে গেল বাবার কাছে শোনা সেই মৃত্যুর পুরাণ কথা। পিঙ্গলবর্ণা কন্যা, পদ্মবীজের মাল্য-ধারিণী, তার কথা, সেই গল্প! মনে হল—খানিকটা যেন বলেন নি তাঁর বাবা। সেটুকু বোধ হয় বলতে নেই। অনুভবে বুঝতে হয়। ওই মৃত্যু কাঁদল—তার অশ্রু থেকে সৃষ্টি হল রোগের। স্রষ্টা তাকে অন্ধ করলেন, বধির করলেন, কিন্তু তার হৃদয়ের মমতা করুণা? সে গেল কোথায়? তাই থেকে বোধ করি সৃষ্টি হয়েছে ভেষজের এবং মৃত্যুর মধ্যের মহাশান্তির! মঞ্জরী—সেই মহাশান্তিকে লাভ করুক! সেই তো মুক্তি!

পরমানন্দ মাধব হে! পরমানন্দ হে! মাধব হে। পরমানন্দ হে!

ভারী পদক্ষেপে—মহাগজের মতই অন্ধকার পথ অতিক্রম করে তিনি চললেন। ইচ্ছা হল সেই মহাগর্তের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন, গভীর নিবিড় থমথম করছে মহাঅরণ্য অসংখ্য কোটি ঝিল্লীর ঐকতানে, মনে হচ্ছে—যেন সেই মহাশূন্যতার মধ্য দিয়ে চলেছে—জন্মজন্মান্তর, সেইখানে উল্লাসধ্বনি ক'রে—নবজন্মের আশায় তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়েন।

এ জন্মের সকল স্বাদ গ্রহণ করা আজ তাঁর শেষ হয়ে গেছে। থমকে দাঁড়িয়ে তিনি আকাশের নক্ষত্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—দাদু।

এসে দাঁড়াল সীতা।

—কে ?

—আমি দাদু। এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন দাদু ? আমি না এসে পারলাম না।

—তোমার নামটা কি বল তো ? ঠিক ঠাওর করতে পারছি না তো !

—ঠাওর করতে পারছেন না ? আমি সীতা। কি হল আপনার ?

—ও সীতা ! আমি ভাবছিলাম।

—কি ভাবছিলেন ? শরীর ভাল আছে তো ?

—আছে ভাই আছে। হাসলেন মশায়। তারপর অগ্রসর হলেন আবার। সীতা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

(তেত্রিশ)

আড়াই মাস পর।

উনিশ শো একান্ন সালের আগস্ট মাস। তেরোশো আটান্ন সালের শ্রাবণ।

জীবন মশায় মাঠের মধ্যে বসে আছেন। রক্ত সন্ধ্যায় আকাশ ভরে উঠেছে। জীবনে কখনও ডাক্তার এমনভাবে মাঠের মধ্যে বসে থাকেন নি। প্রকৃতি তাঁকে কখনও আকর্ষণ করে নি। আজ মাঠে এসেছিলেন—নতুন ক্যানেল হয়েছে—সেই ক্যানেলে জল আসছে আজ, সেই দেখতে এসেছিলেন। এদিকে সামনে হাসপাতালটারও সাদা রঙের উপর সূর্যাস্তের ছটা পড়েছে।

আজ প্রকৃতির মধ্যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। কখনও হয়নি এমন। তিনি যেন ডুবে গেলেন আনন্দের সমুদ্রে। এ এক নূতন আস্বাদ। অপ্রত্যাশিত উত্তরায়ণ। নূতন লোক।

আজই সংবাদ এসেছে—হাসপাতালের ডাক্তার সীতাকে পাঠিয়েছিল—মঞ্জরী মুক্তি পেয়েছে। মঞ্জরী মরেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস তিনি ফেলেছিলেন।

পরমানন্দ মাধব হে!

সেই মাধবের স্পর্শ যেন প্রকৃতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে। কলকল শব্দে ক্যানেলের জল বয়ে চলেছে। লাল ফেনিল আবর্ত নাচতে নাচতে চলেছে। পাশের মুখ দিয়ে জল মাঠে ঢুকছে। ছড়িয়ে পড়ছে নিঃশব্দে মাঠের বুকে—আকাশের মেঘের স্তরে স্তরে লাল রঙ, গাঢ় ফিকে—নানা সংমিশ্রণে নানা রঙ। মাঠের মধ্যে কয়েকটা কেয়ার ঝাড়ে ফুল উঁকি মারছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা। যারা দেখতে এসেছিল ক্যানেলে জল-আসা, তারা ফিরে গিয়েছে।

তিনি একা বসেই আছেন।

মনে হচ্ছে—এখানে একাই বাকী কালটা বসে কাটিয়ে দিতে পারেন।

গোটা প্রকৃতিকে জুড়ে তাঁর দেবতা যেন অঙ্গবিস্তার করে দিয়েছেন। সেই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে তিনি বসে আছেন।

গাঢ় সবুজের উপর সূর্যের রক্তরশ্মি ধারা ছড়িয়ে পড়েছে। ওরই মধ্যে ও কে? ওই দূরে যেন কে আসছে! হ্যাঁ আসছে। হাসপাতালের ফটক

—বেরিয়ে বেরিয়ে আসছে সীতা। একাই চলে আসছে। করুণার মত মৃত্যুর মত ওই মেয়েটি! তাঁর জীবনে মৃত্যু কখনও ভয়ঙ্করী বেশে আসবে না। অমৃতময়ী রূপ নিয়েই তাকে আসতে হবে। সে রূপ তিনি যখনই মনে মনে আঁকতে চেষ্টা করেন তখনই মনে ভেসে ওঠে সীতার রূপ।

অমৃতময়ী মৃত্যুর মতই একা শান্ত পদক্ষেপ চলে আসছে সীতা।

তিনি প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে চেয়ে রইলেন।